স্যার আবদুর রহীম
এর

ইসলামী আইনতত্ত্ব

গাজী শামছুর রহমান

স্যার আবদুর রহীম-এর

ইসলামী আইনতত্ত্ব

গাজী শামছুর রহমান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামী আইনতত্ত্ব

মূল : স্যার আবদুর রহীম

অনুসৃতি : গাজী শামছুর রহমান

প্রচ্ছদ : এম, এ, কাইয়ুম

ই, ফা, প্রকাশনা : ১৩৬

গ্রন্থাগার নং : ৩৪০'৫৯

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৪ আশ্বিন ১৩৯১ মহররম, ১৪০৫

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষে শেখ তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত ; বেঙ্গল প্রেস ৭৩, লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা—১ কর্তৃক মুদ্রিত এবং আবুল হোসেন এণ্ড সন্স, ১/বি গোলাম মোস্তফা লেন, ঢাকা-১ কর্তৃক বাঁধাইকৃত।

মূল্য : ৪৫'০০ টাকা।

ISLAMI AYEENTATTA : Muhammedan Jurisprudence by Sir Abdur Rahim in English, translated and adapted by Ghazi Shamsur Rahman and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.

Price : Tk, 45·00, U S,Dollar 4·50

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণ : প্রকাশকের কথা

যাহা আইন, তাহা অবশ্য পালনীয়। আইনের প্রত্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটি বাধ্যবাধকতার ভাব বিদ্যমান। আইন যিনি প্রবর্তন ও প্রয়োগ করেন, তিনি তাহা বাস্তবায়নের বিধানও সঙ্গে সঙ্গে দিয়া দেন। স্বেচ্ছায় আইন না মানিলে শক্তি প্রয়োগে তাহা মানাইতে হয়। আইনের পশ্চাতে শক্তি কাজ করে।

শুধু শক্তি নয়, আইনের পশ্চাতে যুক্তিও আছে, অন্ততঃ ইসলামী আইনে। বর্তমান গ্রন্থে সেই যুক্তির বিবরণ প্রাপ্তব্য। ইসলামী আইন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইসলামী আইনতত্ত্ব (Juris-prudence) সেই যুক্তির সন্ধান দেয়।

শক্তি প্রয়োগের ভয়ে আইন মানা আর যুক্তির প্রবর্তনায় আইন মানা ভিন্ন বস্তু। দ্বিতীয়টি অনেক উচ্চস্তরের।

বাংলাদেশের আইন-সাহিত্যে যিনি একক পথিকৃৎ এবং যাঁহার মনীষা এই ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত, তিনি বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। আশা রাখি, বইখানি বিদগ্ধজনের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে সক্ষম হইবে।

১৯৮০

শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ : আমাদের কথা

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

১৫-৮০-১৯৮৪ প্রকাশক।

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামী আইনের উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস। কুরআন শরীফের মধ্যে ইসলামী আইনের মৌলিক ইঙ্গিত রয়েছে এবং হাদীস শরীফে তার ব্যাখ্যাগত বিন্যাস আমরা পেয়েছি। হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাদীসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই সমস্ত ব্যাখ্যায় মূল আইনের তাৎপর্যের উপর বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইমাম আবু হানিফা কোনও একটি বিষয়ের উপর যে প্রকারের গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অবিকল সেই গুরুত্ব ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হয়তো দেন নি। কিন্তু এঁদের উভয়ের প্রতিবেদনের মধ্যে ব্যাখ্যাগত পার্থক্য কিছুটা থাকলেও মূল উৎসটা চিরন্তন থাকছে, কারণ তার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন শরীফ। সেই কারণেই বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে কুরআন শরীফের যথার্থ তাৎপর্য নির্ধারণ করবার অধিকার প্রতিটি মুসলমানের থাকে। যাঁরা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ তাঁদের উপর দায়িত্ব তাই গুরুতর—তাঁদেরকে এই মূল তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হয়।

বাংলাদেশে যাঁরা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন তাঁদের সাধারণত আরবী ভাষায় জ্ঞান নেই এবং সে কারণেই তাঁরা মূল উৎস থেকে অর্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন না। অবশ্য আমাদের দেশের আলিমগণ ফিকাহ ও ফারায়েজের ব্যাখ্যাকার হিসাবে বহুদিন ধরে কাজ করে আসছেন এবং তাঁরা ফতোয়াও দিয়ে থাকেন কিন্তু তাঁরা আবার যথার্থ অর্থে আইনজীবী নন।

অন্যান্য আইনগুলো আমাদের দেশে লিখিত ও বিধিবদ্ধরূপে পাওয়া যায় কিন্তু ইসলামী আইন আমাদের দেশে এরকম বিধিবদ্ধ রূপে পাওয়া যাচ্ছে না। কুরআন এবং হাদীসে যে সমস্ত আদেশ আছে সেগুলো বিধিবদ্ধ আইনের রূপে একত্র গ্রথিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি।

যেহেতু ইসলামী আইনের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্, তাই প্রয়োগের পূর্বে একজন আইনজ্ঞকে এ আইন খুঁজে বের করতে হয় এবং তার

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আইনতত্ত্বের ইসলামী প্রতিশব্দ ফিকহ। ফিকহ সম্পর্কে তাই কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

ফিক্‌হ (فقه) শব্দটির মূল অর্থ 'উপলব্ধি' ও 'কোনকিছুর জ্ঞান'। আরবী প্রবাদ আছে (فلان لا يفقه و لا ينقه)। আল-জাওহারী অনুযায়ী এর অর্থ—অমুক ব্যক্তি না বুঝতে পারে, না পারে অনুমান করতে। আদিতে উট বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে, ফিক্‌হ শব্দটির ব্যবহার আরবে প্রচলিত ছিল। যারা দেখেই বলে দিতে পারত কোন উটটি কামাসক্ত আর কোন্‌টি গর্ভবতী, তাদের বলা হত فحل فقيه। ফিক্‌হ শব্দটি, কোন বস্তু সম্পর্কে 'সঠিক উপলব্ধি' ও 'গভীর জ্ঞান'র অর্থ এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। হিজরী ৫ম শতকের গোড়ার দিকে ছা'লাবী রচিত একটি গ্রন্থের নাম ফিকহ-আল-লোগাত, (فقه اللغات—ভাষা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞান)। আইনের কোন কথাই সে গ্রন্থে নেই বরং সেটি আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের সহায়ক কতকগুলি নিয়মবিধির সমাবেশ। ইসলাম পূর্ব যুগে 'ফিক্‌হ-আল-আরব' (فقه العرب) শব্দটি হারিছ ইবন কালাদার নামের সাথে যুক্ত ছিল। বিজ্ঞতার খ্যাতি হিসেবে তাঁর অনেক নাম ছিল 'তাবীবুল আরব' (طبيب العرب)। এই শেষোক্ত শব্দটির ভাবার্থ প্রথমটির সাথে অভিন্ন।

আল-কুরআনে ফিকহ শব্দটি একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে 'উপলব্ধি' অর্থে। বলা হয়েছে (ليتفقهوا في الدين) (তারা যেন ধর্মে উপলব্ধি লাভ করতে পারে); এ থেকে বোঝা যায়, নবীর যুগে ফিকহ শুধু আইন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত দিকসমূহের একটি ব্যাপক অর্থ বহন করেছে। শব্দটি মূল অর্থ হতে কিভাবে তার ব্যবহারিক অর্থে বিবর্তিত হয়েছে, সেটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শুধু ফিক্‌হ নয় আরো কয়েকটি শব্দ যেমন ইলম, ঈমান, তওহীদ প্রভৃতি আদিকালে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলি বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলমানগণের বিজিত ভূখণ্ডে অমুস-লিমদের সাথে সংস্পর্শ, ইসলামে বহুবিধ আইনতত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার—এই নানাবিধ কারণে মুসলিম সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সাথে বহু ইসলামী শব্দ সহজ সরল আদি অর্থের পরিবর্তে বিশেষ অর্থে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়। ইসলামের আদি যুগে ফিক্‌হ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হত ইসলামের জ্ঞান অর্থে। ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করতে গিয়ে আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছিলেন (اللهم فقهه فى الدين) "হে আল্লাহ তাকে ধর্মের জ্ঞান দান কর"। এখানে নবী (সাঃ) যে শুধু আইনের জ্ঞানের কথা বলেননি, বরং সাধারণভাবে ইসলামের গভীর জ্ঞানের কথাই বলেছেন, সে কথা সুস্পষ্ট। বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) এর কাছে এসে কয়েকজন আরব বেদুইন তাদের গোত্রীয় লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা বলেছিল (يفقهو فنا فى الدين)। তারা অবশ্যই ধর্মীয় বিধি বিধান বাদ দিয়ে শুধু আইনতত্ত্ব শিক্ষার কথা বলেননি। এ সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, ফিক্‌হ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত; এর দ্বারা যেমন ইসলামী আইন বোঝাতো, তেমনি বোঝাতো তার সকল দিক।

আদি যুগে ফিক্‌হ শব্দটির মধ্যে সুফীবাদের ভাবার্থও নিহিত ছিল। এহইয়া উল উলুম-আল-দীন গ্রন্থে গায্‌যালী (রঃ) উল্লেখ করেছেন, সুফী ফারকাদ (মৃত্যু আঃ ১৩১ হিঃ) কতকগুলি বিষয়ে আলোচনাকালে হাসান বসরীকে বললেন 'ফোকাহা'রা (فقها ر) তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবে। জবাবে হাসান বসরী বললেন তিনিই প্রকৃত ফকীহ (فقيه) যিনি পার্থিব জগত সম্পর্কে উদাসীন, পরকালে আগ্রহী, ধর্মসম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, ইবাদতে সুনিয়মিত, আচরণে সৎ, মুসলমান ভাইদের কখনো অসম্মান করেন না এবং সমাজের কল্যাণ কামনা করেন। ইসলামের আদিযুগে শব্দটির

www.pathagar.com

এরূপ উদার ব্যবহারের কারণ সম্ভবত এই যে, গোড়ার দিকে ধর্মের মূলনীতিসমূহের ওপর জোর দেয়া হত। লোকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকসমূহ নিয়ে লিপ্ত হত না। এখান থেকে বোঝা যায়, এই শব্দটি নিছক বুদ্ধিগত উপলব্ধি ছাড়া আরো কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করত, সেগুলি হল প্রগাঢ় বিশ্বাস, কুরআনের জ্ঞান, ইবাদতের নিয়ম কানুন এবং ইসলামের অন্যান্য সাধারণ নির্দেশাবলী।

'কালাম' ও ফিক্‌হ দুটি স্বতন্ত্র ইসলামী শাস্ত্র। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এদের কোনটিই স্বতন্ত্র সত্তায় বিকশিত হয়নি। এযাবত কাল ফিক্‌হর দ্বারা যেমন আইনের বিষয়সমূহ বোঝাত, তেমনি ধর্মতত্ত্বের নানান প্রশ্নও এর অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। আবু হানিফা (মৃত্যু ১৫০ হিঃ) ফিক্‌হ-আল আকবর (فقه الا كبر) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ওই গ্রন্থে তিনি ঈমান, আল্লাহর একত্ব, তার গুণাবলী (صفات) মৃত্যুত্তোর জীবন, নবুওত প্রভৃতি ইসলামের মৌল বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। এসব বিষয় প্রকৃতপক্ষে কালাম শাস্ত্রের অন্তর্গত; আইন বিজ্ঞানের নয়। অতএব এই গ্রন্থের নাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিক যুগে ফিক্‌হর মধ্যে কালামের ভাবার্থও অন্তর্নিহিত ছিল। ফিক্‌হর এরূপ উদার অর্থ প্রচলিত ছিল বলেই আবু হানিফা ফিক্‌হর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'স্বীয় অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যক্তির চেতনা' (معرفة النفس مالها وما عليها)। যখন ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হয় এবং একেক দল একেক ব্যাখ্যা নিয়ে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন এই চিন্তা ও মতবাদের বিভিন্নতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এসময় আবু হানিফা ঘোষণা করেন علم ان الفقه فى الدين افضل। 'দীন' এর জ্ঞান 'আহকাম'-এর জ্ঞান অপেক্ষা ভাল'। 'দীন-এর অর্থ, স্পষ্টতই তিনি গ্রহণ করেছেন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ। কেননা, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও অন্যান্য সমজাতীয় বিশ্বাসসমূহকেই তিনি অভিহিত করেছেন 'ফিক্‌হ আল আকবর' (فقه اكبر) বা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান বলে। আল-শাহরিস্তানী 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে লিখেছেন, কালাম শাস্ত্রের সূচনা হয় সর্বপ্রথম আব্বাসীয় খলীফা আল মামুনের যুগে, গ্রীক দর্শনসমূহ যখন আরবীতে

www.pathagar.com

ভাষান্তরিত হয়, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন এই শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং দেখা যায়, স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে কালাম-এর অস্তিত্বলাভের পূর্বে এই শাস্ত্রের বিষয়সমূহ ফিক্‌হের পরিধিভুক্ত ছিল।

আদি যুগে ফিক্‌হ ইসলামী জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট শাখা হিসেবে পরিচিত ছিল না। ইল্‌ম (علم) শব্দের ব্যাপক অর্থে ফিক্‌হের ধারণা অন্তর্লীন ছিল। ইবনে সা'দ-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, ২৪ হিজরী সালে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের সময় ইবনে মাসউদ মন্তব্য করেছেন, "দশ ভাগের নয় ভাগ 'ইল্‌ম' তাঁর সঙ্গে অন্তর্ধান করেছে।" উল্লেখ করা যেতে পারে, হযরত ওমর শুধু ইসলামের ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, খলিফা হিসেবে তিনি ধর্মীয় নানা বিষয় স্থির ও বিধিবদ্ধ করেছেন। এখানে ইবনে মাসউদ 'ইলম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে ফিক্‌হের বিষয়বস্তুও বিদ্যমান। নবী (সাঃ)-এর পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন। যেগুলির সমাধান নবী (সাঃ) স্বয়ং দিয়ে যাননি, সেরূপ অবস্থায় তাঁরা ধর্মীয় মূল নীতিমালার আলোকে নিজেদের বিচার বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে এরূপ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফিক্‌হ শব্দটির প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় উত্তরোত্তর বর্ণনাকারীদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের এক অব্যাহত ধারা সূচিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহর বাণী-মালা (যে ভাষায় তিনি বলেছিলেন), তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁর গোচরীভূত কোন কথা বা কাজের তাঁর মৌন সমর্থনের বর্ণনা 'হাদীস' নামে পরিচিত। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে এই হাদীস সংগ্রহের আন্দোলনের ফলে জ্ঞানের যে নতুন ধারার প্রবর্তন হয় সে জ্ঞান বোঝাতে 'ইলম' শব্দটির ব্যবহার হতে লাগল। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনাভিত্তিক জ্ঞানকেই শুধু ফিক্‌হ বলা হতে লাগল। মোটামুটিভাবে এযুগেই শব্দদুটি পরস্পর হতে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করতে শুরু করে। 'আত

www.pathagar.com

তাবাকাতুল কোবরা' গ্রন্থে ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন হিজরী ৯৪ সালে সায়ীদ ইবনে আল মুসাইয়াব ও আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমানের মতো মদীনার কয়েকজন প্রখ্যাত আইনবিদ ইন্তিকাল করেন। একারণে ওই বর্ষটি সানাতুল ফোকাহা (سنة الفقهاء বা আইনবিদ বর্ষ) বলে পরিচিত হয়। অতএব যুক্তিযুক্তিভাবেই বলা যায় প্রথম হিজরী শতকের শেষের দিকে আইনবিদ এবং হাদীসবেত্তাগণ যখন স্বতন্ত্র পরিচয়ে আবির্ভূত হন তখনই ইলম ও ফিক্‌হ শব্দদুটি বেশেষ অর্থ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়।

ফিক্‌হর উন্মেষলগ্ন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকাল, একথা সুস্পষ্ট হয় স্বয়ং আল-কুরআনের দ্বারা। আল-কুরআনে ফিকহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যবহার বহুবার হয়েছে যে কোন বিষয়ের উপলব্ধি অর্থে। কিন্তু শিক্ষা অর্থে তার ব্যবহার কোথাও দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে 'ইলম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শিক্ষা অর্থে। (আল কুরআনে ২০ নং সূরার ১১৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)।
এই আয়াতে ইলম দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে নবীর ওপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীমালা। আল-কুরআনে গ্রন্থিত এই ঐশী বাণীমালা মুসলমানগণ পাঠ করেন। প্রাথমিক কালে 'ইলম' অর্থাৎ কুরআন বা হাদীসের মত ফিক্‌হ পাঠ ও শিক্ষা করা হত না। পরবর্তীকালে কতকগুলি আইনের সূত্র সৃষ্টি হল। সেগুলি ফিক্‌হ নামে পরিচিত হল এবং সুবিন্যস্ত আইনবিজ্ঞান হিসেবে 'ইলম'-এর ন্যায় অধীত হতে লাগল।

ফিক্‌হর অর্থগত দিক বিশ্লেষণে এর একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। সেটি হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত চিন্তা ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ। এদিক থেকে 'ইলম'-এর সঙ্গে এর পার্থক্য হল—ইলম হল সেই জ্ঞান যা সর্বদা কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে আগত যেমন, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম, এবং হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌র বাণী হতে উৎসারিত জ্ঞান। শব্দ দুটি কখনো কখনো সমার্থবোধক হলেও ফিকহ তার বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য সব সময় বজায় রেখেছে। রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা 'রায়' দিতেন এবং যাঁরা সিদ্ধান্ত প্রদানে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা 'ফোকাহা' (فقهاء) নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 'আত্‌ তাবাকাতুল কোবরা' গ্রন্থে ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত

www.pathagar.com

ওমরের সামনে ফোকাহাগণ কিছু বলতে সাহসী হতেন না কেননা, ওমর স্বয়ং তাঁর 'ফিকহ' (বুদ্ধিমত্তা) ও 'ইলম' (জ্ঞান)-এর গুণে তাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতেন। এখানে আইন ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীর সমাধানে যাঁরা স্বীয় যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের জন্য সুখ্যাত, 'ফোকাহ' শব্দটির দ্বারা তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে। ওমর ইবনে আল খাত্তাব জাবিয়ায় তাঁর এক ভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছেন : "যিনি ফিকহ জানতে আগ্রহী তিনি মুয়াজ ইবনে জাবল-এর কাছে যেতে পারেন।" মুয়াজ রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় ইয়েমেনে বিচারকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত একারণেই ওমর তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও আইনের অভিজ্ঞতার প্রতি ইংগিত দান করেছিলেন।

এভাবে ফিক্‌াহর অর্থগত বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শব্দটির পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে, এবং পরিশেষে আইনের সমস্যাসমূহ বোঝাতে, আরো সুনির্দিষ্টভাবে, আইন সাহিত্য বোঝাতে শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। এর পাশাপাশি আরো দেখা যাবে ইলম-এর সাথে এর একটি স্থায়ী পার্থক্য সূচিত হয়েছে। আইন শাস্ত্রের বিকাশ ও হাদীস শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির সাথে রায় (رأى) ও রিওয়াইয়াহ (رواية) দুটি শব্দ প্রচলিত হয়। প্রথমটি ফিকাহর সাথে দ্বিতীয়টি হাদীসের সঙ্গে সমার্থবোধক হয়ে যায়। ইবনে সাদ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আতা ইবনে আবি রাবাহ (মৃত্যু হিঃ ১১৪) একটি মত প্রকাশ করলে ইবনে জুরাইজ তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি ওই মত প্রকাশ করেছেন রায় (رأى) বা ইলম, কিসের ভিত্তিতে। এখানে রায়-এর সঙ্গে ইলম-এর পার্থক্য দেখানো হয়েছে এবং ইলম হাদীস ভিত্তিক জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং একটি ব্যাপক অর্থ হতে ফিকহ শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে রূপান্তরের এই সময়কাল ইসলামী আইন শাস্ত্রের আদি পর্ব রূপে আমাদের ধরে নিতে হবে।

ইসলামী আইন বুঝাতে সাধারণভাবে অনেকটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো শারীয়াত (شريعة)। গোড়ার দিকে

www.pathagar.com

এই শব্দটিও বিশেষভাবে ইসলামী আইনতত্ত্ব বোঝাত না। শারীয়াত (شر يعت) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে শারাই (شرا ئع)। ইসলামের প্রথম যুগে শারীয়াত শব্দটির ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়। বহুবচন রূপে শব্দটি আদি মুসলিমগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সে সময়ে এর অর্থও ছিল ব্যাপক। শারীয়াত (شر يعة) শব্দটির ব্যবহার ইসলামী আইনের সুনির্দিষ্ট অর্থে পরবর্তীকালে শুরু হয়।

ভাবগত দিক থেকে শারীয়াহ (شر يعه) অর্থ 'জলাধারের পথ' এবং তৃষ্ণাত আশ্রম'। আরবীয়গণ শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করতো 'জলাধার মুখী পথ'-এর ক্ষেত্রে, যেপথ সকলের দৃষ্টি-গোচর এবং স্থায়ী। লিছানুল আরব আরবী অভিধানের মতে শারীয়াহ শব্দটি এভাবেই মহাসড়ক (highway) বা চলার সরল পথ থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

আল কুরআনে শিরআহ (شر عة) ও শারীয়াহ (شر يعة) শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াত:— لكل جعلنا شر عة و منها جا , এবং সূরা জাছিয়ার ১৮ আয়াত :— ثم جعلنك على شر يعة من الامر فا تبعها , উভয় স্থানেই শব্দটি 'দ্বীন' (ধর্ম) অর্থে এসেছে।

নবীর যুগে শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখেছি দ্বীন ইসলামের মৌল বিষয়সমূহের অর্থে। ইবন সাদ কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসের একটি বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের নব দীক্ষিত মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আবেদন জানায়। তারা তাঁকে অনুরোধ করে, তিনি যেন তাঁদের এলা-কায় ইসলামের শারাই (شرا ئع) শিক্ষা দেবার জন্য কাউকে প্রতিনিধি পাঠান। এখানে আরব বেদুইনরা সুস্পষ্টভাবে ইস-লামের মৌলিক স্তম্ভসমূহ এবং অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহকেই বুঝিয়েছে। উপরোক্ত অর্থে শব্দটির প্রচলন আরেকটি হাদীসের দ্বারা সমর্থিত হয়। ওই হাদীস বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইসলামের শারাই' (شرا ئع) কি। জবাবে তিনি নামায, রমযানের রোযা, যাকাত ও হজ্জের কথা উল্লেখ করেন। সুতারাং নবীর যুগে শারাই (شرا ئع) ফারাইদ (فرا ئض) অর্থাৎ ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়ের সমর্থক ছিল।

www.pathagar.com

শারীয়াহ শব্দটি নবীর যুগে দীন বা ইসলামের মৌলবিষয় (شرائع و فرائض) অর্থধারণ করলেও আবু হানিফার যুগে শারীয়াহ্‌-র স্বতন্ত্র ধারণার আভাস পাওয়া যায়। কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' (كتاب العالم و المتعلم) গ্রন্থে দীন' ও শারীয়াহ (دين و شريعة) শব্দদুটির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, দ্বীন চিরকাল অপরিবর্তিত, শারীয়াহ যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। গ্রন্থ লেখক দীন বলতে তওহীদ, নবুওত, আখিরাত ইত্যাদি মৌল বিশ্বাসসমূহ বুঝিয়েছেন, আর শারীয়াহ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রতি পালনীয় বিষয়সমূহকে। তাঁর মতে, বিভিন্ন পয়গাম্বরের দীনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য রয়েছে তাঁদের শারীয়াহ্‌র মধ্যে। প্রত্যেক নবীই পূর্ব-বর্তী নবীর দ্বীনকে সমর্থন করেছেন কিন্তু তাঁদের শারীয়াহ-র বিলুপ্তি কিংবা অপ্রয়োজ্যতা ঘোষণা করে স্বীয় শারীয়াহ অনু-সরণের আহবান জানিয়েছেন। আবু হানিফার যুগে এভাবে দীন শব্দটি ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমিত অর্থে প্রচলিত হতে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী শারীয়াহকে আরো সংহত রূপে দেখেছেন। তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন প্রতিষ্ঠান অর্থে। ইমাম মালিক কোন ব্যক্তির জীবন কালে, তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির হজ্জপালন (حج بدل) এর বৈধতা স্বীকার করেন না কেননা, হজ্জও তাঁর মতে, নামায ও রোযার মত একটি ফরয, যা অন্যের দ্বারা সম্পাদন করা যায় না। শাফেয়ী তাঁর মত খণ্ডন করতে যে যুক্তি প্রদান করছেন সেটি লক্ষ্যনীয়। তিনি বলেন (لا تقاس شريعة على شريعة) একটি নিয়ম প্রণালীর (Institution) উপর আরেকটির সিদ্ধান্ত আরোপ করা উচিত নয়। প্রতিপালনীয় কার্যাদি অর্থেও তিনি শারীয়াহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ইসলামী আইনের ভাব প্রকাশে একটি সমার্থক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও 'শারীয়াহর পরিধি ফিকহ অপেক্ষা ব্যাপক। বর্তমান [illegible] ইসলামের সকল দিক শারীয়াহর আওতাভুক্ত।

আসাফ ফৈজী একজন আধুনিক লেখক, তাঁর Outlines of Muhammadan law গ্রন্থে উভয় পরিভাষার যে তুলনামূলক সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে ফিকহের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত

www.pathagar.com

হয়। তিনি লিখেছেন: শারিয়াহ একটি ব্যাপক আওতা, সমস্ত মানবীয় কার্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত, ফিকাহর আওতা সংকীর্ণ, আইনগত কার্যাদি বলতে যা বুঝায় শুধু তাই এর বিষয়বস্তু। শারীয়াহ আমাদের সর্বদা ঐশী জ্ঞানের কথা মনে করিয়ে দেয়, কুরআন ও হাদীস ছাড়া যেজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; ফিকাহতে যুক্তির প্রাধান্য এবং এর ইলম' ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অবিরাম অনুমোদনের সঙ্গে উল্লেখিত হয়। শারীয়াহর পথ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক স্থাপিত; ফিকাহর প্রাসাদ মানবীয় প্রচেষ্টায় বিরচিত। ফিকাহতে কোন কাজ আইনানুগ কি বে-আইনী, (يجوز و مالا يجوز) অনুমোদন যোগ্য কি অননুনোমদনীয় সেকথা উল্লেখিত হয়। শরীয়াহতে অনুমোদন ও অননুমোদনের স্তর অনেক। ফিকাহ দর্শন হিসাবে আইন শাস্ত্রের একটি পরিভাষা; এবং শারীয়াহ আল্লাহ প্রদত্ত সরল ও সাধু জীবনের একটি বিধি ব্যবস্থার নাম।

এই দুটি পরিভাষার পার্থক্য সূক্ষ্ম এবং কখনো কখনো পরস্পরের অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে একটি পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, সেটি হল শারীয়াহ আইন ও ধর্মীয় বিশ্বাস উভয়ের মিলিত নাম, কিন্তু ফিকাহ শুধুমাত্র আইনের সূত্র সম্পর্কিত শাস্ত্র।

আমরা আরেকটি কোণ হতে আদিপর্বে ফিকাহর বিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ইসলামের আদিলগ্নে রাসূলুল্লাহ কুরআনের তৌহিদী আহবান নিয়ে নানাদিকে প্রচারক পাঠাতেন। ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন, এরূপ সত্তর জন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ কুরআনের শিক্ষার নবদীক্ষিত মুসলিমগণের কাছে বিতরণ করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলা হত কোররা। (قراء) পরবর্তীকালে আরবীয়রা বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে এবং তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি লাভ করে। ইসলামী আইনের বিকাশ ও অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন তাঁর মোকাদ্দামায় বলেছেন, এখন হতে কুরআন পাঠক ও প্রচারকগণ আর কোররা (قراء) নামে পরিচিত হন না;

www.pathagar.com

তাঁরা ফোকাহা ও উলামা (فقها ء و علما ء) নামে অভিহিত হতে থাকেন। ইবনে খলদুনের এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে শায়বানী রচিত কিতাবুল আসার (كتا ب الا ثار) গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন;
(انما قيل اقر أهم لكتا ب الله لان الناس
كا نوا فی ذا لك الز مان اقر أهم للقرا ن افقههم فی الد ين -
অর্থাৎ, সে যুগে কুরআনে যাদের অধিকতর জ্ঞান ছিল ধর্মেও ছিল তাদের গভীরতার উপলব্ধি। ইবনে সাদ এর বর্ণনানুযায়ী, তাবেয়ীগণের মধ্যে বহু 'ফকীহ' ও 'আলিম' ছিলেন। অর্থাৎ আইন ও হাদীস শাস্ত্রে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মদীনার বিদ্বোৎজনদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যার (মৃত্যু) : ৯৪ হি:) ফাকীহ আল ফোকহা (فقه الفقها ء علم العلما ء) হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' হতে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আহল আল ইলম' (اهل العلم) ও আহল আল ফিকহ পদ দ্বয় ইসলামের দ্বিতীয় উত্তর পুরুষ স্তরেই প্রচলিত হয়েছিল। উপরোক্ত পদদ্বয় তাদের প্রতি আরোপ করা হত যারা কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিধি-বিধান বের করার কাজে আত্মনিবেদিত ছিল এবং আইনগত ব্যাপারে রায় প্রদান করতো।

অর্থগত বিবর্তনের একটি প্রথমিক কাল গত হবার পর ফিকহ শব্দটি যখন শুধু আইনের বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রন্থ রচনা শুরু হল। এরূপ কয়েকটি প্রয়াস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (মৃত্যু : ১৮১ হি:) একটি হাদীস গ্রন্থ লিখেন এবং সেটিকে তিনি সাজান ফিকহ, (فقه) গাজাওয়াত (غزا وة) ও যোহদ (زهد) অর্থাৎ আইন, যুদ্ধ ও কৃচ্ছতা—এই তিন বিষয়ের শিরোনামে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি ফিকাহ্‌র ওপর অবিমিশ্র কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। আবু ইউসুফ (মৃত্যু : ১৮৪ হি:) এবং বিশেষভাবে, শায়বানীর (মৃত্যু : ১৮৯ হি:) এই বিষয়ে প্রথম সুবিন্যস্ত কার্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইসলামী আইন গ্রন্থের তালিকায় মালিকের মুয়াত্তা আদিতম। কিন্তু একথাও উল্লেখ্য যে এটি অবিমিশ্রভাবে না হাদীস না ফিকাহর গ্রন্থ। ফিকহ

www.pathagar.com

ও হাদীস শাস্ত্র যখন স্বতন্ত্র স্বত্তায় আবির্ভূত হয়নি এটি সেকালেরই একটি উজ্জ্বল স্মারক। এর পর হতে এই দুটি বিষয়ে আলাদাভাবে গ্রন্থ রচিত হতে থাকে এবং ফিকহ ইসলামী আইনতত্বও স্বতন্ত্র ধারা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিকাশমান হয়। আইনতত্ত্বের বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

হযরত মুহাম্মদের (দঃ) যমানার, আজকার দিনে আমরা যাকে আইনতত্ত্ব বলি তেমন কিছুর প্রচলন ছিল না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সুবিন্যাস্তভাবে ওয়াজিব, মানদুব, হারাম, মকরুহ এবং মোবাহ সম্পর্কে কিছু বলে যাননি। এগুলো পরে আইনতত্ত্বে বিশ্লেষিত ও বিন্যাস্ত হয়েছে। যেসমস্ত আইনবিদ গভীরভাবে আল-কুরআন জানতেন ও নবীর আদেশ নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের চাল চলন ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, সেইসব পণ্ডিত এই সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আইনবিদদের মতে মানুষের সমস্ত কর্ম ঐ পাঁচটির একটির অধীন হতে হবে।

মহানবীর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীদের কাছে এই বিভাগ প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। তাদের কাছে মহানবীর আদর্শই যথেষ্ট ছিল। কিভাবে ওজু করতে হয়, নামায আদায় করতে হয় এবং হজ্জ পালন করতে হয়, এগুলো ছিল মহানবীর নির্দেশিত সাধারণ রীতিনীতির অর্ন্তগত। কিন্তু এতে প্রতিফলিত হয় না যে কোন্ কোন্ কাজ আরকান বা অত্যাবশ্যকীয় আর কোনগুলি তা নয়। অনেক সময়ই অনেক বিষয় মহানবীর গোচরে আনা হয়েছে তার সিদ্ধান্তের জন্য, কিন্তু আইনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে কখনোও কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করেন নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সিদ্ধান্তকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রফেসর Schacht মনে করেন যে এই পাঁচটি বিশেষ শ্রেণীর নির্দেশ (আল আহ্‌কাম- আল খামসাহ) পূর্ববর্তী কালের আইন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মুসলিম আইনবিদগণ গ্রহন করেছেন। **Schacht এর An Intooduction to Islamic Law** দ্রষ্টব্য। কিন্তু তার এই অভিমতকে দ্বিধাহীন মেনে নেয়া যায় না। অনুরূপ

www.pathagar.com

বিদেশী কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না যে একটি অন্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৯ এবং ২৯৫ এবং সূরা আনফালের একটি আয়াত থেকে জানতে পারি যে কখনও কখনও সাহাবীগণ নানা বিষয় বা সমস্যা নিয়ে মহানবীকে প্রশ্ন করেছেন। মহানবীও তাদের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন। তার জীবদ্দশায় সাহাবীগণ দার্শনিক বা তাত্ত্বিক আলোচনা বা আইন কানুনের সূক্ষ্ম বিষয়ে জানতে আগ্রহী ছিলেন না। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে সাহাবী-গণ খুব কমই প্রশ্ন করতেন। অযথা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার জন্য আল কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। কিছু লোকের অতিরিক্ত প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নির্দেশ জারি হয়। ফলে প্রাথমিক নব্য মুসলমানদের নিকট সুন্নত সাধারণ পালনীয় নির্দেশ হিসাবেই বিবেচিত হতে আরম্ভ হয়। মহানবীর জীবদ্দশায়ই অনেক বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয় নি। অবশ্য তিনি কতগুলি নির্দিষ্ট আইন কানুন ও নীতিমালা রেখে যান। আইন বিশেষজ্ঞগণ পরে সে গুলোকে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মহানবীর নির্দেশিত আইন কানুন ও বিধি বিধানের সাথে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যুক্ত করার যে রীতির প্রচলন করে গেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন আইনকে উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তা অনুসরণ করা।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আইন তত বেশী দুষ্পরিবর্তনীয় ছিল না, যা পরবর্তী কালে হয়েছে। যুক্তির ভিত্তিতে অনেক সমস্যার সাথে জড়িত পরস্পর আপাত বিরোধী আইনকে গ্রহণ করতে হয়েছে। মহানবীর ইনতিকালের পর তার সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং আইন বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা এবং রীতিনীতি থেকেই এটা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। মহানবী (দঃ) মত পার্থক্য নিরসনের জন্য একটি পরিস্থিতিতে দুটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের বিস্তারিত সুযোগ দিয়েছিলেন। অনাগত বংশধরদের জন্য এটা ছিল একটি বিবর্তনের যুগ আর সে জন্যেই তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানবিক কারণ এবং সাধারণ জ্ঞানের ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছিলেন। যদি মহানবী

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট এবং একই পথ নির্দেশ করে যেতেন, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই সম্ভব হয়নি, তা হলে অনাগত বংশধরেরা যুগপোযোগী আইন প্রনয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই তার জীবিতকালেই শুধু দুই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল একই পরিস্থিতিতে দুইটি ভিন্ন পথ অবলম্বনের। দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বানু কুরাইজার যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) তার কিছু সাহাবীকে শত্রু এলাকায় পাঠালেন এবং বললেন তারা যেন তাদের গন্তব্য স্থলে পৌছার সাথে সাথেই আসরের নামায আদায় করে নেন। কিন্তু নামাযের সময় পথেই হয়ে গেল। কেউ কেউ নামায পথেই পড়ে নিলেন। তারা যুক্তি দেখালেন যে নবী তাদের নামায স্থগিত রাখার নিদের্শ দেননি (অর্থাৎ উপরের নির্দেশ দ্বারা তা বুঝায় না)। আবার অন্যান্য সাথীরা গন্তব্য স্থলে পেঁীছার পর রাতে তাদের নামায আদায় করলেন। তারা আক্ষরিক অর্থেই নবীর নির্দেশ পালন করলেন। যখন এঘটনা সম্পর্কে হযরত (সাঃ) অবগত হলেন তখন তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। সাহাবীগণ মনে করলেন যে এটা তাদের উভয় দলের সিদ্ধান্তের প্রতি মৌন সম্মতি। তাদের কোন একদলের সিদ্ধান্তই যদি বেআইনি হতো, তা হলে নিশ্চয়ই মহানবী সেটা শুদ্ধ করে দিতেন।

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাই যে মহানবী আইনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পূরণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা কি পন্থায় হলো বা কখন প্রতিপালিত হলো, তার উপর নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে নির্দেশের প্রতি আনুগত্যই গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবীদের মধ্যে একদল অক্ষরিক অর্থে মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশ মেনে নিয়ে রাত্রিতে আছরের নামায আদায় করেছিলেন আর অন্যদল এর তাৎপর্য বা চেতনার উপরই নির্ভর করেছিলেন। এটা বলা প্রয়োজন যে আদেশ পালন করাই বড় কথা নয়, আদেশের পিছনে আল্লাহ্ তায়ালা এবং মহনবী (সাঃ) এর প্রতি অনুগত্যের যে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তার তাৎপর্য উপলব্ধি

www.pathagar.com

করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটাই প্রমাণ করে যে আইনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। যে জ:ন্যই আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্য এসেছে।

মহানবীর (সা) ওফাতের পর সাহাবীগণ, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের অনেকেই ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীর আসন গ্রহণ করেন। তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের কাছে আসতে থাকে। অনেক সময়ই এই সব ধর্মীয় নেতারা মহানবী (সাঃ) কাছ থেকে যা শুনেছিলেন এবং মনে করতে পেরেছিলেন তা থেকেই সিদ্ধান্ত নিতেন। আবার কখনও কখনও কুরআন এবং সুন্নার আলোকে সমস্যার সমাধান করতেন। আবার মাঝে মাঝে মহানবীর (সাঃ) এর অনুকরণে শরীয়ত অনুসরণ সিদ্ধান্ত দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একবার ইবনে মাসুদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে যদি কোন নারীর স্বামী, যার সাথে তার মিলন হয়নি, স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা নির্ধারণ করার পূর্বেই মারা যায় তা হলে সেই নারী কি মোহরানার অধিকারী হবে? ইবনে মাসুদ প্রথমে বলেছিলেন যে তিনি এ সম্পর্কে হযরতের কাছ থেকে কিছুই শোনেন নি। যখন এ ব্যাপারে তার নিকট পরামর্শ চাওয়া হলো তিনি বললেন যে মহিলা তার সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে গড় হিসেবে মোহরানার অধিকারিনী হবে। তিনি আরও উপদেশ দিলেন যে স্ত্রী তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির তার জন্য বরাদ্দ পূর্ণ অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে তবে এজন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঐ সময় মাকিল ইবনে সিনান (মৃঃ ৬৩ হিঃ) নামে এক ব্যক্তি বললেন যে মহানবীও একই ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু ইবনে ওমর (মৃঃ ৭৩ হিঃ) এবং জায়েদ ইবনে আবিদ (মৃঃ ৪৫ হিঃ) ঐ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তাদের মতে বিধবা কোন মোহরানা পাবে না, তবে উত্তরাধীকারির অংশের ভাগ পাবে। ইরাকের লোকেরা ইবনে মাসুদের মতামত গ্রহণ করেছে এবং ওমর ও জায়েদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। এর কারণ হয়তো প্রথম

www.pathagar.com

মতামতটি মহানবী (সাঃ) এর সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং পরেরটি নয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি বা প্রচলন সক্রিয় ছিল। যদি সত্যি মহানবী বিবাহের মত একটি অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলে যেতেন তা হলে এ ধরনের মত পার্থক্যের সৃষ্টিই হতো না। ইরাকীদের মতামতই যদি সত্যি ধরে নেয়া হয় তা হলে বিবাহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইবনে ওমর এবং য়ায়েদ ইবনে সাবিত এর ন্যায় প্রখ্যাত সাহাবীদের মতামতের কি হবে? এটা বিশ্বাস করা দুরূহ যে বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে এবং নিভৃতে জনাকয়েক সাহাবীর নিকট সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। সুতরাং এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে যে হাদীস অন্যান্য সাহাবীদের নিকট পৌঁছায় নি তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু পরে সেগুলোকে কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ফাতেমা ইবনে কায়েসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। জানা যায় যে, দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সামনে সে বলেছিল যে তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু তালাকের পরে যে সময়টুকু অপেক্ষা করতে হয় সে সময়ের জন্য হযরত (সাঃ) নারীর থাকার এবং খাওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা করে যাননি। ওমর এই হাদীস গ্রহণ করতে পারলেন না এই জন্য যে তিনি একটি মহিলার কথার উপর বিশ্বাস করে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ থেকে চ্যুত হতে পারা যায় না। মহিলা সত্য কি মিথ্যা বলছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সব চেয়ে কৌতুহলের ব্যাপার হলো ওমরের এই মন্তব্য আবু ইউসুফ নামক এক ইরাকীই শুধু অবগত ছিল। মালিক এবং শাফিঈ উভয়ই উক্ত হাদীস অনুসরণ (মহিলা বর্ণিত হাদীস) করে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার বাসস্থান, ভরণ পোষণ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। তারা কুরআনের আয়াতের ৬৫ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে, সন্তান সম্ভাব্য তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর জন্য অবশ্য পালনীয়।

www.pathagar.com

কুরআনের ব্যাখ্যা নিয়েও সাহাবীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ নেই অথবা অস্পষ্ট সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কাজেই কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা অনেক সময়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) আদর্শের অনুকরণে হয়েছে অথবা আইন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে। এটা স্বাভাবিক যে প্রচলিত নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সব কিছুতেই মতপার্থক্য থাকবে। শাফিঈ এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। কুর-আনের আয়াতে বলা হয়েছে. "যে স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দেয়া হয়েছে তারা যেন অপেক্ষা করে এবং তিনটি পর্ব।" এই আয়াতে তিন পর্ব শব্দটি অস্পষ্ট। এটা মনে করা হয় যে পর্ব (কুরু) বলতে মাসিক বা ঋতুস্রাব এবং ৭াক পবিত্র হওয়ার সময়কে বুঝায়। সুতরাং দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ). আলী. ইব্নে মাসুদ, আবু মুসা আল্ আশারী সবাই 'আকরা' (aqra) বলতে মাসিক বা হায়েজকেই বুঝিয়েছেন। এদের সাথে একই মত পোষণ করেছেন সাঈদ ইব্নে আল-মুসাইব. আতা এবং আরও পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ। আবার অন্যদিকে আয়শা, জায়েদ ইব্নে থাবিদ এবং ইব্নে ওমর 'আকরা' অর্থে মাসিকের মধ্যবর্তী পাক পবিত্র সময়কেই বুঝিয়েছেন। দুই পক্ষের আলোচনা থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলের মতে তৃতীয় পর্ব শেষ হওয়ার পর পরই অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে যায়। আবার দ্বিতীয় দলের মতে অপেক্ষার সময় (Period of waiting) শেষ হয়ে যায় তৃতীয় পর্ব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই। একইভাবে সাহাবীগণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন কুরআনের ৬ এর ৬৫ আয়াত এবং ২২৬ এর ২ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে। আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্যের অন্যতম কারণ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ কারণ এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহাবীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে হাদীসের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। কোন কোন সময়ে মহানবীর সমকালে দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রচলিত নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন সাহাবী তার একটি অনুসরণ করেছেন আবার অনেকে অপরটি। রিবা' এর ক্ষেত্রে এই জনাই হাদীস পরস্পর বিরোধী। ইব্নে আব্বাস বলেছেন যে,

www.pathagar.com

ওসমান ইবনে যায়েদ হযরতের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে কর্জের বা ধারের (Loan উপর ছাড়া অন্য কিছুর জন্য রিবা (Riba) বা সুদ প্রয়োজ্য নয়। কিন্তু ওবায়দাহ্ ইবনে আল-সামিত, আবু সাইদ আল খুদরী, ওসমান ইবনে আফ্ফান এবং আবু হুরায়রা বলেছেন যে হাতে হাতে লেনদেনযোগ্য ছয়টি জিনিসের উপর রিবা এর প্রচলন ছিল। পূর্বেকার মতের অনুসারী হলেন ইবনে আববাস এবং মক্কার অন্যান্য আইনবিদগণ। তাঁদের মতে একটি দিরহামের পরিবর্তে দুইটি দিরহাম অথবা একটি দিনারের পরিবর্তে দুইটি দিনার নেয়াতে কোন অন্যায় নেই। ইবনে মাসুদ এ ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে গেছেন। ইমাম শাফিঈর মতপার্থক্য দূর করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদই অনুসরণ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এ সমস্ত বিছিন্ন ইতস্তত বিস্তৃত মতামত রসুলুল্লাহ্র (সঃ) পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। কিন্তু সেগুলো ইজমা ভিত্তিতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সাহাবী হাদিস সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না কোন সমস্যা সমাধানে সেই সাহাবী তার নিজের সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। যখন প্রাসঙ্গিক হাদিসটি তার নিকট পৌছাত তখন তিনি নিজেরটি প্রত্যাখ্যান করতেন বা অপ্রযোজ্য ঘোষণা করতেন। ইমাম শাফিইর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর অনেক সময় এভাবে তার নিজের রায়কে পরিবর্তন করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে বা ঘটেছে যে প্রাসঙ্গিক একটি হাদিস হয়তো পাওয়া গেছে কিন্তু সংবাদদাতা বা যিনি হাদিসটি সংরক্ষণ করেছেন তিনি তার গুরত্ব বা অর্থ বুঝতে পারেননি। ইবনে ওমরের কাছ থেকে বর্ণিত রসুলুল্লহ (সঃ) এর একটি হাদিস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক করলে মৃত আত্মা শাস্তি পায়। যখন এ হাদিসের কথা হযরত আয়শার নিকট পৌছাল" তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে হয়তো ইবনে ওমর ভুল করেছেন বা তিনি এর কোন অংশ ভুলে গেছেন। হযরত আয়শা বললেন যে প্রকৃত ঘটনাটি ছিল এ রকম : একবার

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ (সঃ) শুনতে পেলেন যে এক ইহুদীর মৃত্যুতে তার আত্মীয় স্বজন কান্নাকাটি করছেন। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে একদিকে ইহুদীর আত্মীয় স্বজন তার মৃত্যুতে কান্না কাটি করছে আর অপর দিকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি পেতে হচ্ছে। আয়শা আরও বলেছেন যে ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসটি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে একজনের জন্য আরেক জন কোনভাবেই দায়ী নয়।

আল কুরআনের আয়াতের দ্বারা বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা সাহাবী-দের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি কিভাবে আল-কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী হওয়ায় ওমর ফাতেমা বিন কায়েসের হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সাহাবীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যাতে তাদের সিদ্ধান্ত আল-কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে হয়। তাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত রায়কে মহানবী (সঃ) এর আদর্শের কাছাকাছি রাখতে চেষ্টা করেছেন। নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাহাবিগণ আল কুরআন এবং সুন্নার পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

পরবর্তীতে সাহাবীদের অনুসারীরা কেউ কেউ নিজেদের মতামতের উপরই সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য তারা মহানবী (সঃ) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিস এবং সাহাবীদের মতামত যতটুকু সম্ভব স্মরণ রাখতে চেষ্টা করতেন। আবার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে যে মত-পার্থক্য ছিল তা নিরসনের চেষ্টাও চালানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে স্বাধীন ব্যাখ্যা বা ইজতিহাদ (Ijtehad) দুভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত তারা একজন সাহাবীর মতের উপর অন্য আরেক জনের মতকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। কোন কোন সময় সাহাবীদের মতের উপর তাদের উত্তর-সুরীদের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়া হতো। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে অনেকেই মৌলিক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকতেন এবং সত্যিকার অর্থে ইসলামিক আইনের প্রকৃত গঠন এই সমস্ত অনুসারীদের মাধ্যমেই শুরু হয়। ফলে আঞ্চলিকতার দরুন ইসলামী আইনের ক্ষেত্রের পার্থক্য সূচিত হয়।

www.pathagar.com

পরবর্তী যুগে ইসলামী বিশ্বে তিনটি ভৌগলিক বিভাগ সৃষ্টি হয়, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী আইন চর্চা শুরু হয়। এগুলো হলো ইরাক, হেজাজ এবং সিরিয়া। ইরাকের বসরা এবং কুফায় আইনের চর্চা বেশী হতো। তবে আইনের উন্নয়ন এবং অগ্রগতি বসরার চেয়ে কুফায়ই বেশী হয়েছে। একইভাবে হেজাজেও দু'টো প্রসিদ্ধ আইন চর্চার কেন্দ্র ছিল, একটি মক্কা অপরটি মদিনা। এদের মধ্যে আইনের চর্চার ক্ষেত্রে মদিনাই অগ্রণী ছিল। যদিও প্রথম দিকে সিরিয়াদের অবদানের কথা সবিশেষ উল্লেখ নেই তা সত্ত্বেও আবু ইউসুফের নিকট থেকে সিরিয়াবের আইন চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ইসলামী আইন চর্চার ক্ষেত্রে মিশর প্রথম দিকে খুব একটা এগিয়ে আসেনি। মিশরের অনেক বিশেষজ্ঞ ইরাকীদের নিয়ম অনুসরণ করেছেন, আবার অনেকে মদিনার। আল লাইথ ইবনে সাদ (মৃত্যু ১৭৫ হিঃ) মিশরের একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। ইমাম মালিকের সাথে তাঁর কিছু মত-পার্থক্য ছিল। যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তা হলে ইমাম মালিকের নিকট লেখা চিঠি থেকে আইনের ক্ষেত্রে তার মুক্ত চিন্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক একটি প্রদেশের প্রতিটি শহরে আইনের চর্চার জন্য নিজস্ব নেতা বা নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নিজস্ব এলাকায় ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত :—

মক্কা : । আতা ইব্‌নে আবিরাবাহ (মৃঃ ১১৪ হিজরী)
। আমর ইবনে দিনার (মৃঃ ১২৬ হিঃ)

মদিনা : । সাঈদ ইব্‌নে আল মুসাইব (মৃঃ ca ৯৪ হিঃ)
। উরওয়াহ ইবনে আল জুবাইর (মৃঃ ৯৩/৯৪ হিঃ)
। আবুবকর ইবনে আবদাল রহমান (মৃঃ ৯৪/৯৫ হিঃ)
। ওবায়েদ উল্লাহ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌ (মৃঃ ca ৯৮ হিঃ)
। খারিজাহ ইব্‌নে জায়েদ (মৃঃ ৯৯ হিঃ)
। সুলায়মান ইব্‌নে ইয়াছার (মৃঃ ca ১০৭ হিঃ)
। আল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (মৃঃ ১০৭ হিঃ)

www.pathagar.com

উপরোক্ত সাত জন মদিনার ইসলামী আইনবিদগণের অন্যতম। এ ছাড়া আরও বিখ্যাত অনেকেই ছিলেন।

। সেলিম ইবনে আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (মৃ: ১০৭ হিঃ)

। ইব্নে সিহাব আল জুহরী (মৃং ১২৪ হিঃ)

। রাবিয়াহ ইব্নে আবি আবদাল রহমান (মৃঃ ১৩৬ হিঃ)

। ইয়াহিয়া ইব্নে সাঈদ (মৃঃ ১৪৩ হিঃ)

মালিক (মৃ: ১৭৯ হিঃ) এবং তার সমসাময়িক ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণই ছিলেন মদিনার শেষ প্রবর্ত্তক ও উদ্যোক্তা।

বসরা ঃ । মুসলীম ইব্নে ইয়াছার (মৃঃ ১০৮ হিঃ)

। আল হাসান ইব্নে ইয়াছার (মৃঃ ১১০ হিঃ)

। মুহাম্মদ ইব্নে সিরিন (মৃঃ ১১০ হিঃ)

কুফা ঃ । আল কামাহ্ ইব্নে কায়েস (মৃ: ৬২ হিঃ)

। মাশরুক ইবনে আজদা (মৃঃ ৬৩ হিঃ)

। আল আসওয়াদ ইব্নে ইয়াজিদ (মৃ: ৭৫ হি:)

। স্যাইয়াহ ইব্নে আল হারিস (মৃঃ ৭৮ হি:)

এরা ছিলেন আব্দুল্লাহ্ আল মামুদের প্রখ্যাত অনুসারী

। ইব্রাহিম আল নাখাই (মৃ: ৯৬ হিঃ)

। আল শাবিই (মৃঃ ca ১০৩ হিঃ)

। হাম্মাদ ইব্নে আবি সুলায়মান আল আশারী (মৃ: ১২০হিঃ

। আবু হানিফা এবং তার শিষ্যগণ।

সিরিয়া। কাবিসাহ ইব্নে ধুরাইব (মৃ: ৮৬ হিঃ)

। উমর ইব্নে আবদাল আজিজ (মৃ: ১০১ হিঃ)

। মাখুল (মৃ: ১১৩ হি:)

। আল আওয়াই (মৃঃ ৯৫১ হিঃ)—সিরিয়ার নেতাদের মধ্যে শেষ পর্যায়ের।

www.pathagar.com

এই সমস্ত এলাকার আইন বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের নিজস্ব এলাকা বা অঞ্চলের সাহাবীদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন সমস্যার সিদ্ধান্ত এবং আইনের রায় প্রদান করতেন। মদিনার ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের আইন বিষয়ক জ্ঞান হযরত ওমর, হযরত আয়শা এবং ইবনে ওমরের সিদ্ধান্ত থেকেই গ্রহণ করেছেন। একইভাবে আবার কুফার লোকেরা ইবনে মাসুদ এবং আলীর সিদ্ধান্তকেই তাদের আইনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। এটাই তখনকার সময়ের সাধারণ প্রবণতা ছিল। এছাড়াও এদের অনেকেই অন্যান্য সাহাবীদের মতামতও গ্রহণ করতেন।

ইমাম শাফিই তার লেখায় এ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যেখানেই পুরাতন ইসলামী আইনের প্রচলন ছিল সেই সমস্ত শহরেই শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও তিনি মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং সিরিয়ার প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিইর আমলেই প্রথম দিকের বিদ্যা চর্চার স্থানগুলি আইন চর্চা এবং বিতর্কমূলক কর্মে লিপ্ত ছিল প্রবল-ভাবে। তিনি প্রত্যেকটি প্রধান শহরেই আইন বিশেষজ্ঞদের মাঝে মত পার্থক্যের উল্লেখ করেন। কিছু কিছু মক্কাবাসী 'আতা' এর মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করতেন, আবার অনেকে ভিন্ন মতানুসারী ছিলেন। মদিনার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ লোকই ইবনে আল মুসাইবের মতানুসারী ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের মধ্যেই অধিকাংশ ইমাম মালিকের মতানুসারী হয়েছিলেন। ইমাম মালিকেরও একই অবস্থা হয়েছিল। যখন ইবনে আবিল যিনাদ ইমাম মালিকের বিরোধিতা করেছিলেন তখন মুঘিরা ইবনে হাসান এবং আল-দারাওয়ারজী তার কিছু মতামত অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তার বিরোধিতাও হয়েছিল। কুফাতে তিনি বলেন যে, কিছু লোক ইবনে আবি লায়লার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং আবু ইউসুফের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু অনান্যরা ইউসুফকেই অনুসরণ করেছিল এবং ইবনে আবি লায়লার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

প্রথম দিকে ইসলামী আইন চর্চার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মনসুর ১৫৮ হিজরীতে হজ্বে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইমাম মালিককে

www.pathagar.com

বলেছিলেন যে তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তক "আল-মুয়াত্তা"-এর প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করতে চান এবং সাথে সাথে এই নির্দেশও দেন যে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এটাই হবে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইমাম মালিক খলিফাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি যেন একাজ না করেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ তাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মতামত গড়ে তুলেছেন। তাই তিনি খলিফা আল মনসুরকে তাদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেন। ইমাম মালিকের উপদেশ এটাই প্রমাণ করে যে আইনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত রয়েছে। এটা আরও প্রমাণ করে যে ইসলামী আইন তার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পরিবর্তনশীল ছিল যার ফলে মত পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত পণ্ডিতদের মাঝে মতবিরোধের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পূর্বের সাহাবীদের মধ্যকার মত পার্থক্য। এর পর থেকেই মহানবী (সাঃ) এবং তাদের সাহাবীদের প্রদর্শিত এবং প্রচলিত রীতি-নীতি বিভিন্ন শহরে প্রসার লাভ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ের প্রচলিত রীতিনীতির পারস্পরিক বিরোধিতার পাশাপাশি ছিল সাহাবীদের কাছ থেকে পাওয়া পরস্পর বিরোধী মতামত। একজনের মতে হযরত আবু বকর এবং ওমর ফযরের নামাযের সময়ে দোয়া কুনত (Qunut) পাঠ করতেন। আবার অন্য জনের মতে তাঁরা এটা কখনও করেননি। কখনও কখনও সাহাবীদেরকে এমন সব নিয়ম কানুন মেনে চলার কথা শোনা যায় যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রচারিত আদর্শের বিরোধী। এক খবরে জানা যায় যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত উসমান মুজারাহ পদ্ধতি গ্রহণ করতেন এবং তাদের জমির এক তৃতীয়াংশ হিস্যা হিসাবে বর্গা দিয়েছিলেন। কিন্তু জাবির এবং রাফি ইবনে খাদিজের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নীতিতে এটা ছিল বেআইনী, আর এক জায়গায় শোনা যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) মোজার উপর মাসেহ করতেন। কিন্তু হযরত আলী, হযরত আয়শা, ইবনে আব্বাস এবং আবু হোরায়রা এ কথা অস্বীকার করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের আরও পরস্পর বিরোধিতার উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং হাদিস এবং আসার সঙ্কলনের সাথে সাথে পরস্পর বিরোধিতা বেড়েই এসেছে। আইনবিশেষজ্ঞরা এই বিরোধিতামূলক তথ্যের উপর নির্ভর করেই বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন।

www.pathagar.com

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো মতের ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্নতা তার জন্য দায়ী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং মতামত। একটি সমস্যা একই সময়ে বিভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন আইন ও তার ব্যাখ্যার উৎপত্তির কারণ হয়েছে। এই ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে রোধ করার জন্য এবং মুসলিম উম্মতকে আসন্ন ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইজমা প্রবর্তন করা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত ইতস্ততঃ বিস্তৃত মতামতকে বাদ দিয়ে সড়পড়তা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য প্রত্যেক অঞ্চল থেকে মতামত নিয়ে ইজমা প্রবর্তন করা হয়।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ মুসলমানদের আচার, রীতিনীতির ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) এবং তার সাহাবীদের নির্দেশিত পথেই নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ জন্যেই আমরা প্রচলিত নিয়মের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে দেখি। ইমাম মালিক প্রতিবারই সমর্থিত প্রথা বা প্রচলনের (মদিনার) দিকে নিদেশ করেছেন। আবু ইউসুফ বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এবং সর্বজনবিদিত সুন্নতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল আওযায়ী পুনঃ পুনঃ পূর্বেকার মুসলিম নেতাদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছেন।

প্রাচীন আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, আল শায়বানী, মালিক এবং আল আওযায়ী-এর নাম বিশেষ পরিচিত। এটা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে তাদের 'ইজতিহাদ' বা মুক্ত চিন্তার জন্যই (ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে) তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই সমস্ত ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ আঞ্চলিকতা বা গতানুগতিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন নি। আবার এই ধারণাও সম্পূর্ণভাবে সত্য বা নির্ভুল নয়। তাদের নিজস্ব এলাকার প্রচলন রীতিনীতি এবং চিন্তাধারা হয়তো বা অবচেতনভাবে কাজ করেছে। এটা তাদের যুক্তি তর্ক থেকেই প্রতিভাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মদিনায় ইমাম মালিকের আবির্ভাবের পূর্বে একটি বিশেষ চিন্তার অস্তিত্ব ছিল। মদিনায় এক ধরনের লোক বাস করতেন যাদের উত্তরসূরী ইসলামী আইন সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান ছিল প্রচুর। ইব্নে ওমর,

www.pathagar.com

আয়শা, ইবনে আল মুসাইব এবং আরও সাতজন প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ মদিনায় তাদের অবদান রেখে গেছেন। ইমাম মালিকের এই পূর্বসূরিগণ 'ইজতিহাদ' পালনের মাধ্যমে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রেখে গেছেন। যদিও ইমাম মালিক নিজে সন্দেহাতীতভাবে বিভিন্ন সময়ে 'ইজতিহাদ' পালন করেছেন কিন্তু তিনি কখনও তার পূর্বসূরীদের পন্থা থেকে বিচ্যুত হননি। ইরাকেও একই ঘটনা ঘটেছে। ইমাম আবু হানিফার আবির্ভাবের পূর্বে এক ধরনের মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের মতো সাহাবী এবং তাদের উত্তরসূরী আল কামাহ, আল আসওয়াদ, আল শাবিই, ইব্রাহিম আল নাখাই এবং অন্যান্যরা ইরাকে বাস করতেন। এই সব ব্যক্তি ইরাকে একটি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। ইমাম আবু হানিফা এই সমস্ত ঐতিহ্যময় রীতিনীতি ও আইন পড়েছেন, সম-সাময়িক সাহাবীদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি তার পূর্ব সূরীদের মতই 'ইজতিহাদ' অনুসরণ করেছেন তবে ইরাকের ঐতিহ্যকে মনে রেখে। তার খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি ইরাকী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে ওঠেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামী আইনের উৎস স্বাধীন বা মুক্ত ব্যাখ্যার পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত যা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছিল। সময়ের সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ও আইনানুগ মতামতের উপর নির্ভর করতে শুরু করে এবং পরে 'ইজতিহাদের' প্রচলন শুরু হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানের মাঝেই সীমিত ছিল।

যখন আইনের ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছিল তখনই ইমাম শাফিই এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তার পূর্বসূরীদের কাজ কর্ম পড়েন, বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং হাদিস বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে হাদিস শেখেন। তিনি ইরাকী ও মদীনার বিশেষজ্ঞদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং অনেক সমস্যার সাথে মত প্রকাশ করেন। তার পূর্বসূরী এবং সম-সাময়িকদের মধ্যেই অনেক বিষয়ে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন বা বুঝাতে পারেননি। তিনি তাদের যুক্তি তর্কে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য

www.pathagar.com

করেন। অথবা বলা যেতে পারে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রেখে যাওয়া আইন ও রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে না মেনে সাহাবীদের নিকট থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন বেশী তাঁর মূলে ছিল আঞ্চলিকতা। ঘটনাক্রমে একবার ইমাম মালিক, মহানবীর একটি হাদিস, খিয়ার আল্ মজলিস এর কাছ থেকে উদ্ধৃত করেন। এই হাদিসটি একটি চুক্তি মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এই হাদিস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালিক বললেন যে "এ ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই এবং কোন প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিও নেই।" কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইমাম মালিক মহানবীর হাদিস উদ্ধৃত করেছেন এবং অনুসরণও করেছেন। ইমাম শাফিই বললেন যে যদি মহানবীর প্রচলিত রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যই প্রকৃত বা নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে তবে কেন তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি আরও বললেন যে "আমি স্থিরসঙ্কল্প যে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে, যদি কোন কিছু মহানবীর কাছ থেকে এসে থাকে সেটাকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস আমার নেই। সাহাবীদের কাছ থেকে বা অন্য কারও পক্ষ থেকে যত বড় বিরোধিতাই আসুক না কেন।" তিনি আরও দেখতে পেলেন যে ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে অনেক সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্তের একটি নির্দিষ্ট রূপে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোন নিয়ম পালন করা হয়নি। সুতরাং তিনি কিয়াসের (Qiyas) এর জন্য আইন প্রণয়ন করেন। অনেক সময়ই তিনি এই সমস্ত আইনবিদদের সাক্ষী প্রমাণ থেকে দেখেছেন যে তারা হয়তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উদ্ধৃত কোন হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার সাথে বর্ণনাকারীর কোন সম্পর্ক নেই বা থাকলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। সেই জন্যেই তিনি বর্ণনাকারীর বিশেষ নিয়ম নিষ্ঠা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

হাদিসের উপর ইমাম শাফিইর গুরুত্ব আরোপ করার কারণ হচ্ছে এর পূর্বে সঠিকভাবে হাদিস সঙ্কলিত হয়নি। তারপর থেকেই একদল লোক হাদিস সঙ্কলনকে তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়ে হাদিসের মৌলিকত্ব ও প্রকৃতি নির্ধারণের কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁরা মুসলিম বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং হাদিস সংগ্রহ করেন। যদিও ছয়টি হাদিসের সংগ্রহ

www.pathagar.com

তখনও পাওয়া যায়নি, হাদিস সংগ্রহের আন্দোলন তার সময় থেকেই শুরু হয়। ইমাম শাফিই তার লেখায় "আহলাল হাদিস" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ শব্দ দ্বারা তিনি হাদিস বিশেষজ্ঞদেরই বুঝিয়েছেন। এছাড়া হাদিসের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে জনগণ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রীতিনীতি যা প্রাথমিক পর্যায়ে নিগৃহীত হয়েছে, গ্রহণ করতে শুরু করল। ইমাম শাফিই অন্যান্য মুসলিম রীতিনীতির চেয়ে হাদিসকে অধিক সম্মত এবং সুষ্ঠুভিত্তিক মনে করতেন। রসূলুল্লার নির্ভুল এবং সন্দেহমুক্ত হাদিসের নীতি প্রবর্তনের জন্য তিনি অন্যান্য ইসলামী আইনবিদদের সাথে যথেষ্ট বোঝাপড়া করেন যার ফলে আর একটি পক্ষ জন্ম নেয়। এ ছাড়া প্রাথমিক হাদিস বিশেষজ্ঞদের সাথে ইমাম শাফিইর কোন সমঝোতা হয়নি, তার কারণ ইমাম শাফির প্রচারিত আইন ও নীতি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বা বিদেশী মনে হয়েছে।

হিজরীর প্রথম দুই শতাব্দীতে কোন একক ব্যক্তিগত প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে সমস্ত ভৌগলিক বিভাগের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তখনও ছিল। কিছু সর্বজনসম্মত রীতিনীতি ছিল এবং একই মনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞও ছিলেন এই সমস্ত অঞ্চলে। প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতেন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতেন। প্রথম দিকে ইমাম আবু হানিফা তার শিক্ষক হাম্মাদের মাধ্যমে ইব্রাহিমের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তার কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তিনি মোটামুটিভাবে ইব্রাহিমকেই অনুসরণ করেছেন। আল শায়বাণী আবু হানিফাকে আল-মুয়াত্তা (AL-Muwatta) বলে অবহিত করেছেন। তিনি সাধারণত তার অধ্যায় শেষ করেন এই বলে যে এই হচ্ছে আবু হানিফার এবং অন্যান্যের মতামত। আবু ইউসুফ অনেক সময়ই আমাদের নেতা বা আমাদের আইনবিদ বলে তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিইর কাছ থেকে জানা যায় যে কুফায় একটি দল আবু ইউসুফকে অনুসরণ করত এবং আরেকটি ইবনে আবি লাইলাকে। তিনি কুফার কিছু কিছু লোককে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী বলে অবহিত করেছেন।

www.pathagar.com

একইভাবে মদিনাতেও একদল লোক ইমাম মালিকের মতবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ইমাম মালিকের মতামতকে ইজমা হিসেবে গ্রহণ করত। এক সময় তারা খোলাখুলিভাবেই বলেছিল : আমরা আমাদের নেতার মতামত অনুসরণ করি। এ কথা ইমাম মালিককে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল। ইমাম শাফিই নিজেও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন মাঝে মধ্যে। এমন কি আবু ইউসুফ মদিনার লোকদেরকে "আমাদের হেজাজের সাথী" বলে অবহিত করেছেন। এ সমস্ত উদাহরণ প্রমাণ করে যে জনগণের সাথে ইমাম মালিকের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা একাত্মতা ছিল, এটার কারণ হয়তো তার কাছ থেকে মদিনাবাসীরা জ্ঞান অর্জন করেছিল বলে। ইমাম মালিকই সব প্রথম সুবিন্যস্তভাবে 'ফিকাহ্' শাস্ত্র সঙ্কলন করেন। সেই সুদুর ইরাক আফ্রিকা এবং স্পেন থেকে লোক ছুটে আসত ইমাম মালিকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য।

ইমাম শাফিই নিজে আইন বিশেষজ্ঞের কাছে ব্যক্তিগত অনুগত্যের বিরোধী ছিলেন। তিনি এটাকে ঘৃণা করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে মদিনার অন্তর্ভুক্ত ভাবতেন। কখনও কখনও মদিনাবাসীদের সহচর এবং ইমাম মালিককে নেতা ভাবতেন। ইমাম শাফিই অবশ্য মদিনাবাসীদের নীতিকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। সামগ্রিকভাবে তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন এবং শ্রেণীর প্রভাবমুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে দ্বিতীয় হিজরী সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। আঞ্চলিকতা ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে পুর্বে জনগণ স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তার অনুসারী ছিল। পরে ইমাম শাফিই তাঁর নিজস্ব আইন তত্ত্ব গঠন করেন এবং ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেন। ইমাম শাফিই-র পর থেকে আঞ্চলিকতার প্রভাব দূরীভূত হতে শুরু করে এবং ব্যক্তিগত আনুগত্য প্রকাশের ধারা প্রশমিত হয়।

[তথ্যের উৎস : **The early development of Islamic jurisprudence by Ahmad Hasan**]

www.pathagar.com

ইসলামী আইনতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রক্রিয়া বর্তমান যুগে নবোদ্যমে শুরু হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সকল দেশ এই গবেষণার শরীক। প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আইনতত্ত্ব স্থান নয় বরং যুগচিন্তার ধারক ও বাহক। তবে ধ্রুব সে একখানে, আল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে।

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা,

আইন কিসের জন্য? ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজগতভাবে, এককভাবে এবং যৌথভাবে অনুভূতিগতভাবে এবং বুদ্ধিগতভাবে যে বিধিমালা মানিয়া চলিলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয় তাহাই কেবলমাত্র আইনরূপে চিহ্নিত হইবার যোগ্যতা রাখে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সার্বিক কল্যাণ বলিতে আমরা কি বুঝি? যে উদ্দেশ্যে মানুষ-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারিলে তবে মানব জন্ম সার্থক হয়, কল্যাণ তাহাতেই নিহিত। যে বিধিমালা আইনরূপে চিহ্নিত, সেই বিধিমালা কতিপয় আদেশ এবং নিষেধের সমাহার। যাহা ভাল তাহা কর এবং যাহা মন্দ তাহা করিও না, ইহাই এই বিধিমালার মূলকথা। কি ভাল এবং কি মন্দ তাহার যাচাই হইবে কিসের ভিত্তিতে? ভিত্তি হইতেছে পূর্বোক্ত কল্যাণ। কল্যাণ জীবনের উদ্দেশ্য। এখন উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে জীবনকে বুঝিতে হয়।

ইসলাম বলে এই নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণু এক মহাশক্তির অতন্দ্র প্রহরায় তাহারই আইন মোতাবেক আপন আপন নির্ধারিত কর্তব্য পালনে সদা তৎপর। এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা তিনিই শাসন করিতেছেন। ইহা তাহারই

www.pathagar.com

রাষ্ট্র। আমাদের এই সুন্দর নিখিল পৃথিবী তাঁহার সৃষ্ট নিখিল বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এবং আমরা তাঁহারই দাসানুদাস। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁহারই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার করুণায় মানব জাতিকে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিবার জন্য একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়াছেন; সেই ক্ষেত্রে মানুষ তাহার বিবেক এবং বিবেচনার নির্দেশে চলিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু সেই বিবেক এবং বিবেচনা তাঁহার আইনকে কোন ক্রমে ছাড়াইয়া যাইবে না। মানুষকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিবেকও আল্লাহতায়ালার দান।

ইসলামের দৃষ্টিতে আইন বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা বলা হইল। মানব জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার কিভাবে আয়াত বা চিহ্ন মানুষকে দেখাইয়াছেন তাহারই আলোকে তাঁহার প্রেরিত রসূল যে শরীয়ত বা পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই আইন।

যে বিধিমালা লইয়া ইসলামী আইন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই শরীয়ত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব প্রভৃতি জীবনের প্রায় সর্ব বিষয়কে এই বিধিমালা স্পর্শ করিয়াছে। ইহা সার্বজনীন।

শরীয়তের বিধিমালা সামগ্রিকভাবে ইসলাম নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একটি বিধির সহিত অন্য বিধির যোগ অত্যন্ত নিবিড়। যে রাষ্ট্রে দরিদ্রের ভরণ-পোষণের জন্য বায়তুলমালের দ্বার উন্মুক্ত নহে, সেই রাষ্ট্রে চোরের অংগ ছেদনের বিধি নিষ্ঠুর মনে হওয়া স্বাভাবিক। যে দেশের রাস্তায় রাস্তায় নগ্নবক্ষা নারীর মিছিল, সে দেশে ব্যভিচারের জন্য বেত্রাঘাত বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি বিভীষিকাময় মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

আইন বুঝিতে হইলে যে সূত্র বা তত্ত্বের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে হয়। ইসলামী আইন বুঝিতে হইলে তাই ইসলামী আইনতত্ত্ব জানিতে হয়। বিশিষ্ট মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ এই বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অবদানে ইসলামী আইনতত্ত্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে। এখানে পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন যে, এই আইনতত্ত্ব বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের সৃষ্টি। ইসলামী আইন ঐশী, কিন্তু আইনতত্ত্ব মানবিক।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতির উদ্দেশ্যে আইন জারি করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং পরবর্তীকালে মুজতাহিদগণ এই আইন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করিতে গিয়া তাঁহারা আইনের তত্ত্ব বা সূত্র খুঁজিয়াছেন। এইভাবে ইসলামী আইনতত্ত্ব Islamic Jurisprudence গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আইনতত্ত্বের আলোকে নতুন নতুন ফতোয়া বা আইন সৃষ্টি হইয়াছে। আইন সৃষ্টি প্রসঙ্গে ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য আইন ব্যাখ্যা করেন বিচারকগণ, তাহার ফলে নজীর ভিত্তিক আইন জন্ম নেয়। ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করেন মুজতাহিদগণ, বিচারকগণ নয়।

ইমাম আবু হানিফার ইস্তিহসান এবং ইমাম মালিকের ইসতিসলাহ ইসলামী আইনতত্ত্বকে অনেক গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রদান করিয়াছে। যাহাতে মানুষের ইহসান হয় বা ইসলাহ (কল্যাণ) হয়, তাহা প্রতিষ্ঠিত মতের পরিপন্থী হইলেও গ্রহণীয়। এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালতের মহামান্য বিচারকগণ বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে ইজতিহাদের পথে অগ্রসর হইয়া ইসলামী আইনের বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন। ইসলামী আইন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

লাহোর হাইকোর্টের মহামান্য বিচারকগণ বলিয়াছেন, ইসতিহসান ও ইসতিসলাহের আলোকে স্থান এবং কাল বিবেচনা করিয়া সলামী আইন ব্যাখ্যা করা উচিত (P. L. D. 1957 Lahore 998; P.L D 1984 Lahore 558)।

রসূলুল্লাহ্ নিজেও, মনে হয়, ধীরে ধীরে আইনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মানুষের মনে ইসলামের মর্মবাণী তৌহিদ সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে আইয়্যামে জাহেলিয়ার আইনসমূহ পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে ইসলামী আইন স্থাপন করিয়াছিলেন। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন তৃতীয় হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাহ এবং তালাকের আইন সপ্তম হিজরীতে, ফৌজদারী আইন অষ্টম হিজরীতে এবং সুদ সম্পর্কিত আইন নবম হিজরীতে পূর্ণরূপে প্রবর্তিত হয়।

স্যার আবদুর রহীমের Mohamedan Jurisprudence নিঃসন্দেহে একখানি ক্লাসিক গ্রন্থ। এই শতাব্দীর প্রথম দশক ইহার রচনাকাল। দীর্ঘ ছয় দশকের উর্ধবকাল অতিবাহিত হইবার পরও ইহা স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

অনুসৃতির সময় এই পুস্তকের অতি সামান্য কিছু অংশ বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে। দাস প্রথা সম্পর্কে এই পুস্তকে প্রচুর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া অনুসৃতির সময় উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব আবদুল খালেক সাহেবের প্রেরণা আমাকে এই পুস্তক রচনার কাজে উৎসাহিত করেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক শাহেদ আলীকে পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি ইহার ভাষাকে লোকপ্রিয় আখ্যায়িত করিয়া

www.pathagar.com

আমার কাজে উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান আমার সাহিত্য কর্মের সহিত পরিচিত। আইন পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে আমার অধিকার, তাঁহার মতে, নিশ্চিত ও সফলকাম। তাঁহার এই উক্তি আমাকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

গাজী শামছুর রহমান

পদ্ম মহল

৫/৭, গজনবী রোড,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ ।। স্যার আবদুর রহীম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঠাকুর অধ্যাপক রূপে ১৯৬০ সালে আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহার সারাংশ হইতেছে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। আমি দুঃখিত যে, এই বই প্রকাশ করিতে প্রায় চার বৎসর সময় লাগিয়া গেল। এই বিলম্বের জন্য আমিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

এই পুস্তকের প্রথম আধ্যায়কে সমগ্র আলোচনার একটি ভূমিকা বলা যায়। ইহার প্রথম অংশ লিখিবার সময় আমি ম্যাকডোনাল্ডের ইসলামী ধর্মতত্ত্ব হইতে প্রভূত সহায়তা লাভ করিয়াছি।

ইসলামী আইনের বিজ্ঞান বা উসুলের বর্ণনা দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিকাশ ঘটিয়াছিল অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে। এই অধ্যায়গুলির অতি বৃহৎ অংশ 'তৌহীদ' গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। আইন বিজ্ঞানে ইহা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। সদরুশ-শরীয়ত কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইসলামী আইন বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিতে গিয়া আমি আরো অনেক গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি। এইগুলি হইতেছে তাফতাজানী-র তালবিহ ফখরুল ইসলামের আল উসুল এবং তাঁহার ভাষ্য কাহফুল ইসরা, মুহিবুল্লার মুসুল্লুস সাবুত তাঁহার ভাষ্যাবলী, ইবনে হাম্মামের আত্তাকরির অতাওহাবির, মুল্লা জীবনের নুরউল আনোয়ার, তাজউদ্দিন সুবকির জামউল জামায়ী এবং তাঁহার ভাষ্য এবং ইবনে হাবীবের আল মুকতাসাব এবং তাহার ভাষ্য।

ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ অধ্যায় লিখিবার সময় আমি হেদায়া এবং শরহুল-বেকায়া ইহতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। যে মৌলিক সূত্রাবলী এবং প্রত্যয়ের উপর ইসলামী আইনের ভিত্তি, তাহা আমি এই অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করিয়াছি। ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য এই বিবরণে স্পষ্ট হইবে। আইনের এবং আইনতত্ত্বের মধ্যে বিভেদ-রেখা অতি সূক্ষ্ম। আমি এই উভয় বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ যেভাবে এবং ভাষায় তাহাদের চিন্তাধারণাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি সেই ভাব ও ভাষাকে নিষ্ঠা সহকারে

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করতে হয় এবং এ আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার পথটি অত্যন্ত জটিল। এ ক্ষেত্রে আইনজ্ঞের নিজস্ব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়।

জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সকলের এক রকম নয়। ইসলামী আইনের সংকলন এবং ব্যাখ্যাও তাই এক রকম হয়নি। এই উপমহাদেশে যাঁরা ইসলামী আইনের সংকলন, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদের যেমন একটি বিশেষ সুবিধা আছে তেমনি একটি দুর্বলতাও আছে। সুবিধা এই যে, যেহেতু তাঁরা আইনবিদ, তাই সংকলন ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁরা অভ্যস্ত। সেই অভ্যাস তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। কাজে লাগাতে গিয়ে তাঁরা ইসলামী আইনের উপর অনেক উদার প্রভাব আমদানী করেছেন। পাশ্চাত্য আইনের অনেক ভাবধারা তাঁরা ইসলামী আইনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁদের দুর্বলতা এইখানে যে, তাঁরা ইসলামী আইনের মূল উৎস কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সম্ভবত গভীর জ্ঞান রাখেন না। আরবী ভাষায় তাঁদের ব্যুৎপত্তি ব্যাপক নয়।

স্যার আবদুর রহীম যেমন পাশ্চাত্য আইনের তেমনি ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থাবলীর সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত। এ পরিচিতির প্রতিক্রিয়া তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ **Mohamedan Jurisprudence**-এর প্রতি অধ্যায়ে পরিদৃশ্যমান। তাঁর বিশ্লেষণ যে কত উদার এবং যথার্থ তা এই উপমহাদেশের ইসলামী আইনের বিবর্তন দেখলে স্পষ্ট হয়। বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ প্রভৃতি আইনের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, পরবর্তীকালে তা গৃহীত হয়েছে এবং সে অনুসারে আইন প্রণীত হয়েছে। আমাদের ভাষ্যকারদের স্বাভাবিক দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত।

প্রয়োজনের দাবীতেই মানুষকে আইন জানতে হয়। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা আইনের নীতি জানা। স্যার আবদুর রহীম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, এদেশের আইনজীবিগণ মনে করেন যে, ইসলামী আইনের ভিত্তি শুধু কঠোর আদেশমালা, কোন যুক্তি বা নীতির উপর তাদের বুনিয়াদ নেই। তাঁর পুস্তক এই ভুল ভাংতে সহায়তা করবে। ইসলামী আইন যে যুক্তিভিত্তিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা পাঠকগণ বুঝবেন। বস্তুত আইন মানার প্রবণতা

www.pathagar.com

যেমন শাস্তির ভয় থেকে আসে, তেমনি যুক্তি ও কল্যাণবোধ থেকে আসে। শাস্তির ভয় দিয়ে আইন মানানো যায়, কিন্তু তার ফল ভাল হয় না, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা যদি কল্যাণবোধ দ্বারা জাগ্রত হয় তবে তাতে শান্তি বাড়ে।

এ মহান গ্রন্থখানির অনুসরণে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার জন্য একখানি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন ছিল। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে গাজী শামছুর রহমান এ কাজ করে দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গাজী শামছুর রহমান-এর গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা, শিশুতোষ রচনা, যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ প্রভৃতির সাথে আমি বহুকাল অবধি পরিচিত। এ ক্ষেত্রে আমি তাঁকে সার্থক বলি। তিনি বর্তমানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন প্রকার আইনের সংগে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর ভাষা সরল এবং মনোজ্ঞ, তিনি খুব জটিল বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশন করার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখেন, সে কারণে তাঁর গ্রন্থাবলী এবং রচনা আশ্চর্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গাজী শামছুর রহমান সম্পর্কে আর একটি কথা বলা দরকার, তা হচ্ছে—আইনের বিষয়ের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি আইনের কঠিন তত্ত্বগুলোকে যে ভাবে লোকগাহ্য করে প্রকাশ করেছেন তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, আইনের রাজ্যে তাঁর গতিবিধি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত এবং এ বিষয়ে তাঁর রচনা প্রকৃতই সফলকাম।

১৭-২-১৯৭৮

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আধুনিক আইনবিদদের নিকট যাহাতে ইসলামী আইনের ভাব স্পষ্ট হইবার সুযোগ পায় সে চেষ্টা করিয়াছি। যদি আমি ব্যর্থ হইয়া থাকি তবে তাহার কিছু অজুহাত আমি দিতে পারি। আইনতত্ত্বের মত টেকনি-ক্যাল এবং বিমূর্ত বিষয়ের উপর লিখিত আরবী গ্রন্থের অনুবাদ সত্যিই দুরূহ। এই দুরূহতার কারণে ব্যর্থতা আসিতে পারে।

ইসলামী আইনের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক। এই উপমহাদেশের অনেক আইনবিদ মনে করেন যে, কতিপয় আদেশ-নিষেধের স্বেচ্ছাচার সংকলনের নামই হইতেছে ইসলামী আইন। আমি আশা করি এই পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তি পাইবেন এবং বুঝিবেন যে ইসলামী আইনের পশ্চাতে বোধগম্য দর্শন বিরাজমান। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা প্রদান করা। এই অধিকার এবং কর্তব্য যেমন ইহলৌকিক তেমনি পারলৌকিক। ধর্মের সহিত আইনের কোন বিরোধ ইসলামী আইনবিদগণ স্বীকার করেন না। এই দুইয়ে মিলিয়া যে পূর্ণাঙ্গ বিধান গঠিত হয়, তাহাই ইসলামী আইন। যে যুগে এই আইন বিন্যস্ত হইয়াছিল সেই যুগের কথা বিবেচনা করিয়া এবং যে জটিলতা এই বিন্যাসের পথে আসিয়াছিল তাহা মনে রাখিয়া ইসলামী আইনতত্ত্বকে বিচার করিতে হইবে। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ এই ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহা মহামূল্য অবদানরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই পুস্তকে সেই মূল্যবান অবদানের খবর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা আইন বা আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী নন, তাঁহাদের জন্য এই বই-এর কিছু উপকারিতা আছে। বিশ্বের সুন্নী মুসলিমবৃন্দ যে নীতির চরিত্র এবং ভিত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

মাদ্রাজ ॥ মে ১, ১৯১১

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনের বিবর্তনের ইতিহাস ১—৪৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলাম পূর্ব যুগে আরব দেশীয় প্রথা এবং রীতিনীতি ২—১৬

আরব সমাজের গঠন—২, সর্দার এবং তাহার কর্তব্য —৩, মক্কার পরিস্থিতি—৩, গোত্রে গোত্রে বিবাদ—৪, কার্যবিধি—৫, হলফ—৬, প্রতিশোধকমূলক শাস্তি—৬, অন্যবিধ শাস্তি—৭, বিবাহ প্রথা—৭, মোহরানা—৮, বিবাহে নারীর অধিকার—৯, বহুবিবাহ—৯, নিষিদ্ধ বিবাহ—১০, বিবাহ বিচ্ছেদ—১০, তালাক—১০, ইলা —১১, জিহার—১১, খুলা—১১, ইদ্দত—১১, সন্তানের বৈধতা—১১, দত্তক—১২, বালিকা হত্যা—১২, সম্পত্তির অধিকার—১২, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়—১৩, ইজারা —১৫, কর্জ এবং সুদ—১৫, উইল—১৫, মিরাস—১৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলাম জারি হইবার পর আইনতত্ত্ব ১৭—৩৯

ইসলামী আইনের চারিযুগ—১৭।

প্রথম যুগ : আল্-কুরআন—১৮, আল্-হাদীস—১৮।

দ্বিতীয় যুগ : ১৯ খলিফা নির্বাচন—২০, কুরআন সংগ্রহ —২০, আল-হাদীস সংগ্রহ—২১, মুহাদ্দিস এবং ফকিহ্ —২১, মদিনা এবং কুফা—২২, প্রথম চারি খলিফার বিচারকার্য—২২, উমাইয়া খেলাফত—২৩, আব্বাসি খিলাফত—২৪, ইসলামী আইনতত্ত্ব এবং রোমের আইনতত্ত্ব—২৪।

তৃতীয় যুগ : সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা—২৫, আবু হানিফা—২৫, কিয়াস—২৬, ইজমা—২৭, উরুফ— ২৭, আইন বিধিবদ্ধকরণ—২৮, মালিক—২৯, শাফিঈ —৩০, আহম্মদ ইবনে হাম্বল—৩১, হাদীস

www.pathagar.com

বিজ্ঞান—৩২, আইনতত্ত্বে মুহাদ্দিসগণের প্রভাব—৩৪, তফসীরুল কুরআন—৩৫, আইনতত্ত্ব—৩৫।
চতুর্থ যুগ—৩৬, উসূল লেখক—৩৮।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ব্রিটিশ ভারতের ইসলামী আইন ৩৯—৪৭
আইন কর্মকর্তা—৪০, ইসলামী আইন নির্ধারণের পন্থা—৪০, জটিলতা প্রভৃতির অভিযোগ—৪১, অনুবাদের অসুবিধা—৪৩, ইসলামী আইন প্রয়োগের সূত্র—৪৩, ইসলামী পারিবারিক আইন প্রয়োগ—৪৫, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন—৪৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনতত্ত্ব, আইন এবং আইনের শ্রেণীবিন্যাস ৪৮—৬৬
উসূলুল-ফিক্‌হের সংজ্ঞা—৪৮, ফিক্‌হের সংজ্ঞা—৪৮ আইনের সংজ্ঞা—৫০, যুক্তির উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত—৫০, আল্লাহ এবং মানবের মধ্যে চুক্তি হইতেছে আইনের উৎস—৫১, আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা—৫২, কুরআন এবং হাদীস—৫৩, ইজমা—৫৩, কিয়াস—৫৩, প্রথা—৫৪, আইনের কাজ—৫৫, আইনের পরিধি এবং উদ্দেশ্য—৫৫, মানবরত্তিসমূহ—৫৩, অধিকার এবং দায়িত্ব—৫৬, আইনের প্রকৃতি—৫৭, আইন বলবৎ করিবার ব্যবস্থা—৫৮, ইসলামী আইনের প্রয়োগক্ষেত্র—৫৮, রাষ্ট্র পরিচালনা—৫৯, সার্বভৌমত্ব—৫৯, রাষ্ট্র—৫৯, আইনের শ্রেণীবিন্যাস—৬০ দায়িত্বভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ—৬১, ধর্মীয় আইন এবং সামাজিক আইন—৬১, প্রত্যাদিষ্ট ও অপ্রত্যাদিষ্ট আইন—৬২, একিনি এবং জান্নি আইন—৬২, অনমনীয় এবং নমনীয় আইন—৬৩, ব্যাখ্যামূলক আইন—৬৪, রদকারী আইন এবং সংশোধনকারী আইন—৬৪, গণ আইন এবং ব্যক্তিগত আইন—৬৫, ব্যক্তিত্বের আইন—৬৫, দ্রব্যের আইন—৬৬, সাক্ষ্য আইন—৬৬, কার্য বিধি—৬৬, সাংবিধানিক আইন—৬৬, আন্তর্জাতিক আইন—৬৬।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আইনের উৎস ৬৭—১৫৮

প্রথম ভাগ : কুরআন এবং হাদীস ৬৭—৯৫

প্রথম অনুচ্ছেদ : সাধারণ ৬৭—৭৪

ওহী—৬৭, ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রত্যাদিষ্ট আইন—৬৮ আইনের উৎসরূপে আল-কুরআন—৬৮, আল-কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য—৬৯, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ বিধি—৭০, হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস—৭১, রাবীর যোগ্যতা—৭১, রাবীর শ্রেণীবিভাগ—৭২, সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হাদীস—৭২, অন্যান্য আপত্তি—৭৩, রেওয়ায়েত—৭৩, রসূলুল্লাহ্‌র আমল—৭৪, বিষয়বস্তুর নিরিখে হাদীসের ভাগ—৭৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তফসীর ৭৫—৯৭

তফসীরের কাজ—৭৫, শব্দের শ্রেণীবিন্যাস—৭৬, ভিন্নার্থবোধক আ'ম এবং খাস শব্দ—৭৬, প্রকৃতি প্রত্যয়গত নামবাচক বা বর্গীয় শব্দ—৭৬, প্রকৃতি প্রত্যয়গত নামবাচক বা বর্গীয় শব্দ : ৭৬, সীমিত অর্থবোধক এবং চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ—৭৭, সাধারণ শব্দ—৭৭, বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যা—৭৮, বিরোধী নীতির সামঞ্জস্য সাধন—৭৮, সাধারণ এবং বিশেষ নীতি—৭৮, সাধারণ নীতির সীমিতকরণ—৭৯; অধীন বাক্যাংশের প্রতিক্রিয়া—৭৯, স্বাধীন বাক্যের প্রতিক্রিয়া—৮০, সাধারণ শব্দের উদাহরণ—৮০, বহুবচনের ব্যবহার—৮০, বহুবচনের পূর্বে নির্দিষ্টতাবাচক প্রত্যয় যোগ—৮১, একবচন বোধক শব্দের পূর্বে নির্দেশাত্মক প্রত্যয় যোগের প্রতিক্রিয়া—৮১, অনির্দেশক শব্দ—৮২, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার—৮২, কর্ম হইতে অনুমান—৮২, প্রশ্নের উত্তরে বা বিশেষ ঘটনার উপরে বিবৃতি—৮৩, চূড়ান্ত এবং শর্তযুক্ত নীতি—৮৩, ভিন্নার্থক শব্দের ব্যাখ্যা—৮৪, আভিধানিক, আইনভিত্তিক, প্রথাভিত্তিক, ঐতিহ্যবাহী এবং টেকনিকাল অর্থে শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে—৮৪, ফলের দ্বারা কারণ প্রকাশ—৮৬, শব্দের মাধ্যমিক প্রয়োগ—৮৭, শব্দের অর্থ

www.pathagar.com

নিরূপণের পদ্ধতি—৮৭, শব্দের স্পষ্ট এবং সাংকেতিক ব্যবহার—৮৮,লিপির শ্রেণীবিন্যাস—৮৮,শব্দের অর্থের শ্রেণীবিন্যাস—৮৯, চূড়ান্ত পাঠ—৯০, শব্দের অর্থ—৯০, বিবরণমূলক এবং সংজ্ঞামূলক অর্থ—৯১, বক্তব্যের অর্থ—৯১,অনুমোদন দ্বারা নিষেধ বুঝায় না—৯১,শব্দ হইতে আইনের উদ্ভব—৯১, অনুজ্ঞাবাচক শব্দ—৯২, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাজ—৯৩, ভাল কাজ—৯৪, নিষেধ বাচক শব্দ—৯৫, বাতিল ফাসিদ এবং মাকরূহ কাজ —৯৫, বয়ান—৯৫, ইংগিতের মাধ্যমে বয়ান—৯৭।

দ্বিতীয় ভাগ : ইজমা এবং প্রথা—৯৮—১১৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইজমা ৯৭—১১৩

ইজমার সংজ্ঞা—৯৬, শিয়াদের মত—৯৯, ইজমার সপক্ষে যুক্তি—৯৯,ইজমার স্তরভেদ—১০০, ইজমায়কে শরীক হইতে পারে—১০০, মুজতাহিদ বা আইনতত্ত্ব-বিদ—১০১, মুজতাহিদের যোগ্যতা—১০১, নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়—১০২, ধর্মদ্রোহী—১০২, আইন অমান্যকারী —১০৩, যুগ এবং দেশ—১০৩, মদিনায় আইনতত্ত্ব-বিদগণের অভিমত—১০৩, আসহাবদের অভিমত—১০৪, রসুলুল্লাহর (স:) বংশধরদের অভিমত—১০৪, খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিমত—১০৫, ইজমা গঠনের শর্ত—১০৫, ইজমা কখন পরিপূর্ণ হয়—১০৬, ঐক্য মতের বিরোধিতা—১০৮, এককালের ইজমা পরবর্তী কালের ইজমা দ্বারা রদ হইতে পারে—১০৮, ইজমার গঠন পদ্ধতি—১০৯, ইজমা গঠনে মুজতাহিদের সংখ্যা —১১১, আল কুরআন, হাদীস বা কিয়াসের উপর ইজমার বুনিয়াদ—১১১, ইজমার প্রমাণ—১১২, ইজমার প্রতিক্রিয়া—১১২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রথা এবং রীতি ১১৩—১১৪

তৃতীয় ভাগ : বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত ১১৫—১৫১

প্রথম অনুচ্ছেদ : কিয়াস ১১৫—১৩১

কিয়াসের পরিধি—১১৫, আইনের উৎসরূপে কিয়াসের মর্যাদা—১১৬, কিয়াসের বিরুদ্ধে যুক্তি—১১৬,

www.pathagar.com

কিয়াসের সম্বন্ধে যুক্তি—১১৭, কিয়াসের শর্ত—১১৮, ইল্লাত বা কার্যকরী কারণ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য—১২২, দ্বীনি এবং দুনিয়াবী আইনের সংঘর্ষ—১২২, সাধারণ পলিসির উপর কিয়াস অচল—১২৪, ইল্লাত নির্দিষ্ট হইবে—১২৫, কার্যকরী কারণের ন্যায়ানুগতা—১২৫, আইনের মূল প্রসারণযোগ্য—১২৫, আইনের কারণ কি হইতে পারে—১২৬, কারণের সহিত মূলের যোগ—১২৬, কারণ জানিবার উপায়—১২৭, আইনের কারণ অনুসন্ধান—১২৭, আইনের কারণের মূল এবং শাখা ১২৭, ত্যাগের নীতির মাধ্যমে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—১২৮, কিয়াসের মূল্য—১২৮, কিয়াসের মূল্য—১২৯, কিয়াসের মধ্যে সংঘর্ষ—১২৯, কারণ বা উদ্দেশ্যের সীমা—১২৯, কিয়াসের উদাহরণ—১৩০।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহসান ১৩৩—১৩৪

ইসতিহসান বা আইনগত ন্যায়পরায়ণতা—১৩৩, ইসতিহসান এবং কিয়াসের শ্রেণী—১৩৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসলাহ ১৩৪—১৩৫

ইসতিসলাহ—১৩৪।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিদলাল ১৩৫—১৩৬

ইসতিদলাল—১৩৫।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ইজতিহাদ এবং তকলিদ ১৩৭—১৪৯

ইজতিহাদ ও তকলিদ-১৩৭, মুজতাহিদগণের যোগ্যতা—১৩৭, তকলিদ—১৩৯, তকলিদ সম্পর্কে প্রশ্ন—১৩৯, সাধারণ মানুষের কর্তব্য—১৪০, আধুনিক আইনবিদগণ কি প্রাচীন ইমামদের মর্যাদা পাইতে পারেন—১৪০; আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং ইজমার অনুপস্থিতিতে কাজী বা বিচারকের কর্তব্য—১৪৪, মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিভাগ—১৪৬, মুজতাহিদগণের বিধানের প্রতিবেদন—১৪৯, মন্তব্য—১৫০।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

কার্য, অধিকার এবং দায়িত্ব ১৫২—১৬৭

কার্য, অধিকার এবং দায়িত্ব—১৫২, কাজের শ্রেণী-বিন্যাস—১৫২, স্বভাবগত, আইনগত, শরীরগত এবং মস্তিষ্কগত কাজ—১৫২, ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক কাজ—১৫৩, ইনশাআত, আখবারাত এবং ইতিকাদাত—১৫৪, ইসবাতাত এবং ইসকাতাত—১৫৪, প্রত্যাহার-যোগ্য এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য কাজ—১৫৪, কাজের আইনগত প্রতিক্রিয়া—১৫৪, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কাজের শ্রেণীবিন্যাস—১৫৫, ইহলৌকিক উদ্দেশ্যের নিরিখে কাজের শ্রেণীবিন্যাস—১৫৬, সংগঠিত কার্যকর এবং বাধ্যকর কাজ—১৫৭, ইহলৌকিক আদান-প্রদানের মৌলিক উপাদান—১৫৭, শর্ত—১৫৮, অধিকারের শ্রেণীবিভাগ : গণঅধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকার ১৫৮, গণ-অধিকারের উপ-শ্রেণী—১৬০, অনির্ভর এবং নির্ভর অধিকার—১৬১, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিস্থাপিত অধিকার—১৬১, ব্যক্তিগত অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস—১৬২, প্রতিস্থাপক অধিকার—১৬২, দায়িত্বের শ্রেণীভেদ—১৬৩, দায় শোধের শ্রেণী—১৬৪, অধিকার এবং দায়িত্বের উৎস হস্তান্তর এবং বিলোপ—১৬৪, কার্যকর কারণের প্রকারভেদ—১৬৫, প্রস্তুতকারী কারণ—১৬৫, শর্ত—১৬৬।

পঞ্চম অধ্যায়

আইনভিত্তিক যোগ্যতা ১৬৮—২০৪

আইনভিত্তিক যোগ্যতার সংজ্ঞা—১৬৮, ধারণ এবং প্রয়োগের যোগ্যতা—১৬৮, আইনভিত্তিক যোগ্যতার উপর প্রভাব—১৬৯, কৃত্রিম ব্যক্তি—১৬৯, পরিস্থিতি-গত আইনভিত্তিক যোগ্যতার বিভাগ—১৬৯, কাজের সহিত মনের এবং ইচ্ছার সম্বন্ধ—১৭০, অভিপ্রায় এবং সম্মতির পার্থক্য—১৭১, কাজের উদ্দেশ্যের

www.pathagar.com

মুকাবিলায় অভিপ্রায়—১৭২, ইখতিয়ার, নিয়ত এবং আকাঙ্ক্ষা—১৭৩, অভিপ্রায় এবং সম্মতি কখন পূর্ণ হয়—১৭৪, বিচার এবং জ্ঞান—১৭৫, উদাহরণসমূহ—১৭৫, বিস্মরণ—১৭৫, নিদ্রা—১৭৬, মূর্ছাবস্থা—১৭৬, ভ্রম—১৭৭, পানোম্মত্ততা—১৭৮, উপহাস—১৭৯, বল প্রয়োগ—১৮৩, প্রতারণা—১৮৫, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা—১৮৫, তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা—১৮৭, বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা ত্রুটি—১৮৮, শিশু—১৮৮, গণ-অধিকার সম্পর্কে শিশুর দায়িত্ব—১৮৯, শিশুর কাজের এবং চুক্তির যোগ্যতা—১৯০, শিশুর দীন—১৯১, ধর্মান্তরের প্রতিক্রিয়া—১৯১, উন্মাদ—১৯২, জড়বুদ্ধি—১৯২, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি—১৯২, দেউলিয়া—১৯৩, অযোগ্য বৃত্তিধারী ব্যক্তি—১৯৩, দাসত্ব—১৯৩, দাসমুক্তি—১৯৪, দাসের অধিকার—১৯৫, বিবাহ এবং তালাকের অধিকার—১৯৫, ব্যক্তিগত অধিকার—১৯৫, অমুসলিম—১৯৬, ইসলাম কি?—১৯৬, মুসলিমদের মযহাব—১৯৬, অমুসলিম আইন ও প্রথা—১৯৮, ধর্মত্যাগী—১৯৯, মতভ্রষ্ট ব্যক্তি—১৯৯, মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ—২০০, মৃত্যু ব্যাধি—২০০, মৃত ব্যক্তি—২০২, আইনের উপর চুক্তি স্থাপনের প্রভাব—২০৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালিকানা ২০৫—২২০

সূচনা—২০৫, মালিকানা—২০৫, মাল—২০৬, যাহা মাল হইতে পারে না—২০৭, আলো এবং বাতাস—২০৭, আগুন—২০৮, ঘাস—২০৮, পানি—২০৮, চারণভূমি এবং বন—২০৯, জনসাধারণের রাস্তা—২০৯, উৎসর্গকৃত প্রতিষ্ঠান—২১০, স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি—২১০, সদৃশ এবং বিসদৃশ—২১১, নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট সম্পত্তি—২১২, সম্পত্তির ব্যবহার

www.pathagar.com

ও ভোগ—২১৩, সম্পত্তির পশ্চাৎ ভার—২১৪, একক এবং যৌথ মালিকানা—২১৪, সুখাধিকার—২১৫, শুফা—২১৫, শুফার অধিকারের উদ্ভব—২১৫, অগ্রক্রয়ের অধিকারী—২১৬, শুফার শর্ত – ২১৬, দখল—২১৬, দখলি স্বত্ব—২১৮, অন্যায় দখলকারীর দায়িত্ব—২২০, স্বত্বমূলে দখল—২২০, পূর্ণ বা অপূর্ণ দখল—২২০,

সপ্তম অধ্যায়

মালিকানা অর্জন ২২১—২৫৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : আদি অর্জন এবং দীর্ঘাধিকার অর্জনের পদ্ধতি ২২১—২২৩

আদি অর্জন—২২১, দীর্ঘাধিকার—২২২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : চুক্তি ২২৩—২৫৯

চুক্তি—২২৩, ইসলামী আইন চুক্তি—২২৩, চুক্তির গঠন পদ্ধতি—২২৪, চুক্তির শর্ত—২২৫, যে সমস্ত শর্ত বা সীমা চুক্তিতে নাও থাকিতে পারে—২২৭, যৌথ চুক্তি—২২৮, চুক্তির শ্রেণীবিন্যাস—২২৮, অধীন স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয়—২২৯, বিক্রয়—২৩০, বিক্রয়ের প্রকারভেদ—২৩০, বিক্রয়ের শর্ত—২৩১, সালাম—২৩১, ইসতিসনা—২৩৩, সরফ—২৩৩, রিবা—২৩৪ বাঈ-উল-ওয়াফা—২৩৫, সিদ্ধ বিক্রয়ের প্রতিক্রিয়া—২৩৫, বিক্রয় রদ—২৩৬, হিবা—২৩৬, মুশার দান—২৩৭, দখলের প্রকৃতি—২৩৭, দানের পরিধি—২৩৮, শর্তাধীন দান অবৈধ—২৩৯, দানগ্রহীতা সম্পর্কীয় শর্ত—২৩৯, দান প্রত্যাহার—২৪০, হিবা-বি-শারতিল-ইওয়াদ—২৪১, হিবা-বিল-এওয়াদ—২৪১, ওয়াক্ফ এবং তাহার সংজ্ঞা—২৪২, ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য—২৪৩, ওয়াক্ফের সীমা—২৪৩, ওয়াক্ফের সম্পত্তি—২৪৪, ওয়াক্ফ সৃষ্টি—২৪৪, ওয়াক্ফের সম্পত্তির প্রশাসন ও পরিচালনা—২৪৫, উইল বা অসিয়ত

www.pathagar.com

(১১৮৩)—২৪৬, অসিয়তের সীমা—২৪৬, মুসালাহর গ্রহণ—২৪৭, অসিয়তের বৃদ্ধি—২৪৮, অসিয়ত করিবার পদ্ধতি—২৪৯, অসি—২৪৯, অসিয়তনামার ব্যাখ্যা—২৫০, অসিয়ত প্রত্যাহার—২৫০, ইজারা—২৫০, ইজারাভুক্ত সম্পত্তির ব্যবহার—২৫১, ইজারার গঠন—২৫১, ইজারাভুক্ত সম্পত্তির ব্যবহার—২৫১, শ্রমের ইজারা—২৫২, আমানত—২৫২, আমীনের দায়িত্ব—২৫২, আরিয়ত—২৫২, রেহেন—২৫৩, রেহেন গ্রহীতার অধিকার—২৫৩, রেহেন গ্রহীতা এবং রেহেন দাতার দায়িত্ব—২৫৩, রেহেন গ্রহীতার প্রতি-কার—২৫৪, জামিনদারি—২৫৪, এজেন্সী—২৫৫, উকিলের হাতে হাতে সম্পত্তি—২৫৬, মক্কেলের প্রতি উকিলের দায়িত্ব—২৫৬, ওকালতির অবসান—২৫৬, অংশীদায়িত্ব—২৫৭, চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্বে শর্ত —২৫৭, বিভিন্ন প্রকার অংশীদারিত্ব—২৫৭, অংশী-দারের অধিকার এবং দায়িত্ব—২৫৯, অংশীদারিত্ব বিলোপ—২৫৯।

অষ্টম অধ্যায়

পারিবারিক আইন—২৬০—২৮৬

পরিবারের ধারণা—২৬০, বিবাহের নীতি—২৬১, বিবাহের পদ্ধতি—২৬৩, নিষিদ্ধ সম্পর্ক—২৬৩, বাতিল বিবাহ এবং ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ—২৬৫, বিবাহের যোগ্যতা —২৬৫, বিবাহের অভিভাবক—২৬৩, অসম বিবাহ ২৬৭, দাম্পত্য অধিকার—২৬৭, দেনমোহর—২৬৮, বিবাহ বিচ্ছেদ—২৬৯, ইলা, জিহার—২৭২, স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ—২৭২, তালাকের উচ্চারণ—২৭৩, ফুরকাত—২৭৩, ইদ্দত—২৭৪, পিতৃত্ব—২৭৫, পিতৃত্বের স্বীকৃতি—২৭৭, সন্তানের ভরণ-পোষণ—২৭৭, দরিদ্র আত্মীয়বর্গ—২৭৮, অভিভাবকত্ব—২৭৮, দেহের

www.pathagar.com

অভিভাবক—২৭৯, সম্পত্তির অভিভাবক—২৭৯, উত্তরাধিকার—২৮০, উত্তরাধিকারে বাধা—২৮১, মিরাসের বণ্টন : আসহাবুল ফারায়েদ—২৮১, রক্ত নিঃসম্পর্কিত উত্তরাধিকারী—২৮৫, বাদ পড়িবার নীতি—২৮৬।

নবম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ : ক্ষতি—২৮৭—২৯৬

ক্ষতি এবং অপরাধের পার্থক্য—২৮৭, আত্মরক্ষা এবং নিরোধ—২৮৭, ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ—২৮৯, দেহের এবং সম্পত্তির ক্ষতি—২৮৯, দায়-এর নীতি—২৯০, বলপ্রয়োগ—২৯২, প্রতারণা—২৯৩, প্রতিকার—২৯৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অপরাধ ২৯৭—২৯৯

হদ্দ—২৯৭, তাআজির—২৯৮

দশম অধ্যায়

কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য ৩০০—৩২০

প্রাথমিক বক্তব্য—৩০০, আদালত নির্বাচন—৩০১ কতিপয় সংজ্ঞা—৩০১, কে দাবী করিতে পারেন—৩০২, দাবী সম্পর্কীয় বিধিমালা—৩০২, মামলার পক্ষবৃন্দ—৩০৪, মামলার শুনানী—৩০৫, প্রতিদাবীর মাধ্যমে জওয়াব—৩০৬, ভিন্ন এলাকায় বিবাদ হইলে যে কার্যধারা অবলম্বনীয়—৩০৭, ডিক্রী—৩০৭, ডিক্রী জারি—৩০৮, অনুপূরক আদেশ—৩০৯, শালিশ—৩১০, তামাদি—৩১০, সাক্ষ্য আইনতত্ত্ব—৩১১, সাক্ষ্যের শ্রেণী—৩১৩; সাক্ষীর যোগ্যতা—৩১৩, সাক্ষীর যোগ্যতা সম্পর্কে তদন্ত—৩১৫, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য—৩১৫, দাবীর সহিত সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য—৩১৬, প্রমাণের অগ্রগণ্যতা—৩১৭, কোন্ পক্ষের দাবী গ্রহণীয়—৩১৭, অবস্থাভিত্তিক সাক্ষ্য—৩১৮,

www.pathagar.com

দালিলিক সাক্ষ্য—৩১৯, স্বীকৃতি—৩১৯, সাক্ষ্য প্রত্যাহার—৩২০, প্রতিবন্ধ—৩২০।

একাদশ অধ্যায়

সাংবিধানিক আইন এবং প্রশাসনিক আইন ৩২১—৩২৯

সাংবিধানিক আইন : রাষ্ট্রের ধারণা : ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের পদ—৩২০, ইমামের নির্বাচন—৩২২, প্রশাসনিক আইন : রাজস্ব—৩২৩, ইমামগন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক—৩২৪, যাকাত—৩২৫, জিজিয়া কর—৩২৫, উশর—৩২৬, বিচার ব্যবস্থা—৩২৭, কাজী নিয়োগ—৩২৭, মহিলা কাজী—৩২৮, কাজীর অধিকার এবং ক্ষমতা—৩২৮, কাজীর অন্যান্য কর্তব্য—৩২৮।

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আইন ৩৩০—৩৩৬

মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যেকার সম্বন্ধ—৩৩০ যুদ্ধ ঘোষণা—৩৩০, শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সৈনিকদের জীবন এবং সম্পত্তি—৩৩১, যুদ্ধের সময় মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিমদের কর্তব্য—৩৩২, সন্ধি বা চুক্তি - ৩৩২, দারুল ইসলাম এবং দারুল হরব—৩৩৩, বিদেশে নাগরিকের কর্তব্য—৩৩?।

কতিপয় আরবী শব্দ এবং অভিব্যক্তির

বাংলা ব্যাখ্যা ৩৩৭—৩৫২

সহায়ক গ্রন্থাবলী ৩৫৩—৩৫৪

বিষয়সূচী ৩৫৫—৩৬৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনের বিবর্তনের ইতিহাস

প্রাথমিক মন্তব্য

সুন্নী-মুসলিম-আইনতত্ত্ব পর্যালোচনায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মুসলিমদের মধ্যে আইনের এবং আইন-তত্ত্বের বিবর্তনের পথের প্রধান মনজিলসমূহের মৌলিক বৈশিষ্টগুলি সম্যক বুঝিয়া লওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবভূমিতে যে প্রথা এবং রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। বস্তুত ইসলামী আইনের ইতিহাসে ইহাদের অবদান অনন্য; ইহারা ইসলামী আইনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইহা সর্বজনবিদিত যে, আরবভূমিতেই ইসলামী আইনের জন্ম এবং আরব আইনতত্ত্ববিদগণ ইহার বিকাশ সাধন করেন; স্বাভাবিকভাবে তাই ধরিয়া লওয়া যায় যে, আরবের সামাজিক ইতিহাস এবং আরব মানস ও আরববাসীর চরিত্র ইসলামী আইনের উপর অনপনেয় ছাপ রাখিয়াছে। অধিকন্তু এ ধারণাও ঠিক নহে যে, আরবের সমগ্র প্রথাভিত্তিক আইনকে রদ ও রহিত করিয়া ইসলাম তদস্থলে সম্পূর্ণ নূতন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে। যে মানবগোষ্ঠির মধ্যে ইসলামী আইনের জন্ম ও বিবর্তন, সকল আইনের মত ইসলামী আইনেরও ভিত্তিরচনার বহু উপাদান সেই মানব-গোষ্ঠির প্রথা ও রীতি নীতির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। উদাহরণের মাধ্যমে এই বক্তব্য প্রমাণ করা যায়।

অংশীদারিত্বের আইনানুগতার বিবরণ প্রসঙ্গে 'হেদায়ার' গ্রন্থকার বলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ্ অংশীদারী কারবার আরব সমাজে প্রচলিত দেখিয়াছিলেন এবং তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাই এই কারবার আইনানুগ।' হেদায়ার গ্রন্থকারের এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে হাম্মাম বলেন, 'অংশীদারিত্বের আইনানুগতার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু কতিপয় হাদীসের উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ্‌র যামানা হইতে শুরু করিয়া এ যাবতকাল এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।' তফসীরে আহমদী বলে, 'মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকে সাধারণভাবে আইনানুগ মনে করা উচিত। শুধু রদ ও রহিতের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নিষেধ আসিয়াছে। রসূলুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের পর কিছু কাজ বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সব আইনানুগ রহিয়া

www.pathagar.com

গিয়াছে। ইসলাম-পূর্বকালের বহু বিধি-বিধান ইসলামী আইন গ্রহণ করিয়াছে---কখনও প্রকাশ্য স্বীকৃতির মাধ্যমে, কখনও নীরব সম্মতির মাধ্যমে।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব দেশীয় প্রথা এবং রীতিনীতি

আরব সমাজের গঠন

ইসলামী আইন যে কালে প্রবর্তিত হয়, সেকালের আরব সমাজ একটি ক্রান্তিকালে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা তাহাদের যাযাবর প্রকৃতি এবং অভ্যাসাদি তখনও পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে নাই। সেকালে আরববাসিগণ বহু গোত্র এবং উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। এই গোত্র এবং উপগোত্র কতিপয় পরিবার লইয়া গঠিত হইত। গোত্রের সহিত গোত্রের শত্রুতা লাগিয়াই থাকিত এবং এই শত্রুতার সময় তাহাদের আচরণকে সংযত এবং সংহত করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত প্রথা বা জনমত ছিল না। কিন্তু কোন কোন সময় একাধিক গোত্র আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষার জন্য একত্র হইয়া চুক্তি করিত এবং তাহার ফলে কলহ কোন্দলের পরিবর্তে কিছুকাল সমাজে শান্তি বিরাজ করিত। এই শান্তির সময় কিছু কিছু আইনের উদ্ভব হইত। মক্কা এবং মদীনায় প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটিত। মক্কায় হজ্জের জন্য বহু মানুষের যাতায়াত হইত। এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বৃহৎ। এখানে যেসব গোত্র বাস করিতেন তাহারা প্রায়ই পরস্পর আত্মীয় ছিলেন। মক্কা, মদীনা এবং আরও কতিপয় শহরে জমজমাট ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এশিয়ার পণ্য এইসব শহরের মধ্য দিয়া ইউরোপে যাইত। সমগ্র বৎসর ধরিয়া আরবের বিভিন্ন স্থানে বাজার বসিত। শহরের অবস্থা এইরূপ ছিল।

অন্যদিকে মরুভূমিতে যাহারা বাস করিতেন তাহারা বেদুঈন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই বেদুঈনদেরও নিজস্ব প্রথা ও রীতি-নীতি ছিল। শহরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতির সহিত বেদুঈনদের প্রথা ও রীতি-নীতির খুব বেশী পার্থক্য ছিল না। অবশ্য শহরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতির ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইত সংযমের চিহ্ন আর বেদুঈনদের মধ্যে চঞ্চলতা। প্রত্যেক গোত্রের আবার নিজস্ব রীতি-নীতি

www.pathagar.com

এবং প্রথা ছিল ; তবে সকলের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্টের কিছু মিল দেখা যাইত। আরব দেশের সর্ববৃহৎ মানবমণ্ডলী মূর্তি পূজা করিত। তাহাদের মধ্যে কিছু খ্রীস্টান এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মদীনা এবং দক্ষিণ আরবে বহু সংখ্যক ইহুদীর বাস ছিল। ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব আইন ও রীতি প্রচলিত ছিল।

সর্দার এবং তাহার কর্তব্য

রসূলুল্লাহ্‌র যামানার আরবদের প্রশাসনের জন্য আরবদেশে কোন নিশ্চিত সংবিধান ছিল না, ছিল না কোন স্থায়ী প্রকৃতির সরকার। প্রত্যেক গোত্র আপন গোত্রের জন্য সর্দার নির্বাচন করিত। খান্দানের শরাফতি, বয়স এবং জ্ঞানের খ্যাতির জন্য যিনি গোত্রের সকলের কাছে আস্থা এবং সম্মান পাইতেন তিনিই সাধারণত সর্দার নির্বাচিত হইতেন। অন্য গোত্রের সাথে কথা বলিবার এবং অন্য গোত্রের মুকাবালায় আপন গোত্রের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ছিল একমাত্র সর্দারের। কোন কোন সময় সর্দারকে সাহায্য করিবার জন্য প্রবীণ পারিষদ থাকিত। সর্দার যে আদেশ জারি করিতেন বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেন তাহা গোত্রের সকলেই মানিয়া লইত। তৎকালে জনমতের প্রভাবে এবং শক্তিতে সর্দারের সিদ্ধান্ত বলবৎ হইত ; জনমত ছাড়া সর্দারের অধিকারে তাহার আদেশ কার্যকরী করিবার কোন অস্ত্র ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে শক্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্দার শাস্তির আদেশ প্রদান করিলে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার আদেশ মানিত না এবং শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্য পরিবারের অন্যান্যরা সর্দারের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিত। এই অবস্থায় তখন ঐ পরিবার তাহাদের গোত্র ছাড়িয়া অন্য গোত্রে যোগ দিত। ঐ পরিবার তখন নতুন গোত্রের আহলাফ (বিশ্বস্ত বন্ধু) হইয়া যাইত। দণ্ডিত ব্যক্তি যদি প্রাণ লইয়া পালাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রে আশ্রয় লইতে পারিত, তবে তাহাকে দাখিল (প্রবেশকারী) বলা হইত।

মক্কার পরিস্থিতি

মক্কা শহরে সে সময় সরকার গঠনের প্রস্তুতি চলিতেছিল। এই শহরের যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তাঁহাদেরই স্কন্ধে পবিত্র কাবাগৃহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। সেকালে কাবাগৃহে শুধু যে প্রার্থনা বা উপাসনা হইত তাহা নহে, উহা বহুবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক উৎসবের

www.pathagar.com

কেন্দ্র ছিল। কোন পরিবার শুধু কলহ কোন্দল সম্পর্কে তদন্ত করিত এবং সিদ্ধান্ত দিত ; সেই পারবারের সর্দারই এই কাজ করিতেন। কোন গোত্র আবার তাহার গোত্রের কোন ব্যক্তির কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিত ; সেই গোত্রের সর্দারের উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল। হযরত আবুবকর যিনি এক সময় ইসলামের প্রথম খলিফার পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন, তিনিই এক সময় এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গোত্রে গোত্রে বিবাহ

নরহত্যাকে সেকালে গোত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। এক গোত্রের কোন ব্যক্তি অপর গোত্রের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, হত ব্যক্তির গোত্রপতি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আঘাতকারীকে তাহার হাতে সোপর্দ করিবার জন্য হত্যাকারীর গোত্রের নিকট দাবী জানাইতে পারিত। কি কারণে আঘাতকারী ব্যক্তি নিহত-ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিল সেদিনে তাহা কেহ জানিতে উৎসুক ছিল না। দণ্ডের পরিবর্তে রক্তপণ দিয়া হত্যার বদলে প্রাণ কিনিয়া লওয়া যাইত। একটি হত্যায় রক্তপণ ছিল একশত উট। আঘাতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের গোত্র মিত্র-ভাবাপন্ন হইলে এবং হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার দোষ অস্বীকার করিলে আঘাতকারী ব্যক্তির গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিকে হলফ নিতে বলা হইত। যদি তাহারা অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষিতার হলফ লইতে পারিত, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হইত। এই প্রসংগে তৎকালে আরবে প্রচলিত প্রথার বর্ণনা বোখারী বর্ণিত একটি ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

খাদিশ নামক বনু হাশিম পরিবারের এক ব্যক্তিকে কোরায়েশ গোত্রের বনু আমির পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার সহিত সিরিয়া যাইবার জন্য নিয়োগ করে। নিয়োগকর্তা খাদিশকে তাহার উষ্ট্রপালের তত্ত্বাবধানে নিয়ো-জিত রাখে। পথ চলিতে চলিতে খাদিশ তাহার নিয়োগকর্তার বিনানুমতিতে একটি উটের দড়ি এক পথিকের হস্তে সমর্পণ করে। নিয়োগকর্তা খাদিশের এই অপকর্মের কথা শুনিতে পাইয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং খাদিশকে লক্ষ্য করিয়া লাঠি ছুঁড়িয়া মারে। সজোরে নিক্ষিপ্ত এই লাঠি খাদিশের শরীরের এমন স্থানে লাগে যে, সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুপথযাত্রী

www.pathagar.com

খাদিশ তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একজন ইয়েমেনবাসীকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখে। খাদিশ ইয়েমেনবাসী পথিককে বলে যে, শুধু উটের দড়ির জন্য তাহার নিয়োগকর্তা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। খাদিশ ইয়েমেনবাসীকে অনুরোধ করে, সে যেন তাহার নিয়োগকর্তার এই জুলুমের কথা তাহার গোত্রপতি আবু তালেবের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। কিয়ৎকাল পর খাদিশের নিয়োগকর্তা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলে আবু তালেব তাহাকে খাদিশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, পথিমধ্যে খাদিশ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কিছুদিন পর খাদিশের নিয়োগকর্তা যখন কাবা গৃহ তওয়াফ করিতেছিল, সেই সময় ইয়েমেনবাসী পথিক মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া আবু তালেবকে খাদিশের নিহত হইবার সংবাদ জ্ঞাপন করে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র বনু হাশিম পরিবারের এক ব্যক্তি তওয়াফরত খাদিশের নিয়োগকর্তার নিকট গিয়া অভিযোগ করে যে, সে খাদিশকে হত্যা করিয়াছে। খাদিশের নিয়োগকর্তা এই অভিযোগ অস্বীকার করে। অতঃপর আবু তালেব নিজে সেই ব্যক্তির নিকট যান এবং বলেন, 'তুমি আমার পরিবারের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ। এখন দুইটি পথ তোমার সামনে উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটি হত্যার পরিবর্তে তুমি একশত উট দিতে পার অথবা তোমার বংশের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে আনিয়া হলফ লওয়াইতে পার যে, তুমি খাদিশকে হত্যা কর নাই। তুমি যদি এই দুইটি পথের কোন একটিকে বাছিয়া লইতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যা করিব।' খাদিশের নিয়োগকর্তার পরিবার হইতে আটচল্লিশ ব্যক্তি প্রস্তাবিত হলফ গ্রহণ করে। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজন দুইটি উট দিয়া হলফের দায় হইতে রক্ষা পায়। বনু হাশিমের এক মহিলা নিয়োগকর্তার বংশ বনু আমিরের একটি লোকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। সেই মহিলার এক পুত্র খাদিশের নিয়োগকর্তার পক্ষে হলফ লইয়া পঞ্চাশ পূর্ণ করে।

কার্যবিধি

সেকালে বিচারের কার্যবিধি খুবই সহজ ছিল। কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ বা কোন দাবী লইয়া উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ বাদীকে তাহার সমর্থনে প্রমাণ আনিতে বলা হইত। বাদী সাক্ষী আনিতে ব্যর্থ হইলে এবং বিবাদী বাদীর দাবী অস্বীকার করিলে, বিবাদীকে হলফ করিতে বলা হইত। যদি সে হলফ লইত, তবে তাহাকে সমস্ত দায়দায়িত্ব হইতে মুক্তি

www.pathagar.com

দেওয়া হইত। কোন কোন সময় উভয় পক্ষই কাহিনের (ভবিষ্যৎ বক্তা) কাছে যাইত এবং তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্রীতদাস হইলে তাহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য কখনো কখনো তাহার উপর নির্যাতন চালানো হইত।

হলফ

সেকালে মামলার নিষ্পত্তিতে হলফের বিরাট ভূমিকা ছিল। হলফের প্রতি সেকালে সব মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই কারণেই সাক্ষীকে হলফ দেওয়া হইত। হলফ দিবার পদ্ধতির মধ্যে অনেক পবিত্রতাব্যঞ্জক অনুষ্ঠানাদি সংযুক্ত ছিল। কাবা সংলগ্ন কিন্তু তাহার বহির্ভাগে একটি স্থান হলফের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। এইস্থানকে হাতিম বলা হইত। হাতিম শব্দের অর্থ ধ্বংসকারী। এই নাম হইতে বুঝা যায় তৎকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, হলফ লইয়া মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিলে দেবতাগণ তাহাকে ধ্বংস করিবে। ঠিক কি আকারে এবং কি প্রকারে হলফ লওয়া হইত তাহা জানা যায় না, তবে তাহারা সাধারণত তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে বা দেবরাজ হবল-এর নামে হলফ লইত। তাহারা যে হলফ লইয়াছে ইহার প্রতীকস্বরূপ অনুষ্ঠান শেষে তাহারা ছড়ি, পাদুকা কিংবা তীর ছুঁড়িয়া মারিত।

প্রতিশোধমূলক শাস্তি

সর্বপ্রকার অপরাধের শাস্তির ভিত্তি ছিল প্রতিশোধ। রক্তপণ বা ক্ষতি-পূরণ দিয়া শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত। অপরাধীর আঘাতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তজ্জন্য হতব্যক্তির সমস্ত গোত্র রুখিয়া উঠিত; এই মৃত্যুকে তাহারা তাহাদের সকলের ক্ষতি বলিয়া গ্রহণ করিত। আঘাত-কারী গোত্র বা পরিবারের কাছে তাহারা ক্ষতিপূরণ দাবী করিত। গোত্রে গোত্রে বা পরিবারে পরিবারে এইভাবে বিরোধ বাধিয়া যাইত। ক্ষতি পূরণের পরিমাণ বংশের কৌলীন্যের কারণে কম-বেশী হইত। নিম্ন গোত্রের কোন ব্যক্তি উচ্চ গোত্রের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উচ্চ গোত্র নিম্ন গোত্রের নিকট বেশী ক্ষতিপূরণ দাবী করিত। তাহারা একটি খুনের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ চাহিত। একটি নারীর পরিবর্তে একজন পুরুষকে দাবী করিত বা একজন ক্রীতদাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাবী করিত।

www.pathagar.com

অন্যবিধ শাস্তি

রক্তপণ এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়া আরব দেশে তৎকালে অন্যবিধ শাস্তির প্রচলন ছিল। চোরের দক্ষিণ হস্ত কর্তন করা তাহার মধ্যে একটি। মদীনায় ইহুদিগণ ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে মারিয়া ফেলিত কিন্তু পরবর্তী কালে তাহার দেহে বেত্রাঘাত করিত এবং মুখে চুনকালি মাখিত।

বিবাহ প্রথা

ইসলামের আবির্ভাব কালে নারীপুরুষের সম্পর্ক এবং সন্তানদের মর্যাদা সম্পর্কে যে প্রথা এবং রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল তাহা বড়ই অনিশ্চিত। সেকালে একদিকে ছিল নিয়মিত বিবাহ প্রথা, আবার অন্যদিকে ছিল বিবাহের নামে নারী পুরুষের বিচিত্র যৌনমিলন। এই সব মিলন প্রাচীনতম আরব সমাজের সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের পরিচয় বহন করে। ইসলামী আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে আরবদেশে নিম্নবর্ণিত চার প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল ঃ

(১) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তাহার কন্যা কিংবা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে অবস্থিতা কোন রমণীর পাণি প্রার্থনা করিত এবং সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে মোহরানার বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিত। এই প্রকার বিবাহকে ইসলাম অনুমোদন করিয়াছে।

(২) নিজের বংশের ধারার মধ্যে নীল রক্ত আমদানী করিবার অভিপ্রায়ে স্বামী তাহার স্ত্রীকে বলিত, 'ফলানা মহৎ ব্যক্তিকে আহবান কর এবং তাহার সহিত সহবাসে মিলিত হও।' অনুগতা জায়া সেই মহৎ ব্যক্তিকে আহবান করিত এবং গর্ভ ধারণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত একত্রে বাস করিত। স্ত্রীর শরীরে যতদিন গর্ভের চিহ্ন প্রকাশ না পাইত ততোদিন স্বামী দূরে অবস্থান করিত।

(৩) দশের কম সংখ্যক পুরুষ এক রমণীর সহিত নিয়মিতভাবে যৌন মিলনে রত হইত। সন্তান প্রসবের পর সেই রমণী সকল পুরুষকে আহবান করিত। তাহারা একত্র হইলে রমণী একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, 'আমার কোলে যে সন্তান আসিয়াছে তুমি তাহার পিতা।' চিহ্নিত সেই ব্যক্তি ঐ সন্তানের পিতৃত্বকে আর কখনো অস্বীকার করিতে পারিত না।

(৪) সমাজে বারাঙ্গনাগণ তাঁবুতে বসবাস করিত এবং তাহারা তাহাদের তাঁবুর সম্মুখে তাহাদের পেশার প্রতীকবাহী পতাকা উড়াইত। বহু লোক

www.pathagar.com

তাহাদের তাঁবুতে যাতায়াত করিত। তাহাদের সন্তান হইলে তাহারা দেহবিশারদগণের নিকট পিতৃত্বের বিচার চাহিত।

উপরে যে চারি প্রকারের বিবাহের কথা বলা হইয়াছে, উহার মধ্যে শেষ তিন প্রকার বিবাহকে বিবাহ না বলাই সংগত। তবে এই প্রকারত্রয়, নারী এবং পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রে সমাজ যে বিবর্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাহার নিশ্চিত পরিচয় বহন করে। নানাবিধ স্তর পার হইয়া অনেক পরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে আরব সমাজ প্রথম প্রকার বিবাহে পৌঁছিয়াছিল।

সেকালে আরবদের মধ্যে স্বল্পকাল স্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইহাকেই 'মুতা' বিবাহ বলা হইত। ফতহুল কাদিরে বর্ণিত হইয়াছেঃ গ্রামে কোন নবাগত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি কোন নারীকে মুতা বিবাহ করিত। সেই গ্রামে যতদিন সে থাকিতে পারিবে বিবেচনা করিত ততদিনের জন্য সে ঐ রমণীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার চুক্তি করিত। আত্মীয়হীন অপরিচিত গ্রামে সেই রমণী তাহার অস্থায়ী স্বামীর শয্যাসংগিনী হইত এবং তাহার ঘর সংসার সামলাইত।

মোহরানা

ইসলাম-পূর্ব যামানায় আরববাসীদের মধ্যে পত্নীর কল্যাণের জন্য পতি কর্তৃক মোহরানা প্রদানের নীতি প্রচলিত ছিল। বিবাহ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মোহরানা বিবেচিত হইত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পত্নীর এই প্রাপ্য টাকা তাহার অভিভাবকই গ্রহণ করিত। যাহা পাত্রীর প্রাপ্য তাহা পাত্রীর অভিভাবক কেন লইত, ইহা বুঝিয়া ওঠা সম্ভব নহে। সম্ভবত অতি প্রাচীন যুগে বিবাহ ছিল একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মতো আদান-প্রদান, পাত্রীর অভিভাবককে অর্থ দিয়া পাত্র স্ত্রী কিনিয়া লইত; সেই প্রথা চলিয়া আসিতে থাকায় পাত্রীর অভিভাবকগণ মোহরানা গ্রহণ করিত। আবার ইহাও হইতে পারে যে, মোহরানা সর্বদাই পাত্রীর পাওনা ছিল; কিন্তু কেহ কেহ সে আইন ভঙ্গ করিয়া অভিভাবকের ক্ষমতা প্রয়োগে পাত্রীর প্রাপ্য নিজে আত্মসাৎ করিত। সে যাহাই হউক, রসূলুল্লাহ্‌র আবির্ভাব কালে বিবাহ চুক্তিতে মোহরানা অবশ্য প্রদেয় ছিল এবং ইহা স্ত্রীগণই পাইত। তৎকালে বিবাহের সময় মোহরানা দেওয়া না হইয়া থাকিলে, মৃত্যু বা তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হইবার পর স্ত্রী উহা আদায় করিতে পারিত। সাধারণত স্ত্রী তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় বা জনমতের সমর্থনে মোহরানা আদায় করিতে পারিত। শিগার

www.pathagar.com

বিবাহে মোহরানা লাগিত না। মোহরানাকে এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে অনেকে এই বিবাহের পথ বাছিয়া লইত। শিগার বলিতে বদ্‌লা বিবাহ বুঝায়। এক ব্যক্তির ভগ্নিকে অন্য ব্যক্তি এই শর্তে বিবাহ করিল যে, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে তাহার ভগ্নির সহিত বিবাহ দিবে, ইহাই ছিল 'শিগার' বিবাহের ব্যাপার। এইরূপ বিবাহে মোহরানা লাগিত না। স্ত্রী অসতী হইলে সে তাহার মোহরানার দাবী হারাইত। এই নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক বিবেকহীন পাষণ্ড স্বামী তাহাদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনিত এবং এইভাবে মোহরানা না দিয়াই স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিত। এই অবস্থার শিকার হইয়া অনেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তাহাদের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত।

বিবাহে নারীর অধিকার

ইসলাম-পূর্ব যামানায় নারীর বিবাহ করিবার কোন নিজস্ব অধিকার ছিল না। সে নিজে কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিত না। বালিকা হউক বা তরুণী হউক, বিধবা হউক বা কুমারী হউক, তাহাকে বিবাহ দিবার অধিকার ছিল তাহার অভিভাবকের অর্থাৎ পিতার, ভ্রাতার বা অন্যের। তাহারা যাহাকে নির্বাচন করিত পাত্রীকে তাহার ঘরেই যাইতে হইত। তাহার সম্মতির প্রশ্ন তো দূরের কথা তাহার প্রকাশ্য অসম্মতিকে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্বক বিবাহ দিবার উদাহরণ সে যুগে কম ছিল না। একাধিক বিধবা রাখিয়া স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধারণত এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। স্বামীর পুত্র বা অন্য ওয়ারিস স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর একখানি বস্ত্রখণ্ড এক এক করিয়া বিধবাদের (আপন মাতা ব্যতীত) শরীরে নিক্ষেপ করিত। বিধবাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য এইরূপ বস্ত্র নিক্ষেপ করা হইত। কোন বিধবা যদি এইভাবে বস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে পতিত্বে গৃহীত হইবার পূর্বে স্বামীর ঘর হইতে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইত তবে মৃতের আত্মীয়গণ তাহাকে তাহার প্রাপ্য মোহরানা দিতে অস্বীকার করিত। বস্তুত সেকালে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ তাহার অনান্য সম্পত্তির মতো তাহার পত্নীগণকেও গ্রহণ করিত পারিত।

বহুবিবাহ

সেকালে আরববাসিগণ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত। সামর্থ্য, সুযোগ এবং ইচ্ছা—এগুলি ছিল নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। সামর্থ্যে কুলাইলে এবং সুযোগ

www.pathagar.com

আসিলে এবং ইচ্ছা থাকিলে যে কোন সংখ্যক নারীকে একত্রে স্ত্রীরূপে রাখিবার অধিকার সকল পুরুষের ছিল। সেকালে সমর্থ বিত্তবান পুরুষদের বহু স্ত্রী ছিল, এতদ্ব্যতীত তাহারা ক্রীতদাসীও রাখিত।

নিষিদ্ধ বিবাহ

রক্ত সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। মাতা কন্যা, ভগ্নি, সন্তানের সন্তান, কোন পুরুষ বিবাহ করিতে পারিত না। সম্ভবত তাহারা খালা, ফুফু, ভাইঝি বা বোনঝিকেও বিবাহ করিতে পারিত না। বিমাতা, চাচাতো, মামাতো বা খালাতো ভগ্নি বা স্ত্রীর ভগ্নির বিবাহে কোন বাধা ছিল না। এক সঙ্গে দুই ভগ্নিকে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ ছিল না। সম্ভবত শ্বাশুড়ী এবং সৎকন্যাকে বিবাহ করা চলিত না।

বিবাহ বিচ্ছেদ

সেকালে পুরুষের স্ত্রী গ্রহণের অধিকার যেমন ছিল অবাধ, অবাধ্য স্ত্রীকে বর্জন করিবার অধিকারও তেমনি ছিল নিরঙ্কুশ। পুরুষ যখন তখন যে কোন স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিত। সেজন্য তাহাকে কোন কারণ দেখাইতে হইত না কিংবা কোন আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় লইতে হইত না। যখন খুশী বিনা কারণে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিত।

তালাক

সাধারণত তালাকের মাধ্যমেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা হইত। ইচ্ছা করিলে স্বামী তাহার স্ত্রীকে অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়া বর্জন করিতে পারিত। সে অবস্থায় ঐ নারী পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিত। আবার ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়া পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিত। কখনও কখনও তাহারা দশবার তালাক দিয়া দশবার পুনর্গ্রহণ করিত। এবং এইভাবে হতভাগিনী নারীর উপর নিষ্ঠুর খেলা খেলিত। স্বামীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রীকে দিন যাপন করিতে হইত। কখন সে পরিত্যক্ত হইবে এবং কখন সে ঘরে থাকিবে তাহা সে জানিত না। কখনও কখনও স্বামী স্ত্রীকে অস্থায়ী তালাক দিত। সে অবস্থায় সে স্বামীর সহিত বাস করিতে পারিত না—আবার পুনর্বিবাহ করিতে পারিত না।

www.pathagar.com

ইলা

স্বামী শপথ লইয়া স্ত্রীকে বলিত, 'তোমার সহিত আমার কোন যোগাযোগ রহিল না।' ইহাতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন গণ্য হইত। ইহাকে ইলা তালাক বলে।

জিহার

স্বামী স্ত্রীকে বলিত, 'তুমি আমার মাতার পিঠের মত দেখিতে।' একথা উচ্চারণের সাথে সাথে, বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। ইহাকে জিহার তালাক বলে।

খুলা

সেকালে স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার। তবে কোন কোন সময় স্ত্রীর পিতা-মাতা স্বামীকে বুঝাইয়া মোহরানার দাবী ত্যাগ করিয়া বা লওয়া হইয়া থাকিলে মোহরানা ফেরত দিয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিত। এই ব্যবস্থা খুলা নামে পরিচিত।

ইদ্দত

তালাক, জিহার, ইলা, খুলা যেভাবেই হউক না কেন, যে নারীর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে সে পুনর্বিবাহ করিতে পারিত কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইত। এই অপেক্ষার কালকে ইদ্দত বলা হইত। গর্ভে সন্তান আছে কিনা তাহা নির্ণয় করার জন্য ইদ্দত পালন করা হইত। অবশ্য কোন কোন সময় গর্ভবতী স্ত্রীকে স্বামী তালাক প্রদান করিত এবং স্বামীর সম্মতি লইয়া সে পুনর্বিবাহ করিত। স্বামীর মৃত্যু হইলে ইদ্দত এক বৎসর ছিল।

সন্তানের বৈধতা

বিবাহিত দম্পতির সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণে কোন জটিলতা ছিল না; সন্তানের মাতার স্বামী যে তাহার পিতা ইহা মানিয়া লওয়া হইত। কিন্তু নিয়মিতভাবে বিবাহিত না হইয়া যে মাতা সন্তান ধারণ করিত, সে মাতার পিতৃত্ব নির্ধারণের দায়িত্ব এবং অধিকার ছিল একান্তভাবে প্রসূতির।

www.pathagar.com

দত্তক

আরবদের মধ্যে দত্তক প্রথা প্রচলিত ছিল। দত্তক গ্রহণের সময় কোন আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য ছিল কিনা তাহা অজ্ঞাত কিন্তু মনে হয় যাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা হইত তাহার পিতামাতার সহিত চুক্তি মূলে ইহা হইত। দত্তক পুত্রের বয়স কত বা যাহারা দত্তক গ্রহণের অভিপ্রায় করে তাহার নিজস্ব পুত্র সন্তান আছে কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর ছিল। যাহাকে দত্তক গ্রহণ করা হইত সে দত্তক-গ্রহীতার পরিবারে চলিয়া যাইত এবং তাহার পদবী গ্রহণ করিত। অধিকার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পুত্রের এবং দত্তক পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

বালিকা হত্যা

আরব দেশের পিতা যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পুত্র কামনা করিত আর কন্যার জন্ম হইলে সে প্রমাদ গণিত। সেকালে নারীকুলের অবর্ণনীয় দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাতা-পিতার পক্ষে এই প্রমাদ খুব স্বাভাবিক ছিল। রসূলুল্লাহর যামানায়ও বালিকা সন্তান হত্যার বহর একেবারেই কমিয়া যায় নাই; তখনও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পিতা কন্যাকে মৃত্তিকা গহবরে পুঁতিয়া ফেলিত।

সম্পত্তির অধিকার

আরববাসীর সম্পত্তি বলিতে যাহা ছিল তাহা খুবই সাধারণ। উট গবাদি পশু, তাঁবু, বসন ভূষণ এবং কিছু তৈজস ইহাই ছিল তাহাদের সম্পত্তি। অর্থের আদান-প্রদানও তখন শুরু হইয়াছে, তাহাও সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু সবচাইতে মূল্যবান সম্পত্তি ছিল ক্রীতদাস। শহরাঞ্চলে সুনির্মিত গৃহাদি এবং বিপণি দেখা যাইত; সেই কারণে ভূমি সেখানে মূল্যবান ছিল। স্বত্বাধিকারিত্ব ছিল ব্যক্তিভিত্তিক। সম্পত্তির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার বলিয়া কিছু ছিল না। স্থাবর এবং অস্থাবর অথবা পৈতৃক এবং স্বোপার্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। প্রার্থনার স্থান ছাড়া গণসম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না। সকলেই সম্পত্তি অর্জনের অধিকার রাখিত। ক্রীতদাস নিজেই তাহার প্রভুর সম্মতি ছিল। সুতরাং সে কোন সম্পত্তির মালিক হইতে পারিত না। নারীর উত্তরাধিকার ছিল না কিন্তু তাই বলিয়া সম্পত্তি অর্জনের পথে তাহার কোন অন্তরায় ছিল না। পিতা-মাতা বা

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সে যে দান বা উপহার পাইত এবং স্বামীর নিকট হইতে সে যে মোহরানা পাইত তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। অনেক নারী সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত এবং কেহ কেহ ভূমি ও গৃহাদির অধিকারী ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহার স্বত্বাধিকার খুব নিরাপদ ছিল না। আত্মীয়ের বা পিতার বা স্বামীর অভিভাবকত্বে এবং রক্ষণাধীনে না থাকিলে তাহার সম্পত্তি ভোগ তো দূরের কথা, ইজ্জত লইয়া টানাটানি পড়িত। দুর্ভাগ্যবশত রক্ষক ভক্ষক হইয়া পড়িলে তাহার আর প্রতিকার ছিল না।

এতিমের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। অসাধু অভিভাবকের দুষ্কার্য হইতে রক্ষা করিবার মত কোন আইন সেদিন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল না।

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়

আরববাসী তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিরংকুশ অধিকার রাখিত। সে যেমন বিক্রয় এবং দানের মাধ্যমে সম্পত্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে হস্তান্তর করিতে পারিত, আবার তেমনি কর্জ, রেহেন বা ইজারার মাধ্যমে তাহার স্বত্বাধিকার আংশিকভাবে বা সীমিতভাবে হস্তান্তর করিতে পারিত। বিক্রয় বহু প্রকারের হইতে পারিত। নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(১) জিনিসের বদলে জিনিস। ইহাকে বিনিময় বলা যায়। ইহাকে মুকায়াদা (مقايضة) বলা হইত।

(২) অর্থের বদলে জিনিস। ইহা সাধারণ বিক্রয়ের মত। ইহাকে বা'ঈ (بيع) বলে।

(৩) অর্থের বদলে অর্থ। ইহা অর্থ বিনিময়ের মত। ইহাকে সরফ (صرف) বলা হইত।

(৪) অগ্রিম মূল্য লইয়া জিনিস বিক্রয়। ইহাতে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতাকে জিনিস অর্পণ করা হইত। ইহাকে সালাম (سلم) বলা হইত।

(৫) প্রত্যাহার শর্তসম্বলিত বিক্রয়।

(৬) অপ্রত্যাহারযোগ্য বিক্রয়।

(৭) ভবিষ্যৎ মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে জিনিস বিক্রয়।

(৮) উৎপাদন ও খরিদমূল্যে নির্দিষ্ট মুনাফাসহ জিনিস বিক্রয়। ইহাকে মুরাবাহা (مرابحة) বলা হইত।

www.pathagar.com

(৯) খরিদ বা উৎপাদন মূল্যে জিনিস বিক্রয়, ইহাকে তাওয়ালিয়া (التولية) বলা হইত।

(১০) উৎপাদন বা খরিদ মূল্যের নিম্নমূল্যে বিক্রয়। ইহাকে ওয়াদি (وضيع) বলা হইত।

(১১) দরকষাকষি করিয়া বিক্রয়। ইহাকে মূসাওয়ামা (مساومه) বলা হইত।

(১২) প্রস্তর নিক্ষেপে বিক্রয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক বস্ত্রখণ্ড বিক্রয়ের জন্য মওজুদ থাকিত। ক্রেতা সেই দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিত। যে বস্ত্রখণ্ডের উপর উহা পতিত হইত, তাহা বিক্রিত গণ্য হইত। কোন পক্ষই ইহাতে আপত্তি করিতে পারিত না। ইহাকে বাঈ-বে-ইল্‌কায়ল হাজর (بيع بالقاء الحجر) বলিত।

(১৩) দ্রব্য স্পর্শ করিয়া ক্রেতা জিনিস কিনিত। একবার স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ক্রেতা আর মূল্য সম্পর্কে আপত্তি করিতে পারিত না। ইহাকে মূল্যমাস্সা (ملامسه) বলিত।

(১৪) দোকানদার ইচ্ছুক ক্রেতার দিকে দ্রব্য ছুঁড়িয়া দিত। নিক্ষেপের সাথে সাথে বিক্রয় সম্পূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাকে মুনাবাজা (منابذه) বলিত।

(১৫) সংগৃহীত খেজুরের বদলে গাছের খেজুর বিক্রয়। ইহাকে মুজাবানা (مزابنه) বলিত।

(১৬) গাছের গম কিংবা গর্ভের ভ্রূণ বিক্রয়। ইহাকে মুহাকালা (محاقلة) বলিত।

(১৭) দেনা থাকিলে সেই দেনার বিনিময়ে এই শর্তে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইত যে, দেনা শোধ হইলে সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিত। ইহাকে বাঈউল ওয়াফা (بيع الوفا) বলিত।

(১৮) বিক্রেতা ক্রেতার নিকট এই শর্তে দ্রব্য বিক্রয় করিত যে, ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে উহা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

(১৯) ক্রেতা বিক্রেতাকে বিক্রয় মূল্যের কিছু অংশ দিয়া জিনিস পরখ করিবার জন্য গ্রহণ করিত। যাচাইয়ে টিকিলে সে অবশিষ্ট মূল্য দিয়া দিত। পছন্দ না হইলে সে জিনিস দিয়া দিত কিন্তু যাহা সে দিয়াছে তাহা ফেরত পাইত না। ইহাকে ইরবুন (عربون) বলা হইত।

www.pathagar.com

(২০) বিক্রয়ের সময়ে বিক্রয়ের বিষয়বস্তু বিক্রেতার দখলে না থাকিলেও সে উহা দখলে আনিয়া বিক্রয়ের চুক্তি পূর্ণ করিতে পারিত। ইহাও এক প্রকার বিক্রয় ছিল।

ইজারা

সাধারণত এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হইত। কদাচিৎ দুই বা তিন বৎসরের জন্য দেওয়া হইত; কিন্তু ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর কোন ইজারার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইজারার মূল্য উৎপাদনের অংশ বা গম বা অর্থ দিয়া শোধ করা হইত। ফসল উৎপাদনের ইজারায় জমিতে বপনের বীজ কোন সময় ইজারাদাতা আবার কোন সময় ইজারাগ্রহীতা দিত। ইজারাদাতা দিলে ঐ ইজারাকে মুখাবারা (مخابرة) বলা হইত। ইজারা-গ্রহীতা বীজ দিলে ঐ ইজারাকে মুজারাআ (مزارعة) বলা হইত।

কোন কোন সময় এইরূপ চুক্তিও হইত যে ইজারাগ্রহীতা বীজ সরবরাহ করিত আর ইজারাদাতা সমগ্র জমির উৎপন্ন শস্য না লইয়া এক অংশের হিস্যা লইত। ফলবান বৃক্ষেও ইজারা দেবার প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল

কর্জ এবং সুদ

আরব দেশে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাহারা (আরববাসিগণ) সুদে টাকা খাটাইত। ইহুদীদের মধ্যে কুসীদ-জীবীদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। সুদকে সেকালে রিবা (ربو) বলিত। জিনিস বন্ধক দিবার প্রথাও সেকালে প্রচলিত ছিল। অধমর্ণ জিনিসের জামানতে উত্তমর্ণের নিকট হইতে অর্থ কর্জ লাভ করিত। অধমর্ণ জিনিস ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিত, নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিত না।

উইল

আরববাসী তাহার সম্পত্তি উইল মূলে মৃত্যু-পরবর্তী কালের জন্য বিলি ব্যবস্থা ও বিন্যাস করিয়া যাইতে পারিত। এই অধিকার কোন প্রকার সীমা বা শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। সমস্ত সম্পত্তি যে কোন লোকের বরাবরে সে উইল করিতে পারিত। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন এমনকি সন্তানকে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করিয়া সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোন বিত্তবানের বরাবরে উইল করিয়া দিতে পারিত, কেহ তাহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবার অধিকার রাখিত না। অন্য সকল সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া একটি মাত্র উত্তরাধিকারীর বরাবরে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিতেও পারে।

মিরাস

যে সমস্ত পুরুষ বংশধর অস্ত্রধারণে সক্ষম তাহারাই উত্তরাধিকারী হইত। নারী এবং শিশুর ওয়ারিস হইবার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। রক্তের সম্বন্ধ, দত্তক এবং চুক্তি—এই তিন সূত্রের ভিত্তিতে মিরাস বণ্টিত হইত। রক্তের সম্পর্কের মধ্যে আসিত পুত্র, পৌত্র, পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতৃবর্গ। দত্তক পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের সমতুল্য গণ্য হইত। চুক্তির মাধ্যমে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওয়ারিস হইতে পারিত। মৃত্যুর পূর্বে দুই ব্যক্তি এইরূপ চুক্তি করিত যে তাহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে অন্যজন তাহার সম্পত্তি বা সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট আয় পাইবে। অবশ্য উইল করিয়া গেলে আর কেহ ওয়ারিস হইতে পারিত না। সমগ্র সম্পত্তি সম্পর্কে উইল না হইয়া থাকিলে তবেই উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠিত। উত্তরাধিকারিগণ কে কত অংশ পাইত এবং কাহার আগে কে পাইত এবং কে কাহাকে বঞ্চিত করিত, এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজ্ঞাত। সম্ভবত গোত্রপতি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে অংশ নির্ধারণ করিয়া দিতেন। বয়স্ক পুত্র থাকিলে কন্যাগণ কিছু পাইত না। কোন অবস্থায় স্ত্রী, ভগ্নি এবং মাতা ওয়ারিস হইত না। কিন্তু মোহরানা অপরিশোধিত থাকিলে মৃতের সম্পত্তি সর্বাবস্থায় দায়ী হইত। কোন কোন গোত্রে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য মৃতের সম্পত্তি দায়ী হইত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম জারি হইবার পর আইনতত্ত্ব

হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাব কালে আরবদেশের সামাজিক অবস্থা রীতি-নীতি এবং প্রথার বিষয় বর্ণনা করা হইল। সেই রীতি-নীতি এবং প্রথাভিত্তিক স্তর অতিক্রম করিয়া ইসলামী যামানায় সমাজ আইন প্রণয়নের স্তরে উত্তীর্ণ হয়। প্রথা এবং রীতি-নীতির মাধ্যমে আইনের বিবর্তন স্বভাবত শ্লথ গতি হইয়া থাকে। আদেশ নিষেধ প্রভৃতির মাধ্যমে যখন আইন আসিতে শুরু করে, তখন সমাজের এই শ্লথতা ঘুচিয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ শুধু আরববাসীদের বা সরকারের উদ্দেশে ইসলাম প্রচার করেন নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানবজীবন। তিনি বিশ্ব-ধর্মের সার্বজনীন নক্শার মধ্যে সরকারী আইনকে অঙ্গীভূত করিবার সূত্র প্রদান করেন।

ইসলামী আইনের চারি যুগ

ইসলামী আইন এবং ইসলামী আইনতত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সম্যক পর্যালোচনা করিতে হইলে ইহাকে চারি যুগে বিভক্ত করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সংগত। রসূলুল্লাহর হিজরত-দিবস হইতে শুরু করিয়া তাঁহার ওফাত-দিবস পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে (৬২২ হইতে ৬৩২ খৃস্টাব্দ) প্রথম যুগ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। এই যুগ আইন প্রণয়নের যুগ নামে অভিহিত। ইসলামী আইনের এই স্বর্ণযুগে মহান আল্লাহ্ রাহমানুর রহীম নিজেই কুরআনের মাধ্যমে আইন জারি করেন এবং আল্লাহ্তালার পিয়ারা নবী-এ-করীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেই আইন বলবত করেন। আমরা আল্লাহ্তালার আইন পাই আল কুরআনে আর রসূলুল্লাহ্র কর্ম পাই হাদীসে। এই দুই উৎসের উপর ভিত্তি করিয়া সুন্নত-আল-যামাতের চারি মযহাব গড়িয়া উঠিয়াছে।

রসূলুল্লাহ্র ইনতিকালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সাহাবা এবং তাবেয়িনদের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে দ্বিতীয় যুগ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। আইন সংগ্রহ, তাহার তফসীর এবং যৌথ আলোচনার মাধ্যমে তাহার বিস্তৃতি এই যুগের বৈশিষ্ট।

দ্বীন এবং আইনের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পর্যালোচনা এবং গবেষণা তৃতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। সুন্নত-আল-যামাতের মযহাব চতুষ্টয় এই

২—

www.pathagar.com

যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই যুগের শুরু এবং তৃতীয় শতাব্দীতে শেষ।

অতঃপর ইসলামী আইনের আর উদার ব্যাখ্যা দেখা যায় নাই। আইন-তত্ত্ববিদগণ আপন আপন মযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণের কাজ বিশ্লেষণ করিয়াই সময় কাটাইয়াছেন। এই সময়কে চতুর্থ যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগ শুরু হইয়াছে চতুর্থ শতাব্দীতে এবং আজও ইহার শেষ হয় নাই। তবে বর্তমান শতাব্দীতে আইনের উদার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নূতন পদক্ষেপ দেখা যাইতেছে।

প্রথম যুগ

আল কুরআন

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে মুহূর্তে আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হন সেই মুহূর্ত হইতে শুরু করিয়া তাঁহার ইনতিকালের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে ওহী পাইতে থাকেন। যে পবিত্র কিতাবে এই ঐশী বাণীসমূহ (ওহী) সংগৃহীত হইয়াছে তাহা আল কুরআন নামে সমধিক পরিচিত। আল্লাহ্‌তালার আদেশ এবং অভিপ্রায় বহন করিয়া তাঁহারই ভাষায় রসূলুল্লাহ্‌র উপর এই সমস্ত ওহী নাজিল হইয়াছিল। আল-কুরআন অনন্তকাল হইতে বর্তমান ছিল, কিন্তু ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল খণ্ডাকারে সময়ে সময়ে। এই খণ্ডগুলিকে আয়াত বলা হয়। ঘটনা বা পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে তাহা নিরসনের আইন জ্ঞাপন করিয়া বহু আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কখনও কখনও আল্লাহ্‌তালা কিছু আয়াত রহিত (মনসুখ) করিয়া অধিক কল্যাণকর আয়াত নাজিল করিয়াছিলেন।

আল্‌-হাদীস

রসূলুল্লাহর (সঃ)জীবনকালে তিনি যে সমস্ত আদেশ দিয়াছিলেন এবং যাহা যাহা নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। রসূলুল্লাহ্‌র যামানায় স্বাভাবিকভাবে বহুবিধ সরল ও জটিল সমস্যা, সহজ ও কঠিন প্রশ্ন বা সামান্য ও গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এইসব সমস্যা, প্রশ্ন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে রসূলুল্লাহ আল কুরআনে তাহার সমাধান খুঁজিতেন। সেখানে কিছু খুঁজিয়া না পাইলে রসূলুল্লাহ নিজেই সমাধান দিতেন। আল-হাদীসের ভিত্তি হইতেছে এই সমস্ত

www.pathagar.com

সমাধান। এই সমাধানগুলিও অবশ্য প্রতিপাল্য। আল কুরআনে যে আদেশ-নিষেধ আসিয়াছে তাহার ভাষা ও ভাব আল্লাহ্‌তালার, আর আল-হাদীসে যে আদেশ-নিষেধ পাওয়া যায় তাহার ভাষা রসূলুল্লাহ্‌র এবং ভাব আল্লাহ্‌তালার। যেহেতু আল-হাদীসও আল্লাহ্‌তালার নির্দেশ, তাই আইন নির্ধারণে আল-হাদীসের দান অপরিসীম। রসূলুল্লাহ যাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন সে সব এবং তাঁহার আচরণ সুন্নাহ্‌রূপে গণ্য। তিনি কি অনু-মোদন করিয়াছেন আর কি করেন নাই, তাহা তাঁহার আচরণ হইতে বুঝিয়া লওয়া হইয়াছে। যে রীতি-নীতি বা প্রথা বা কাজ মুসলিমগণ রসূলুল্লাহ্‌র সামনে বা জ্ঞাতসারে করিয়াছেন এবং একাধিকবার করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ বাধা দেন নাই, সেই রীতি বা প্রথা বা কাজ রসূলুল্লাহ্‌র অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবার যে বিশেষ আচরণ রসূলুল্লাহ্‌ সর্বদা এড়াইয়া চলিতেন তাহা তাঁহার অননুমোদিত সাব্যস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুগ

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ৬৩২ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হিজরীর একাদশ সালে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁহার ইন্‌তিকালের সাথে সাথে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রুহানী এবং জাগতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব তাঁহার সাহাবাদের উপর স্বাভাবিক-ভাবেই বর্তায়। সেই সময় হইতেই ইসলামী আইনে একটি নয়া যামানার সূত্রপাত ঘটে। রসূলুল্লাহ্‌ ছিলেন শেষ নবী; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে ওহী লাভ করিয়া তাহা দ্বারা রুহানী এবং জাগ-তিক সমস্যার সমাধানের পথ আর উন্মুক্ত রহিল না। যাহা রহিল তাহা হইতেছে আল্লাহ্‌তালার আল কুরআন এবং রসূলুল্লাহর আল-হাদীস। আল্লাহতালার অভিপ্রায় ও নির্দেশজ্ঞাপক ওহীর স্থলে আল কুরআন ও আল-হাদীস মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে চালাবার জন্য রহিয়া গেল। আল কুরআন ও আল-হাদীসে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইত সেগুলি লইয়া কোন ঝন্‌ঝাট ছিল না। মুসলিম সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল এবংপ্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল। আল কুরআন ও আল-হাদীসে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় সাহাবাগণ তাঁহাদের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনার আলোকে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহর সাহচর্যে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ এবং অনুমোদন ও বিরক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সুতরাং তাঁহারা যখন কোন সমস্যার সমাধান দিতেন তখন সেই সমাধানের মূলে রসূলুল্লাহ্‌র মৌলিক আদর্শ কাজ করিত। সুতরাং যখন সাহাবাগণ একমত হইয়া কোন নির্দেশ দিতেন তখন ধরিয়া লওয়া হইত যে, তাহা সন্দেহাতীতরূপে সঠিক।

খলিফা নির্বাচন

রসূলুল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পরমুহূর্তে যে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা তৎকালীন নবীন মুসলিম সমাজে প্রকট হইয়া ওঠে, তাহা বিশ্বের মুসলিম সমাজের জন্য খলিফা নির্বাচন। এই সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে প্রবল মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। অদ্যাপি সে মতদ্বৈধতার পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নাই, বরং ইহার ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই সম্প্রদায় হইতেছে শিয়া এবং সুন্নত-আল যামাত বা সুন্নী। শিয়াগণ দাবী করেন, যে খিলাফতের অধিকার রসূলুল্লাহ্‌র পরিবারের বাহিরে বিস্তৃত হইতে পারে না। সুন্নিগণ মনে করেন যে সকল মুসলিমই তাহাদের খলিফা নির্বাচনের অধিকার রাখে। প্রামাণ্য ইতিহাস বলে যে, রসূলুল্লাহ্‌র ওফাতের সময় হযরত আলীর পক্ষে কেহ খিলাফতের দাবী উত্থাপন করেন নাই। তখন হযরত আবুবকর প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। মুসলিম রাষ্ট্রে তিনি হন রাষ্ট্রপ্রধান। জুমার সালাত তিনিই পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের তিনিই ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার হাতে কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। আল কুরআন ও আল-হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করাই তাঁহার দায়িত্ব ছিল। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁহার ছিল না। ইসলামী আইনে একমাত্র আল্লাহতালাই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

কুরআন সংগ্রহ

সকল আইনের উৎস হইতেছে আল কুরআন ও আল-হাদীস। মুসলিম সমাজ পরিচালনায় তাই ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এগুলি তখনও সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে সংগৃহীত ও সংকলিত হয় নাই। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ তাই প্রথমে ইহাদের সংগ্রহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। রসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় হাফিজগণের স্মৃতিতে এবং প্রস্তরে, খর্জুর-পত্রে ও অস্থিতে আল কুরআন সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে দমন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় সেই অভিযানে অনেক ক্বারী নিহত হন। হযরত উমর-এর পরামর্শে হযরত

www.pathagar.com

আবুবকর, পাছে কোনক্রমে আল কুরআনের কোন আয়াত নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে আল কুরআন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করেন। জায়েদ প্রায় সর্বদাই রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকিতেন এবং কখনও কখনও তাঁহার কথা লিখিতেন। আল কুরআন সংগ্রহ করিবার ভার তাহার উপর অর্পিত হয় এবং তিনি ১১ হইতে ১৪ হিজরীর মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল আরও কতিপয় কুরআন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া হযরত ওসমান এক-খানি শুদ্ধ কুরআন সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কুরআনের প্রথম সংস্করণকে পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব জায়েদের উপর অর্পণ করেন। পরীক্ষান্তে এই প্রামাণ্য সংস্করণ হেফাজতে রাখিয়া হযরত ওসমান অন্য সমস্ত সংস্করণ ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। হযরত ওসমানের এই নির্দেশ কার্যকরী করা হয় এবং তাহার ফলে সমগ্র বিশ্বে একখানি প্রামাণ্য আল কুরআন থাকিয়া যায়। আজ পর্যন্ত উহা অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

আল-হাদীস সংগ্রহ

আল কুরআন সংগৃহীত হইয়াছিল খলিফার নির্দেশে ও নেতৃত্বে কিন্তু আল হাদীস সেভাবে সংগৃহীত হয় নাই; কেন হয় নাই তাহা কেবল অনুমানের বিষয়। ভক্ত মুসলিমদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর হাদীস সংগ্রহ নির্ভরশীল ছিল। যাহারা হাদীস জানিতেন তাঁহাদের চারিদিকে হাদীস প্রশিক্ষণের জন্য তাঁহারা শিষ্যমণ্ডলী গড়িয়া তুলিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ যাহা বলিয়াছেন তাহা জানিবার এবং সঞ্চয় করিবার জন্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহের প্রবল জোয়ার আসিয়া পড়িল। এই জোয়ারের তোড়ে অনেক মিথ্যা এবং ভ্রমাত্মক হাদীস জমিয়া যাইতে লাগিল। হযরত উমর তাঁহার খিলাফত কালে সর্বদাই হাদীস বর্ণনাকে নিরুৎসাহিত করিতেন এবং এক সময় উহা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত উমরের এই ব্যবস্থা অতি অস্থায়ী ছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই হাদীস গবেষণার কাজ দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে থাকে।

মুহাদ্দিস এবং ফকিহ্‌

যাহারা হাদীসবেত্তা তাঁহারা ইসলামী পরিভাষায় মুহাদ্দিস নামে খ্যাত। আর যাঁহারা আইনতত্ত্বে পারদর্শী তাঁহারা ফকিহ্‌ নামে পরিচিত। সকল

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস ফকিহ ছিলেন না। হাদীসের মধ্য হইতে আইনের সূত্র আহরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিদ্যায় এবং প্রবণতায় এই কঠিন কাজে যে সমস্ত সাহাবা সুখ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন— আলী, উমর, ইবনে উমর, ইবনে মাসূদ এবং ইবনে আব্বাস। তাঁহাদের অভিমতের উপর ভিত্তি করিয়া ইসলামী আইনতত্ত্বের বহু সূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

মদীনা এবং কুফা

কুফায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইবনে মাসূদ হাদীস এবং ইসলামী আইন শিক্ষাদান করেন। অন্যান্য ফকিহ এবং মুহাদ্দিসগণ মদীনায় শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী ছিলেন। কুফা এবং মদীনা দীর্ঘ দিন ধরিয়া মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইবনে মাসূদের ছাত্রদের মধ্যে আল-কামা এবং আসোয়াদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আলকামা এবং আসোয়াদ উভয়ই অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত ইব্রাহীম আন-নাখাঈ। তিনি ইরানের ফকিহ নামে বিশেষ-ভাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। আইনের সূত্রাবলী সংগ্রহ এবং সংকলন করিয়া ইবরাহীম একখানা কিতাব প্রকাশ করেন। ইমাম আবু হানিফার শিক্ষাগুরু হাম্মাদের কাছে এই কিতাবখানা ছিল। মদীনায় হাদীস পাঠের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। হাদীস শিক্ষা অন্যত্র যে অবহেলিত হইয়াছে এমন অভিযোগ যুক্তিহীন। আইনের উৎস হিসাবে হাদীসের মর্যাদা সকল এলাকায় ছিল। হাদীস প্রশিক্ষণের পদ্ধতি নিম্নরূপ ছিল: শিক্ষক বলিতেন, ফলানা আমাকে বলিয়াছেন যে, ফলানা তাহাকে বলিয়াছে যে, ফলানা তাহাকে বলিয়াছে যে, ফলানা তাহাকে বলিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ছাত্রগণ এই বর্ণনার প্রত্যেকটি শব্দ লিখিয়া রাখিত। তাঁহারা বর্ণনা-কারীর পারম্পর্যও লিখিয়া রাখিত। রসূলুল্লাহর ওফাতের সময় হইতে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই স্বাভাবিকভাবে বর্ণনাকারীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিল।

প্রথম চারি খলিফার বিচার কার্য

রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় তিনি নিজেই বিচার কার্য করিতেন। তাঁহার ওফাতের পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহর অনুসরণে হযরত আবুবকর নিজেই

www.pathagar.com

বিচার কার্য করিতেন কিন্তু কালক্রমে রাজনৈতিক সমস্যা বাড়িতে থাকিল এবং খলিফার পক্ষে নিজে বিচার কাজ করা আর সম্ভব হইয়া উঠিল না। তখন তিনি হযরত উমরের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। হযরত আবুবকর প্রথমে কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর প্রথম কাজী নিয়োগ করেন। তিনি এই ফরমান জারি করেন যে, আইনের ইজ্জত সর্বোচ্চ এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন নয়। হযরত উমর একজন ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছিলেন। হযরত উমর এবং ঐ ইহুদী যখন বিচারের জন্য কাজীর এজলাসে উপস্থিত হন তখন খলিফাকে দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে কাজী আপন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। কাজীর এই দুর্বলতাকে হযরত উমর ক্ষমা করেন নাই। তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। হযরত উমরের সময় অবশ্য কাজীর ক্ষমতা ও এখতিয়ার সঠিক-ভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নাই এবং কাজীর আদেশ বা দণ্ড কার্যকরী করিবার মত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নাই। হযরত উমর নিজে একজন আইনতত্ত্ববিদ ছিলেন, হযরত আলীও ছিলেন তদ্রূপ। হযরত আলীর সময় কাজীর এখতিয়ার এবং কার্যধারা অনেকাংশে প্রবর্তিত ও নিশ্চিত করা হয়। হিজরী ৪০ সালে হযরত আলী শাহাদত লাভ করেন এবং তাহার সাথে সাথে খোলা-ফায়ে রাশেদীনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসলামী আইনতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই যুগকে ইসলামের আদেশ-নিষেধের নিখুঁত অনুসরণের যুগ বলা যায়। এই যুগে স্বয়ং খলিফা, অথবা তাহার তত্ত্বাবধানে অন্য কোন ব্যক্তি আইন প্রয়োগ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ইসলামের নিয়ন্ত্রণের সীমা বর্ধিত হইতে থাকে এবং অনেক পরাজিত দেশের আইনের সংস্পর্শে ইসলামী আইনকে আসিতে হয়। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে সর্বদা আইনের সাথে দ্বীন সংযুক্ত ছিল এবং আইন প্রয়োগ করিবার সময় তাঁহারা একদিকে দ্বীনের অনুশাসন এবং অন্য দিকে প্রযোজ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া খলিফাগণ দামাস্কাসে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলামী আইনে এই খলিফাগণের ব্যুৎপত্তি গভীর ছিল না। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ এই বংশের একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। শুধু নিষ্ঠা বা তাকওয়ার জন্য নয় বরং তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সনদের উপর অনেক হাদীস প্রতিষ্ঠিত। উমাইয়া

www.pathagar.com

খিলাফতের কালে যদিও কাজী বিচার-কার্য করিতেন তবু ইসলামী আইন সম্পর্কে পাঠ এবং গবেষণা হইত অধ্যাপকদের বক্তৃতা কক্ষে। অধ্যাপকগণ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন না। আইন পাঠ করিবার এবং জানিবার আগ্রহ উমাইয়া খিলাফতের আমলে হ্রাস পায় নাই, বরং ইরাকে এবং মেসোপটেমিয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আইন গবেষণার সূত্রপাত হয়। এইভাবে ইসলামী আইনতত্ত্বের বিজ্ঞান জন্ম লাভ করে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা আইনকে বিষয়-ভিত্তিক ভাবে ভাগ করেন এবং আইনের ভাষায় পরিভাষা প্রয়োগ করেন এবং আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ণয় করেন।

আব্বাসী খিলাফত

হিজরীর ১৩২ সালে উমাইয়াদের পতন হয় এবং আব্বাসিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আইনতত্ত্বের গবেষণায় তাঁহাদের উৎসাহ ছিল প্রবল। আইনতত্ত্ববিদগণকে বিশেষভাবে তাঁহারা উৎসাহিত করিতেন। তৎকালে হিজাজ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং সাম্রাজের অন্যান্য স্থান হইতে মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ আব্বাসী খলিফাদের রাজধানী বাগদাদে সমবেত হইতেন। এইভাবে বাগদাদ সেইদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত হয়। আব্বাসী খলিফাগণ কাজীদিগকে অত্যন্ত উচ্চ বেতনে নিয়োগ করিতেন এবং রাষ্ট্রে তাঁহারা অতি উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আইন এবং সাধারণ শিক্ষায় যাঁহারা পারদর্শী ছিলেন কেবল তাঁহাদিগকেই খলিফাগণ কাজী নিযুক্ত করিতেন।

ইসলাম আইনতত্ত্ব এবং রোমের আইনতত্ত্ব

এই সময়ে জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর সাহিত ইসলামী আইনকে মোকাবালা করিতে হয় এবং মুসলিম পণ্ডিতগণ গ্রীক ও রোমান সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তুলনামূলক আইনতত্ত্বের ছাত্রবৃন্দের চোখে ইসলামী আইন এবং আইনতত্ত্বের সহিত রোমান আইন এবং আইনতত্ত্বের প্রচুর সাদৃশ্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। রোমান আইনতত্ত্ব-বিদদের নিকট মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ ঋণী ছিলেন কিনা এং ঋণী থাকিলে কি পরিমাণে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মুসলিম আইন-তত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের কর্মে এবং রচনায় কোন সময় কোনভাবে রোমান

www.pathagar.com

আইন বা আইনতত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। রোমান আইনতত্ত্ব যে ইসলামী আইনের কোন উৎস হইতে পারে ইহার কোন স্বীকৃতি কোথাও নাই।

তৃতীয় যুগ

সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

আব্বাসী খলিফাদের আমলে সুন্নী সম্প্রদায়ের মযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অত্র পুস্তকের বিষয়বস্তু হইতেছে এই মযহাবগুলির আইনতত্ত্ব। নীতির দিক হইতে এই মযহাবগুলির মধ্যে কোন মতভেদ নাই, খুঁটিনাটিতে ইহাদের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। তবে শিয়া আইনের সহিত এই চার মযহাবের আইনের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সে পার্থক্য অতীত রাজনৈতিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভব হইয়াছিল। এই পুস্তকে শিয়া আইন সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হইবে না।

আবু হানিফা

ইমাম আবু হানিফার পূর্ণ নাম আবু হানিফা আন-নু'মান ইব্নে সাবিত। হিজরী ৮০ সালে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের খিলাফতের সময় এই মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন এবং বৃদ্ধ বয়সে আব্বাসী খিলাফতের সময়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। আইনতত্ত্ব সাধনায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মুত্তাকি রসূলুল্লাহ্র বংশধর জাফর আস-সাদিক এবং পূর্ববর্ণিত ইব্রাহীম আন্-নাখাঈয়ের যোগ্যতম শিষ্য বিখ্যাত আইনতত্ত্ববিদ হাম্মাদ। যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি হাদীস শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আশ-শা'বি, কাতাদা ও আল-আ'মাশ। আবু হানিফা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন। একাধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে তাহা তিনি ধরিতে পারিতেন। বিশ্লেষণ এবং তাহার মাধ্যমে সূত্র আহরণের ক্ষমতায় তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রখর। সকল পঠিত এবং শ্রুত বিষয় স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া অতঃপর সেগুলি বুদ্ধি সহযোগে আত্মস্থ করিয়া এবং সর্বশেষে তাহার মধ্য হইতে সূত্র আহরণ করিয়া তিনি আইনতত্ত্বের গবেষণা করিতেন। তাঁহার এই গবেষণার খ্যাতি

www.pathagar.com

দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। বহু জ্ঞানপিপাসী এবং শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে ভিড় করিতে থাকে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহাদের ইসলামী আইনে উল্লেখ-যোগ্য অবদান আছে, তাঁহারা হইতেছেন আবু ইউসুফ, মুহম্মদ এবং জুফার। আবু হানিফা যেভাবে এবং যে ধারায় শিক্ষা দিতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত সর্বাধিক প্রাধান্য পাইত। এইজন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার মযহাবকে ব্যক্তিগত অভিমতবাদী (আহলুর-রায়) বলা হয়। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত-গণ মনে করিতেন যে, তিনি যুক্তিভিত্তিক নীতির উপর সর্বদাই বেশী জোর দিতেন, হাদীসের উপর নয়। তাঁহারা মনে করিতেন যে আবু হানিফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হাদীসের আলোক হইতে যুক্তির আলোককে বেশী পছন্দ করিতেন: তৎকালে আইনতত্ত্ববিদগণ মোটামুটিভাবে দুইভাবে বিভক্ত ছিলেন। তাহার এক ভাগে ছিলেন আরবের পণ্ডিতগণ। তাঁহাদিগকে হাদীসবাদী বলা হইত। অন্যভাগে ছিলেন ইরাকের পণ্ডিতগণ। তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত অভিমতবাদী বলা হইত। যদিও আবু হানিফা ব্যক্তিগত অভিমত-বাদী ছিলেন তবুও ইহা ধারণা করা ঠিক হইবে না যে, হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান অপ্রচুর ছিল বা হাদীসকে তিনি আইনের উৎস বলিয়া মনে করিতেন না। ইবনে খালদুন বলেন, কেহ কেহ মনে করেন, হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানের অভাবের কারণে কোন কোন ইমাম তাঁহাদের রচনায় খুব অল্প হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্তই অমূলক। সকল ইমামই বিশ্বাস করিতেন যে, আইনের উৎস হইতেছে আল কুরআন এবং আল-হাদীস তবে কোন কোন ইমাম হাদীস গ্রহণ করিতে কঠোর সাবধানতা গ্রহণ করিতেন। হাদীস যাচাইয়ের মানদণ্ড তাঁহাদের কাছে এতই কঠিন ছিল যে, বহু হাদীস তাঁহাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হইত না। আবু হানিফা এই ব্যাপারে অতিশয় কঠোর ও হুঁশিয়ার ছিলেন। তিনি হাদীস গ্রহণ করিবার সময় গভীর সতর্কতার সহিত সেগুলি পরীক্ষা করিতেন। সর্বজন-স্বীকৃত বহু হাদীস তাঁহার এই পরীক্ষায় টিকিত না। তদুপরি সব হাদীস তাঁহার নিকট আইনের সূত্র প্রদানে সক্ষম ছিল না। বলা হইয়া থাকে যে, তৎকালে প্রচলিত অতি বৃহৎ সংখ্যক হাদীসের মধ্যে তিনি মাত্র আঠারোটি হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কিয়াস

আইনতত্ত্বের সূত্র এবং মূলনীতি প্রণয়ন আবু হানিফার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। বস্তুত আজ আমরা যে আইনতত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি তাহার প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

তিনি। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে যদিও কিয়াসের প্রচলন ছিল তবু তিনি সর্বপ্রথম ইহাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব প্রদান করেন। সদৃশ ব্যাপারে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিই কিয়াসের মূল কথা। তাঁহার প্রচেষ্টায় "কিয়াস" মুসলিম আইনতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য উৎসরূপে গৃহীত এবং অনুসৃত হয়। আইনের যে নীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন সেই নীতি, তাঁহার ভাষায় ইস্তিহসান (استحسان) নামে পরিচিত। ইহা উত্তরকালের ইউরোপীয় ন্যায়পরতা (equtiy) নীতির সমতুল্য। এই নীতির মূল কথা হইতেছে বাস্তবতার সহিত আইনের সূত্রকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া। একটি উদাহরণের মাধ্যমে কিয়াস ও ইস্তিহ্সানকে বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইসলামী আইনে বিক্রয়-চুক্তি সিদ্ধ হইতে হইলে চুক্তির সময় উহার বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকিতে হইবে। যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই ইসলামী আইনের পুরাতন নীতিতে সেই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ ; সুতরাং অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া বিক্রেতা স্বর্ণকার একটি নির্দিষ্ট মূল্যে তাহা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিবে এই চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য অলংকারের অবিদ্যমানতার কারণে অসিদ্ধ। আবু হানিফার প্রবর্তিত নীতি ইস্তিহসান এই চুক্তিকে সিদ্ধ ঘোষণা করে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পূর্বে নমুনা দিয়া সেই নির্দিষ্ট মূল্যে অলংকার গড়াইয়া লওয়ার নীতি প্রচলিত। ইস্তিহ্সান সূত্র অনুযায়ী এই চুক্তি তাই বৈধ।

ইজমা

ইজমা বলিতে ঐকমত্য বুঝায়। রসূলুল্লাহর সাহাবাগণ যে বিষয় সম্বন্ধে ঐকমত্যে উপনীত হইতেন, সেই বিষয়ে তাঁহাদের ঐকমত্যকে প্রামাণ্য আইনরূপে গ্রহণ করা হইত। অতঃপর তাবেঈন বা সাহাবাদের অনুসারীদের বা প্রত্যক্ষ অনুবর্তীদের দ্বারা গৃহীত ইজমাও প্রামানিক আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু অনেক আইনতত্ত্ববিদ তাবেঈনদের (অনুবর্তীদের) ইজমার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকেন। আবু হানিফা রায় দেন যে ইজমাকে কোন কালে সীমা-সরহদের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত নয়। যে কোন কালে পূর্বতন ইজমার অনুরূপ কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে পরবর্তী যুগেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উর্‌ফ

স্থানীয় প্রথা বা রীতি-নীতিকে আইনের পরিভাষায় উরফ বলা হয়। আইনে উর্‌ফের অবদানকে আবু হানিফা স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। আল-আশ্‌বাহ

www.pathagar.com

ওয়ান-নাদায়ের গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ আইনের অনেক সিদ্ধান্ত প্রথা ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পরে এইগুলি আইনের সূত্র হইয়া দাঁড়ায়। সকল আইনতত্ত্ববিদের মত আবু হানিফাও আল কুরআন ও হাদীসকে ইসলামী আইনের প্রধান উৎস গণ্য করিতেন। তিনি ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান এবং উর্‌ফকেও ইসলামী আইনের উর্‌স গণ্য করিতেন তবে এগুলি তাঁর কাছে ছিল অপ্রধান।

আইন বিধিবদ্ধকরণ

ইসলামী আইনতত্ত্বের অতি বিপুল পরিসরে আবু হানিফা কাজ করিতেন, সেই কাজের সহায়করূপে তিনি লাভ করিয়াছিলেন অনেক যোগ্য ছাত্র। আইনকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রধান ছাত্রদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট চল্লিশজনকে নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইয়াহিয়া ইবনে আবি জাঈদ, হাফস ইবনে গিয়াস, আবু ইউসুফ, দাউদ আত্-তাঈ, হাব্বান এবং মাণ্ডাল মশহুর হাদীসবেত্তা ছিলেন। বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্য হইতে আইনের সূত্র আহরণ করিবার ক্ষেত্রে জুহার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাসিম ইবনে নুইম এবং মুহম্মদ আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এইসব রত্ন সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দিনের পর দিন অবিশ্রান্তভাবে বাস্তব প্রশ্নাবলীর উপর ব্যাপক গবেষণা করিতেন। এই গবেষণামূলক বিশ্লেষণের সময় প্রাস-ঙ্গিকভাবে যে সমস্ত প্রশ্ন গবেষকদের মনে জাগ্রত হইত তাহা লইয়াও তাঁহারা বিশ্লেষণ কর্ম পরিচালনা করিতেন। এই বিশ্লেষণ এবং গবেষণা চলিত তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে। অবশেষে তাঁহারা পূর্ণ এবং স্বাধীন মতামত বিনি-ময়ের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইত। এইভাবে ত্রিশ বৎসরের অবিরাম সাধনার পর ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ করিবার কাজ শেষ হয়। অবশ্য শেষ হইবার পূর্বে প্রতি খণ্ড সম্পূর্ণ হইবার সাথে সাথে প্রচারিত হইয়াছিল। ইসলামী আইনতত্ত্বের চরম দুর্ভাগ্য যে, আইনের এই বিশ্বকোষ হারাইয়া গিয়াছে, ইহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই বিশ্বকোষ প্রণয়নে আবু হানিফার অতি বৃহৎ অবদান ছিল। ইহা ছাড়া তিনি আর কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা তাহা সন্দেহাতীতরূপে জানা যায় নাই। অনেকে বলেন যে, তিনি 'ফিক্‌ই আকবর' গ্রন্থের রচয়িতা কিন্তু অধিকাংশের মতে এই গ্রন্থ তাঁহার রচিত নয়। তাঁহার দুইটি রচনার

www.pathagar.com

সন্ধান এযাবত পাওয়া গিয়াছে ; একটি হইতেছে মাস্‌নদ-ই-ইমাম আবু হানিফা এবং অপরটি হইতেছে একখানি চিঠি। প্রথমখানি হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন আর দ্বিতীয়খানি তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কাজী আবু ইউসুফকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া আবু ইউসুফ বাগদাদে প্রধান কাজীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। আবু ইউসুফের জ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রতিভাকে আবু হানিফা শ্রদ্ধা করিতেন। হানাফী আইনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে সূত্রাবলী বিদ্যমান তাহার অনেকগুলি আবু ইউসুফের প্রভাবে প্রণীত হইয়াছিল। আবু হানিফার দ্বিতীয় প্রখ্যাত শিষ্য মুহম্মদ প্রচুর লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সব গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। আবু হানিফাকে কাজীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। নিজের বিবেক বজায় রাখিয়া তিনি ঐ কাজ করিতে পারিবেন না, এই আশংকায় তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তথাকথিত এই অপরাধের জন্য কুফার প্রশাসক ইবনে হুবায়রা র নির্দেশে তাঁহাকে বেত্রাঘাতের দণ্ড সহ্য করিতে হয়। খলিফা আল্ মনসুর তাঁহাকে কাজীর পদ গ্রহণের অস্বীকৃতির অপরাধের অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং সেই অন্ধকার কারাভ্যন্তরে মুসলিম বিশ্বের এই অতি মহান আইনতত্ত্ববিদকে, জনগণের বিশ্বাস মতে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। সেই যুগের জনগণ তাঁহাকে যে কতখানি শ্রদ্ধা করিত তাহার প্রমাণ তাঁহার জানাজার সমাবেশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দশদিন ধরিয়া তাঁহার জানাজা হইয়াছিল এবং প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক তাঁহার জানাজায় শরীক হইয়াছিল। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তুরস্কের প্রায় সব মুসলিমই হানাফি মযহাবপন্থী। মিশর, আরব এবং চীন দেশেও হানাফি মযহাবের মুসলিম দেখিতে পাওয়া যায়।

মালিক

হিজরীর ৯৫ সালে মদীনায় মালিক ইবনে আনাস জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায়ই তাঁহার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার স্থল ছিল। তাঁহার সমগ্র জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এই মদীনার পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্ র আদেশে রসূলুল্লাহ্ ইসলাম প্রচার করেন এবং এখানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয়। তাঁহার ইন্তিকালের পর এখানে হাদীসের জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

এই পবিত্র ভূমিতেই মালিকের আবির্ভাব ঘটে। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার যামানায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার এই খ্যাতি অম্লান রহিয়াছে। তিনি যেমন হাদীস-তত্ত্বে বিশারদ ছিলেন তেমনি আইনতত্ত্বেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনিও একটি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার জীবনকালে তাঁহার মযহাব খুবই প্রভাবশালী ছিল। স্পেনের মুরগণ মালিকী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর আফ্রিকায় এখনও বহু মালিকী মযহাবের লোক আছে। আবু হানিফার মতবাদের সহিত তাহার মতবাদের কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। মালিকের নিকট আবু হানিফার বিখ্যাত শিষ্য মুহম্মদ দীর্ঘ তিন বৎসর কাল হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। মালিকের জন্ম এবং কর্মক্ষেত্র ছিল মদীনা। সুতরাং, রসূলুল্লাহর পরিণত বয়সের ইসলাম প্রচারকেন্দ্র মদীনাবাসীর নিকট হইতে রসূলুল্লাহর এবং তাহার সাহাবা এবং তাবেঈনদের অনসৃত নীতি ও বিধি সম্পর্কে তাহার পক্ষে জ্ঞান লাভ করা সহজ এবং সুবিধাজনক ছিল। এই জ্ঞানকে তিনি তাঁহার আইনের নীতিনির্ধারণে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অভিমতের মোকাবালায় হাদীসকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিমতকে তিনি সাধারণভাবে প্রাধান্য দেন নাই। যখন একেবারেই কিছু পাওয়া যায় নাই তখনই তিনি ব্যক্তিগত অভিমতের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। মদীনায় যে প্রথা এবং রীতিনীতি দেখা যাইত সেগুলিকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি মনে করিতেন, এই সমস্ত প্রথা ও রীতি-নীতি রসূলুল্লাহর যামানা হইতে চলিয়া আসিতেছে। জনকল্যাণের জন্য আবু হানিফা যেমন ইস্তিহ্সানের প্রবর্তন করেন তেমনি মালিক মুসলাহাত নীতির প্রবর্তন করেন। আল কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসের সহিত ইসলামী আইনের আরো একটি উৎস তিনি প্রবর্তন করেন। এই উৎসের নাম ইসতিদলাল। আবু হানিফার মৃত্যুর ঊনত্রিশ বৎসর পর ইমাম মালিকের মৃত্যু হয়। ইমাম মালিকের 'আল মুয়াত্তা' একখানি হাদীস সংকলন। ইহাতে প্রায় তিনশত হাদীস স্থান পাইয়াছে।

শাফিঈ

মুহম্মদ ইবনে আশ শাফিঈ ইমাম মালিকের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ছাত্রের প্রতিষ্ঠা শিক্ষককেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শাফিঈ ছিলেন রসূলুল্লাহ্র পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের বংশধর। প্যালেস্টাইনে তাহার জন্ম হয়।

www.pathagar.com

আইন ও হাদীসের শিক্ষা তিনি শুধু মালিক ইবনে আনাসের নিকটই গ্রহণ করেন নাই, আবু হানিফার শিষ্য মুহম্মদ এবং আরও অনেকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যবয়সেই তাহার মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। যৌবনকালেই তিনি আইনতত্ত্বের উপর বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। অচিরেই তাঁহার খ্যাতি দূরদূরান্তে বিস্তৃত হয় এবং তাহার প্রচারিত আইনের সূত্র গৃহীত হইতে থাকে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মযহাবের নাম শাফিঈ মযহাব। সংখ্যার দিক হইতে তাঁহার মযহাবপন্থীদের স্থান হানাফিদের নিম্নে কিন্তু অন্য মযহাবপন্থীদের উর্ধ্বে। বিচারের ভারসাম্য রক্ষা এবং অভিমতে মধ্যপথ গ্রহণ, এই দু-ই নীতি ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট। হাদীসের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ় বস্তুত ইমাম শাফিঈ যাহাকে ইসলামী আইনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়, ইসলামী আইন নির্ধারণে হাদীসের যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব, তাহা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে হাদীস বা সুন্নাহ আল কুরআনকে ব্যাখ্যা করে, সুতরাং হাদীস ব্যতীত আল কুরআন বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু হাদীসের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি কোন শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার শিক্ষাগুরু মালিকের চাইতে তিনি কিয়াসের ব্যবহার অধিক করিতেন। ইজমা-র প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি উদার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ একবার বলিয়াছিলেন, "আমার উম্মত কখনো কোন ভুল সিদ্ধান্তে একমত হইবে না।" রসূলুল্লাহ্‌র এই মহান বাণী অনুসরণ করিয়া ইমাম শাফিঈ ইজমা বা ঐকমত্যকে প্রচুর গুরুত্ব দিতেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার ইস্‌তিহ্‌সানের পরিবর্তে ইমাম মালিকের ইস্‌তিদ্‌লালকে বেশী পছন্দ করিতেন। আইনের নীতি-উসূল সম্পর্কে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মিশরে এই মযহাবের লোক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকা, আরব, ভারতের বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনেক শাফিঈ সম্প্রদায়ের লোক আছে।

আহমদ ইবনেহাম্বল

ইমাম আবু হানিফার জন্ম ইরাকে, ইমাম মালিকের জন্ম মদীনায়, ইমাম শাফিঈর জন্ম প্যালেস্টাইনে আর ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ আহমদ ইবনে হাম্বলের জন্ম বাগদাদে। হিজরী ১৬৪ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, তন্মধ্যে ইমাম শাফিঈ প্রধান। তিনি হাম্বলী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হাদীসে সুপণ্ডিত ছিলেন।

www.pathagar.com

হাদীস শাস্ত্রে এবং ধর্ম শাস্ত্রে তাঁহার খ্যাতি উচ্চস্তরের ছিল। সংখ্যার দিক হইতে এত হাদীস তৎকালে আর কাহারও মুখস্থ ছিল না। হাদীসকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই ছিল তাঁহার প্রবর্তিত আইনের মূল সূত্র। তিনি নিজেও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতেন। হাদীস ব্যাখ্যায় তিনি অনমনীয় ছিলেন এবং ব্যাখার মাধ্যমে তিনি হাদীসের প্রসারণ এবং সংকোচন করিতে দিতেন না। ইজমা এবং কিয়াসকে তেমন মূল্য তিনি দেন নাই। ধর্মীয় মতে তিনি সর্বদাই অবিচল থাকিতেন। খলিফা আল মামুনের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি অভিযুক্ত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন। এই অন্যায় নির্যাতন তাঁহাকে আরও মহীয়ান করিয়া তোলে। তাঁহার উপর জনগণের শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। ২৪১ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইলে আট লক্ষ পুরুষ এবং ষাট হাজার মহিলা তাঁহার জানাজায় শরীক হয়। তাঁহার অনুবর্তিগণকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের মতবাদের জন্য নির্যাতন সহিতে হয়। আরবের কিছু অংশ ছাড়া আজ আর কোথাও তাহার মযহাবপন্থী লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আইন-তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তবে অন্যান্য আইন গ্রন্থে তাহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার হাদীস সংকলন, 'মুসনাদুল ইমাম হামবল' এখন দুর্লভ। যদিও এই বিখ্যাত সংকলনে পঞ্চাশ সহস্র হাদীস সংগৃহীত হইয়াছে তবু বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের অভাবে ইহার উপকারিতা খুব অধিক নহে।

এই ইমাম চতুষ্টয় আরও কিছু পণ্ডিতের উদ্ভবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুফিয়ান ছৌরি এবং দাউদ জাহিরী প্রসিদ্ধ। তবে তাঁহাদের প্রবর্তিত মযহাব কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইমাম হামবলের মৃত্যুর সাথে সাথে স্বাধীন আইনতত্ত্ববিদদের যমানা শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এযাবৎ যাহা করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা এই ইমামদের প্রবর্তিত আইনের টিকা এবং ভাষ্যমাত্র। বর্তমান শতাব্দীতে কিছু নব জাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

হাদীস বিজ্ঞান

ইমাম হাম্বলের মৃত্যুর পর হাদীস শাস্ত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক জন্মলাভ করেন। যদিও তাঁহারা বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদ ছিলেন না তবু ইসলামী আইনের বিবর্তনে তাঁহাদের শ্রমের প্রভাব সুস্পষ্ট। হাদীসে ইমাম

www.pathagar.com

হামবলের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার কৃচ্ছতাপূর্ণ জীবনধারা হাদীস পাঠের দিকে অনেক তরুণ মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করে। একদল তরুণ শিক্ষার্থী হাদীস তত্ত্ব শিক্ষার সমর্পিত হইয়া এই বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে বদ্ধপরিকর হন। এই দলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ আবু ইসমাইল আল বোখারী। তিনি ইমাম হামবলের ছাত্র ছিলেন এবং বোখারী নামেই পরিচিত হন। জুহরী, মালিক এবং ইবনে জুরাইজ হাদীস সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং তাহা স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থবদ্ধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনতত্ত্ববিদগণ এই সংগৃহীত হাদীস যাচাই এবং পরীক্ষা করিতে থাকেন। এই যাচাই এবং পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের নীতি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ এবং মালিক যেভাবে আইনতত্ত্বকে যাচাই এবং পরীক্ষা করিয়াছিলেন হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলিম পণ্ডিতগণ সেইভাবে হাদীসকে যাচাই ও পরীক্ষা করেন। এই কাজে যিনি পথিকৃৎ ছিলেন তিনি হইতেছেন পূর্ববর্ণিত বোখারী। বোখারীর হাদীস সুন্নী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত। সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে তিনি মাত্র সাত হাজার হাদীস সহি বলিয়া ঘোষণা করেন। হিজরীর ২৫৬ সালে (৮৬৯ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় একই ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অথচ স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছিলেন নিশাপুরের পণ্ডিত—মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। তিনি মুসলিম নামেই সমধিক পরিচিত। হিজরী ২৬১ সালে (৮৭৪ খৃঃ) তিনি মারা যান। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলিমের অবদান সংখ্যার দিক হইতে বোখারীর তুলনায় কম। কিন্তু প্রামাণ্যতার দিক হইতে তাঁহার হাদীস কোনক্রমেই নিম্নস্তরের নহে। বোখারী এবং মুসলিমের সংকলনকে সুন্নী সম্প্রদায় প্রামাণ্য হাদীস সংকলন বলিয়া সর্বদাই মানিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই সংকলন দুইখানি প্রধানতম হইলেও আরও চারখানি হাদীস সংকলনকে তাঁহারা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। এই চারখানি হইতেছে চারজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের সংকলন। এই মুহাদ্দিসগণ হইতেছেন—তিরমিজী (মৃত্যু হিজরী ২৭৯ —৮৯২ খৃঃ), আবু দাউদ (মৃত্যু হিজরী ২৭৫ =৮৮৮ খৃঃ), ইবনে মাজাহ্ (মৃত্যু হিজরী ২৭৩=৮৮৬ খৃঃ) ও নেসাঈ (মৃত্যু হিজরী ৩০৩=৯১৫ খৃঃ)। এই ছয়জন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস একত্র

www.pathagar.com

হাদীস সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করিয়াছেন। এই কারণে, একই হাদীস ইহাদের সংকলনে স্থান পাইয়াছে। যে হাদীস যত বেশী সংকলনে স্থান পাইয়াছে সে হাদীস তত বেশী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। বোখারী এবং মুসলিম উভয়ই অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সাবধানী সংকলনকারী ছিলেন। হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে তাঁহারা কোন যত্ন বা শ্রমকেই বেশী মনে করেন নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহাদের সংগৃহীত এবং সংকলিত সমস্ত হাদীস সুন্নী সম্প্রদায় অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তাঁহারা যে হাদীসকে সত্য বলিয়াছেন, সেই হাদীসই যে গ্রহণযোগ্য হইবে সুন্নী সম্প্রদায় তাহা মনে করে নাই। তাহাদের যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সাবধানতা যথেষ্ট প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য, তবুও তাঁহারা অভ্রান্ত নন। সুন্নী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ হাদীসের প্রামাণ্যতা লইয়া অনেক বিরোধ বিতর্ক হইয়াছে।

আইনতত্ত্বে মুহাদ্দিসগণের প্রভাব

বোখারী এবং মুসলিম ইসলামী আইনতত্ত্বের উপর যে প্রভাব রাখিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও অতি গভীর। বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদ শাফিঈ এবং মালিক হাদীসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন, বোখারী এবং মুসলিমের সংকলন শাফিঈ এবং মালিকী মযহাবের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়াছিল। ইহা সত্য যে, ইমাম আবু হানিফার মতবাদে ব্যক্তিগত বিচারের প্রাধান্য ছিল, তবুও হানাফী মযহাবের উপর বোখারী এবং মুসলিমের সংকলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে হিজাজের হাদীসবাদীরা এবং ইরাকের ব্যক্তিগত অভিমতবাদীরাও বোখারী ও মুসলিমের প্রভাবে অনেকখানি একত্র হইয়া গিয়াছে। হানাফী মযহাবের সমস্ত আইন তত্ত্ববিদ পরবর্তীকালে তাঁহাদের পুস্তকে বোখারী এবং মুসলিমের সংকলন হইতে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। বোখারী এবং মুসলিমের প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, একটি বিশেষ ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবু হানিফা তাঁহার সময়ের প্রায় সকল মুহাদ্দিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তখন রসূলুল্লাহর (সঃ) আসহাবগণের বংশধরদের মনে রসূলুল্লাহ্‌র আদেশ ও আচরণ জাগ্রত থাকিবার কথা, কিন্তু এতদ সত্ত্বেও এই মহান ইমাম সতের কিংবা আঠারটি হাদীসকে মাত্র খাঁটি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হানাফী সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বহু

www.pathagar.com

শত হাদীসকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। প্রতিষ্ঠাতা যেখানে মাত্র সতেরটি হাদীসকে প্রামাণ্য মনে করিলেন, অনুসারীরা সেখানে সতের শত পর্যন্ত আসিয়াও থামিলেন না, এই উদারতার হেতু কি? চিন্তার এই পরিবর্তনের কারণ কি? ইহা বোখারীর প্রভাব ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা অবিসংবাদিতরূপে বোখারীর প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। বোখারী আবু হানিফার মতবাদকে পছন্দ করিতেন না, তিনি তাঁহার সংগৃহীত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, বহু প্রশ্নে আবু হানিফার মত ভ্রান্ত কিন্তু হানাফী মযহাবের দৃষ্টিতে বোখারী কোনদিন তাঁহার শ্রদ্ধার আসন হারান নাই। একদিকে যেমন হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ কালক্রমে আইনের ক্ষেত্রে হাদীসের ব্যবহারকে ব্যাপক করিয়াছেন; তেমনি অন্যদিকে শাফিঈ এবং মালিকী মযহাবের আইনতত্ত্ববিদগণ আবু হানিফা প্রবর্তিত ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়াছেন। সকল সম্প্রদায় এমনিভাবেই কাছাকাছি আসিয়াছে এবং সকলেই মধ্যপথে পৌঁছিয়াছে।

তফসীরুল কুরআন

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসলামী আইনের প্রাথমিক উৎস হইতেছে আল কুরআন। মুসলিম সমাজের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই মহাগ্রন্থ ব্যাখ্যার কাজে নিয়োজিত থাকিয়া আইনের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। কুরআন ব্যাখ্যার বিজ্ঞানকে তফসীর বলা হয়। তফসীরের কাজে যাহারা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন—তাবারী (মৃত্যু হিজরী ৩১০=৯২২ খৃঃ), জামাখশারী (মৃত্যু হিজরী ৫৩৮=১১৪৩ খৃঃ), বায়দাবী (মৃত্যু হিজরী ৬৮৫—১২৮৬ খৃঃ), গাযযালী (মৃত্যু হিজরী ৫০৪—১১১০ খৃঃ), দুই জালালউদ্দিন এবং ফখরুদ্দীন রাজী। সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর সমসাময়িক কালে রচিত এবং প্রকাশিত তফসীরে আহমদী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একখানি উপাদেয় ভাষ্য। অনেক আইনের সূত্র এই ভাষ্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা আহমদ, মোল্লাজীওন নামে পরিচিত ছিলেন। আবশ্য এই সমস্ত পণ্ডিত কেহই আইনতত্ত্ববিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নাই।

আইনতত্ত্ব

তৃতীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম আইনতত্ত্ববিদগণ বিশেষ করিয়া ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালিক আইনতত্ত্বে যে অবদান

www.pathagar.com

রাখিয়াছিলেন তাহা দুই প্রকার। প্রথমত বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব যে ইসলামী আইন ইসতিমাল করিতেছে তাহার অতিবৃহৎ অংশ এই ইমামচতুষ্টয়ের বিধানাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, তাঁহারা উসূলের উদ্ভাবক। উসূল শব্দের অর্থ হইতেছে মূল বা শিকড়। ইলমুল উসূল অথবা উসূলের বিজ্ঞান বলিতে আইনতত্ত্ব বুঝা যায়। আইনের উৎস নির্ধারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনা করাই ইলমুল উসূল তথা আইনতত্ত্বের কাজ। ইসলামী আইনের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয় যে শাস্ত্রে তাহার নাম ইলমুল ফারু (ফারু অর্থ শাখা)। অবশ্য ইলমুল উসূল এবং আইনতত্ত্ব ঠিক এক নয়। উসূলের সাধারণ কাজ হইতেছে আইনের মূল সূত্র এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা, অধিকার এবং কর্তব্যের মাধ্যমে মানুষের কাজে আইন প্রয়োগ করা এবং আইনের ধারণাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করা। আর ইলমুল উসূলের প্রধান কাজ হইতেছে আল কুরআন এবং আল-হাদীসের তফসীরের বিধি আলোচনা করা, ইজমা প্রতিষ্ঠার সূত্র নির্ধারণ করা এবং সর্বশেষে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন প্রশ্নের সমাধান না পাওয়া গেলে কিয়াসের মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করা। ইসলামী আইনে ইলমুল উসূলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধরিতে গেলে রসূলুল্লাহর জীবনকালেই আইন প্রণয়নের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর ইজমার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল, কিন্তু ইজমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন তাহার অভাবে ইজমার মাধ্যমে আইনের বিবর্তন খুব শ্লথ গতি এবং অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইজমার অভাবে, আইনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে পথ খোলা রহিয়াছে তাহা হইতেছে তফসীর, নজীর এবং কিয়াস। এমতাবস্থায় ইসলামী আইনের বিবর্তনের জন্য এবং ফেকাহ অথবা আইনের জ্ঞানের জন্য উসূল অত্যাবশ্যকীয়। সুন্নাতুল জামাতের ইমাম চতুষ্টয় আইনতত্ত্বের সূত্রাবলী সম্পর্কে ঐকমত্য, শুধু খুটিনাটি বিষয়ে তাঁহাদের মতপার্থক্য দেখা যায়।

চতুর্থ যুগ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মযহাব প্রতিষ্ঠাতাগণের অবদানের প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। অতঃপর মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনতত্ত্বে কেহই আর বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদের সার্থক স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর যে সকল আইনতত্ত্ববিদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা ইমামগণের

www.pathagar.com

আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হন এবং এই কাজে তাঁহারা যেমন আইনের সূত্রের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করেন তেমনি বিশেষ বিশেষ আইনের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন। অনেক বাস্তব প্রশ্ন ইমামদের যামানায় একেবারেই উত্থিত হয় নাই, তাহারা সেইগুলি লইয়া আলোচনা করেন। ইমামগণ যে সূত্র লইয়া বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, এই আইনতত্ত্ব-বিদগণ সেইগুলি সংরক্ষণ ও শ্রেণীবিন্যাস করেন। হিজরীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাজী খানের মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিতে থাকে।

অতঃপর যে সকল আইনতত্ত্ববিদ এই ক্ষেত্রে কাজ করেন তাঁহাদের কর্ম পরিধি অধিকতর সংকীর্ণ। কোন বিশেষ প্রশ্নে ইমামগণ বা তাঁহাদের শিষ্যবর্গ যে বিভিন্ন অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিয়া কোন অভিমত শুধু তৎসম্পর্কে আলোচনা করা এবং কোন অভিমত গ্রহণ-যোগ্য তাহার বিধান দেওয়াই ছিল তাঁহাদের কাজ। যে সমস্ত আইন-তত্ত্ববিদের কথা বলা হইতেছে, হানাফী মযহাবপন্থী সদরুশ-শরীয়ত (মৃত্যু হিজরী ৭৫০, খৃঃ ১৩৪৯) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রসংগে একটি অমূলক ধারাণার উল্লেখ করিতে হয়। অধুনা কিছু কিছু মুসলিমের মনে এই ধারণা দানা বাঁধিয়াছে যে মহান ইমামগণ এবং তাঁহাদের যোগ্য শিষ্যবর্গ যাবতীয় ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সমস্যা এবং প্রশ্ন সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করিয়া প্রকৃত এবং কল্যাণকর সমাধান দিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্য বর্তমান যামানায় যে কোন প্রশ্ন যে কোন ভাবেই আসুক না কেন তাহার সমাধান মহান ইমামগণের এবং তাঁহাদের যোগ্য শিষ্যবর্গের কিতাবের মধ্যে অবশ্য পাওয়া যাইবে। এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে। বরং পরবর্তী কালে যে সমস্ত সমাধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের আলোকে সমস্যা নিষ্পত্তি করা সহজ।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম বিশ্বে বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের অভ্যুদয় ঘটে। যদিও মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করাই তাঁহারা তাঁহাদের কাজ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তবুও এই বিনীত শিরোনামের অন্তরালে তাহারা আইনতত্ত্বে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছন তাহা গুরুত্বে এবং বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তাঁহারা মূল পাঠের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাহা সংযোজন করিয়াছেন তাহা মূল্যবান এবং সৃষ্টির দিক হইতে ইংরাজ বিচারকদের রায়ের সমতুল্য। বস্তুত তাঁহাদের বিশ্লেষণের মধ্যেই ইমামগণের মতবাদের পূর্ণ রূপ দেখিতে পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। ইবনে হাম্মান, ইবনে নাজিম এবং ইবনে আবেদিন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হানাফী আইনকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হানাফী আইনের কোন প্রশ্নের সমাধান করিতে অদ্যকার দিনেও তাহাদের গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। হিজরী একাদশ শতাব্দীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশ অনুসারে যে বিখ্যাত আইনগ্রন্থ সংকলিত হয় সেই ফতোয়াই আলমগীরী আইন সাহিত্যে এক অমূল্য অবদান। এই কিতাব সংকলনকারীদের জ্ঞান, শ্রম এবং গবেষণা ক্ষমতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

উসূল লেখক

উসূল সম্পর্কে ইমাম শাফিঈকে প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা বলা যায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে উসূল সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন গবেষণা আরম্ভ হয় নাই। উসূলের উপর যাঁহারা অবদান রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হানাফী আইনে আবুবকর জাসসাসূর রাজী (Abu Bakr Jassasu'r Razi মৃত্যু হিজরী ৩৭০), ফখরুল ইসলাম বাজদাবী (Fakhru'l Islam Bazdawi, মৃত্যু হিজরী ৪৮২), আস-সারাখসি As.sarakhsi, মৃত্যু হিজরী ৪৮৩), আলকুর্দরী (Al-kurdri, মৃত্যু হিজরী ৫৬২), হিসামুদ্দীন (Hisamu'd din, মৃত্যু হিজরী ৭৯০), সাদরুস শরীয়ত (Sadru'sh shari'at, মৃত্যু ৭৪৭), সাদউদ্দিন তাফতাজানি (Sa'dud-din Taftazani) ইবনে হাম্মাম (Ibn Hammam, মৃত্যু হিজরী ৮৬১), মুহিবুল্লাহ (Muhi bbu'lah. মৃত্যু হিজরী ১১৯) এবং বাহরুল-উলুম (Bahrul-Ulum. প্রসিদ্ধ। শাফিঈ আইনে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (Abu Bakr Ibn Abdu'llah, মৃত্যু হিজরী ৩৩০) আল-নাওয়াই (An Nawa'i, মৃত্যু হিজরী ৬৭৬), তাজউদ্দিন সবকী Tagu'd-dinn's-Subki মৃত্যু হিজরী ৭৭১ , আল-মাহাল্লী Mahalli মৃত্যু হিজরী ৮৬৪) এবং আহমদ ইবনে কাসিম (Ahmad Ibn Qasim) প্রসিদ্ধ। মালিকী আইনে ইবনে হাজিব (Ibn Hajib,; মৃত্যু হিজরী ৬৪৬) এবং কাজী উদুদ (Qazi Udud, মৃত্যু হিজরী ৭৫৬) প্রসিদ্ধ। হামবলী আইনে কাজী আলাউদ্দিন এবং আবু বকর ইবনে জাইদিনিল খারজি (Abu Bakr Ibn Zaidini'l-Khargi মৃত্যু হিজরী ৮৩৬) প্রসিদ্ধ। ফখরুল ইসলাম বাজদাবী রচিত আল উসূল, হাশিয়া সহ সদরুশ শরীয়ত রচিত তৌদি, তাফতাজানি রচিত তালবিহ হানাফী আইনের

www.pathagar.com

প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাজউদ্দিন সবকী রচিত জামউল জাওয়ামি, আল মাহাল্লী রচিত উহার তফসীর এবং আল আয়াতুল বায়্যিনাত নামক আমহদ ইবনে কাসিম কর্তৃক উহার ভাষ্য শাফিঈ মযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইবনে হাজিবের মুখতাসার এবং কাজি উদুদ কর্তৃক উহার তফসীর মালিকী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। হামবলী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ দুর্লভ। তাফতাজানি যদিও শাফিঈ সম্প্রদায়ের আইনতত্ত্ববিদ তবুও তৎকর্তৃক রচিত তৌদির ভাষ্য হানাফিগণ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে যে সব কিতাব সর্বদাই ব্যবহৃত হইত তন্মধ্যে ফতহুল কাদিরের রচয়িতা ইবনে হাম্মামের তকরীর ওয়া তাহাবীর এবং তফসীরি আহমদীর প্রণেতার রচিত আল মানারের ভাষ্য নূরুল আনোয়ার এবং বাহারুল উলুমের মসাল্লামুস-সাবুত এবং তাহার ভাষ্য সর্বপ্রধান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বৃটিশ ভারতের ইসলামী আইন

ভারতে বৃটিশ শাসনের শুরু হইতেই এদেশে ইসলামী আইনের এক নূতন পর্যায় শুরু হয়। অতঃপর ইসলামী আইন তাহার নিজস্ব অধিকারে এদেশে আর বজায় থাকিল না। কিন্তু তাই বলিয়া ইসলামী আইন ভারতের বুক হইতে একেবারে মুছিয়া গেল না। বৃটিশ শক্তি যে সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে বজায় রাখিলেন, আদালতে সেইসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রচলন রহিল।

বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগে জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধীরে ধীরে দণ্ডবিধিতে, রাজস্ব আইনে, ভূমি আইনে, কার্যবিধিতে এবং সাক্ষ্য আইনে নূতন যুগ আসিল, ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইঙ্গ-ভারতীয় আইন প্রবর্তিত হইল। তাহার পর আস্তে আস্তে সম্পত্তি হস্তান্তরের ইসলামী আইনও পরিত্যক্ত হইয়া সেই স্থলে সংসদীয় আইন প্রবর্তিত হইল। পারিবারিক সম্পর্ক এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে, বিবাহে, তালাকে, খোরপোষে, অভিভাবকত্বে, উত্তরাধিকারে, হিবায়, উইলে এবং ওয়াকফে ইসলামী আইন বজায় রহিল। এইসব ক্ষেত্রে মুসলিমগণ ইসলামী আইন দ্বারা আজও শাসিত হইতেছেন। অগ্রক্রয়ের ব্যাপারে এদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে ইসলামী আইন আজও প্রচলিত আছে। মুসলিমগণ তাহাদের নিজস্ব সম্প্রদায় বা মযহাবের আইন দ্বারা শাসিত হন।

www.pathagar.com

আইন কর্মকর্তা

ইসলামী আইন এবং হিন্দু আইন সম্পর্কে আদালতকে উপদেশ এবং পরামর্শ দিবার জন্য বৃটিশ আমলের প্রাথমিক যুগে মুসলিম মুফতী এবং মৌলবী ও হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন। আইনের প্রশ্ন উঠিলে আদালত তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া বিচার করিতেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এই বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও পরামর্শ অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছীয় তখন এই প্রথা রহিত করা হইল। বিচারপতি লুই জ্যাকসন বলেন, "এদেশের মানুষের অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে তাহা বিচার করিবার দায়িত্ব আইনবিদদের অধিকারে আসিয়াছে। ইহাতে দেশবাসীর অনেক উপকার হইয়াছে। পণ্ডিতদের হাতে পড়িলে তাহাদের তর্কের ধুম্রজালে আটকা পড়ার সম্ভাবনা ছিল, তৎস্থলে পূর্ব নযীরের আলোকে বিচার হওয়া খুবই সম্ভব (৫ কলিকাতা ২২৮)।" বিচারপতি ট্রেভেল্যান (Tryvelyan) ওয়াক্‌ফ আইনের একটি প্রশ্ন বিচার প্রসংগে বলেন, "মুফতীদের উপদেশ লইয়া বিচার করিবার প্রথা যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা যে পরামর্শ দিতেন তদ্দ্বারা বিচার্য বিষয়ের আইন পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইত (২০ কলিকাতা ১১৬)।"

ইসলামী আইন নির্ধারণের পন্থা

মুফতী এবং পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণের প্রথা রহিত হইবার পর একটি অবস্থা ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া ওঠে। প্রথমত, তর্কিত বিষয়ে ইসলামী আইনের বিধান নির্ধারণ করিতে বড়ই বেগ পাইতে হয়। বিচারপতি মার্কবি বলেন, "ইসলামী আইন আবিষ্কার করিবার উপায় এতই সীমিত যে, আমি সুযোগ পাইলে ইসলামী আইনের প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করি" (১২ ডব্লিউ আর ৩৪৪)। এই অবস্থার পর অনেক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সৈয়দ আমীর আলীর বিখ্যাত গ্রন্থ ইসলামী আইন এবং স্যার রোনাল্ড উইলসনের ইঙ্গ-ইসলামী বিধি প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তবুও আশংকা হয় যে, বিচারকবৃন্দ এবং ব্যবহারজীবিগণ ইসলামী আইনের প্রশ্নে খুব সহজ হইতে পারেন না। যে সব প্রশ্নের উত্তর আদালতের নযীরে পাওয়া যায় না সেই সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাহারা নিদারুণ অনিশ্চিতিতে ভোগেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইসলামী আইন বড়ই কৃত্রিম এবং জটিল ও অনিশ্চিত। এই প্রশ্ন বিবেচনার দাবী

www.pathagar.com

রাখে। বর্তমানে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় এবং নযীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনিশ্চিতি হ্রাস পাইয়াছে।

জটিলতা প্রভৃতির অভিযোগ

ইসলামী আইন সম্পর্কে তিনটি অভিযোগ করা হয়। প্রথম অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইহা বড়ই জটিল। যাঁহারা এই অভিযোগ করেন তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু ইসলামী আইন ইসলাম ধর্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেই হেতু দুনিয়ার কাজ-কারবার সম্পর্কীয় ইসলামী আইন বাছাই করিয়া বাহির করা বড়ই ঝঞ্ঝাটের কাজ। দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইসলামী আইন অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই অভিযোগের সমর্থনে বলা হয় মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে খুব বেশী মতভেদ দেখা যায় এবং এই মতভেদের কারণে আইনের প্রশ্নে সঠিক সমাধান দুরূহ হইয়া পড়ে। তৃতীয় অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইসলামী আইন কৃত্রিম। এই অভিযোগের প্রবক্তাগণ বলেন যে, ইসলামী আইনে যে সমস্ত বিধি বর্তমান এবং এইসব বিধির সমর্থনে যেসব যুক্তি প্রদত্ত হয় তাহা একেবারেই বাস্তববর্জিত।

জটিলতার অভিযোগ সম্পর্কে বলা যায় যে, ইসলামী আইনে দ্বীনের সহিত দুনিয়ার কোন ভেদ নাই, তবে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে বহু খণ্ডে এবং বহু দৃষ্টিকোণ হইতে ভাগ করিয়া দেখা সম্ভব এবং আইনতত্ত্বের কাজই হইতেছে আইনের শ্রেণীবিন্যাস। এই শ্রেণীবিন্যাস এবং বিশ্লেষণের ফলে ধর্মীয় দায়িত্ব এবং আইনের ধারণাকে পৃথক করা সম্ভব। আইনকেও আবার নানা অংশে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। অতঃপর আর জটিলতা থাকিবার অবকাশ থাকে না। অনিশ্চয়তার অভিযোগের জবাবে বলা যায় যেসব ক্ষেত্রে আল কুরআন এবং আল-হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান সেসব ক্ষেত্রে কোনই অনিশ্চয়তা নাই। যেখানে ইজমা পাওয়া যায় সেখানেও অনিশ্চয়তা থাকিবার কথা নয়। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়াসের পরিধির মধ্যে অনিশ্চয়তার অবকাশ যথেষ্ট এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইসলামী আইনে কিয়াসের পরিধি সুবিস্তীর্ণ। তবে অনিশ্চয়তা একেবারে অবিমিশ্র অভিশাপ নয়। যে সমস্ত প্রশ্নের একাধিক সমাধান আইনগ্রাহ্য, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, বিশেষ আইন দ্বারা বাধ্য না হইয়া সুবিবেচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির সহিত সমঞ্জস সমাধান দেওয়া সম্ভব। এই স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে উপকারী হইতে পারে। আদালত বিশেষ বিশেষ অবস্থা

www.pathagar.com

বিবেচনা করিতে পারেন এবং বিবেচনা করিয়া তাহাতে সকলের কল্যাণ হয় এমন ফয়সালা দিতে পারেন। আইন দ্বারা বিচারকের হাত বাঁধিয়া না দিয়া তাহা উন্মুক্ত রাখা সব সময় ক্ষতিকর নয়। অনিশ্চয়তার কারণ হইতেছে মতভেদ আর এই মতভেদকে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ স্বাগত জানাইয়াছেন। তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সেই মহান বাণী স্মরণ করেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে, উম্মতের মধ্যে মতভেদ থাকা আল্লাহ্‌র রহমতের চিহ্ন। কৃত্রিমতার অভিযোগ সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে ইসলামী আইনের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, দুইভাবে আইনের সূত্র পাওয়া যায়। প্রথমত, আল কুরআনে এবং সহি আল-হাদীসে ইহা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, আল কুরআনে বা আল-হাদীসে না পাওয়া গেলে উহাতে বর্ণিত কোন সূত্রকে আদর্শ ধরিয়া কিয়াসের মাধ্যমে বিধি নির্ধারণ করিতে পারা যায়। আইনতত্ত্ববিদদগণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, মূল বিধি হইতে কিয়াসের মাধ্যমে গৃহীত বিধির অবরোহণ যুক্তিবহ হইতে হইবে। বহু প্রশ্নে প্রকাশ্য বিধি না পাইয়া আইনতত্ত্ববিদগণ বিষয়ের সমাধানের জন্য বার বার বিষয়ান্তরে গিয়াছেন এবং তাহার পর যুক্তির আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। নাবালকের অভিভাবকের প্রশ্ন নিরসন করিতে গিয়া তাঁহারা অজুর সূত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন, এইভাবে কিছু কৃত্রিমতা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা ইসলামী আইনের মূল আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং সমাজের পক্ষে উপকারী। এই প্রসংগে স্মরণ রাখা উচিত যে, অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ বিচার কার্যের সহিত প্রত্যক্ষভাব জড়িত ছিলেন না এবং সেই কারণে তাহাদের প্রদত্ত সূত্র কৃত্রিমতার অভিযোগ হইতে পূর্ণভাবে রেহাই পাইবার যোগ্য নয়।

ইসলামী আইনতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। আধুনিক আইনে যে সমস্ত প্রশ্নের বিচারের ভার বিচারকের ব্যক্তিগত সুবিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ইসলামী আইনে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বিধির মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে বিচারকদের সুবিবেচনার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ক্ষতিপূরণের কথা বলা যায়। কোন অবস্থায় কে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইবে তাহা আইনে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরিমাণ কমাইবার বা বাড়াইবার অধিকার বিচারককে দেওয়া হয় নাই। ইংরেজ আইনে যে অনুমান পরিবর্তনশীল, ইসলামী আইনে তাহা নয়।

www.pathagar.com

একইভাবে চুক্তি বা সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছে। এই বাধা নিষেধ আরোপ করার কারণ হইতেছে তৎকালীন রিবার প্রচলন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আইনের সূত্র নির্ধারণকালে আইনের ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। বিচারের ক্ষেত্রে তখনও অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি প্রথা কেবল লুপ্ত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হইতে শুরু করিতেছে।

ইসলামী আইন বুঝিতে হইলে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়। আধুনিক চিন্তা এবং ধারণার আলোকে সব আইন বিচার করা ঠিক হইবে না। আর একটি কথা, সমগ্র জীবন দর্শনের সহিত মিলাইয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে ইসলামী আইনের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটিত হয়; বলাবাহুল্য সেই সুযোগ বা অবকাশ সকলের নাই।

অনুবাদের অসুবিধা

ইসলামী আইন-বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের আইন সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী স্বাভাবিকভাবে আরবী ভাষায় রচনা করিয়াছেন। আরবী ভাষায় লিখিত এই সব মূল আইন গ্রন্থগুলি যাহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইসলামী আইন বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আরব আইনতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, অনুবাদের সময় অনুবাদক অনুবাদের ভাষায় সেই ভাবব্যঞ্জক শব্দ সব সময় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। হেদায়ার মত গ্রন্থ অনুবাদের সময় এই অভাববোধ অনুবাদককে নিরন্তর পীড়া দেয়। এই গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখিত। ইহা পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে লেখক ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তকের পাঠক শুধু আইনতত্ত্ব, আল কুরআন এবং আল-হাদীস সম্পর্কে সুপরিচিত নন, তিনি তাহাদের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন এবং আইনের ভাষায়ও তিনি জ্ঞান রাখেন।

ইসলামী আইন প্রয়োগের সূত্র

যে সমস্ত আইনজীবী এবং বিচারক আধুনিক পাশ্চাত্য আইনে সুপণ্ডিত, তাঁহারা আরব আইনতত্ত্ববিদগণের অভিমত আক্ষরিকভাবে সর্বদা অনুসরণ করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন আইনবিদদের কিছু কিছু অভিমত এতই সংকীর্ণ এবং বর্তমান জীবন-ব্যবস্থায় অপ্রয়োগযোগ্য যে

www.pathagar.com

সেগুলি অনুসরণ করিলে সুবিচার ব্যাহত হইবে এবং উন্নতির প্রতিকূলতা করা হইবে। অবিভক্ত যৌথ সম্পত্তি, যাহা ইসলামী আইনে মুশা নামে পরিচিত, তাহার দান প্রসংগে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া প্রধান বিচারপতি গার্থ বলেন, 'অদ্য আমরা যে যুগ, যে সমাজ এবং যে আইন ব্যবস্থার অধীনে এই দেশে বাস করিতেছি সেই দেশ, সমাজ-ব্যবস্থা এবং আইন ইসলামী প্রবর্তনকালের দেশ, সমাজ ও আইন হইতে বহুদূরে। ইসলামী আইন বহু শতাব্দী পূর্বে বাগদাদে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবুও মামলায় মুসলিমগণ পক্ষ হইলে আমরা সর্বদাই ইসলামী আইন অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুঃখ এই যে, ইসলামী আইন আবিষ্কার করা প্রায়শঃই কঠিন হইয়া পড়ে। তদুপরি হানাফী আইনের ক্ষেত্রে ইমামে আবু হানিফা এবং তাহার দুই শিষ্যের মত-পার্থক্য নিরশন করিয়া আইনের সূত্রের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত ইসলামী আইনের সূত্রের সন্ধান করা এবং তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং সেই নির্ধারিত আইন এই দেশের সামাজিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া সুনীতি ও সুবিবেকের সহিত প্রয়োগ করা (১০ কলিকাতা ১১২৩)।" বিচারপতি গার্থের এই অভিমত ইসলামী আইনের মূল ধারণার সহিত সুসমঞ্জস। বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদগণের প্রশ্নে এই ধারণার সমর্থন আছে। প্রয়োজন এবং সামাজিক জীবনের দাবী, এই দুই অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্মুখে রাখিয়া বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য আইন প্রয়োগ করা উচিত, ইহাই ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের ঘোষণা। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল কুরআনের বা প্রামাণ্য হাদীসের বা প্রতিষ্ঠিত ইজমার মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত নির্দেশ অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি মনে রাখিয়া এদেশের আদালতসমূহ বিচারকালে আইন প্রয়োগের সময় এদেশের মানুষের জীবনের এবং তাহাদের রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতির বিষয়ে বিবেচনার অধিকারে আনিতে পারেন। আমাদের দেশে আদালতসমূহ রাষ্ট্রীয় আদেশে সংসদীয় আইনের অধীনে ক্ষমতা লাভ করিয়া ইসলামী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং তাহারা কাজী এবং মুফতিগণের সমকক্ষ নন। কাজী এবং মুফতিগণের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আধুনিক বিচারকগণের সেই যোগ্যতা আবশ্যক নহে। ইসলামী আইন নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে কাজী ও মুফতিগণ যে সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন আমাদের দেশের

www.pathagar.com

আধুনিক কালের বিচারকগণ সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তবে ইসলামী আইনের প্রশ্ন বিচার্য হইলে আমাদের দেশের আধুনিক বিচারকগণ ইসলামী আইনের উৎস এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যকারদের অভিমত বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। এদেশের মুসলিমগণ যে ব্যাখ্যাকে মানিয়া লয়, বিচারকগণ সেই ব্যাখ্যাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।

ইসলামী পারিবারিক আইন প্রয়োগ

উপরে যে নীতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, এদেশে সেই নীতি বরাবরই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইহার খেলাপও দেখা গিয়াছে। এদেশের উচ্চ আদালতসমূহের সিদ্ধান্তগুলিতে (নযীর) দেখা যায় যে, পারিবারিক সম্পর্কে এবং উত্তরাধিকারের আইন প্রয়োগের বেলায় আদালতসমূহ খুব বেশী স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাহারা বর্তমান যুগের সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করিয়া মধ্যযুগের লেখকগণ যে সমস্ত সূত্রের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়াছেন। হিবা, ওয়াকফ বা উইলের ক্ষেত্রে বিচারকদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বজলুর রহিম বনাম শামসুন্ নাহার বেগম-এর মামলায় মুসলিম স্বামী তার বিবাহিত মুসলিম স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য স্বত্ব উদ্ধারের মামলা করেন। সেই মামলায় একপক্ষ বলেন যে, এই প্রশ্ন বিচার কালে ইসলামী আইনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই উচিত। এই কেসের বিচার প্রসংগে প্রিভি-কাউন্সিল বলেন, "ইসলামী আইন মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হইবে, এই অধিকার স্বীকৃত। ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্নে তাই এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না যাহা ইসলামী আইনের পরিপন্থী। ইসলামী আইনের পরিপন্থী কোন আদেশ দিলে সমগ্র মুসলিম সমাজ শংকিত হইবে। ইসলামী আইন যদি দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইত কিংবা ইসলামী আইন অগ্রসর এবং সভ্য সমাজের কোন দাবীকে নস্যাৎ করিত, তাহা হইলে অন্য কথা হইত (১১ মুরস ইণ্ডিয়ান আপীল ৫৫১)। আগা মোহাম্মদ বনাম কুলসুম বিবির কেসে মুসলিম বিধবার খোরপোষের প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আল কুরআনের একটি আয়াতের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেখানো হইয়াছিল যে, স্বামীর সম্পত্তিতে মিরাস পাইবার পরও বিধবা খোরপোষ পাইবার অধিকারী। এই প্রসংগে প্রিভি

www.pathagar.com

কাউন্সিল বলেন, আল কুরআনের সূরা বাকারার ২৪১ ও ২৪২ নং আয়াতের যে ব্যাখ্যা, তাহার সহিত হেদায়া এবং ইমামিয়া প্রদত্ত আইন কি করিয়া খাপ খায় তাহা গবেষণা করা অনাবশ্যক। প্রাচীনকালের জনমান্য ভাষ্যকারগণ এই সমস্ত প্রশ্নে যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আদালতবৃন্দ মানিয়া লইবেন (২৫ কলিকাতা ৯)। প্রাচীন মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধা যে কতদূর যাইতে পারে তাহা একটি তালাকের কেসের উদাহরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই কেসে যদিও স্বামীকে জোর করিয়া তালাক দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল তথাপি ঐ তালাক সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বিচারপতি জ্যাকসন বলেন, "ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ ইসলামী আইন সম্পর্কে যে বিধান দিয়াছেন আধুনিকতার অজুহাতে আমরা সেই বিধানকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না।" তবে বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। ১৯৫৯ সালে বিলকিস ফাতেমার কেসে আদালত স্ত্রীকে খুলা তালাকের অধিকার প্রদান করেন। ইহার দ্বারা তিনি (স্ত্রী) বিবাহ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ১৯৬৭ সালে খুরশীদ বিবির কেসে সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ক্রমশই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রতীয়মান হইতেছে। দখলার্পণ ব্যতীত হিবা সম্পূর্ণ হয় কিনা সেই প্রশ্নে প্রিভি কাউন্সিল বলেন, "সম্পত্তির মালিক ইসলামী আইনে নির্দেশিত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে। সে তাহার জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তি তাহার এক পুত্রকে দিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা করিতে হইলে তাহার পক্ষে কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিতে হইবে। এই আনুষ্ঠানিকতাগুলি যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা ভালভাবে বিবেচনা করিতে হইবে (২ কলিকাতা ১৮৪)।" পরবর্তী একটি কেসে প্রিভি কাউন্সিল বলেন, "অবিভক্ত যৌথ সম্পত্তি দান সম্পর্কে ইসলামী আইনে যে বিধান দেখা যায় তাহা উন্নয়নশীল সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় (১১ এলাহাবাদ ৪৬০)"। পরবর্তী অন্য একটি কেসে প্রিভি-কাউন্সিল বলেন, "কোম্পানীর শেয়ার দানের ক্ষেত্রে মুশার আইন প্রয়োগ করা চলে না (৩৫ কলিকাতা ১)।" পরবর্তী কেসে প্রিভি কাউন্সিল বলেন, "যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বিধান সুবিচারের অনুকূল নয় সেই সব ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

প্রাচীন বিধান প্রতি বা হাদীসের প্রতি আস্থা স্হাপন করা বা সেই সমস্ত বিধান বা হাদীসকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভিত্তিতে নূতন বিধি নির্মাণ করা বিপজ্জনক। কোন বিধানকে আবিষ্কার করিয়া তাহা মানিয়া লওয়া কিংবা প্রাচীন বিধানের উপর নূতন অনুমান গ্রহণ করা কম বিপজ্জনক নয়। আধুনিক কালে আইনের যে ব্যাখ্যা বিচারকবৃন্দের নিকট মূলের সহিত অনুকূল মনে হয়, সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করাও বিপজ্জনক। পাচীন আইনতত্ত্ববিদগণ যে ব্যাখ্যা করেন নাই, সেই ব্যাখ্যাই যে উচিৎ এমন ধারণা করাও বিপজ্জনক (২৫ এলাহাবাদ ২৩৬)।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনতত্ত্ব, আইন এবং আইনের শ্রেণীবিন্যাস

উসূলুল-ফিক্‌হের সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থে উসূলুল ফিকহ হইতেছে ফিকহের মূল সূত্র। যে জ্ঞান বা বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে ফিক্‌হ-তত্ত্ব আলোচনা করে তাহাকে উসূলুল ফিক্‌হ বলে। সুতরাং আইন বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উৎস এবং ঐ উৎসসমূহের এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা করাই উসূলুল-ফিক্‌হের কাজ। উসূলুল-ফিক্‌হের এই আলোচনার মধ্যে চারিটি প্রধান বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত, যথা: ১। আইনদাতা (হাকিম حاكم), ২। আইন (হুকুম حكم), ৩। আইনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কর্ম, অধিকার এবং দায়িত্ব (মাহ্‌কুম বিহী محكوم به) এবং ৪। যাহাদের জন্য আইন তাহারা অর্থাৎ ব্যক্তিগণ (মাহকুম আলাইহি محكوم عليه)।

ফিক্‌হের সংজ্ঞা

ফিক্‌হের শাব্দিক অর্থ জানা বা জ্ঞান। ইমাম আবু হানিফার মতে, যাহা মানুষের অনুকূলে (লাহু له) এবং যাহা মানুষের প্রতিকূলে (আলাইহি عليه), তৎসম্পর্কে জানা বা তাহাদের জ্ঞানই হইতেছে ফিক্‌হ। সদরুশ্‌ শরীয়ত এই সংজ্ঞার ভাষ্য দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ফিক্‌হ মানুষের আমল লইয়া আলোচনা করে এবং এই আলোচনার মাধ্যমে কোন্‌ আমল তাহার পক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে উপকারী এবং কোন আমল আধ্যাত্মিকভাবে তাহার পক্ষে অপকারী, তাহা বলিয়া দেয়। অন্য কথায় ফিক্‌হের বিষয় হইতেছে আধ্যাত্মিক পুরস্কার এবং শাস্তির জ্ঞান। আল্লাহ্‌ তা'লা আল কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন যে কেয়ামতের দিন মানুষ ভালোমন্দ যাহা করিয়াছে তাহার ফল পাইবে। এই আয়াত শরীফের উপর ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত ফিকহের সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। সদরুশ্‌ শরীয়ত বলেন যে, ইমাম আবু হানিফার এই সংজ্ঞা ত্রুটিহীন নহে। কারণ এমন অনেক কাজ আছে যাহা আধ্যাত্মিকতার সহিত যুক্ত নহে, সেই সমস্ত কাজ

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। ক্রয় বিক্রয় ইজারা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতার সহিত যুক্ত নহে। তবে উপকারী বলিতে যদি যাহা শাস্তির কারণ নহে তাহা বুঝায় এবং ক্ষতিকর বলিতে যদি যাহা শাস্তির কারণ তাহা বুঝায় তবে ইমাম সাহেবের সংজ্ঞাকে ত্রুটিহীন বলা যায়। উপকারী বলিতে যদি যাহা আধ্যাত্মিক পুরস্কারের কারণ তাহা বুঝায় এবং ক্ষতিকর বলিতে যদি যাহা আধ্যাত্মিক পুরস্কারের কারণ নহে তাহা বুঝায় তাহা হইলেও ইমাম সাহেবের সংজ্ঞাকে ত্রুটিহীন বলা যায়। সদরুশ শরীয়ত আরো বলেন যে, যে জ্ঞান মানুষ কি করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত এবং কি করিতে সে বাধ্য তাহা শিক্ষা দেয় তাহাকে ফিক্‌হ বলে। কিন্তু এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে ফরয ও হারামের জ্ঞান ফিক্‌হের মধ্যে আসে না। সদরুশ শরীয়ত বলেন, ইমাম আবু হানিফার সংজ্ঞার আরেকটি অর্থ সম্ভব। মানুষ যাহা করে তাহাকে তাহার আমল বলে। যাহা সে করে না (Ommission) তাহাকেও আমল বলা যায়। এই অর্থে মানুষের পক্ষে যাহা হালাল ও হারাম, ফিক্‌হ তৎসম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এই অর্থে মানুষের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করাই ফিকহের কাজ। অন্য কথায় মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের বিজ্ঞানই হইতেছে ফিক্‌হ।

সদরুশ শরীয়তের আলোচনা, ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক প্রদত্ত ফিক্‌হের সংজ্ঞা, মানুষের আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত সংজ্ঞার মূল ভাষ্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ফিক্‌হের এলাকায় শুধু আমলকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, উহা ঈমানের দিকেও প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি ফিক্‌হকে শুধু ফিকহ না বলিয়া ফিকাহল আকবর বলিতেন এবং ফিকহের এখতিয়ারের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র ফেলিতেন। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক যুগে, পারলৌকিক বিষয়াবলী এবং ইহলোকে মানুষের আত্মার উন্নতি পথের বিপদ এবং পরীক্ষাসমূহের আলোচনা, ফিকহের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে, দার্শনিক গাযযালী যথার্থই বলিয়াছেন, ফিকহ বলিতে আইনের বিধির বিজ্ঞান বুঝায়।

তৌদীহ (Taudih)-এর গ্রন্থকার ফিকহের সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে সমস্ত আইন (আহকাম) শরীয়ত প্রবর্তন করিয়াছে এবং যাহা সকলের পক্ষে প্রতিপাল্য করা হইয়াছে এবং যাহা ওহী এবং ইজমার মাধ্যমে স্থিরীকৃত

www.pathagar.com

হইয়াছে সেই আইনের জ্ঞানকে ফিকহ্ বলে। কিয়াসের জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত। শাফিঈ মতবাদের আইনতত্ত্ববিদগণের মতে বিশিষ্ট উৎস হইতে প্রাপ্ত মানুষের আমল সম্পর্কিত শরীয়তের আইনের জ্ঞানকে ফিকহ্ বলে। মালিকী আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, যুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত শরীয়তের বিধানকে ফিকহ্ বলে।

শাফিঈ মতবাদের আইনতত্ত্ববিদগণের সংজ্ঞায় সাধারণ বৈজ্ঞানিক আইনসমূহকে ফিকহের এলাকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শরীয়ত বলিতে সেই আইন বুঝায় যাহা মানুষের পক্ষে আল্লাহর ওহী ছাড়া জানিবার সাধ্য ছিল না। তাহাদের ধারণায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ লাভ করা যায় তাহা শরীয়তের আইনের বিষয়বস্তু নহে।

আইনের সংজ্ঞা

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের ধারণায় মানুষের আমল সম্পর্কে আদেশমূলক, নিষেধমূলক এবং ঘোষণামূলক যে বিধানসমূহ আল্লাহতালা ওহীর মাধ্যমে এরশাদ করিয়াছেন তাহাই আইন। সুতরাং ইসলামী আইনতত্ত্বের মূল বুনিয়াদ হইতেছে ওহী। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেমন জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমনি ওহীর মাধ্যমেও যায়। ইহার স্বীকৃতির নাম ঈমান (ايمان)। ঈমানকে বলা হয় বিশ্বাস। এখানে বিশ্বাস বলিতে আল্লাহতালার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস শুধু বুঝায় না, বুঝায় মানবিক প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতার তসদিক (تصديق) বা স্বীকৃতি।

যুক্তির উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত

আল্লাহতালার উপর বিশ্বাস মানুষের সহজাত বৃত্তি। তাহার বিবেক তাহার অন্তরের মধ্যে ইহাকে জাগ্রত রাখে, ইহাকে বলা যায় তানবিহুল কলব (تنبيه القلب)। ঈমানের ঘোষণাকে বলা হয় ইকরার (اقرار)। ইহা একটি দৈহিক কাজ। আল্লাহতালার কর্তৃত্বের স্বীকৃতিকে মানসিক কাজের (فعل القلب) পর্যায়ে ফেলা হয়। আল্লাহ্তালার অস্তিত্বের জ্ঞান ঈমানের বুনিয়াদ। এই জ্ঞান আবশ্যকীয় জ্ঞান, অর্থাৎ জরুরী (ضرورى) ইলম্। এই জ্ঞানকে সহজাত (বাদিহী—بدهى) বলা যায়। তবে মানুষের যুক্তিবোধ পরিপক্ক না হইলে সে এই জ্ঞান আয়ত্তে আনিতে পারে না। যুক্তির পরিপক্কতাই এই জ্ঞানের পূর্ব শর্ত। মানুষের মানসিক বৃত্তিসমূহ যখন যুক্তির আলোকে

www.pathagar.com

প্রদীপ্ত হয় তখন সে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্বের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে যে, বিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এবং মালিক আছেন। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ক, আল্লাহ্‌তালা সম্পর্কে তাহার জ্ঞান স্বচ্ছ। সুতরাং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হইলে, মানুষের মধ্যে যুক্তির উপর আস্থা আসিলে, আল্লাহতালার দিকে সে অপ্রতিরোধ্য এবং অপরিহার্যভাবে আকৃষ্ট হইবে। দেখা যাইতেছে এবং এইভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ঈমান যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ওহীভিত্তিক দ্বীনসমূহ মানুষের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করে নাই, সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং ইসলামী আইনতত্ত্বের ধারণায় আইনের বুনিয়াদ এবং ঔচিত্য মানুষের জ্ঞান ও যুক্তির (عقل) মধ্যে সূচিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, সে আল কুরআনের ভাষায় নিজের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করে। আর যে হতভাগ্য একাধিক দেবতায় আস্থাশীল এবং স্রষ্টার মধ্যে দুর্বলতা দেখিতে পায় সে ব্যক্তি তাহার রিপু এবং খেয়ালের দ্বারা বিভ্রান্ত। সে তাহার জ্ঞান এবং যুক্তির আহবান শুনিতে পায় নাই।

আল্লাহ্ এবং মানবের মধ্যে চুক্তি হইতেছে আইনের উৎস

আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার সহিত আল্লাহ্‌তালার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি তাহার কর্তৃত্বকেও স্বীকার করে। অন্য কথায় আল্লাহ-তালার অস্তিত্বের স্বীকৃতি যেমন আমাদের সহজাত, ঠিক তেমনি আমাদের উপর তাঁহার আদেশ করিবার অধিকারের স্বীকৃতিও সহজাত। আল্লাহতালা সকল জ্ঞানের আধার এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানবজাতির ব্যবহার এবং উপকারের জন্য এই নিখিল বিশ্ব এবং তাহার মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ-তালার আদেশ পালন না করা শুধু অকৃতজ্ঞতা নয়, নিদারুণ অজ্ঞতাও বটে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, কাফিরের শাব্দিক অর্থ হইতেছে অকৃতজ্ঞ। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, সৃষ্টিকালে আল্লাহ্‌তালা মানুষের সাথে একটি প্রাথমিক চুক্তি (মিসাক ঈ-আজালি میثاق ازلی) করিয়াছিলেন। সেই চুক্তিতে মানুষের আরওয়াহ্ আল্লাহ্‌তালার আনুগত্যের শপথ লইয়াছিল এবং আল্লাহতালা মানুষের ব্যবহার এবং ভোগের জন্য বিশ্ব সৃষ্টির ওয়াদা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তালার আইন এই চুক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

www.pathagar.com

অন্যান্য আইনবিদগণের ধারণায় এই চুক্তি একটি প্রতীক মাত্র। এই প্রতীকের মাধ্যমে বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষের আনুগত্য তাহার সৃষ্টির সমকালীন এবং মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির অধিকর্তা। যে ভাবেই গ্রহণ করা হউক না কেন এই কাহিনী ইসলামী আইনতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা পরিষ্কার করা যাইতেছে। ইসলামী আইনে বলা হইয়াছে যে, অধিকার এবং দায়িত্বের যোগ্যতা সকল মানুষের আছে; যে জন্মিয়াছে তাহার এবং যে জন্মে নাই তাহারও। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় যখন মানব শিশুর দেহ সঞ্চালন শুরু হয়, তখনই সে অধিকার এবং দায়িত্বের যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহই একমাত্র আইন দাতা

আইন জারি করিবার অধিকার আল্লাহতালার। আইন জারি করিবার শক্তি তাঁহার সার্বভৌম। আদিকাল হইতে তিনি রসূল এবং নবিগণের মাধ্যমে তাঁহার আইন জারি করিয়া আসিতেছেন। যাহারা সৃষ্ট জীব, তাহারা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সহিত আইনের পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া পড়ে। হযরত আদম এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বংশধরদের যামানায় ভ্রাতা ও ভগ্নির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। তৎকালে নারীর সংখ্যা অপচুর ছিল। তাই এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কালক্রমে যখন নারীর সংখ্যা বাড়িল তখন এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু যত পরিবর্তনই হউক না কেন, এক সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহতালার নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের নীতি কোনদিন নষ্ট হয় নাই। কিন্তু কোন কোন যুগে মানুষ আল্লাহতালার আইনের উপর নিজের বাহাদুরী ফলাইয়াছে, আবার কোন কোন যুগে মানুষ আল্লাহর আইন ভুলিয়া গিয়াছে। সেই কারণেও আল্লাহ্তালা নবীর পর নবী পাঠাইয়াছেন। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) আবির্ভাবের পূর্বে ঐশী আইন দুষিত হইয়া পড়িয়াছিল; এমন কি সকল আইনের প্রধানতম সূত্র এক আল্লাহর ইচ্ছায় সমর্পিত হওয়া, এই নীতি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে আল্লাহ্তালা, সকল আইনের সনাতন সূত্র আল্লাহতালার উপর পূর্ণ আনুগত্য — এই সত্যকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে উদ্ধার করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মিশনের সত্যতায় বিশ্বাস করা তাই মানুষের আদি বৃত্তির একটি উপাদান।

www.pathagar.com

কুরআন এবং হাদীস

যে কিতাবে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নিকটে প্রেরিত আল্লাহ্‌র ওহী লিপিবদ্ধ আছে তাহাকেই কুরআন বলে। আইন এবং ধর্মের বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত অনুপ্রাণিত আদেশকে হাদীস বলে।

ইজমা

মানুষের সুবিধার জন্যই আইনের প্রয়োজন। মানুষের সুবিধার জন্য প্রয়োজনমত, কুরআন এবং হাদীসের সহিত অসমঞ্জস নয় এমন আইন প্রবর্তন করার অধিকার আল্লাহতালা মুজতাহিদ বা আইনতত্ত্ববিদগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। এই ন্যস্ত ক্ষমতার অধিকার বলে যে আইন প্রদত্ত হয় সেই আইনকেও আল্লাহর আইন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আইনের এই উৎসকে ইজমা বা ঐকমত্য বলে। ইজমা একজনের অভিমত নহে, ইহা একাধিক আইনতত্ত্ববিদের সম্মিলিত ঐকমত্যভিত্তিক সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। ইজমার মাধ্যমে যে আইন ঘোষিত হয়, তাহা তর্কাতীতরূপে গ্রহণযোগ্য। ইহাদের বৈধতা লইয়া কোন তর্ক চলে না। কি যুক্তির বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাও বিবেচনার বস্তু নহে। ধরিয়া লওয়া হয় যে, এই সিদ্ধান্ত কুরআন এবং হাদীস মোতাবেক হইয়াছে। কুরআন ও হাদীসসম্মত নহে, এই অজুহাতে এই সিদ্ধান্তকে অবৈধ গণ্য করা যায় না। তবে পরবর্তী মুজতাহিদগণ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তকে রদ করিতে পারেন। সুতরাং ইহা স্পষ্ট, ইসলামী আইনতত্ত্ব সম্মিলিতভাবে মুজতাহিদের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পর আর কোন নবী আসিবেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওহীও আর আসিবে না। এখন একমাত্র ইজমার মাধ্যমেই ইসলামী পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন সম্ভব।

কিয়াস

ইজমা বলিতে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুজতাহিদগণের সম্মিলিত গবেষণালব্ধ মতৈক্যভিত্তিক অভিমতকে বুঝায়। যেসব অভিমত বা সিদ্ধান্ত বিশেষ বিশেষ আইনতত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত গবেষণার ফল, সেই সব সিদ্ধান্তকে কিয়াস বলা যায়। এই কিয়াসের উপরই ইসলামী আইনের অতি বৃহৎ অংশ প্রতিষ্ঠিত। সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যখন কোন বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদ

www.pathagar.com

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা অভিমত প্রদান করেন তখন তাঁহার সেই কাজকে আইন প্রণয়ন না বলিয়া আইন আবিষ্কার বলা যায়। বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদের এই সাদৃশ্যভিত্তিক অভিমতের বা কিয়াসের গ্রহণীয়তা বিচার করিতে হইলে উহার উৎসের দিকে তাকাইতে হয়। যে আইন ওহী বা ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিপূরকরূপে কিয়াসকে বা আইনতত্ত্ববিদের সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এই অভিমত বা সিদ্ধান্ত কোন নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করে না বরং প্রতিষ্ঠিত আইনকে একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানকল্পে বিস্তৃত করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ইজমাকে যেমন আল্লাহ্‌র আইন বলা যায়, কিয়াসকেও তেমনি আল্লাহ্‌র আইন বলা যায়। তবে যে আইনের বুনিয়াদ হইতেছে ইজমা, সেই আইনকে অবশ্য প্রতিপাল্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু কিয়াসের ক্ষেত্রে তেমন নহে। কিয়াসের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাদিষ্ট আইনের সহিত সমঞ্জস কিনা ইহা যাচাই করিয়া তবে ইহার প্রতিপাল্যতা নির্ধারণ করিতে হয়। অতএব কিয়াসভিত্তিক আইনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহার প্রামাণ্যতা অনুমানধর্মী (জান্নি ظنی)। বিচারক কিংবা আইনতত্ত্ববিদ যদি দেখেন যে, কিয়াসভিত্তিক সিদ্ধান্ত মূলের সহিত খাপ খায় না তবে তিনি তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিতে পারেন। যদি দেখা যায় যে কোন প্রত্যাদিষ্ট আইন বা ইজমার সহিত কিয়াসভিত্তিক আইনের সংঘর্ষ হইতেছে সেক্ষেত্রে কিয়াসভিত্তিক আইনকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্য আইনে উচ্চ আদালতসমূহের নযীরের মূল্য যেরূপ, ইসলামী আইনে কিয়াসের মূল্যও সেইরূপ।

প্রথা

আইনের বিধি নির্মাণে প্রথা ও রীতি-নীতির (عادات ’ عرف ’ تعامل) অবদান যথেষ্ট। যে সূত্রের উপর ইজমার আইন প্রতিষ্ঠিত সেই সূত্রের উপর প্রথার আইনও প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁহার জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি ওহী লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় আরব দেশে বহু প্রথা ও রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। সেই সমস্ত প্রথা ও রীতি-নীতির মধ্যে অনেকগুলি আল কুরআন বা আল হাদীস রদ করে নাই। অনেকগুলি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ নীরব ছিলেন। এইগুলিকে আইনের উৎস বলিয়া গণ্য করা হয়। যে প্রথা ও রীতি-নীতি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে বা স্বয়ং রদ করেন নাই সেই প্রথা বা রীতি-নীতি আইন বলিয়া মানিয়া লওয়া

www.pathagar.com

হইয়াছে। রসূলুল্লাহর (সঃ) ইন্তিকালের পরেও কিছু কিছু প্রথা ও রীতি-নীতির উদ্ভব হয়, সেইগুলিকেও আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়। 'যাহা জনগণের পক্ষে কল্যাণকর তাহা আল্লাহর চোখে ভালো', এই নীতি অনুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত প্রথাকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এই নীতির উপর ভরসা করিয়া বলা হয় যে, ঐগুলিও আল্লাহর আইন। তবে প্রত্যাদিষ্ট বা ইজমাভিত্তিক আইনের সহিত সমঞ্জস না হইলে প্রথাভিত্তিক আইন গ্রহণীয় হয় না। এই দিক দিয়া প্রথাভিত্তিক আইন কিয়াসভিত্তিক আইনের সমমর্যাদাসম্পন্ন। তবে প্রথা যুক্তিবহ কিনা উহা পরীক্ষা করা অনাবশ্যক। এই দিক দিয়া ইহা ইজমাভিত্তিক আইনের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। প্রথাভিত্তিক আইনের মর্যাদা ইজমার নীচে এবং কিয়াসের উপরে।

আইনের কাজ

মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কাজকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করাই হইতেছে আইনের কাজ। আইনের সংজ্ঞা হইতেই এই উপলব্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আইন মানুষের স্বেচ্ছা বিহারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ কাজ করিবার বা না করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে। মানুষ ইচ্ছা শক্তির (এখতিয়ার اختيار) ধারক। যে বিধান প্রাকৃতিক তাহা আইনরূপে গণ্য নহে। বস্তুজগতে যে সমস্ত আইন কার্যকরী রহিয়াছে (যেমন মাধ্যাকর্ষণ আইন) বা মানুষের জীবন ধারণে যে সমস্ত প্রাকৃতিক আইন (যথা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আইন কার্যকরী রহিয়াছে, সেগুলি আইনতত্ত্বের দৃষ্টিতে আইন বলিয়া পরিগণিত হয় না।

আইনের পরিধি এবং উদ্দেশ্য

আইনের পরিধি তাহার উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত এবং সমাজগতভাবে মানবকল্যাণই হইতেছে আইনের উদ্দেশ্য। আইনদাতার মাহাত্মকীর্তন করা আইনের উদ্দেশ্য নয়, কারণ আল্লাহ্‌তালা কোন জয়গানের জন্য অপেক্ষমান নন। তিনি সর্বপ্রকার অভাব ও ত্রুটিমুক্ত। মানবকল্যাণ শুধু ইহলোকে সীমাবদ্ধ নয়, পরলোক পর্যন্ত ইহার দৃষ্টি; আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানবের এই উভয়বিধ কল্যাণ সাধন। ইসলামী আইনের ধারণায় মানবজীবন অবিনশ্বর। এই কারণে আইনের পরিধি মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলী পর্যন্ত বিস্তৃত।

www.pathagar.com

মানব বৃত্তিসমূহ

মানবজাতি চারটি বৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছে। এইগুলি তাহাদের সহজাত বৃত্তি। ইহারা হইতেছে আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, আত্মোন্নয়ন এবং সামাজিক প্রবৃত্তি। জীবন-পথে চলিবার জন্য আল্লাহতালা আমাদিগকে কিছু পথ চিহ্ন এনায়েত করিয়াছেন। এই বৃত্তিগুলি হইতেছে সেই পথচিহ্ন। আইনের পরিভাষায় এই পথকে বলে শরীয়ত আর চিহ্নকে বলে আয়াত। আত্মরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির বৃত্তি আমাদিগকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার প্রেরণা জোগায়। আত্মোন্নয়ন এবং সামাজিক প্রবৃত্তি আমাদের কাজের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সামাজিক প্রবৃত্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, আমরা সমাজবদ্ধ জীব এবং সমাজের সহিত আমাদের সম্পর্ক রহিয়াছে এবং সেই কারণে আমাদের কাজকর্মকে সংযত রাখা প্রয়োজন। আত্মোন্নয়নের বৃত্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, উন্নতির জন্য আমাদিগকে সংযমের সহিত প্রয়াস পরিচালনা করা উচিত। আইন মানুষের আত্মার উন্নতির জন্য সচেষ্ট। আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য (কুরবাত قربة) লাভের জন্য যে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন আবশ্যক, আইন তাহা বলিয়া দেয়। মানুষের দুনিয়াবি জীবনে সে যাহাতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে ভালোমতো বাঁচিয়া থাকিতে পারে আইন তাহার নির্দেশ দেয়।

অধিকার এবং দায়িত্ব

মানবজীবনকে কল্যাণমুখী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন যে মাধ্যম ব্যবহার করে তাহা হইতেছে অধিকার (হক حق) এবং দায়িত্ব (ওজুব وجوب)। এই দুইটি মাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। বিশেষভাবে অন্য মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করিবার স্বীকৃত ক্ষমতাকে আইনের ভাষায় অধিকার বলে। যাহার বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগ হয় সেই ব্যক্তি উহা মানিয়া লইতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতাকে দায়িত্ব বলে। অধিকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ-তালা। কিন্তু যেহেতু মানুষ তাহাদের সামাজিক জীবনে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল সেহেতু মানুষের অভাব পূরণের এবং কল্যাণের জন্য আল্লাহতালা কিছু সীমার মধ্যে মানুষকে একে অপরের প্রতি অধিকার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহর আইন তাই এক ব্যক্তিকে ক্ষেত্র-বিশেষে অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়। এই সংকীর্ণ পরিধির

www.pathagar.com

বাহিরে মানুষের স্বেচ্ছাবিহারের পথে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই। কেহ তাহার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে অধিকার রাখে না। তাহার স্বাধীনতা অশৃঙ্খলিত। অনেক আইনতত্ত্ববিদের মতে মানুষের সবকিছু করিবার অনুমতি আছে। এই নীতির নাম ইবাহাত (إباحة)।

আইনের প্রকৃতি

পাশ্চাত্য আইনতত্ত্বে (**Western Jurisprudence**) যে সমস্ত আদেশ মানুষ পালন করিতে বাধ্য এবং না করিলে তাহাকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হইতে হয় এবং যেগুলি আদালত কার্যকরী করেন, সেই সমস্ত আদেশকে আইন বলা হয়। কিন্তু ইসলামী আইনতত্ত্বে আইনের ধারণা এইরূপ সংকীর্ণ নহে। ইসলামী আইনতত্ত্বে, আইনদাতার সমগ্র অভিপ্রায়ের প্রকাশকে, আইন বলা হয়। মানুষ কি করিবে, কি করিবে না ; কি তাহার অবশ্য প্রতিপাল্য, কি তাহার অবশ্য প্রতিপাল্য নয় ; কি তাহার করা উচিত এবং কি তাহার করা উচিত নহে এবং কি সে করিলেও করিতে পারে বা না করিলেও পারে—এই সমস্ত নীতিগুচ্ছকে আইন বলে। এগুলি আদেশ-ব্যঞ্জক হইতে পারে, আবার অভিপ্রায়ব্যঞ্জক হইতে পারে।

পাশ্চাত্য আইনতত্ত্বে সেই সমস্ত আদেশকে আইন বলে, যে সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত না হইলে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা বলা থাকে ; আদেশ ভঙ্গের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে উহাকে আইন বলা হয় না। যদি বলা হয় যে, প্রত্যেকে তাহার নিজের অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করিবে এবং কেহ যদি তাহার ভোগে বাধা দেয় তবে বাধাদানকারী ব্যক্তির কারাদণ্ড হইবে, তবে এই আদেশকে আইন বলা যায় ; কারণ ইহা ভঙ্গ করিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইসলামী আইনতত্ত্বে আইনদাতার সকল আদেশই আইনরূপে গণ্য। যে আদেশ ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারীর জন্য কোন শাস্তির বিধান করা হয় নাই সে আদেশও আইন। যে নির্দেশ আদেশমূলক নয়, শুধু ঘোষণামূলক, তাহাও আইনরূপে গণ্য হয়। এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তির নিকট কোন প্রস্তাব করে এবং অপর ব্যক্তি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় ; এই সূত্রকে আইন বলা হয়। যদিও এই সূত্র শুধু ঘোষণাব্যঞ্জক, আদেশব্যঞ্জক নহে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনতত্ত্বে, আদেশ-নির্দেশকে কার্যকরী করিবার জন্য আদালতে ব্যবস্হা না থাকিলেও ঐগুলি আইনরূপে গণ্য হইবার অধিকার রাখে। আদালতে কার্যকরী করা যায় এমন আদেশ-নির্দেশের সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। মানুষের কাজের প্রকৃতি সংজ্ঞায়িত করা এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার এবং সম্পর্কের নির্দেশ দেওয়া আইনের প্রধান কাজ; আইনের আদেশ বলবৎ করিবার দায়িত্ব ইহার প্রশাসনিক শাখার।

আইন বলবৎ করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কল্যাণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, এই দুইটিই হইতেছে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য। এই দুই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পুরস্কারের মাধ্যমে মানুষকে অনুগত হইতে উৎসাহিত করা হয় এবং শাস্তির মাধ্যমে অবাধ্য হইতে নিরুৎসাহ করা হয়। শাস্তি ইহকালে হইতে পারে আবার পরকালেও হইতে পারে। ইহকালের শাস্তিকে ইকাব (عقاب) এবং পরকালের শাস্তিকে আযাব (عذاب) বলা হয়। পুরস্কার সর্বদাই পরকালের জন্য নির্দিষ্ট। ইহাকে সওয়াব (ثواب) বলা হয়।

ইসলামী আইনের প্রয়োগক্ষেত্র

ইসলামী আইনের প্রয়োগক্ষেত্র সাধারণত ব্যক্তিগত। যে ব্যক্তি মুসলিম সে ব্যক্তির উপর ইসলামী আইন প্রযোজ্য। দেশ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কোন মুসলিমের উপর আইন প্রয়োগ ব্যাহত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামে আইনের বুনিয়াদ হইতেছে ধর্মবোধ এবং বিবেক, রাষ্ট্রীয় শক্তি নয়। মুসলিম এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাহার উপর প্রযোজ্য আইন পরিবর্তিত হয় না। সে যদি এমন দেশে বাস করে যে দেশ মুসলিম রাষ্ট্র নহে তবুও ইসলামী আইন তাহার উপর প্রযোজ্য হয়। মুসলিম যেখানেই যাক না কেন সে তাহার বিবেককে সঙ্গে লইয়া যায়। তবে যে ব্যক্তি এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তাহার উপর ইসলামী আইন কার্যকরী হয় না। যে ব্যক্তি আইনদাতার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তিকে আইনদাতার আদেশের অধিকারে আনা যায় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে আইনদাতার হেফাজতের অধিকারও সে হারায় কিন্তু এতদসত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইসলামী আইনের উপর প্রকাশ্য শত্রুতা করে ততক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত আল্লাহ্ তালা তাহাকে এই বিশ্বে আপনভাবে জীবন ধারণের অনুমতি দেন। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলমানগণ সেই সমস্ত আইনের অনুগত হইতে বাধ্য যে সমস্ত আইন ইসলাম ধর্মীয় বিধির বহির্ভূত; অন্য ইসলামী আইন তাহার উপর বাধ্যকর নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম যদি মদ পান করে, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হয় না। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম মদ এবং শুকরের ব্যবসা করিতে পারে। তাহারা কোন ইমামের অধীন নয়, তাই ইসলামী আইন তাহাদের উপর প্রয়োগ করা হয় না।

রাষ্ট্র পরিচালনা

রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আইন প্রয়োগের অধিকার সমগ্র জাতির; নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা জনগণ সেই অধিকার প্রয়োগ করে। ইসলামের আদিযুগে ইমাম অথবা খলিফাগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইমাম অথবা খলিফা ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা বা নির্বাহী প্রধান। আইন প্রণয়নের কোন অধিকার তাঁহার ছিল না। সকলের মতো তিনিও ইসলামী আইনের অধীন ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষের প্রতি আদালতের যে এখতিয়ার, তাঁহার উপরও আদালতের সেই এখতিয়ার ছিল। অবশ্য যেহেতু তিনি নির্বাহী প্রধান ছিলেন এবং সমস্ত প্রশাসনিক যন্ত্র তাঁহার অধীনে ছিল সেহেতু আদালতের আদেশের প্রতি অনুগত হওয়া অনেকখানি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। তাঁহারা কোন বিশেষ ক্ষমতা ও সুবিধার অধিকারী ছিলেন না।

সার্বভৌমত্ব

ইসলামী আইনে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সার্বভৌম। তিনি সকল কর্তৃত্ব ও অধিকারের আধার। কিন্তু তিনি মানুষের উপর আইন আবিষ্কারের এবং প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ বা ন্যস্ত করিয়াছেন। সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লার পরে মানুষ হইতেছে সার্বভৌম। ইসলামী আইনে মানুষ হইতে সার্বভৌমত্বকে বিমুক্ত করা যায় না।

রাষ্ট্র

ইসলামী আইন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা পোষণ করে। সেই রাষ্ট্রের প্রধান হইতেছেন খলিফা। প্রতিনিধি এবং প্রশাসকের মাধ্যমে তিনি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের নির্বাহী দায়িত্ব পরিচালনা করিবেন। কিন্তু যেখানে খলিফা বা ইমাম নাই সেখানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিবার পথে কোন বাধা থাকিবার কথা নহে। আব্বাসীয় খলিফাদের পর আর কোন খলিফা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি পায় নাই। কিন্তু তাহারা মুসলিম রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

আইনের শ্রেণীবিন্যাস

আইনকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আইনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা সংজ্ঞাদানকারী আইন এবং ঘোষণাদানকারী আইন। আদেশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আইনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা প্রতিপাল্য আদেশ এবং সাধারণ আদেশ। প্রতিপাল্য আদেশকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ফরয এবং হারাম অর্থাৎ যাহা করিতেই হইবে এবং যাহা কিছুতেই করা যাইবে না। সাধারণ আদেশকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা মানদুব (مندوب) এবং মাকরূহ্ (مكروه) অর্থাৎ যাহা করা ভাল এবং যাহা করা খারাপ। আবার যে কাজ ফরয হারাম, মানদুব এবং মাকরূহ্ নহে তাহাকে মুবাহ (مباح) বলে।

সংজ্ঞাদানকারী আইনের মধ্যে পড়ে সেই সমস্ত আইন, যেগুলি ফরয, হারাম, মানদুব এবং মাকরূহ্-এর সংজ্ঞা দেয়। কাজের প্রতিক্রিয়া যেমন ক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন, রাজস্ব দিবার দায়িত্ব ইত্যাদি যে আইন বর্ণনা করে তাহাও সংজ্ঞাদানকারী আইনের আওতায় আসে। এই আইন-সমূহ মানুষের স্বাধীনতার পরিধি নির্ধারণ করে, অন্যকথায় তাহার অধিকার ও দায়িত্বের কথা বর্ণনা করে। আরবী ভাষায় ইহাকে তকলিফি (تكليفى) বলে।

যে শ্রেণীর আইন সংজ্ঞাদানকারীর আইনের উপাদান বর্ণনা করে তাহাকে ঘোষণাকারী আইন বলা হয়। ঘোষণাদান আইন সংজ্ঞাদানকারী আইনের ব্যাখ্যা দান করে। প্রস্তাব এবং গ্রহণের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ইহার ফলে একজনের স্বত্ব নষ্ট হয় এবং অন্যজনের স্বত্ব উদ্ভব হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু তাহার ওয়ারিশদের সম্পত্তি পাইবার অধিকার দেয় এইগুলি ঘোষণাকারী আইনের উদাহরণ। বালেগ না হইলে হেবা, ওয়াক্ফ বা উইল করা যায় না; ইহাও একটি ঘোষণাদানকারী আইনের উদাহরণ।

www.pathagar.com

দায়িত্বভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

কার্যকরীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আইনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) এই দুনিয়ায় মানুষ একাকী বাস করিতেছে না, বাস করিতেছে যৌথভাবে, বাস করিতেছে সম্মিলিত হইয়া। ফলে একের সহিত অন্যের সংস্পর্শ হইতেছে। কিন্তু যতই সংস্পর্শ হউক না কেন মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে একক থাকিয়া যাইতেছে। দুনিয়ার মানুষের এই একক এবং সম্মিলিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন আছে। এক শ্রেণীর আইন এই নিয়ন্ত্রণের ভার লইয়াছে। সমগ্র মানব সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য এই আইনের প্রয়োজন ; এই কারণে এই আইন কার্যকরী করিবার দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সমাজ ইহা করিতে বাধ্য।

(২) মানুষের জীবনে এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি একান্ত-ভাবে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার মধ্যে কতিপয় বিষয়ের সহিত দুনিয়ার আদান প্রদানের যোগ আছে। এইগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক পুরস্কার এবং শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তালা এই শ্রেণীর আইন বলবৎ করেন।

(৩) মানুষের জীবনে আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা একাধারে তাহার আধ্যাত্মিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই বিষয়গুলি সম্পর্কীয় আইন ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, আবার নাও পারে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে চুক্তির আইন, সম্পত্তি হস্তান্তরের আইন, উত্তরাধিকারের আইন, অপরাধের আইন প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনের মধ্যে পড়ে সাদ্‌কার আইন, সালাত-সিয়ামের আইন, সালাতের আযান হইলে কর্মবিরতির নির্দেশের আইন প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীর আইনের মধ্যে পড়ে, সালাত ও যাকাতের আইন, রমযানের সিয়ামের আইন ইত্যাদি।

ধর্মীয় আইন এবং সামাজিক আইন

আইনকে তাহাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা ধর্মীয় এবং সামাজিক। এই প্রসংগে তাফতাজানি বলেন, পরলোকের

www.pathagar.com

উন্নতির জন্য এবাদতমূলক আইন হইতে পারে, আবার শুধু এই দুনিয়ার ব্যাপারের সহিত সম্পর্কযুক্ত আইন হইতে পারে। দুনিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত আইনগুলি আবার তিন শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে আসে সেই সমস্ত আইন যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। এইগুলিকে মুয়ামালাত বলে (معاملات)। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে পারিবারিক সম্পর্কের আইন। এইগুলিকে বলে মুনাকাহাত (منا كحات)। তৃতীয় শ্রেণীতে আসে শাস্তির আইন। ইহাকে বলে উকুবাত (عقوبات)।

প্রত্যাদিষ্ট ও অপ্রত্যাদিষ্ট আইন

উৎসের বিচারে আইনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আল কুরআন এবং সহিহ্ আল-হাদীসে যে আইন পাওয়া যায় তাহাকে প্রত্যাদিষ্ট আইন বলে। ইজমা এবং কিয়াসের আইনকে অপ্রত্যাদিষ্ট আইন বলে।

একিনি এবং জান্নি আইন

উৎসের ঐশিত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, কতিপয় আইন স্বভাবতই নিশ্চিত আইন আর কতিপয় আইন বিবেচনার আইন। নিশ্চিত আইনগুলিকে একিনি (يقينى) আইন এবং বিবেচনানির্ভর আইনগুলিকে জান্নি (ظنى) আইন বলা যায়। বস্তুত সকল আইনই ঐশী। কারণ আইন জারি করিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। যে আইনগুলি সম্বন্ধে কোন প্রত্যাদেশ নাই সেই সমস্ত আইন প্রত্যাদিষ্ট আইনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হয়। এই আইনের মধ্যে যেগুলি ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে আল্লাহ র অভিপ্রায় বলিয়া গণ্য করা হয়। যেগুলির ভিত্তি কিয়াস, সেগুলি গ্রহণ করা উচিত কিন্তু একেবারে বাধ্যকর নহে। প্রত্যাদিষ্ট আইনের উপর ঈমান রাখা বাঞ্ছনীয়, কারণ সেইগুলি নিশ্চিত আইন, একিনি আইন। কিন্তু অপ্রত্যাদিষ্ট জান্নি আইন যেমন শুদ্ধ হইতে পারে তেমনি অশুদ্ধও হইতে পারে এবং সেই কারণে ইহা পালন না করিলে বা পালন করিয়া পরে ইহা অশুদ্ধ জানিতে পারিলে কোন ক্ষতি নাই। কাজী প্রত্যাদিষ্ট আইন মানিতে বাধ্য কিন্তু অপ্রত্যাদিষ্ট আইনের ক্ষেত্রে তাঁহার এমন দায়িত্ব নাই। তিনি নিজেই এই সমস্ত ব্যাপারে নীতি প্রণয়ন

www.pathagar.com

করিতে পারেন। কাজী বা বিচারক যদি প্রত্যাদিষ্ট আইনের বহির্ভূত কোন আদেশ দেন তবে ভুল ধরা পড়িবার পরে তিনি নিজেই সেই আদেশ রদ করিতে পারেন। তাহার পরবর্তী কাজীও এই কাজ করিতে পারেন। কিন্তু কিয়াসভিত্তিক আইনের ক্ষেত্রে আদেশ পরিবর্তিনের অধিকার বিস্তৃত নহে। আগেই বলা হইয়াছে যে, কিয়াসভিত্তিক আইন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নহে। এই ক্ষেত্রে কাজীর আদেশ সহজে রদযোগ্য নহে। আল কুরআনের মতন (Text)-কে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সেগুলির ভাষা আল্লাহতা'লার। রসূলুল্লাহ্‌র হাদীসকেও প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে তবে সেগুলির ভাষা রসূলুল্লাহর (সঃ)। হাদীসের শুদ্ধত্ব বিচারে যে হাদীসকে সহিহ বলা যায়। উপর ঈমান রাখা এবং অনুগত হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিছু হাদীসের শুদ্ধতা একেবারে নিশ্চিত না হইলেও যেগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর এইগুলির অনুগত হওয়া উচিত। যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ খুব উচ্চ পর্যায়ের নহে, আইনতত্ত্ববিদ এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারেন। তিনি যদি হাদীসকে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন তবে তিনি তাহার নীতি মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে এই জাতীয় হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া যে আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে আইনের মর্যাদা কিয়াসভিত্তিক আইনের মত।

অনমনীয় এবং নমনীয় আইন

আইনকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা অনমনীয় (আজিমাত عزيمة) এবং নমনীয় (রুখসাত رخصة)। অনমনীয় আইন বলিতে সেই আইনগুলিকে ধরা হয় যেগুলি প্রয়োগে কোন নমনীয়তা নাই। অসুবিধা বা অহেতুক কঠোরতা এড়াইবার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে যে সমস্ত আইনকে নমনীয় করা যায় সেইগুলিকে নমনীয় আইন বলে। সমগ্র ইসলামী আইনে নমনীয়তার অবারিত প্রবাহ দেখা যায়। মানুষের প্রয়োজন, তাহার প্রথা, তাহার অভ্যাস, এইসব সামনে রাখিয়া আইনকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃঢ়তাকে কোমলত্বে আনা হইয়াছে। ইসতিদলাল এবং ইসতিহসান এই দুই নীতির ভিত্তিতে আইনের মধ্যে নমনীয়তা আনয়ন করা হইয়াছে। একটি উদাহরণ দিলে এই নমনীয়তা বুঝিতে পারা যাইবে। দ্রব্য বিক্রয়ের আইনে বলা হইয়াছে যে, যে দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই তাহার ক্রয়-বিক্রয় হয় না ; পরে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে এই প্রতিশ্রুতিতে অর্থ

www.pathagar.com

লইলেও সেই আদান প্রদানে আইনভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় হয় না। এই আইনকে প্রয়োগের সময় নমনীয় করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে অর্ডার লইয়া মাল প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করাকে সিদ্ধ বিক্রয়চুক্তি বলা যায়। এই নমনীয়তা আধ্যাত্মিক আইনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আধ্যাত্মিক আইনের ক্ষেত্রে সমস্ত বিধি প্রতিপালন করা পুণ্যজনক কিন্তু দুনিয়ার আইনের ক্ষেত্রে নমনীয়তার দ্বারা আইনের নীতি আহত হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আইন

আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা নানাভাবে হইতে পারে। ভাষা এবং ব্যাকরণের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া এবং যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আইনের মতনকে ব্যাখ্যা করা যায়; আবার কুরআনের একটি আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এইভাবে একটি হাদীসকে অন্য হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাখ্যা বলিতে শুধু অর্থ নির্ধারণ নয়, প্রয়োগের সীমা নির্ধারণও বুঝায়। এই প্রকারের ব্যাখ্যাও আইনের অন্তর্ভুক্ত।

রদকারী আইন এবং সংশোধনকারী আইন

আইনতত্ত্ববিদগণের মতে আল কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং কতিপয় হাদীস সম্পূর্ণ রদ হইয়া গিয়াছে আর আল কুরআনের কিছু আয়াত এবং কিছু হাদীস সংশোধিত হইয়াছে। আয়াতকে আয়াত দ্বারা এবং হাদীসকে হাদীস দ্বারা রদ বা সংশোধন করা হইয়াছে। অনেক আইনতত্ত্ববিদের মতে এইসব রদকারী এবং সংশোধনকারী আইনকে ব্যাখ্যামূলক আইন বলাই সংগত। যখন কোন আইন জারি করা হয় এবং সেই আইনের মধ্যে কতকাল ইহা বলবৎ থাকিবে তাহা না বলা হয় এবং আইনদাতা যখন একটি বিশেষ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ আইন রদ করেন তখন ধরিয়া লওয়া হয় যে, রদ হইবার পূর্ব মুহূর্তকাল পর্যন্ত বলবৎ রাখিবার জন্যই ঐ আইন প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং রদকারী আইন ব্যাখ্যামূলক আইনমাত্র। একইভাবে যখন একটি আয়াত বা হাদীস অন্য আয়াত বা হাদীস দ্বারা সংশোধিত হয় তখন ধরিয়া লওয়া হয় যে সংশোধনের পর মূল আয়াত বা হাদীস সংশোধিত আকারে প্রযুক্ত হইবে এবং ইহা এক প্রকার ব্যাখ্যামাত্র। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একটি কিয়াসকে অন্য কিয়াস দ্বারা রদ করা যায় না।

www.pathagar.com

গণ-আইন এবং ব্যক্তিগত আইন

অধিকারের নিরিখে আইনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—গণ-আইন এবং ব্যক্তিগত আইন। অধিকারের কিছু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আর কিছু মানুষের। যাহা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য তাহাকে হক্কুল্লাহ (حقوق الله) এবং যাহা মানুষের প্রাপ্য তাহাকে হক্কুল এবাদ (حقوق العباد) বলা হয়। হক্কুল্লাহ কে আবার গণ-অধিকার এবং হক্কুল এবাদকে ব্যক্তিগত অধিকার বলা যায়। গণ-অধিকারের মালিকানা আল্লাহ্‌তা'লার; কিন্তু যেহেতু সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য এই অধিকার প্রযুক্ত হয় সেহেতু ইহাকে গণ-অধিকার বলা হয়। কর আরোপ করিবার অধিকার এইরূপ একটি গণ-অধিকার। এই অধিকার সমগ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে ইমাম প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিগত অধিকারের মালিকানা ব্যক্তির; তাই তাহাকে ব্যক্তিগত অধিকার বলা হয়। ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ভাড়া আদায় করিবার যে অধিকার ইহা একান্তই বাড়ীর মালিকের। ইহা একটি ব্যক্তিগত অধিকারের উদাহরণ। অপরাধীকে শাস্তি দিবার অধিকার সমগ্র সম্প্রদায়ের; অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার ক্ষতিপূরণ পাইবার। অনেক অপরাধ আছে যাহা রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়াই বিবেচনা করে এবং অপরাধীকে শাস্তি দেয়। যে আইনে এই শাস্তির বিধান থাকে তাহাকে গণ-আইন বলে। আবার এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা রাষ্ট্র বিবেচনার অধিকারে আনে না। সেগুলি সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে অপরাধীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। ইহা যে আইনের মাধ্যমে করা হয়, তাহাকে ব্যক্তিগত আইন বলে।

ব্যক্তিত্বের আইন

মানুষ কি প্রকারের অধিকার এবং কর্তব্য ধারণ এবং বহন করিবার যোগ্যতা রাখে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য যে বিধান আছে, আইনতত্ত্ববিদগণ সেইগুলিকে ব্যক্তিত্বের আইন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শিরোনামাতে আসে শিশু, উন্মাদ, কাফির, ক্রীতদাস এবং অসুস্থ ব্যক্তির যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার আইন।

www.pathagar.com

দ্রব্যের আইন

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ দ্রব্য আইনের জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীকে চিহ্নিত করেন নাই। অধিকার আদায় এবং দায়িত্ব প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষের যে কাজ তাহাই আইনের বিষয়বস্তু। কোন কোন সময় এই অধিকার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া দ্রব্যের সহিত সংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই দ্রব্যের জন্য কোন আইনের প্রয়োজন নাই। দ্রব্যকে মানুষ ভোগ দখল করে মাত্র।

সাক্ষ্য আইন

ইসলামী আইনতত্ত্বে সাক্ষ্য আইনের কিছু অংশ মূল আইনের মধ্যে এবং কিছু অংশ সহায়ক আইনের মধ্যে পড়ে। মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়াকে শাহাদাত (شهادة) বলে। ইহাতে যোগ্যতার প্রশ্ন জড়িত। অন্য কোন ব্যক্তির উপর যে দায় সৃষ্টি করিতে পারে সেই ব্যক্তিই শুধু সাক্ষ্য দিতে পারে। সাক্ষ্য প্রমাণকে সামগ্রিকভাবে বায়না (بينة) বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলবৎ করিবার জন্য সত্য নির্ধারণে আদালতকে সহায়তা করা।

কার্যবিধি

বিচারকের কর্তব্য যে বিধিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইসলামী আইনতত্ত্বে তাহা কার্যবিধি নামে পরিচিত। ইহাকে আদাবুল কাজী (ادب القاضى) বলে।

সাংবিধানিক আইন

ইসলামী আইনতত্ত্বের কেতাবসমূহের যে অধ্যায়ে সাংবিধানিক আইন আলোচিত হয় তাহার নাম সিয়ার (السير)। এই অধ্যায়ে সম্প্রদায়ের প্রধানের অধিকার এবং দায়িত্ব বর্ণিত হয়।

আন্তর্জাতিক আইন

ইহাও অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন, সিয়ার অধ্যায়ে সমস্ত ইসলামী আইনতত্ত্বের কিতাবে আলোচিত হইয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত বা মুসলিমের সহিত অমুসলিম রাষ্ট্রের এবং অমুসলিমের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিৎ তাহাই ইহার বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আইনের উৎস

প্রথম ভাগ ঃ কুরআন এবং হাদীস

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সাধারণ আলোচনা

ওহী

ইসলামী আইনের প্রধান এবং প্রাথমিক উৎস হইতেছে ওহী (وحى)। ওহীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা—প্রকাশ্য (জাহির ظاهر) এবং আভ্যন্তরীণ (বাতিন باطن)। প্রকাশ্য ওহী নানাভাবে রসূলুল্লাহ্‌র উপর অবতীর্ণ হইত। ফিরিশতা জিবরাইল আল্লাহ্‌র হুকুমে রসূলুল্লাহ্‌র কাছে আল্লাহ্‌র ভাষায় বা ইঙ্গিতে ওহী লইয়া আসিতেন। অনুপ্রেরণার (ইলহাম الهام) মাধ্যমেও তিনি জ্ঞান লাভ করিতেন। আভ্যন্তরীণ ওহী বলিতে রসূলুল্লাহ্‌র সেই সব অভিমতকে বুঝায়, যেগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তালার ভাষায় যে সমস্ত ওহী রসূলুল্লাহ্‌র নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল, আল কুরআন হইতেছে তাহার সংকলন। ফিরিশতা জিবরাইলের ইঙ্গিতের মধ্যে যে সমস্ত প্রকাশ্য ওহীর বিষয়বস্তু নিহিত ছিল এবং ইলহাম বা অনুপ্রেরণার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ যাহা লাভ করিয়াছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ ওহী বলিতে যাহা বুঝানো হইয়াছে এই সমস্ত লইয়া আ-হাদীস (হাদীসের বহুবচন) গঠিত।

কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ রসূলুল্লাহর ব্যক্তিগত অভিমতকে ওহীর পর্যায়ে উন্নীত করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের মতে, অন্যান্য লোকের অভিমতের যে মূল্য, রসূলুল্লাহ্‌র অভিমতেরও সেই মূল্য। কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায়ের সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহর ব্যক্তিগত অভিমতকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহা প্রকাশ্য ওহী দ্বারা অসমর্থিত হয়, গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুত রসূলুল্লাহ্‌র জীবনে অনেক সময় গিয়াছে যখন তাঁহার নিকট কোন প্রকাশ্য ওহী অবতীর্ণ হয় নাই। এই সময়ে রসূলুল্লাহ্‌র নিকট যে সমস্ত প্রশ্ন আসিয়াছে তাহা সমাধান করিবার জন্য তিনি নিজের বিচার বুদ্ধি খাটাইয়াছেন এবং তাঁহার সাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া তাঁহার অভিমত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ভুল হইলে আল্লাহ তালা প্রকাশ্য ওহী প্রেরণ করিয়া তাহা শুধ্রাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রসূলুল্লাহ্ যে অভিমত বা সিদ্ধান্ত দিয়াছেন তাহা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তালা কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। সমর্থনযোগ্য না হইলে আল্লাহ্ তালা তাহা রদ করিয়া দিয়াছেন। এই যুক্তিতে 'আ-হাদীস'কে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। রসূলুল্লাহ্'র ইনতিকালের পর নবূয়তের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আর কোন ওহী আসিবে না। এমতাবস্থায় তাঁহার অভিমত এবং সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবার দাবী রাখে।

রসূলুল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধ অবশ্য পালনীয়। তাঁহার কাজ এবং অভ্যাস (আফাল افعال) ও অনুসরণীয়। সুতরাং, তিনি যে রীতি বা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং পালন করিয়াছেন তাহা নযীররূপে মানিয়া লইতে হয়। এইগুলি সুন্নাহ্'র অংশ বলিয়া বিবেচিত।

ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রত্যাদিষ্ট আইন

কোন কোন আইনতত্ত্ববিদের ধারণায় ইসলাম-পূর্ব যামানায় ওহীর মাধ্যমে যে আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, অবশ্য ইসলাম যেসব আইন রদ করিয়াছে সেগুলি নহে। আবার কোন কোন আইনতত্ত্ববিদের মতে ইসলাম-পূর্ব যামানার প্রত্যাদিষ্ট আইন মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক নহে। হানাফী মতবাদে বলা হইয়াছে, অসমর্থন না করিয়া ইসলাম-পূর্ব যামানার যে সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট আইন আল কুরআনে উল্লেখিত হইয়াছে, সেইগুলি মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক। ইসলাম-পূর্ব যামানার ঐশী কিতাবসমূহের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে, তাই সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। যেহেতু মানব সমাজ ঐগুলিকে অবিকৃত এবং অক্ষত অবস্থায় পায় নাই, সেহেতু ইহাদিগকে বাধ্যতামূলক বলিয়া গ্রহণ করা উচিৎ নহে।

আইনের উৎসরূপে আল কুরআন

অনন্তকাল হইতে কুরআনের অস্তিত্ব বর্তমান। খণ্ডে খণ্ডে বিশ বা পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইহা রসূলুল্লাহ্'র উপর নাযিল হইয়াছে। আল কুরআন

www.pathagar.com

কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিকে সূরা (سورة) বলে। প্রত্যেক সূরার নাম আছে। সূরা হইতেছে আয়াতের (آيات) সমষ্টি। আল কুরআনের আয়াতসমূহ যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ বিন্যাস অনুযায়ী আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু বিশ্বাস করা হয় যে, রসূলুল্লাহ নিজেই বর্তমানে প্রচলিত বিন্যাস অনুমোদন করিয়াছিলেন। আয়াতসমূহের মধ্যে যেগুলিকে ইসলামী আইনের উৎস বলিয়া চিহ্নিত করা যায় সেগুলির প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

(১) তৎকালে উত্থিত প্রশ্নাবলীর সমাধানের জন্য কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(২) শিশু হত্যা, জুয়া, সুদপ্রথা, সীমাহীন বহুবিবাহ প্রভৃতি আপত্তি-জনক প্রথা রদ করিবার জন্য কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(৩) সমতার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের নীতি নির্ধারণ এবং নারী জাতির মর্যাদার উন্নয়ন প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের জন্য কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(৪) অক্ষম ব্যক্তি এবং নাবালকদের হেফাযতের জন্য কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(৫) শান্তি এবং শৃঙ্খলার জন্য শাস্তির নীতিমূলক কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(৬) কিছু সাধারণ আদেশ-নিষেধ কতিপয় আয়াতে বিধৃত।

বাকারা, নিসা, ইমরান, মায়দা, নুর, তালাক এবং বনী ইসরাইল সূরাসমূহের মধ্যে এই সমস্ত আয়াতের বেশীর ভাগ পাওয়া যায়।

আল কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য

আল কুরআনের সহিত আল-হাদীসের পার্থক্য অনেক। আল কুরআনের ভাষা আল্লাহ্ তালার ভাষা। ইহা তাঁহারই বাণীর সংকলন। তাই কুর-আনের বাণীর মধ্যে যেমন আইন খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক রত্নরাজি। আল কুরআনে শব্দের (نظم) আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা এক সময় বলিয়াছিলেন, ভাষা আল কুরআনের আবশ্যিক উপাদান নহে এবং সে কারণে কোন ব্যক্তি যদি ফার্সী ভাষায় সালাত আদায় করে তবে তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার এই মত পরিবর্তিত হয়।

www.pathagar.com

হাদীসের ভাষা রসূলুল্লাহ্‌র, আল্লাহর নহে। সুতরাং ভাষার দিক হইতে আল কুরআনের সহিত 'আল-হাদীসের' বিপুল পার্থক্য।

আল কুরআনের আয়াতসমূহ যে আল্লাহ্‌তালার বাণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে প্রমাণের উপর আল কুরআনের আয়াতসমূহের বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত সেই প্রমাণ খুব মজবুত প্রকৃতির। আল কুরআনের মধ্যে প্রক্ষেপ বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। মজবুত প্রমাণের ভিত্তিতে এইরূপ দাবী নিঃসন্দেহে করা যায়। এই দৃঢ় প্রমাণ সমর্থিত সমগ্র কুরআনকে আইনতত্ত্ববিদগণ মুতাওয়াতির (متواتر) বলিয়াছেন। সর্ব-জনস্বীকৃত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে মুতাওয়াতির বলে। আল কুরআন সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির। আল-হাদীসের মধ্যে মাত্র পাঁচটি কিংবা ছয়টিকে মুতাওয়াতির বলা যায়। আল কুরআন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং এই সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইয়াছিল রসূ-লুল্লাহর ইন্‌তিকালের পরেই। কিন্তু আল-হাদীসের ক্ষেত্রে এইরূপ হয় নাই। আল কুরআনের মুতাওয়াতির হওয়ার কারণ বোধ হয় এইখানেই।

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ বিধি

আল-হাদীস যে আইনের উৎস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা বিশুদ্ধ কিনা তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আইনতত্ত্ববিদগণ কয়েকটি বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। সময়ের দিক হইতে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্‌র ইন্‌তিকালের পর প্রথম যুগ শুরু হয় এবং তাঁহার আসহাবগণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি ধরা হয়। এই যুগের মুসলিমগণকে খুবই বিশ্বস্ত মনে করা হয়। এই যুগে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে সেই সমস্ত হাদীসকে সাধারণত বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহা খুব স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ্‌র জীবনকালে যে সমস্ত সৌভাগ্যবান মুসলিম তাঁহার মোবারক সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তিবর্গ রসূলুল্লাহর হাদীস বর্ণনা করিতে স্বাভাবিকভাবেই সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। দ্বিতীয় যুগে আসে সেই সমস্ত হাদীস যেগুলির বর্ণনাকারী হইতেছেন আসহাবদের উত্তরসুরীরা। ইহাদিগকে তাবাউন (تابعون) বলা হয়। তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌র মোবারক সহবত পান নাই কিন্তু আসহাবদের সহবত পাইয়াছিলেন—ইঁহাদের বর্ণিত হাদীসও মূল্যবান, তবে আসহাবদের বর্ণিত হাদীস হইতে ইঁহাদের স্থান

www.pathagar.com

নিম্নে। তৃতীয় যুগে পড়ে তাবাউনদের উত্তরসূরীদের বর্ণিত হাদীস। এই ব্যক্তিবর্গকে তাবা তাবাইন (تبع تابعين) বলে। তাঁহারা তাবাউনদের সহবতে আসিয়াছিলেন।

হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস

প্রমাণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া হাদীসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আসে মুতাওয়াতির। এইগুলির বিশুদ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। বহু সংখ্যক লোক, বহু স্থানের লোক এবং বহু যুগের লোক এই হাদীস একইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে মশহুর (مشهور) হাদীস। কোন কোন সাহাবী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী যুগেও কেহ কেহ এইগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও এগুলির স্থান প্রথম শ্রেণীর নিম্নে তবুও এইগুলির বিশুদ্ধতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীতে আসে আহাদ (آحاد) হাদীস। এই শ্রেণীর হাদীসের বিশুদ্ধতা সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত না হইলেও আইনতত্ত্ববিদগণ এইগুলির উপর ইসলামী আইনের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কোন কোন আইনতত্ত্ব-বিদ এই শ্রেণীর হাদীসকে আইনের উৎস বলিয়া স্বীকার করেন না।

রাবীর যোগ্যতা

যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাহাকে রাবী (راوى) বলে। রাবীর বর্ণনাকে সাক্ষ্যের সাথে তুলনা করা যায়। সাক্ষ্য দিবার জন্য সাক্ষীর যে যোগ্যতাসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন, রাবীর সেই সব যোগ্যতা থাকিতে হইবে। প্রথমত, তাঁহাকে পরিণত বুদ্ধির এবং সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হইতে হইবে। শিশু, উন্মাদ এবং জড়বুদ্ধির বর্ণনা তাই গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ভাল ধারণশক্তি দাবত (ضبط) থাকিতে হইবে। ধারণশক্তি বা দাবত বলিতে ভালভাবে শুনিবার ক্ষমতা এবং যাহা শোনা হইয়াছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা এবং যাহা শোনা এবং বুঝা হইয়াছে তাহা মনে রাখিবার ক্ষমতা এবং সর্বশেষে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বুঝায়। অবশ্য অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ দাবতকে রাবীর আবশ্যিক যোগ্যতা মনে করেন না, ইহাকে অগ্রাধিকার প্রদানের উপাদান মনে করেন। তৃতীয়ত, রাবীকে মুসলিম হইতে হইবে। চতুর্থত, তাঁহাকে সৎ ও পরহেজগার লোক হইতে হইবে। যে ব্যক্তি দ্বীন এবং বিবেকের নির্দেশ মানিয়া চলে

www.pathagar.com

তাহাকেই সৎ এবং পরহেজগার বলে। কাফিরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। নারী, ক্রীতদাস এবং অন্ধের বর্ণনা গৃহীত হয়।

রাবীর শ্রেণীবিভাগ

যে রাবীর যোগ্যতা যতবেশী তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মূল্য তত বেশী। কোন রাবী অনেক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কোন রাবী একটি বা দুইটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বেশী হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা খ্যাত বা (মাআরুফ معروف) এবং যাঁহারা খুব কম হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা স্বল্পখ্যাত বা (মাযহুল مجهول) নামে পরিচিত। কান রাবী আইনজ্ঞ আবার কোন কোন রাবী তেমন নহে। হানাফিগণের মতে আইনে জ্ঞানী ব্যক্তির হাদীস কিয়াসভিত্তিক হাদীস হইতে বেশী মূল্যবান। কিন্তু মালেকি সম্প্রদায় কিয়াসভিত্তিক হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়। যে সমস্ত আইনবিদ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রখ্যাত হইতেছেন খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, রসূল পত্নী আয়শা, জায়েদ, মুয়ায এবং আবু মুসা আসআ'রী। আবু হুরায়রা এবং আনাস অনেক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা আইনতত্ত্ববিদ ছিলেন না। যে রাবী বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নাই. কিন্তু যেগুলি করিয়াছেন তাহা আসহাবগণ সমর্থন করিয়াছেন সেই রাবীকে উচ্চ পর্যায়ের গণ্য করা হয়; আর তাঁহার বর্ণিত হাদীস আসহাবগণ অস্বীকার করিলে সেই হাদীসকে কোন মূল্য দেওয়া হয় না। আসহাবগণের মধ্যে একদল তাঁহার হাদীস শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে এবং অন্যদল অশুদ্ধ বলিলে সেই হাদীসকে কিয়াসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।

সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হাদীস

যাহা রসূলুল্লাহ (সঃ) করিয়াছেন, বলিয়াছেন এবং অনুমোদন করিয়াছেন তাহাই হাদীস। সুতরাং হাদীসের উৎস তিনি। রাবিগণ তাঁহাদের বর্ণনায় যতক্ষণ তাঁহার কাছে পোঁছাইতে না পারেন ততক্ষণ তাহা সংযুক্ত হাদীস হয় না। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর আসহাব নন তিনি যদি বলেন, রসূলুল্লাহ অমুক কথা বলিয়াছেন; তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি রসূলুল্লাহর মুখ হইতে শোনা-ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁহার পূর্ববর্তী বক্তা বা বক্তাগণকে পৌছাইতে পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাদীস সংযুক্ত হাদীস হয় না। হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

"অমুক আমাকে বলিয়াছেন যে অমুক তাহাকে বলিয়াছেন যে অমুক তাহাকে বলিয়াছেন যে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাকে বলিয়াছেন ইত্যাদি।" যে হাদীসের এইরূপ শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য নাই তাহাকে বিযুক্ত বা মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে। আসহাবগণের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। হানাফী এবং মালেকী সম্প্রদায়ের লোক তাবাউন এবং তাবা তাবাইনদের মুরসাল হাদীসও গ্রহণ করেন।

অন্যান্য আপত্তি

যে হাদীস সংযুক্ত অর্থাৎ মুরসাল নহে সে হাদীসের গ্রহণীয়তাতেও অনেক আপত্তি থাকিতে পারে। রাবীর যোগ্যতায় দুর্বলতা থাকিতে পারে, বিশেষ হাদীসখানি আল কুরআনের আয়াতের সহিত অসমঞ্জস হইতে পারে বা অন্যান্য মশহুর হাদীসের বিরুদ্ধে হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, আসহাবগণ ঐ হাদীসকে অস্বীকার করিয়াছেন। আবার এমনও হইতে পারে যাহা অনেকের জানার কথা কিন্তু বেশী লোকের সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে।

হাদীসের বিরুদ্ধে আরেক রকম আপত্তি থাকিতে পারে যাহাকে আরবী ভাষায় তান (طعن) বলে। রাবী যে হাদীস বর্ণনা করিলেন তিনি যদি তাহার উল্টা কাজ করেন বা পরবর্তীকালে তিনি যদি উহার সত্যতা অস্বীকার করেন তবে সে হাদীস অগ্রাহ্য হয়। হাদীসের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, আসহাবগণের তাহা জানিবার কথা কিন্তু আসহাবগণ তাহা বর্ণনা করেন নাই তবে ঐ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। কিন্তু যে ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হইতেছে সেই ঘটনা যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাহা খুব কম লোকের জানিবার কথা তবে আসহাবগণের না জানিবার কারণে ঐ বর্ণনাভিত্তিক হাদীসকে অগ্রাহ্য করা হয় না।

রেওয়ায়েত

প্রাথমিক যুগে হাদীসসমূহ মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হইত ; ইহাই ছিল সেকালের পদ্ধতি। বর্তমান কালে ইহা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হইতেছে। হাদীস বর্ণনার দুই প্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পদ্ধতিতে বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি অমুক কর্তৃক একটি বিশেষ বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছেন (হাদ্দাসানা حدثنا)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে এই যে, ইহাতে

www.pathagar.com

বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি অমুক ব্যক্তি হইতে অমুক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন (আখবারনা اخبرنا) ।

এই স্থলে যে প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ববহ, তাহা হইতেছে রেওয়ায়েতটির ভাষা। রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহর ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে আবার বর্ণনাকারী আপন ভাষায় রসূলুল্লাহর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। যে হাদীসের ভাষা রসূলুল্লাহর, অন্য শর্তাবলী পূরণ হইলে সেই হাদীস সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয়; এমন কি রাবী যদি আইনবিদ নাও হন তবুও সেই হাদিস গ্রহণযোগ্য হয়। হাদীসের ভাষা যদি রসূলুল্লাহর না হয় তবে তাহার গ্রহণীয়তা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। একদল আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, ঐ সব হাদীস একেবারেই আগ্রাহ্য। অন্য দল এবং অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ এই দলে পড়েন না, তাহারা মনে করেন যে ঐ হাদীসে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবোধগম্য না হইলে উহা গ্রহণযোগ্য। তাঁহাদের মতে রাবী যদি আইনবিদ না হন কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ যদি তিনি বোঝেন তবে এই হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়। এই সমস্ত হাদীসের ভাষা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয় তবে রাবী আইনবিদ হইলেও সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এই শ্রেণীর হাদীসের ভাষা যদি বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয় তবে রাবী আইনবিদ হইলেই ইহা গ্রহণযোগ্য হয়।

রসূলুল্লাহ্‌র আমল

রসূলুল্লাহ যাহা করিতেন এমন কিছু যদি হাদীসের বিষয়বস্তু হয় তবে সেখানে দেখিতে হইবে যে, ঐ বিষয়টি আইনের দৃষ্টিতে মুসলিমগণের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্যের এলাকায় পড়ে কি না। এইরূপ হাদীসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করিতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে যে, ঐ বিষয় সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন কি না। রসূলুল্লাহর নিকট যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে এবং রসূলুল্লাহ যদি তাহার জবাব দিয়া থাকেন তবেই তাঁহার জবাব ঐ প্রশ্নের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আইনের উৎসরূপে গণ্য হয়। অবশ্য রসূলুল্লাহ যাহা করিয়াছেন সমগ্র মুসলিম সমাজ তাহা করিতে পারে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়বস্তুর নিরিখে হাদীসের ভাগ

বিষয়বস্তুর নিরিখেও হাদীসকে ভাগ করা যায়। যেখানে আল্লাহ্‌র অধিকারের প্রশ্ন সেখানে মানুষের পক্ষে কর্তব্যচ্যুতি হইলে তাহার শাস্তি বিধান

www.pathagar.com

সম্পকীয় হাদীস তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন উহা একাধিক বা মশহুর হাদীস হয়। হাদীসের বিষয়বস্তু মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হইলে এবং ঐ হাদীসে মানুষের দায় দায়িত্বের বিধান থাকিলে রাবীর যোগ্যতাসাপেক্ষে উহা গ্রহণ-যোগ্য হয়। এই ক্ষেত্রে রাবীকে আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য যে সমস্ত যোগ্যতা প্রয়োজন, তাহার অধিকারী হইতে হইবে। আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে যেভাবে বর্ণনা করিতে হয়, ঐ হাদীসের বর্ণনাও ঠিক সেইরূপ হইতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তফসির

তফসিরের কাজ

তফসির অর্থাৎ ব্যাখ্যাকে আইনতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট শাখা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মতে তফসির একটি বিশিষ্ট শাস্ত্র। আইনকে ব্যাখ্য করিবার জন্য শুধু এই শাস্ত্র প্রযুক্ত হয় না, সর্ব-প্রকার ব্যাখ্যাতেই ইহার প্রয়োগ। তফসিরের উদ্দেশ্য কি? যাহা তফসির করা হইতেছে, তাহা হইতে তাহার মর্ম উদ্ধার করাই হইতেছে তফসিরের প্রধান কাজ। অন্য কথায় যিনি আইনদাতা বা আইন ব্যাখ্যাতার অভিপ্রায় আবিষ্কার করাই তফসিরের প্রধানতম কাজ। তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা হইতে অভিপ্রায় আবিষ্কার করিতে হয়। যে ভাবে বলা হইয়াছে তাহার মূল্য যাহা বলা হইয়াছে তাহার চাইতে কম নয়। আইনদাতা বা আইন ব্যাখ্যাতা অনেক কিছু অব্যক্ত রাখিতে পারেন, তফসিরের কাজ হইতেছে সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু আইনদাতা বা আইন ব্যাখ্যাতার মনে কি আছে তাহা কি করিয়া জানা যায় বা তাহার অভিপ্রায় কি ভাবে বুঝা যায়? এই জানিবার ও বুঝিবার পথ হইতেছে পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করা এবং তাহার ভিত্তিতে অভিপ্রায় নির্ধারণ করা। ধরা হউক, আইনদাতা তাঁহার আমলে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত দেখিলেন এবং দেখিয়াও ঐ প্রথার রদমূলক কোন আইন জারি করিলেন না; তাহার এই নীরবতাকে উক্ত প্রথার অনুমোদন বলিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে। কিংবা রসূলুল্লাহর একজন সাহাবী একটি অপরিচিত (মযহুল مجهول) হাদীস শুনিলেন এবং তাহাতে কোন প্রতিবাদ করিলেন না; ধরিয়া লইতে হইবে তিনি ইহার শুদ্ধতা মানিয়া লইয়াছেন। মানুষের আচরণ ব্যাখ্যর ক্ষেত্রে তাহার নীরবতা একটি উল্লেখযোগ্য সংকেত।

www.pathagar.com

শব্দের শ্রেণীবিন্যাস

অর্থের দিক হইতে শব্দকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আসে শব্দের ব্যাকরণভিত্তিক অর্থ নিরূপণ। শব্দটি কি ভিন্নার্থবোধক না দ্ব্যর্থবোধক না বহু-অর্থবোধক না একার্থবোধক? শব্দটি কি আ'ম (عام) অথবা খাস (خاص)? দ্বিতীয় ভাগে আসে শব্দের ব্যবহার। শব্দটি কি প্রাথমিক (হাকীকী حقیقی) অর্থবহ অথবা ইহার আরেকটি অর্থ সম্ভব (মাজাজী مجازی)? শব্দটি কি কোন উপাখ্যানের ইঙ্গিত বহন করে? শব্দটি কি আভিধানিক বা টেকনিক্যাল অর্থে ব্যবহৃত হয়? তৃতীয় ভাগে আসে শব্দটি যাহা প্রকাশ করিতে চাহে, তাহা কি প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রশ্ন। চতুর্থ ভাগে আসে শব্দের অর্থ বহনের বিভিন্ন পদ্ধতি।

ভিন্নার্থবোধক আম এবং খাস শব্দ

একই ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে। আরবী ভাষায় ইহাকে মুশতারাক (مشترک) বলে। বাংলা ভাষায়ও এমন শব্দ প্রচুর পাওয়া যায়—'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ যেমন কলহ তেমনি সংযোগ। কুকথা বলিতে যেমন মন্দ কথা তেমনি দুনিয়াবী কথা বুঝানো যায়। 'নাই' শব্দে যেমন নাভী বুঝায় তেমনি শূন্যতা বুঝায়। শব্দের এক বচনের প্রয়োগ দ্বারা অনেক সময় বহুকে বুঝায়। এইরূপ শব্দকে আ'ম শব্দ বলে। মানব বলিতে সকল মানুষকে বুঝানো হয়। আবার বহুবচন বাচক শব্দ দ্বারা সকলকে না বুঝাইয়া শ্রেণীকে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ শব্দকে জামআ' মুনাক্কার (جمع منکر) বলে। 'রাস্তায় মানুষ দেখিলাম' এই বাক্যের মানুষ শব্দ দ্বারা সকল মানুষ বুঝায় না, কিছু মানুষ বুঝায়। আবার কোন শব্দ একবার মাত্র প্রয়োগ করিয়া একাধিককে বুঝানো হয়। এইরূপ শব্দকে খাস শব্দ বলে। খাস শব্দ শ্রেণীর জন্য ব্যবহার হইতে পারে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়গত, নামবাচক বা বর্গীয় শব্দ

শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত হইতে পারে। মূল হইতে এই শব্দ আহরণ করা হয়। হত্যাকারী বলিতে কাতেল শব্দ ব্যবহার করা যায়। ইহা কতল হইতে উদ্ভূত। আবার এইরূপ না হইয়া শব্দনামবাচক হইতে পারে কিংবা

www.pathagar.com

বর্গীয় হইতে পারে। নামবাচক হইলে ইহাকে আ'লাম (علم) এবং বর্গীয় হইলে ইহাকে ইসমে জেন্‌স (اسم جنس) বলে।

সীমিত অর্থবোধক এবং চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ

যদি কোন প্রত্যয়গত বা বর্গীয় বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুকে চিহ্নিত করা হয় এবং সেই চিহ্ন প্রকরণে কোন সীমা না রাখা হয় তবে সেই শব্দকে চূড়ান্ত অর্থবোধক বা মুতলাক (مطلق) শব্দ বলে ; অন্য অবস্থায় ইহাকে সীমিত অর্থবোধক বা মুকায়্যাদ (مقيد) বলে। যে বস্তুর জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে যদি ঐ বস্তুর সমগ্রতা ব্যাপ্ত হয় তবে সেই শব্দকে আ'ম শব্দ বলে। বিশেষ চিহ্নযুক্ত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইলে ইহাকে বিশিষ্ট বা মাহদ (معهود) শব্দ বলে। অবিশেষ বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইলে এই শব্দকে অবিশেষ অর্থাৎ নাকারা (نكره) বলে।

সাধারণ শব্দ

হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণের মতে যখন কোন সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন ঐ শব্দাশ্রিত সকলকে তাহা আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মধ্যে নিশ্চিতি থাকে। সুতরাং সাধারণ নির্দেশমূলক একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াতের মাধ্যম ব্যতীত নিয়ন্ত্রিত অর্থবোধক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শাফিঈ' আইনতত্ত্ববিদগণ অন্য মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, একটি সাধারণ শব্দ ঐ শব্দাশ্রিত সব বস্তুকে আকর্ষণ করে সত্য কিন্তু উহা কোন নিশ্চিতি বহন করে না। সুতরাং কুরআন শরীফের আয়াত বা একটি সংযুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন আহাদ হাদীস বা কিয়াসের দ্বারা উহার প্রয়োগকে সীমিত করা যায়। আবার কোন কোন আইনতত্ত্ব-বিদ বলেন যে, সাধারণ শব্দের দ্বারা একজনকেও বুঝাইতে পারে। কয়েক জনকেও বুঝাইতে পারে, আবার অনেকজনকেও বুঝাইতে পারে। কতিপয় আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, সাধারণ শব্দ একবচন হইলে অন্তত একজনকে এবং বহুবচন হইলে অন্তত তিনজনকেও বুঝায়, অবস্থার বিবেচনায় ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। হানাফী মতবাদের যুক্তি খুব সরল। তাঁহারা বলেন, কোন সাধারণ নীতির প্রয়োগ যদি সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় এবং এইরূপ সীমাবদ্ধতার কোন কারণ বা প্রমাণ উপস্থিত না থাকে, তবে সাধারণ শব্দযুক্ত নীতিকে ঐরূপ সীমিত ব্যাখ্যা দিলে তৎদ্বারা আইন-দাতার অভিপ্রায়কে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যা

যখন একই প্রকৃতির দুইটি নীতি একে অন্যের বিপরীত ভাব প্রকাশ করে তখন নিষেধাত্মক ভাবকে গ্রহণ করিতে হয়, অনুমতিজ্ঞাপক ভাবকে নয়। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে, তুমি ক্রীতদাসীকে গ্রহণ করিতে পারো। অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে, দুই ভগ্নিকে একত্রে গ্রহণ করিও না। এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে দুই ভগ্নি গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে, অন্যক্ষেত্রে দুই ভগ্নি একত্রে গ্রহণ নিষিদ্ধ। হানাফিগণ এই অভিমত অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, নিষেধাত্মক নীতি অনুমতিজ্ঞাপক নীতির উপর প্রাধান্য পায় এবং সে কারণে সবস্থলে দুই ভগ্নি গ্রহণ আইন বহির্ভূত।

বিরোধী নীতির সামঞ্জস্য সাধন

ক্ষেত্রবিশেষে দুইটি পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর। সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে, বিধবাদের ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন। আবার সূরা নিসায় বলা হইয়াছে, গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল প্রসব না হওয়া পর্যন্ত। হযরত আলী এ সম্পর্কে বলেন যে, বিধবাকে চার মাস দশ দিন কাল ইদ্দত পালন করিতেই হইবে কারণ ইহাই আল কুরআনের নির্দেশ। আল কুরআনে দুইটি সময় দেওয়া হইয়াছে। একটি হইতেছে প্রসবকাল পর্যন্ত আর একটি চার মাস দশ দিন। চার মাস দশ দিনের পর প্রসব হইলে তাহার পর আর তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। কিন্তু তাহার আগে হইলে তাহাকে এ মেয়াদ পালন করিতে হইবে। ইবনে মাস'উদ বলেন, সূরা নিসার নীতি সূরা বাকারার নীতিকে আংশিকভাবে রদ করিয়াছে এবং গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত তাহার প্রসবের সাথে সাথেই শেষ হইয়া যায়। চার মাস দশ দিনের আগে প্রসব হইলেও ইদ্দত প্রসবের সাথেই শেষ হইয়া যায়।

সাধারণ এবং বিশেষ নীতি

যখন একটি সাধারণ নীতির সহিত একটি বিশেষ নীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই দুইটি নীতির বিষয়বস্তু একই হয় এবং ইহার কোনটি আগে এবং কোনটি পরে জানা না যায়, তখন ধরিয়া লইতে হয় যে উভয় নীতি একই সময় প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এইরূপ ধরিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হয়। শাফিঈ'দের মতে বিশেষ নীতির

www.pathagar.com

সীমার মধ্যে সাধারণ নীতি গ্রহণ করিতে হয়। হানাফীদের মতে ঐ দুইটি নীতিকে কোন প্রকারে সামঞ্জস্যের মধ্যে না আনা গেলে সাধারণ নীতি সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয়। সাধারণ যদি বিশেষের পরবর্তীকালের হয় তাহা হইলে নির্বিবাদে ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিশেষ নীতি রদ হইয়া গিয়াছে। আর বিশেষ নীতি যদি সাধারণ নীতির পরবর্তীকালের হয় তবে বিশেষ নীতি সাধারণ নীতির যে অংশের সহিত অসমঞ্জস তাহা রদ করে।

সাধারণ নীতির সীমিত করণ

সাধারণ নীতি, অধীন বাক্যাংশ (غير المستقل) দ্বারা বা স্বাধীন বাক্য (المستقل) দ্বারা সীমিত হইতে পারে অধীন বাক্যাংশ সাধারণ নীতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। অধীন বাক্যাংশ সাধারণ নীতিকে চারিভাবে সীমিত করিতে পারে ; যথা—ব্যতিক্রম করিয়া (ইসতিসনা استثناء), শর্ত আরোপ করিয়া (শরত شرط), গুণ আরোপ করিয়া (সিফাত صفة) এবং পরিধি নির্ধারণ করিয়া (গাইয়া غاية)। অধীন বাক্যাংশ যেখানে ব্যতিক্রম নির্দেশ করে সেখানে সাধারণ নীতির প্রয়োগ কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়। অধীন বাক্যাংশ যেখানে শর্ত আরোপ করে, সেখানে সাধারণ নীতি ঐ শর্তের সীমানার মধ্যে প্রযুক্ত হয়। অধীন বাক্যাংশ যেখানে গুণ আরোপ করে, সেখানে সাধারণ নীতি ঐ গুণ সমন্বিত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়। অধীন বাক্যাংশ যেখানে পরিধি নির্ধারণ করে, সাধারণ নীতির প্রয়োগ সেখানে ঐ পরিধির মধ্যে সীমায়িত হইয়া যায়। সাধারণ নীতি একটি স্বাধীন বাক্য দিয়া সীমিত করা যায়। সাধারণ বাক্যের প্রকাশ এবং প্রয়োগ নানাভাবে হইতে পারে। ইহার প্রয়োগ যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং প্রথার আলোকে করিতে হয়। নাবালক বা উন্মাদ কোন দায়িত্ব বহন করিতে পারে না। দায়িত্ব বহনের আইন তাহাদের উপর প্রযুক্ত হয় না ; ইহা মানবিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ফল। আল কুরআন বলে, "তোমাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে।" এই সব কিছুই অর্থ সেই সব বস্তু যাহা মানুষ মূল্যবান মনে করে। যখন কোন মানুষ বলে, "আমি গোশত খাইব না", ইহার অর্থ যে গোশত সে সচরাচর খাইত তাহা সে খাইবে না।

অধীন বাক্যাংশের প্রতিক্রিয়া

যখন কোন সাধারণ নীতি অধীন বাক্যাংশ দ্বারা সীমিত হয়, তখন সীমায়িত ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণ নীতির প্রয়োগক্ষেত্র অটুট থাকিয়া যায়।

www.pathagar.com

সাধারণ নীতি হইতে যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তু বাহির করিয়া লওয়া হয় তবে ঐ বহির্ভূত বস্তু ছাড়া অন্য সর্বত্র সাধারণ নীতির প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু যাহা বাহির করিয়া লওয়া হয় তাহা যদি অনির্দিষ্ট হয়, তবে এই নীতি খাটে না।

স্বাধীন বাক্যের প্রতিক্রিয়া

সাধারণ নীতিকে যখন স্বাধীন বাক্য দিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তখন সাধারণ নীতি আর তাহার চরিত্রের চূড়ান্ততা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু যখন এই নিয়ন্ত্রণ আমাদের যুক্তিভিত্তিক হয়, তখন সাধারণ নীতির চূড়ান্ততা অব্যাহত ও অক্ষত থাকিয়া যায়।

কোন বিশেষ বস্তুকে স্বাধীন বাক্য দিয়া সাধারণের ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হইতেছে তাহা যদি বুঝা না যায় তবে সেই নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য হয় এবং সাধারণ নীতি বলবৎ থাকে। যাহা ব্যতিক্রম করা হইতেছে তাহা যদি বুঝিতে পারা যায় তবে তাহার প্রয়োগকে কিয়াসের দ্বারা বিস্তৃত করা যায়। এক ব্যক্তি বলিল, "আমি আমার দুইটি গরু এক হাজার টাকায় বিক্রয় করিলাম, তবে একটি গরু সম্পর্কে আমি আমার বিক্রয় প্রত্যাহার করিতে পারিব।" কোন গরু সম্পর্কে প্রত্যাহারের অধিকার রাখা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য কত, তাহা যদি জানা থাকে তবে এই চুক্তি সিদ্ধ গণ্য হয়। আর কোন্ গরুটি সম্পর্কে প্রত্যাহারের অধিকার রাখা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য কত টাকা, ইহা যদি জানা না থাকে তবে বিক্রয় চুক্তি অসিদ্ধ গণ্য হইবে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার দুইটি গরু বিক্রয় করে এবং হস্তান্তরের আগে একটি গরু মারা যায়, তবে জীবিত গরুটির বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

সাধারণ শব্দের উদাহরণ

ব্যাকরণের দিক হইতে এবং প্রয়োগের দিক হইতে শব্দ সাধারণ অর্থ বহন করিতে পারে। মানুষ শব্দ দ্বারা সমগ্র মানবজাতি বুঝাইতে পারে, আবার যাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে তাহাদের প্রত্যেককে বুঝাইতে পারে।

বহুবচনের ব্যবহার

যখন কোন শব্দ বহুবচনে ব্যবহার করা হয়, তখন তাহার অর্থ অন্তত তিন। আরবী ভাষায় বচন তিনটি ; যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

www.pathagar.com

কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আল কুরআনে যেখানে ভ্রাতাগণ এবং ভগ্নিগণ বলা হইয়াছে, সেখানে দুই বা ততোধিক ভ্রাতা ও ভগ্নি বুঝানো হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার সমগ্র আত্মীয় কুলের বরাবরে উইল করিয়া দেয় এবং তাহার আত্মীয়কুলের মধ্যে যদি দুইজন জীবিত থাকে তবে সেই দুইজন তাহার সমগ্র সম্পত্তি উইল মূলে পাইবে। এখানে বহুবচন বলিতে দুইজনকে বুঝায়।

বহুবচনের পূর্বে নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক প্রত্যয় যোগ

যখন বহুবচনে বাচক শব্দের পূর্বে টি, খানি, খানা প্রভৃতি শব্দ (আল ال) যোগ হয় এবং ঐ যোগ দ্বারা কোন বিশেষ বস্তুকে বুঝাইবার অভিপ্রায় থাকে না তখন ঐ শব্দ সমষ্টিবোধক সাধারণ অর্থ বহন করে। একটি হাদীসে, কোরাইশদের মধ্য হইতে ইমাম নির্বাচনের নির্দেশ দিতে গিয়া, 'ইমামগণ' শব্দের পূর্বে নির্দেশাত্মক প্রত্যয় 'আল' যোগ করা হইয়াছে। এই প্রত্যয় যোগের ফলে কোরাইশগণের মধ্য হইতে সকল ইমাম মনোনয়ন বাধ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। রসূলুল্লাহর ইন্তিকালের পর আনসারগণ দাবী করিয়াছিলেন যে, কুরাইশদের মধ্য হইতে একজন ইমাম মনোনীত করা হউক এবং আনসারদের মধ্য হইতে আরেকজন ইমাম মানোনীত করা হউক। উপযুক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এই দাবী নাকচ করা হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, বহুবচনের পূর্বে নির্দেশাত্মক প্রত্যয় থাকিলে তদ্দ্বারা ঐ শব্দাশ্রিত সমগ্র শ্রেণী বুঝাইবে। এক ব্যক্তি বলিল, "আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি "ক"-কে এবং আল-মাসাকীনদের বরাবরে দান করিলাম। এখানে "ক" অর্ধেক পাইবে এবং দরিদ্রগণ অর্ধেক পাইবে। বহুবচনবোধক শব্দের পূর্বে নির্দেশাত্মক প্রত্যয় না থাকিলে কি অর্থ দাঁড়াইবে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে।

একবচনবোধক শব্দের পূর্বে নির্দেশাত্মক প্রত্যয় যোগের প্রতিক্রিয়া

একবচন-বোধক শব্দের পূর্বে যখন নির্দেশাত্মক প্রত্যয় (আল ال) থাকে এবং উহার দ্বারা কোন একটি বিশেষ বস্তুকে বুঝানো না হয় তখন ঐ শব্দ

www.pathagar.com

সমগ্রতাবোধক হয়। চোরদের শাস্তির বিধান প্রসঙ্গে আল কুরআনে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইতেছে 'পুরুষ চোরটি এবং নারী চোরটি।' ইহার দ্বারা সমগ্র চোর শ্রেণীকে বুঝানো হইয়াছে।

অনির্দেশক শব্দ

কোন অনির্দেশক শব্দ যদি না-বোধক অর্থ বহন করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে সেই শব্দের বর্গীয় (generic) প্রয়োগ হয়। আল কুরআনে বলা হইয়াছে, 'জিজ্ঞাসা কর, কে তৌরাত নাজিল করিয়াছেন'। এখানে কে শব্দের দ্বারা সবকে বাদ দিয়া আল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়। যখন কোন ব্যক্তি বলে, "আমি যদি কোন মানুষকে প্রহার করি তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি" ইহার অথ, আমি কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিব না। কোন ব্যক্তি যদি বলে, "আমি আলেম ছাড়া কাহারও সহবতে যাইব না" ইহার অর্থ সেই ব্যক্তি শুধু আলেমের সহবতে থাকিবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার

আইয়ুন (أي) শব্দের প্রয়োগ বর্গীয়। মান (من) শব্দের ব্যবহারও বর্গীয় হইতে পারে। মা (ما) শব্দের প্রয়োগ জড় এবং জীব উভয় বস্তুর উপর হইতে পারে। জামী (جميع) এবং কুল (كل) শব্দের ব্যবহার বর্গীয়।

কর্ম হইতে অনুমান

যখন কোন মানুষের শুধু কাজ বর্ণিত হয়, তখন সেই কাজ হইতে কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ নহে। কোন বিশেষ কাজের পশ্চাতে বিশেষ পরিস্থিতি থাকিতে পারে ; সেই পরিস্থিতিকে অবধান না করিয়া শুধু কাজের উপর সিদ্ধান্ত অনুমান করা ঠিক নহে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কাবা শরীফে নামায পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এই হাদীস হইতে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুচিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয এবং নফল সব নামায কাবা শরীফে আদায় করিতেন। অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন্ নামায কাবা শরীফে পড়িয়াছিলেন তাহা ঠিক করিতে হইবে ;

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তরে বা বিশেষ ঘটনার উপরে বিবৃতি

প্রশ্নের উত্তরে যখন কোন বক্তব্য রাখা হয় কিংবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন বিবৃতি প্রদান করা হয় তখন সেই বক্তব্য বা বিবৃতি মৌলিক নীতিনির্দেশক হইতে পারে, আবার বিশেষ প্রশ্নাশ্রয়ী বক্তব্য বা বিবৃতি হইতে পারে। এই সম্বন্ধে আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

সদরুশ-শরীয়ত অনুযায়ী, কোন বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেও যদি কোন বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদত্ত হয়, তবুও সেই বক্তব্য বা বিবৃতিকে মৌলিক নীতিনির্দেশক গণ্য করিতে হয়। আসহাব এবং তাবাউনগণ এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ইজমা হইয়াছে। এই মতকে প্রিভি কাউন্সিল সমর্থন করে নাই (২২ কলিকাতা ৬৩২)।

চূড়ান্ত এবং শর্তযুক্ত নীতি

একটি বিষয় সম্পর্কে দুই রকম নীতি থাকিতে পারে। যথা চূড়ান্ত এবং শর্তযুক্ত নীতি। এই দুই নীতির মধ্যে যদি কোন বিরোধিতা না থাকে তবে উভয়কেই মানিতে হয়। একটি লোক বলিল, "মানুষকে খাদ্য দাও", এবং তারপর বলিল, "উলঙ্গ মানুষকে বস্ত্র দাও।" এখানে একজন ব্যক্তি দুইটি নির্দেশ দিয়াছে ; এই দুইটির একটি চূড়ান্ত এবং অপরটি শর্তযুক্ত। যেখানে বলা হইয়াছে যে মানুষকে খাদ্য দাও, সেখানে সকল মানুষকে বুঝানো হইয়াছে, কোন বিশেষ মানুষকে নয়। সেখানে মানুষের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু যেখানে বলা হইয়াছে যে, উলঙ্গ মানুষকে বস্ত্র দাও ; সেখানে দানের উদ্দেশ্য হইতেছে উলঙ্গ মানুষ, সকল মানুষ নয় ; সেখানে মানুষের উপরে শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। এই দুইটি নির্দেশ পরস্পরবিরোধী নয়। এই দুইটি আদেশই প্রতিপালন করা উচিত। যখন দুইটি বক্তব্য একই নির্দেশ বহন করে কিন্তু তাহাদের বিষয়বস্তু পৃথক হয় তখন হানাফীদের মতে উভয় বক্তব্যকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু শাফি-ঈদের মতে চূড়ান্ত বক্তব্য শর্তযুক্ত বক্তব্যের সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে। ঈদ উল-ফিতরের সময় ফিতরা প্রসংগে দুইটি হাদীস আছে। একটিতে বলা হইয়াছে "সকল স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের জন্য ফিতরা দাও।" অন্যটিতে বলা হইয়াছে, "মুসলিম স্বাধীন এবং ক্রীতাদাসের জন্য ফিতরা দাও"। হানাফীদের মতে গৃহের সকল মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য ফিতরা দিতে হইবে,

www.pathagar.com

শাফিঈদের মতে শুধু পরিবারের মুসলিমদের জন্য ফিতরা দিতে হইবে। অবশ্য একই বিষয়ে একই নির্দেশমূলক দুইটি হাদীস থাকিলে চূড়ান্ত নীতি শর্তযুক্ত নীতির সাপেক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দেশ দেওয়া হইল, 'তিন দিন রোযা রাখ'; একই ঘটনার ভিত্তিতে আবার বলা হইল, 'পরপর তিনদিন রোযা রাখ'। এস্থলে এরপর তিন দিনই রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু এই নীতি হাঁ-বোধক আদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য, না-বোধক আদেশ সম্পর্কে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দেশ দেওয়া হইল, 'ক্রীতদাসকে মুক্ত করিও না', তারপর বলা হইল, 'অমুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্তি দিও না।' এ স্থলে কোন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া যাইবে না। মূলনীতি হইতেছে, যতদূর পারা যায় ততদূর ভিন্ন ভিন্ন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

ভিন্নার্থক শব্দের ব্যাখ্যা

শব্দ বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্যাখ্যা করিবার সময় তাই শব্দ কি অর্থ বহন করিতেছে তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক বা আদি অর্থে ব্যবহৃত হইলে সেই শব্দকে সংজ্ঞাবাচক (হাকিকত حقيقة) শব্দ গণ্য করিতে হয়। বাই (بيع) বলিতে বিক্রয়, নিকা (نكاح) বলিতে বিবাহ, তালাক (طلاق) বলিতে বিবাহ বিচ্ছেদ, হিবা (هبة) বলিতে দান বুঝানো হয়। এইসব ক্ষেত্রে এই শব্দগুলিকে সংজ্ঞাবাচক শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সংজ্ঞাবাচক শব্দরূপে ব্যবহার না করিয়া উহাকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যায়। সেইসব ক্ষেত্রে ঐ শব্দকে মাধ্যমিক (মাজাজ مجاز) গণ্য করা হয়। কোন কোন লেখক শব্দগুলিকে সংজ্ঞাবাচক বা মাধ্যমিক না বলিয়া তাহাদের অর্থের উপর ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করিতে বলেন। সদরুশ-শরীয়তের মতে ইহা অন্যায়।

আভিধানিক, আইনভিত্তিক, প্রথাভিত্তিক, ঐতিহ্যবাহী এবং টেকনিকাল অর্থে শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে

যদি কোন শব্দ আভিধানিক (لغوى) অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন সেই ব্যবহারকে যথার্থ নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক গণ্য করা হয় কিন্তু শব্দ যখন আইনভিত্তিক, প্রথাভিত্তিক, ঐতিহ্যবাহী বা টেকনিকাল অর্থে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয় তখন ঐ ব্যবহারকে আলঙ্কারিক প্রয়োগ বা গূঢ় প্রয়োগ গণ্য করা হয়। সুতরাং মাধ্যমিক প্রয়োগ বলিতে উহাকে আদি অর্থ হইতে সংশ্লিষ্ট অর্থে স্থানান্তর বুঝায়। এই স্থানান্তর যখন হইয়া যায় তখন শব্দটি প্রয়োগ ক্ষেত্রে নূতন অর্থ বহন করিতে থাকে। ঐ শব্দের আদি অর্থ তখন লুপ্ত হইয়া যায়। একটি শব্দকে একই সময় সংজ্ঞাবাচক এবং মাধ্যমিক অর্থে ব্যবহার করা যায় না। একটি শব্দ একই সময় দুইটি অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে না। খামর বলিতে একটি বিশেষ প্রকার মাদক পানীয় বুঝায়, ইহাই ইহার আইনভিত্তিক অর্থ। খামরের মৌলিক অর্থ হইতেছে সেই বস্তু যাহা মানুষের জ্ঞানের উপর আবরণ সৃষ্টি করে। খামর শব্দ সংজ্ঞাবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় মাধ্যমিক অর্থে। যে বিশেষ পানীয়কে খামর বলা হইতেছে সেই বিশেষ পানীয় সম্ভবত এই কারণে ঐ নাম পাইয়াছে যে ইহা মানুষের জ্ঞানের উপর আবরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু আদি অর্থ যাহাই থাকুক, ইহার প্রয়োগিক অর্থ হইতেছে এক বিশেষ প্রকার মাদকপানীয়। গাজা, ভাঙ, সিদ্ধি প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানের উপর আবরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই বলিয়া ঐগুলিকে খামর নামে অভিহিত করা চলে না। শব্দের প্রয়োগ যেখানে অভিপ্রায়ভিত্তিক সেখানে ঐ প্রয়োগকে শব্দের অর্থ (মানা معنی) বলে। শব্দের প্রয়োগ যেখানে সিদ্ধান্তভিত্তিক সেখানে উহাকে গুঢ়ার্থক (মাফহুম مفهوم) বলে। যে বস্তুর জন্য শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, শব্দের প্রয়োগ সেই ভিত্তিতে হইলে উহাকে মুসাম্মা (مسمی) বলে।

কোন বিশেষ সময়ের সম্পর্কে শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। যদি বলা হয়, বালেগ হইলে এতিমদিগকে তাহার সম্পত্তি দাও। এতিমগণ বালেগ হইলেই তবে এই নির্দেশ কার্যকর হয়। কখনো কখনো শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ দ্বারা যাহা প্রতীয়মান হইতেছে তাহা না বুঝাইয়া অন্য বস্তু বুঝায়। খামর বুঝাইতে মাসকির (مسکر) শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন সময় শব্দের এমন প্রয়োগ হয় যাহাতে ইহা আদি অর্থ বর্ণনা করিয়া বিপরীত অর্থ বহন করে। "অংশ দ্বারা সমগ্র, সমগ্র দ্বারা অংশ, বহুবচন দ্বারা একবচন, রাকাবা (স্কন্ধ رقبة) দ্বারা ক্রীতদাস, কারণ দ্বারা ফল, ফল দ্বারা কারণ, শর্ত দ্বারা বস্তু এবং বস্তু দ্বারা শর্ত" বুঝানো যাইতে পারে। মূল আয়াতে যখন বলা হয়, আল্লাহতালা আসমান হইতে খাদ্য প্রেরণ করেন, তখন ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহতালা বৃষ্টি দেন এবং সেই বৃষ্টিতে ফসল

www.pathagar.com

ফলে। আরেকটি আয়াতে যখন বলা হয়, আল্লাহ তোমার ঈমানকে বৃথা যাইতে দিবেন না, তখন ঈমান বলিতে দীনি আমল বুঝায়। যখন কোন সাহসী লোককে সিংহ বলা হয় তখন ঐ ব্যক্তির মধ্যে সিংহের সাহস আরোপ করা হয়।

আইনের অভিব্যক্তি কোন সময় সংজ্ঞাবাচক অর্থে আবার কোন সময় মাধ্যমিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্পত্তির বদলে সম্পত্তি দেওয়াকে বিক্রয় চুক্তি বলা যায়। মানুষের শ্রমের বদলে সম্পত্তি ইজারা দেওয়া যায়। মানুষের শ্রম সম্পর্কিত চুক্তিকে তাই মাধ্যমিক অর্থে বিক্রয় বলা যায়। কারণ দ্বারা অনেক সময় ফল বুঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হানাফীদের মতে বিবাহ দ্বারা স্বামীর বরাবরে স্ত্রীর উপর মালিকানা সৃষ্টি হয়। স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা দিতে বাধ্য এবং বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকারও সে রাখে। এমতাবস্থায় স্বামীকে স্ত্রীর মালিক বলা একেবারেই অসঙ্গত নয়। এমতাবস্থায় কোন নারী যদি কোন পুরুষকে বলে, মোহরানার এওয়াজে আমি আপনার কাছে আমাকে বিক্রয় করিয়াছি এবং পুরুষ যদি তদুত্তরে বলে আমি মঞ্জুর করিয়াছি তবে ঐ নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইয়া যাইবে। বিক্রয় করিবার কথা না বলিয়া যদি দান করিবার কথা বলা হয় তবুও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, কারণ দানের মাধ্যমে মালিকানা সৃষ্টি হয়। এইসব ক্ষেত্রে যদিও বিক্রয় ও দান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তবুও উহাদের প্রয়োগ সংজ্ঞাবাচক নহে, মাধ্যমিক। ইহাদের দ্বারা বিবাহ বুঝানো হইয়াছে। শাফিঈ সম্প্রদায় এই মতকে অগ্রাহ্য করে। তাঁহারা বলেন, বিবাহের উদ্দেশ্য হইতেছে বংশরক্ষা, প্রবৃত্তিদমন এবং প্রেম। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে এইগুলি সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং বিক্রয় এবং দান শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইলে নিকা (نكاح) বা তাজবীজ (تزويج) বা ঐ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

ফলের দ্বারা কারণ প্রকাশ

কোন কোন সময় এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয় যে প্রকাশ্যে ফলস্বরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে কারণ-স্বরূপ। কিন্তু যে শব্দের ব্যবহার এইরূপ, সে শব্দে ফল এইরূপ প্রকৃতির হইবে যাহা কারণ হইতে উদ্ভূত।

www.pathagar.com

শব্দের মাধ্যমিক প্রয়োগ

শব্দ প্রাথমিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে আবার মাধ্যমিক অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এক ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে বলে, 'এই ব্যক্তি আমার পুত্র।' এই বাক্য উচ্চারণ করিবার সাথে, ইমাম আবু হানিফার মতে, ঐ ক্রীতদাস মুক্ত হইয়া যাইবে ; কারণ কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে ক্রীতদাস করিতে পারে না। পুত্রের মালিকানা পিতার নাই। ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়জ্ঞাপক বাক্য একবার উচ্চারিত হইলেই ক্রীতদাস মুক্ত হইয়া যায়। এইরূপ বাক্য প্রত্যাহার করা যায় না। ইমাম আবু হানিফার দুই শিষ্য মুহাম্মদ এবং ইউসুফ এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা বলেন, উচ্চারিত বাক্য অর্থহীন। সুতরাং ইহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই।

শাফিঈ সম্প্রদায় মনে করে যে, খামর বলিতে শুধু মদ বুঝায় না অন্যান্য মাদকও বুঝায়। হানাফিগণ মনে করেন যে, তাহাদের এই ব্যাখ্যা ভুল, কারণ, একই শব্দকে তাহার সংজ্ঞাবাচক অর্থে এবং দূরায়ত অর্থে ব্যবহার করা যায় না।

শব্দের অর্থ নিরূপণের পদ্ধতি

আল কুরআনে বলা হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ঈমান আনিতে পারে।' এই বাক্যের শাব্দিক অর্থ অতি পরিষ্কার। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ঈমান আনা ও না আনা ইচ্ছার কথা, যে কেউ ইচ্ছা করে সে ঈমাম আনুক ; আর যে কেউ ইচ্ছা না করে, সে ঈমান না আনুক। বাক্যটিকে এই অর্থে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। আল কুরআনের বহু আয়াতে বলা হইয়াছে, বেঈমান পরকালে শাস্তি পাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুরআনের অধিকাংশ আয়াত অনুযায়ী ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য, ইহা ইচ্ছার ব্যাপার নহে। এমতাবস্থায় 'যে ইচ্ছা করে সে ঈমান আনিতে পারে' এই বাক্যে যে শব্দাবলী আছে তাহা প্রাথমিক অর্থে গ্রহণীয় নহে। এই শব্দগুলিকে মাধ্যমিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক অর্থে গ্রহণ করিলে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কিছু মানুষ ঈমান আনিবে আর কিছু মানুষ আনিবে না।

www.pathagar.com

একটি হাদীসে আছে, 'নিয়ত ছাড়া ইবাদত নাই।' এই হাদীসের অর্থ শাব্দিকভাবে গ্রহণ করা ঠিক নহে। নিয়ত ছাড়াও নামায পড়া যাইতে পারে। এই বাক্যের অর্থ দাঁড়াইবে, যে ইবাদতের পশ্চাতে আন্তরিকতা নাই, তাহার মূল্য নাই। যদি বলা হয়, 'সে একটি মানুষ' তবে এই বলার উদ্দেশ্য থাকে যে ঐ ব্যক্তি একজন গুণবান মানুষ। যদি বলা হয়, 'আমি এই গাছের কিছু খাইব না, ইহার অর্থ এই যে, 'আমি গাছের ফল খাইব না।' যদি বলা হয়, 'ঝরণার পানি ঘাসের জন্ম দিয়াছে' ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার রহমতে ঝরণার পানিতে ঘাস সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এইসব উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হয় যে, শব্দের ব্যবহার যেমন প্রাথমিক তেমনি মাধ্যমিকও হইতে পারে। কি ভাবে কোন স্থানে কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুদ্ধি খাটাইয়া পরিস্থিতি দেখিয়া অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়া নিতে হয়।

শব্দের স্পষ্ট এবং সাংকেতিক ব্যবহার

শব্দের ব্যবহার দুই রকম হইতে পারে। যথা স্পষ্ট (সরিহ صريح) এবং সাংকেতিক (কিনায়া (كناية) যে শব্দ প্রয়োগের সময় তাহার আদি অর্থ বহন করে তাহাকে স্পষ্ট শব্দ বলে আর যে শব্দ প্রয়োগের সময় তাহার আদি অর্থ বহন করে না সেই শব্দকে সাংকেতিক বলে। স্পষ্ট শব্দ বিধৃত বাক্য সহজেই বোধগম্য। ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা নিষ্প্রয়োজন। সাংকেতিক শব্দ বুঝিতে হইলে ঐ শব্দের প্রয়োগকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—নতুবা পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হয়। যে আইনে শাস্তির ব্যবস্থা আছে সে আইনে স্পষ্ট ভাষার ব্যবহার থাকা চাই। অন্যথায় ইহা কার্যকরী হয় না।

লিপির শ্রেণীবিন্যাস

লিপিকে (কিতাবাত كتابة) তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

(১) সহজ পাঠ্য প্রথামাফিক এবং নিয়মিত লিপি (মুস তাবিনুন মুরসুমুন (مستبين مرسوم) ঃ কাগজের উপর সমস্ত বিবরণ দিয়া যাহা লেখা হয় তাহাকে এই শ্রেণীর লিপি বলা যায়। স্পষ্ট শব্দ বা বাক্যের যে মর্যাদা এই লিপিরও সেই মর্যাদা।

www.pathagar.com

(২) সহজ পাঠ্য কিন্তু প্রথাবহির্ভূত এবং অনিয়মিত লিপি (মুসতাবিয়ুন গাইরু মুরসুমুন مستبين غير مرسوم) প্রাচীর গাত্রে বা বৃক্ষপত্রের লিপি এই শ্রেণীতে পড়ে। প্রথা বহির্ভূত এবং অনিয়মিত হইলে কাগজের উপর লিপিও এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত লিপি সাংকেতিক বলিয়া গণ্য, ইহাদের অর্থ গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হয়।

(৩) অস্থায়ী এবং অদৃশ্য লিপি (গাইরু মুসতাবিয়ুন غير مستبين) ঃ এইগুলি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবার কথা নহে।

মুক এবং বধিরদের অঙ্গভঙ্গিকে সাংকেতিক ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা নিরক্ষর হউক বা সাক্ষর হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

শব্দের অর্থের শ্রেণীবিন্যাস

শব্দের অর্থ প্রকাশিত বা লুক্কায়িত হইতে পারে। প্রকাশিত হইলে ঐ শব্দকে বলে প্রতীয়মান (জাহির ظاهر)। শব্দের অর্থ যদি অধিক প্রকাশিত হয় তবে ইহাকে বলে স্পষ্ট (নাস نص); ইহা যদি এমন প্রকৃতির হয় যে ইহাকে আর অধিকতর প্রকাশ করা যায় না। তবে ঐ শব্দকে দ্ব্যর্থহীন (মুফাসার (مفسر) এবং ইহা যদি অধিকতর স্পষ্ট হয় এবং অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি-বিশিষ্ট হয় তবে ইহাকে স্থির (মুহকাম محكم) বলা হয়। আল কুরআনে বলা হইয়াছে, বিক্রয় হালাল ও রিবা হারাম। এই আয়াতকে প্রতীয়মান বলা হয়; কারণ ইহার কোন অস্পষ্টতা নাই। এই আয়াত জাহিরের উদাহরণ। স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হইয়াছে দুই, তিন, চার। বিবাহের ক্ষেত্রে এই আয়াত জাহির এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে নাস। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন বলিয়া যে আয়াত আসিয়াছে তাহা মুহকামের উদাহরণ।

অবস্হার জন্য যে শব্দের অর্থ লুক্কায়িত হয় তাহাকে গুপ্ত (খাফি خفى) বলে। অর্থের দিক হইতে যে শব্দ খাফি কিন্তু বুদ্ধি বিচারের মাধ্যমে যাহার অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে মুশকিল (مشكل) বলে। যে শব্দের অর্থ অন্য শব্দের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে হয় তাহাকে অস্পষ্ট বা মুজমাল (مجمل) শব্দ বলে। শব্দ যদি এমন হয় যে কিছুতেই ইহার অর্থ আবিষ্কার করা যায় না তবে ঐ শব্দকে অবোধ্য মুতাশাবিহ (متشابه) বলে।

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় সাধারণ চোরকে সারিক বলে, কাফন চোরকে বলে নাব্বাস এবং পকেটমারকে বলে তাররার। শাস্তি প্রসংগে আল কুরআনে সারিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এই শব্দের ব্যবহারেকে খাফি বলা যায়। আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এই বাক্য মুজমাল; কারণ রিবা অর্থ বৃদ্ধি এবং সকল আইনবিদদের মতে সর্বপ্রকার বৃদ্ধি হারাম নয়। রসূলুল্লাহ্ ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আল কুরআনের সূরার প্রথম দিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে শুধু অক্ষরের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা মুতাশাবিহার উদাহরণ।

যখন শব্দ খাফি তখন অনুসন্ধান করিতে হয়। যখন শব্দ মুশকিল তখন অনুসন্ধান এবং চিন্তা করিতে হয়। যখন শব্দ মুজমাল তখন অনুসন্ধান, চিন্তা এবং আলোচনা করিতে হয়। যখন শব্দ মুতাশাবিহ্ তখন অনুসন্ধান অনর্থক হইয়া পড়ে।

সর্বপ্রথম শব্দকে তাহার প্রাথমিক অথে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে অসুবিধা হইলে অন্য পথ ধরিতে হয়।

চূড়ান্ত পাঠ

কোন লিপিবদ্ধ বক্তব্যকে পাঠ (Text) বলা হয়। পাঠ দুইভাবে চূড়ান্ত (কাত্ই قطعی) হইতে পারে। পাঠ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকিতে পারে, এমন অবস্থা হইলে ইহা নিশ্চিত জ্ঞান (ইলমুল একিন علم يقين) বহন করে। পাঠ এমন হইতে পারে যে ইহার প্রমাণ বা অর্থ সম্পর্কে প্রামাণ্য যুক্তি বর্তমান। এইরূপ পাঠ সন্তোষজনক জ্ঞান (ইলমুত তামানিয়াত علم اطمانية) বহন করে।

শব্দের অর্থ

বস্তু নির্দেশ করিতে শব্দ ব্যবহার করা হয় (মাওদু লাহু موضوع له)। বস্তুর অংশ নির্দেশ করিতে শব্দ ব্যবহার করিতে হয় (জুজ جزء)। শব্দের এমন ব্যবহারও দেখা যায় যাহাতে প্রয়োগ দ্বারা উহার লক্ষ্য নির্দেশিত হয় (লাজিমুহুল মুতাখ্খার لازمه المتاخر)। ভাষার দ্বারা এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে (ইবরাতুন عبارة)। সংকেত দ্বারাও এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে (ইশারাতুন اشارة)।

www.pathagar.com

বিবরণমূলক এবং সংজ্ঞামূলক অর্থ

আল কুরআনে বলা হইয়াছে 'যে নারী সন্তানের জন্ম দিয়াছে তাহার ভরণপোষণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত যাহার জন্য সে সন্তানের জন্ম দিয়াছে।' স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই আয়াতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা আরও বুঝায়, সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার; কারণ তাহার কারণেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই আয়াতে আরও বুঝা যায় যে, সন্তানের উপর পিতার অধিকার আছে কারণ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পিতার জন্যই মাতা সন্তানের জন্ম দিয়াছে। এই আয়াতে আরও বুঝা যায় যে, সন্তানের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের অধিকার পিতার।

বক্তব্যের অর্থ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া আল কুরআন বলে, 'তাহাদের জন্য উহ্ বলিও না। এই বাক্যের অর্থ পিতা মাতার মনে বেদনার সৃষ্টি করে, এমন কিছু করা সন্তানের পক্ষে উচিত নয়।

অনুমোদন দ্বারা নিষেধ বুঝায় না

যখন বলা হয় যে, 'হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নবী ছিলেন 'তখন ইহা বলা হয় না যে আর দুনিয়ায় কোন নবী ছিলেন না। এক বিষয়ে বলা হইলে অন্য বিষয় নাকচ হইয়া যায় না। নিষেধাত্মক আদেশ থাকিলে তদ্দ্বারা নির্দেশাত্মক আদেশ সূচিত হয় না।

শব্দ হইতে আইনের উদ্ভব

আইনে কাজকে ফরয, হারাম, মুবাহ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। শব্দের মাধ্যমে কি রূপে ইহাদের উদ্ভব হয় তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়। বিবৃতি আকারে যাহা বলা হয় তাহা হইতে অবশ্য প্রতিপাল্য আইনের উদ্ভব হইতে পারে। বিবৃতির আকারে যাহা বলা হয় তাহার তাগিদ বেশী। উদাহরণস্বরূপ আল কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ

'সন্তানগণকে জননী স্তন্য দান করেন।' এই আয়াত একটি বিবৃতি মাত্র। ইহার মধ্যে আপাত প্রতীয়মান কোন আদেশ বা নিষেধ নাই, তবুও

www.pathagar.com

এই আয়াত শরীফের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে সন্তানদিগকে স্তন্য পান করানো সকল জননীর পক্ষে ফরয। বিবৃতিমূলক বাক্য হইতে আদেশাত্মক আইনের আবিষ্কার করার কারণ সুস্পষ্ট। আল্লাহতালা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা একটি অবিসংবাদিত সত্য এবং যাহা সত্য তাহা সকলের মানা উচিত। সুতরাং যদিও আল্লাহতালা বলেন নাই যে "হে জননিগণ তোমরা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দাও"—তবুও যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহার অর্থ ঐরূপ দাঁড়ায়। ঐরূপ অর্থ না করা হইলে আল্লাহতালা প্রদত্ত বিবরণের উপর অসত্যতা আরোপ করা হয়।

আদেশাত্মক বাক্য আইনের জন্ম দিতে পারে। যখন বলা হয়, ইহা কর বা ইহা করিও না তখন এইসব আদেশাত্মক বাক্যের মধ্যে আইনের উৎস খুঁজিয়া লইতে হয়। এই প্রকার বাক্যগুলিকে উদ্ভবকারী (ইনশা الشاء) বাক্য বলা হয়।

অনুজ্ঞাবাচক শব্দ

হানাফীদের মতে, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য আদেশবাহী। যে বিষয়ে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়, সেই বিষয়ে ঐ বাক্য বিধৃত অনুজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্বাপর অবস্থা বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করিয়া চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া যায় না। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য উপদেশমূলক বা অনুমতিমূলক হইতেও পারে। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য দ্বারা বলা যাইতে পারে যে এই কাজটি করা ভাল বা এই কাজটি করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। আল কুরআনের একটি আয়াতে বলা হইয়াছে, 'তোমরা যখন আদান প্রদান কর তখন উহা লিপিবদ্ধ কর।' আল কুরআনের এই আয়াতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (Imperative) ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারগণ এই আয়াতের অনুজ্ঞা বা নির্দেশকে বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) বলেন নাই। তাঁহারা এই আয়াতকে উপদেশমূলক বা অনুমতিমূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি অনুজ্ঞায় আছে, "তোমরা শিকার কর" ইহার অর্থ এই নয় যে, শিকার করা ওয়াজিব। ইহাতে শিকারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অনেক আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন, অনুজ্ঞাবাচক বাক্যকে নির্দেশরূপে গ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই। কারণ অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের অন্য রূপ ব্যবহারও সচরাচর দৃষ্ট হয়। অনেক আইনতত্ত্ববিদের মতে

www.pathagar.com

অনুজ্ঞাবাচক শব্দকে উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। আবার কেহ কেহ মনে করেন ইহা শুধু অনুমতির ভাব বহন করে। হানাফিগণ মনে করেন যে, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য অনুমতিমূলক হইতে পারে আবার বাধ্যতামূলকও হইতে পারে। কোন স্থলে ইহা কোন ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। নিষেধবাচক বা না-বোধক বাক্যের ব্যাখ্যাও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাজ

অনুজ্ঞাবাচক বা নিষেধবাচক বাক্যসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কতিপয় সাধারণ নীতি প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। যে কাজ সম্পর্কে অনুজ্ঞাবাচক বা নিষেধবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকৃতির উপর এইসব সাধারণ নীতি নির্ভরশীল। কাজ ভাল (হুছনুন حسن) বা মন্দ (কুবহন قبح) অথবা কাজটি ন্যায় বা অন্যায় ইহার উপর এইসব নীতির প্রয়োগ নির্ভর করে।

কাজ উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট তাহা তিন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হয়। প্রথমত, কাজ মানব-মানসে আনন্দদায়ক বা বিরক্তিজনক হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, গুণের দিক হইতে কাজ নিখুঁত বা খুতযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয়ত ইহলোক এবং পরলোকে কাজ জাযা বা সাজার কারণ হইতে পারে। প্রথম দুই দৃষ্টিকোণের বিচার যুক্তির মাধ্যমে হইতে পারে। তৃতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে কাজের বিচার সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আইন যাহা করিতে বলে তাহা করা ভাল এবং আইন যাহা করিতে নিষেধ করে তাহা করা মন্দ ; এই অভিমত সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু আশারিগণ বলেন যে, আইনের নির্দেশ এবং নিষেধ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। অথাৎ আইন যাহা করিতে বলে, তাহা নিশ্চয় ভাল কাজ এবং আইন যাহা করিতে নিষেধ করে, তাহা নিশ্চয় মন্দ কাজ। মোতাজিলাগণ মনে করেন যে, আমাদের যুক্তি যাহাকে ভাল বলে তাহা করিতে আইন আদেশ দেয় এবং আমাদের বিবেক যাহা খারাপ বলিয়া নির্দেশ করে, তাহা করিতে আইন নিষেধ করে। সুন্নিগণের অধিকাংশের মতে যুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ ভাল কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করা যায় ; কিন্তু তাই বলিয়া আইনদাতা, মানুষ যাহা ভাল মনে করে তাহা আদেশ দিতে এবং মানুষ যাহা খারাপ মনে করে তাহা নিষেধ করিতে বাধ্য নন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বলেন

www.pathagar.com

যে, আইনদাতা যাহা ভাল তাহা আদেশ দেন, যাহা মন্দ তাহা নিষেধ করেন। মোতাজিলা এবং অধিকাংশ সুন্নীদের মতের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা শাব্দিক মাত্র, মৌলিক নয়।

কাজ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট তাহা অন্য দুই ভাবে দেখা যায়। কাজ আদতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইতে পারে। আবার উহা অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসিয়া উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইতে পারে। এই অন্য কিছু কাজের বাহিরের বস্তু হইতে পারে বা ইহার অংশ হইতে পারে। যখন ইহা কাজের অংশ, তখন ঐ অংশের নামের সহিত কাজের নামের তফাৎ থাকে না। নামায যদিও ইবাদতের অংশ, তবু ইহাকে ইবাদত বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ নাও হইতে পারে। সেজদা নামাযের অঙ্গ কিন্তু সেজদাকে নামায বলা হয় না। জেহাদ করা ভাল কি মন্দ, তাহা নির্ভর করে জেহাদের অংশভুক্ত কোন কাজের জন্য নয়, অন্য বিচারে। দুশমন অমুসলিমের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ভাল, অন্যথায় জেহাদ ভাল নয়। অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে আর জেহাদ করার কারণ থাকে না।

ভাল কাজ

এমন কিছু ভাল কাজ আছে, সেগুলি কোন সময়েই ত্যাগ করা উচিত নহে। ঈমানের স্বীকৃতি এমন একটি কাজ, যাহা কোন সময় পরিত্যাগ করিতে হয় না। আবার এমন কাজ আছে যেগুলি পরিত্যাগ করা চলে। ঈমানের স্বীকৃতির প্রকাশ ইকরার (اقرار) সময় বিশেষ বন্ধ রাখা যায়। যথেষ্ট কারণ বা অজুহাত না থাকিলে যে কাজ আদতে ভাল তাহা কখনোই ত্যাগ করা যায় না। কোন ব্যক্তি যদি তাহার ঈমানের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং তাহার এই অস্বীকৃতির পশ্চাতে যদি কোন জবরদস্তি বা অন্য কোন প্রকার সিদ্ধ কৈফিয়ত না থাকে তবে সেই ব্যক্তিকে মোমিন বলা যায় না। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি নিজেরা ভাল এবং অন্যের সহিত যোগেও ভাল। যাকাত দেওয়ার কাজটি যেমন নিজে ভাল তেমনি দরিদ্রের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহা দরিদ্রদের পক্ষেও ভাল। কিন্তু যাকাত আদায় করিবার উপর দরিদ্রের কোন স্বত্ব নাই। হজ্জ করা ভাল কাজ কিন্তু তাহাতে অন্যের কোন উপকার নাই। রোযা রাখা আর নিজের প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করা একই কথা। এমতাবস্থায় যাকাত, রোযা এবং হজ্জ

www.pathagar.com

প্রভৃতি কাজকে নিজগুণে ভাল বলা হয়। এইগুলি পবিত্র ইবাদত। যাহারা যোগ্যতা রাখে তাহারাই শুধু এই কাজগুলি করিতে বাধ্য।

নিষেধবাচক শব্দ

যে কাজগুলি করিতে নিষেধবাচক আইনের মাধ্যমে বাধা দেওয়া হয় সেগুলিকে মন্দ কাজ বলিয়া ধরা হয়। নরহত্যা, ব্যভিচার এবং মদ্যপান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সুতরাং এগুলি মন্দ কাজরূপে গণ্য। যে কাজ অন্য কিছুর সহিত যোগের ফলে খারাপ গণ্য হয় এবং সেই কারণে নিষিদ্ধ করা হয় সেই কাজ ক্ষেত্রবিশেষে সামগ্রিকভাবে মন্দ হইতে পারে, আবার আংশিকভাবেও মন্দ হইতে পারে। যাহা যোগে কাজ খারাপ গণ্য হয় তাহা যদি কাজের অংশ হয় তবে ঐ কাজকে সামগ্রিকভাবে মন্দ ধরিতে হয়। কিন্তু যাহা যোগে কাজ খারাপ গণ্য হয় তাহা যদি বাহিরের বস্তু হয় তাহা হইলে ঐ কাজ খারাপ নাও হইতে পারে।

বাতিল ফাসিদ এবং মাকরূহ কাজ

যখন কোন কাজ মন্দ হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ হয় তখন সেই কাজকে বাতিল (باطل) বলা হয়। যখন কোন কাজকে তাহার বিশেষ দোষের জন্য নিষেধ করা হয় তখন সেই কাজ ফাসিদ (فاسد) বলিয়া গণ্য হয়। যখন কোন কাজ অন্য কোন পরিস্থিতির কারণে নিষিদ্ধ করা হয় তখন তাহাকে মাকরূহ (مكروه) বলে।

বয়ান

একটি পাঠকে (text) অন্য পাঠ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। ইহাকে আইনের পরিভাষায় বয়ান (بيان) বলা হয়। আইনের একটি পাঠকে অন্য পাঠ দ্বারা কখনো কখনো রদ করিতে দেখা যায় ইহাও এক প্রকার বয়ান। আল কুরআনের একটি আয়াত যখন অন্য আয়াত দ্বারা রদ করা হয় (নসখ نسخ) তখন রদকারী আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রথমোক্ত আয়াতের আদেশ বলবৎ থাকে। কোনো কোনো আইনতত্ত্ববিদ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন আদেশ রদ হইয়া গেলে তাহার সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। একটি আয়াতকে যখন অন্য আয়াত রদ করে, তখন দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতকে ব্যাখ্যা করে না, নষ্ট করিয়া দেয়।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে স্পষ্টতর করিয়া তোলা যায়। ইহাকে (তকরীর تقرير) বলে। আবার ইহাকে অনির্দিষ্টতা হইতে নির্দিষ্টতার দিকে লইয়া যাওয়া যায়, ইহাকে (তফসীর تفسير) বলে।

কোন কোন পাঠ অন্য পাঠকে গুণ এবং প্রয়োগের দিক হইতে সীমায়িত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

একটি পাঠ অন্য পাঠ দ্বারা রদ হইতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে উভয় পাঠের মধ্যে বিরোধিতা থাকিতে হইবে এবং ঐ বিরোধিতা একই বিষয় সম্পর্কে, একই সময় এবং একই স্তরের হইবে।

হানাফী এবং শাফিঈ ও মালেকী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আইনতত্ত্ব-বিদের মতে (১) আল কুরআনের একটি পাঠ অন্য পাঠ দ্বারা রদ হইতে পারে, (২) একটি হাদীস অন্য হাদীস দ্বারা রদ হইতে পারে, (৩) আল কুরআনের পাঠ হাদীসের পাঠ দ্বারা রদ হইতে পারে এবং (৪) হাদীসের পাঠ কুরআনের পাঠ দ্বারা রদ হইতে পারে। শাফিঈ এবং মালেকী সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক আইনতত্ত্ববিদ হাদীসের পাঠ দ্বারা কুরআনের পাঠের রদ স্বীকার করিতে রাজী নন।

সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে যে, পিতামাতার বরাবরে উইল করিয়া যাওয়া উচিত কিন্তু সূরা নিসায় বলা হইয়াছে যে, পিতামাতা মরহুমের ওয়ারিশ হইবেন। এই ক্ষেত্রে সূরা নিসার আয়াত সূরা বাকারার আয়াতকে রদ করিয়াছে। সূরা বাকারার একটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে, বিধবাগণ খোরপোষ পাইবে। কিন্তু সূরা নিসার এক আয়াত দ্বারা ইহা রদ করা হইয়াছে।

রসূলুল্লাহর (সঃ) এক হাদীসে দেখা যায় যে, মাজার জেয়ারত নিষিদ্ধ কিন্তু তাহার পরবর্তী হাদীসে ইহার অনুমতি দেখা যায়। কুরআনের পাঠকে হাদীসের পাঠ দ্বারা রদের দৃষ্টান্ত বিরল। আল কুরআনের আয়াত দ্বারা হাদীসের রদের বহু উদাহরণ আছে। হাদীসের ভিত্তিতে জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া হইত, পরে আল কুরআনের আয়াত কাবা গৃহকে কেবলা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। আল কুরআনে এভাবে হাদীসের বিধিকে রদ করে। এই প্রকার রদের পরিস্থিতি আর উদ্ভব হইতে পারে না কারণ রসূলুল্লাহ্র (সঃ) ইন্তিকালের সাথে সাথে কুরআন শরীফের উৎসমুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

আল কুরআন বা হাদীসের আইন ইজমা বা কিয়াস দ্বারা রদ করা যায় না। ইজমাকে ইজমা দ্বারা এবং কিয়াসকে কিয়াস দ্বারা রদ করা যায়।

আল কুরআনের আয়াতে যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির আধ্যাত্মিক মূল্য বর্তমান। এই শব্দগুলি উচ্চারণে সওয়াব হয় এবং ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ গুনাহের কাজ। কখনো কখনো আল কুরআনের একটি আয়াতে আইনের দিক হইতে অন্য আয়াত দ্বারা রদ করা হয়; রদ সত্ত্বেও ইহা আল কুরআনের অংশ থাকিয়া যায়। কিন্তু যেখানে একটি আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের ভাষা এবং আইন রদ করা হয় সেখানে রদকৃত আয়াত আর আল কুরআনের অংশ থাকে না। আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় আল কুরআন সংগ্রহের সময় এইরূপভাবে রদকৃত আয়াতগুলি বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই প্রকার রদকৃত আয়াতের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ইংগিতের মাধ্যমে বয়ান

আল কুরআনে বলা হইয়াছে, পিতামাতা তাহার (মরহুম) ওয়ারিশ হইবে এবং মাতা এক তৃতীয়াংশ পাইবে। এখানে পিতা কত পাইবে তাহা বলা হয় নাই; ইংগিত করা হইয়াছে মাত্র। সেই ইংগিতে বুঝা যায় যে, পিতা অবশিষ্ট সম্পত্তি পাইবে। কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ প্রথার প্রচলন অব্যাহতভাবে চলিতে দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সম্পর্কে কিছু বলা না হইলেও ইংগিত দ্বারা ইহাদিগকে সমর্থন দেওয়া হইয়াছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ইজমা এবং প্রথা

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইজমা

ইজমার সংজ্ঞা

কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ প্রশ্নে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের ঐকমত্যকে আইনের পরিভাষায় ইজমা বলে। ইহা আইনের একটি উৎসরূপে গণ্য হয়। আল কুরআন এবং আল-হাদীসে ইজমার সমর্থনে অনেক উক্তি পাওয়া যায়। আল কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং আল-হাদীসের কিছু পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

(১) মুসলিমগণ যাহা ভাল মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে ভাল মনে করেন। —হাদীস।

(২) আমার উম্মতগণ, যাহা অন্যায় তাহাতে কখনও একমত হইবে না।—হাদীস।

(৩) সংখ্যাগুরুর অনুসরণ করা তোমাদের জন্য বাধ্যকর।—হাদীস।

(৪) আল্লাহতালার হেফাজতের হাত সকলের উপর প্রসারিত। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে তাহারা ঠকিবে।—হাদীস।

(৫) বিচ্ছিন্নবাদিগণ দোযখে যাইবে। —হাদীস।

(৬) যাহারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়ার পরও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহাদের মত হইও না।—আল কুরআন।

(৭) অদ্য আমরা তোমার দ্বীনকে পূর্ণ করিয়াছি। —আল কুরআন।

(৮) যাহা সত্যের বাহিরে তাহা ভ্রম।—আল কুরআন।

(৯) আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি অনুগত হও এবং অনুগত হও তাহাদের প্রতি যাহাদের কর্তৃত্ব আছে।—আল কুরআন।

(১০) তুমি যদি নিজে না জান তবে যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। —আল কুরআন।

(১১) মানুষের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ। যাহা ন্যায় তাহা করিতে এবং যাহা অন্যায় তাহা না করিতে লোকদের আদেশ দেওয়া তোমাদের কর্তব্য।—আল কুরআন।

(১২) আমরা তোমাদিগকে মধ্য পথের অনুসারী করিয়াছি, তোমরা অন্যদের নিকট সত্যের সাক্ষী।—আল কুরআন।

(১৩) কিন্তু যাহারা রসূল হইতে নিজেদেরকে পৃথক করিবে, রসূলের

www.pathagar.com

নিকট নির্দিষ্ট পথ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পরও যদি কেহ নিজেকে রসুল হইতে পৃথক করিয়া মুমিনের পথ ব্যতীত অন্য পথে গমন করে, তাহা হইলে সে যে প্রকার আমাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে আমরাও তদ্রূপ তাহার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব।—আল কুরআন।

উপরে কুরআন এবং হাদীসের যে সব আয়াত ও বক্তব্য উদ্ধৃত হইল, তাহার বলে সুন্নী জামাতের সকল মযহাবের সকল অনুসারিগণ ইজমাকে আইনের উৎস বলিয়া গণ্য করে। এই বিষয়ে রসূলুল্লাহ্‌র আস-হাবগণও একমত হইয়াছিলেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ ইজমাকে আইনের উৎস বলেন কিন্তু তাঁহাদের মতে ইজমার অধিকার অধিকতর বিস্তৃত। যুদ্ধের প্রস্তুতি, প্রশাসন এবং এমনকি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিন্যাসও ইজমার সূত্র হইতে গ্রহণ করা উচিত। রসূলুল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পরমুহূর্তে সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য একজন নেতা নির্বাচনের প্রয়োজন পড়িল। সকলে মিলিয়া হযরত আবুবকরকে (রা) নির্বাচন করিলেন। ইজমার ভিত্তি স্থাপিত হইল।

শিয়াদের মত

ইজমার প্রামাণ্যতা বা ইহার গ্রহণীয়তার নিশ্চিতি সম্বন্ধে দুইটি মত পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মতাবলম্বিগণ বলেন, ইজমার দ্বারা শরীয়তের কোন প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে সমাধান করা যায় না। অন্য মতাবলম্বিগণ বলেন, মুজ-তাহিদগণ যখন একটি বিষয় সম্বন্ধে একমত হন, তখন সেই মতকে অর্থাৎ ইজমাকে অদৃশ্য (গায়েব غائب) ইমামের মতের প্রতিধবনি বলিয়া গণ্য করা যায় এবং এইভাবে ইহাকে মূল্য দেওয়া যায়। নাজ্জাম এবং খারিজি মতাবলম্বিগণ ইজমার বৈধতা স্বীকার করেন না।

ইজমার সপক্ষে যুক্তি

সুন্নী আইনতত্ত্ববিদগণ ইজমার সপক্ষে অনেক অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন ; তাহাদের প্রধান যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহতালা আল কুরআনে বলিয়াছেন যে, তিনি দ্বীন-ইসলামকে পরি-পূর্ণ করিয়াছেন এবং ইসলাম চিরস্থায়ী হইবে ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী। আল কুরআনে যে সমস্ত আইনের বিধি স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে

www.pathagar.com

তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে অসংখ্য আইনের প্রশ্ন নিয়ত উত্থিত হইতেছে, আল কুরআনের ঐ স্বল্প সংখ্যক বিধি দ্বারা পূর্ণভাবে তাহার সমাধান হইতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহলোকে নাই; প্রশ্ন বা সমস্যা লইয়া তাই আর তাঁহার দরবারে যাওয়া চলে না। এমতাবস্থায় আল কুরআন এবং আল-হাদীসে যাহা বিদ্যমান আছে তাহার ভিত্তিতে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিত এবং তাহা সম্ভব। তাহা না হইলে আইনের ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতা দেখা দেয় তাহা কি দিয়া পূরণ হইতে পারে? নূতন সমস্যার উদ্ভবের কারণে আল কুরআন এবং আল-হাদীস সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে; তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। যাহারা আইনবিদ তাহারাই কেবল আল কুরআন ও আল-হাদীস হইতে সূত্র আহরণ করিতে সক্ষম। সকল প্রশ্নে তাহাদের ঐকমত্য তাই সিদ্ধ। যাহা সিদ্ধ তাহাই সত্য, কারণ ইসলামের মতে সত্য এক এবং তাহার বাহিরে সবকিছু ভুল।

ইজমার স্তরভেদ

প্রামাণ্যতার দিক হইতে বিচার করিলে ইজমার অনেক স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ইজমা নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য। কেহ যদি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ আনা যায়। যে ইজমা অভ্রান্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং আইনের সমস্ত নির্দেশ মানিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাকে চূড়ান্ত ইজমা বলে। যে সমস্ত ইজমা সার্বজনীন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই এবং যাহার গঠন সম্পূর্ণভাবে বিধিভিত্তিক নয়, সেগুলিকে নিশ্চিত ইজমা বলা যায় না; তবুও তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য। আইনতত্ত্ববিদদের ইজমার চাইতে রসূলুল্লাহর (সঃ) আসহাবদের ইজমার মূল্য বেশী।

ইজমায় কে শরীক হইতে পারে

সুন্নীদের মতে মুসলিম মুজতাহিদ বা আইনতত্ত্ববিদগণই শুধু ইজমা গঠনে অংশগ্রহণ করিতে পারে। এই গবেষণায় অমুসলিমদের কোন স্থান নাই। মুসলিমদের উপর আল কুরআন ও আল-হাদীস এই অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা আইনদাতার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সুতরাং আইন ও দ্বীনের ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে সত্য নির্ধারণ

www.pathagar.com

করা অসম্ভব। জ্ঞানবুদ্ধির অপরিপক্কতার কারণে নাবালক এবং উন্মাদগণ এই গবেষণায় শরীক হইতে পারেন না।

মুজতাহি বা আইনতত্ত্ববিদ

যে সমস্যা সমাধানের জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ অপরিহার্য সেই সমস্যা-সমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে শুধু আইনতত্ত্ববিদগণ ইজতিহাদ বা গবেষণার অধিকারী, অন্য কেহ নন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এই স্তম্ভগুলি সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম সমাজে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলির বাহিরের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সাধারণ মুসলিমগণ আইনতত্ত্ববিদ-দের উপর নির্ভর করিবে; ইহাই আল্লাহ্‌র আদেশ। আল্লাহ্ কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে মানিবার আদেশ দিয়াছেন, ইহাদিগকে আইনবিদ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে শাসক বা প্রশাসক অন্তর্ভুক্ত নহেন। যাহারা শাসক বা প্রশাসক তাহারা আইনতত্ত্ববিদগণের নিকট হইতে পরামর্শ লইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতে বলা হইয়াছে, তুমি যদি না জান তবে যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মযহাবের মত এইরূপ, কিন্তু আবু বকরুল বুলাকানি বলেন যে, শিশু, উন্মাদ এবং অমুসলিম ব্যতীত সকলেই গবেষণার মাধ্যমে আইন গঠনে শরীক হইতে পারে। ইমাম গাজ্জালি বলেন—ইজমার জন্য সকল মুসলিমের সম্মতি প্রয়োজনীয় হইলে ইজমা আর কোনদিনই সম্ভব হইবে না।

মুজতাহিদের যোগ্যতা

যে ব্যক্তি আইনের উপর গবেষণা করিতে সক্ষম তাহাকেই মুজতাহিদ বলে। ফখরুল ইসলামের মতে যে ব্যক্তি উসূল এবং ফারু অর্থাৎ আইনতত্ত্ব এবং সর্বপ্রকার প্রয়োগী আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তিনিই শুধু মুজতাহিদ গণ্য হইতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, উসূল বা ফারুর যে কোন একটি জানিলে তিনি মুজতাহিদ হইতে পারেন। তবে তাহাকে অবশ্যই আল কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান রাখিতে হইবে। শুধু পড়িতে জানাই যথেষ্ট নয়, তাহাকে ইহা বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখিতে হইবে। আল-হাদীসও তিনি জানিবেন। ভাসাভাসা জানিলে হইবে না, ইহাদের কোন্‌টি জয়ীফ, কোন্‌টি মারুফ, বা কোন্‌টি মাজহুল, কোন্‌টি মাশহুর এবং কোন্‌টি আহাদ তাহা জানিতে হইবে। সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের

www.pathagar.com

ক্ষমতাও তাহার থাকিতে হইবে। মুফাস্‌সির বা মুহাদ্দিস হইলেই ইজমায় অংশগ্রহণের অধিকার জন্মে না। মুজতাহিদের যোগ্যতা জনমত দ্বারা নির্ণীত হয়, রাষ্ট্রীয় নির্দেশের দ্বারা নয়।

সদরুশ শরীয়ত এবং বহু হানাফী আইনতত্ত্ববিদের মতে একমাত্র নিষ্ঠাবান মুসলিম সম্প্রদায় ইজমা গঠনের অধিকার রাখে; যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা ইজমায় শরীক হইতে পারে না। শাফিঈ এবং মালেকী সম্প্রদায় এবং কিছু হানাফী আইনতত্ত্ববিদ বলেন যে, যাহারা কাফির, একমাত্র তাহারাই ইজমার অধিকার হইতে বঞ্চিত।

নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়

যাহারা সুন্নত এবং জামাতকে অনুসরণ করে তাহাদিগকেই নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে আহলুস-সুন্নত ওয়াল-জামাত বা উম্মাতুল মুতাবাদ (অনুসারীর দল) বলে। হানাফী, শাফিঈ, মালেকী এবং হাম্‌বলী মযহাবের অনুসারিগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের বাহিরের লোকদিগকে সাহিবুল বিদাত বলে। সুন্নীদের মতে সাহিবুল বিদাতগণ ইজমায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। তাহাদের অযোগ্যতার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া সুন্নী সম্প্রদায় আল কুরআন ও আল-হাদীসের উপর নির্ভর করে। আল কুরআন এবং আল-হাদীসে সকলকে একত্রে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, যাহারা বিভেদ সৃষ্টি করিবে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া শাস্তি পাইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাস অন্যের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তৎপর, তাহারা নিরপেক্ষ মনের অধিকারী নন; আর যাহারা নিরপেক্ষ নন তাহারা সত্য লাভে অসমর্থ। মুসলিমদের মধ্যে যে প্রবীণ সম্প্রদায় বর্তমান, তাহাদের মধ্যে যাহারা আলেম তাহারাই ভ্রমের উর্ধ্বে। তাহারা সর্বদাই মধ্যপথ অবলম্বন করেন। যাহারা মধ্যপথ অবলম্বন করেন তাহারা সৎ-চরিত্রের লোক এবং তাহারা সত্যের সাক্ষী। মুসলিমগণ দলগতভাবে যাহা করে তাহাই ন্যায়। তাহারা মানুষকে অন্যায়ের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারে।

ধর্মদ্রোহী

যে সমস্ত খারিজি হযরত আলীর খিলাফতকে অস্বীকার করে এবং

www.pathagar.com

যাহারা বলে যে, গুনাহ করিলে মুসলিম কাফির হইয়া যায় এবং যে সমস্ত শিয়া হযরত উমর ও হযরত উসমানের খিলাফতকে অস্বীকার করে, তাহারা সকলেই ধর্মদ্রোহী। যাহারা বলে যে, সৃষ্টির সীমা পর্যন্ত, তাহার বাহিরে নয়, আল্লাহ্‌র জ্ঞান বিস্তৃত ; তাহারা ধর্মদ্রোহী। যে সমস্ত শিয়া বলে যে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিল হযরত আলীকে নবুয়ত দিবার এবং জিবরাইলের ভুলে হযরত মুহাম্মদ নবুয়ত পাইয়াছিলেন, তাহারা ধর্মদ্রোহী। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) প্রিয় আসহাব আবুবকর, উমর এবং উসমানকে লইয়া যাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তাহারা ধর্মদ্রোহী। ইহারা কেহই ইজমায় শরীক হইতে পারে না। উল্লেখযোগ্য হে সুন্নত-আল জামাত্‌ভুক্ত পণ্ডিতদের মতও ইহাই ; বর্তমান যামানায় কিছু ব্যতিক্রম উচ্চারণ শোনা যাইতেছে।

আইন অমান্যকারী

যিনি ফরয তরক করেন অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি প্রতিপালন করেন না তাহাকে (ফাসিক فاسق) বলা হয়। যিনি ফাসিক তিনি ইজমায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহার আমল নাই তিনি বিশ্বাসযোগ্য নন। হানাফীদের অধিকাংশের ইহাই অভিমত। তবে বিখ্যাত হানাফী আইন-তত্ত্ববিদ ইমাম সারাখসি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এবং দুর্বিনীত স্পর্ধায় আইন অমান্য করেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইজমাতে শরীক হইবার অধিকার হারান না। শাফিঈ এবং সম্ভবত মালেকী মতে ফাসেক হইলেই ইজমাতে অংশগ্রহণের অধিকার নষ্ট হয় না।

যুগ এবং দেশ

সুন্নী জামাতের সকল সম্প্রদায়ের মতে ইজমা কোন দেশ বা যুগের মধ্যে সীমিত নয়। মালেকী সম্প্রদায়ের মতে শুধু আসহাবদের এবং মদীনার তাবাউনদের ইজমা গ্রহণযোগ্য। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ যাহাদের মধ্যে সম্ভবত ইমাম হাম্বল আছেন—মনে করেন যে, শুধু রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) আসহাবগণের মধ্যে ইজমা সীমাবদ্ধ।

মদীনায় আইনতত্ত্ববিদগণের অভিমত

ইমাম মালেক বলেন, মদীনাই ছিল দ্বীন-ই-ইলমের কেন্দ্র। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) আসহাবগণ এবং তাবাউনগণ সেখানে তাহাদের জীবন কাটাইয়াছেন। এই শহরেই রসূলুল্লাহ (সঃ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখান হইতেই তিনি

www.pathagar.com

বেশীর ভাগ প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন। মদীনাকে পুণ্যভূমি বলা যায়। এই মতের বিরোধিগণ বলেন, মক্কাকেও পুণ্যভূমি বলা উচিত। রসূলুল্লাহ্‌র জীবনকালে এবং তাহার তিরোধানের পর আল কুরআন, আল-হাদীস এবং আইনের পণ্ডিতগণ আরবের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মালেকী সম্প্রদায় তাহাদের অভিমতের পশ্চাতে দুইটি হাদীসের সমর্থন দেখান। একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, আগুন যেমন সোনাকে শুদ্ধ করে মদীনাও তেমনি মানুষকে শুদ্ধ করে। আরেকটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সর্প যেমন তাহার গর্তের গাত্রে লাগিয়া থাকে, ইসলামও ঠিক তেমনি মদীনায় লাগিয়া থাকিবে। অন্যান্য আইনতত্ত্ববিদ এই দুই হাদীসকে শুধু মদীনার পবিত্রতা জ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন। ইবনে বুফাইর এবং ইবনে ইয়াকুবুর রাদা বলেন, ইমাম মালেকের মতে মদীনার বাহিরে ইজমার অস্তিত্ব নাই। এই মত সর্বজনস্বীকৃত মালেকী মত নয়।

আসহাবদের অভিমত

"মানুষদিগের মধ্যে আপনারাই শ্রেষ্ঠ", "আমার উম্মতগণ ভ্রান্তিতে কখনও একমত হইবে না।" এই দুইটি হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় আইনতত্ত্ববিদ বলেন, রসূলুল্লাহ্‌র আসহাবগণ ছাড়া অন্য কেহ ইজমা গঠন করিতে অধিকারী নন। তাহারা বলেন, এই দুইটি হাদীসের লক্ষ্য হইতেছে আসহাবগণ, ইমাম হাম্বলও এই মতের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, অন্য যুগে ইজমা হওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। দাউদ জাহিরীর অনুসারিগণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। রসূলুল্লাহর আসহাবগণের ইজমার মর্যাদা নিশ্চিতভাবে সর্বোচ্চ। কিন্তু তাই বলিয়া ইজমা একমাত্র আসহাবগণ ছাড়া হইতে পারে না ইহা যুক্তির কথা নয়। অধিকাংশ আইন-তত্ত্ববিদের মতে উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যা সীমিত করা অনাবশ্যক। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় ঐ হাদীসদ্বয়ের লক্ষ্য হইতে পারে।

রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশধরদের অভিমত

শিয়া সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া ইমামিয়া এবং জাহেদিয়াগণ ইজমার প্রামাণ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাহারা বলেন, ইজমা গঠনের অধিকার একমাত্র রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশধরদের আছে, অন্য কাহারও নাই। তাহাদের এই দাবী সমর্থনে তাহারা আল কুরআনের একটি আয়াত এবং একটি

www.pathagar.com

হাদীসের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল কুরআনের একটি আয়াতে আছে, রসূলুল্লাহ্‌র ঘরের মানুষকে আল্লাহতালা অবিশুদ্ধতা হইতে পরিষ্কার করিতে অভিপ্রায় করেন।' একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, আমি তোমাদের জন্য দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। ঐ বস্তুদ্বয় হইতেছে, আল কুরআন এবং আমার বংশধরগণ। ইহাদের অনুসরণ করিলে তোমরা কোনদিন ভুল পথে যাইবে না। সুন্নী সম্প্রদায় শিয়া সম্প্রদায়ের এই দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তাহারা বলেন, আল কুরআনের যে আয়াতের উপর শিয়া সম্প্রদায় নির্ভর করেন, সেই আয়াতে বর্ণিত ঘরের মানুষ বলিতে রসূলুল্লাহ্‌র বংশধর বুঝায় না, বুঝায় তাহার পত্নিগণ এবং বিশুদ্ধতা হইতে পরিষ্কার করার অর্থ পত্নিদিগকে কুফরীর মলিনতা হইতে ঈমানের স্বচ্ছতায় আনয়ন করা। সুন্নী সম্প্রদায় শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত হাদীসকে আহাদ হাদীস বলেন ; এইরূপ অসমর্থিত হাদীসের উপর ইজমা হইতে পারে না। তাহারা আরও বলেন যে, এই হাদীসকে সত্য মানিয়া লইলেও হেদায়েতের সার্বিক অধিকার তাহাদের উপর বর্তায় না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিমত

ইমাম হাম্বল এবং কিছু কিছু হানাফী আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন, রসূলুল্লাহ্‌র চার খলিফার একার্থক সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ইজমা গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, দুইজন খলিফার একার্থক সিদ্ধান্তের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ইজমা গঠনের শর্ত

সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মযহাবের মতে যুগের সকল আইনতত্ত্ববিদ একমত হইলেই তবে চূড়ান্ত ইজমা গঠিত হইতে পারে। অধিকাংশ আইন-তত্ত্ববিদ কোন প্রশ্নে একমত হইলেও ইজমা হইতে পারে। ইবনে জারীর, আবু বোকাইর রাজী এবং আবুল হাসান খাইয়াত এই মত পোষণ করেন। হানাফী, শাফিঈ এবং মালেকিগণ মনে করেন, যাহারা একমত হইতে পারেন নাই, তাহারা যদি সংখ্যায় খুব বেশী না হন, তবে অধিকাংশের ঐকমত্য ইজমারূপে গণ্য হইবে। তাহাদের মতে এই ইজমা সিদ্ধ এবং সকলের জন্য

www.pathagar.com

বাধ্যকর হইবে। কিন্তু ইজমাকে চূড়ান্ত বলা যাইবে না কারণ যাহারা এই ইজমাকে মানিবেন না তাহারা কাফির হইবেন না।

একজন আইনতত্ত্ববিদ, যেহেতু তিনি রক্ত মাংসের মানুষ, ভুল করিতে পারেন কিন্তু যখন বহু আইনতত্ত্ববিদ একত্র হইয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তাহাদের মতের অভ্রান্ততা মানিয়া লওয়া যায়। রসূলুল্লাহর হাদীসে বলা হইয়াছে, 'আমার উম্মতগণ একমত হইয়া ভুল করিবেন না।' এখানে 'উম্মতগণ' শব্দ দ্বারা সকলকে নয়, অধিকাংশকে বুঝানো হইয়াছে। অধিকাংশের অভিমত দ্বারা ইজমা গঠিত হইতে পারে, এই মতে বিশ্বাসিগণ বলেন, অধিকাংশ বলিতে সকলকে বুঝাইলে মুসলিম বিশ্বে কোনদিনই ইজমা গঠিত হইবে না।

এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ তাহাদের আপন বক্তব্য রাখিয়াছেন। আবু ইসহাকুল আসফিরিনি বলেন, তিনি সকলের ঐকমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ হাজার বিধির কথা জানেন। ইবনে হাম্মাম এই সংখ্যা এক লক্ষে উন্নীত করেন। বর্তমান যুগে বিশ্বের সমগ্র মুসলিম আইনতত্ত্ববিদের পক্ষে একত্রে কোন প্রশ্নে একমত হওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। চূড়ান্ত ইজমা বর্তমানে যুগে গঠন করা নিশ্চয়ই দুস্কর কিন্তু অধিকাংশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজমা গঠনের নীতি যদি মানিয়া লওয়া যায় তবে বর্তমান যুগে ইজমা গঠন এবং তাহার প্রয়োগ তত কঠিন নাও হইতে পারে।

ইজমা কখন পরিপূর্ণ হয়

আইনতত্ত্ববিদগণ যদি যথেষ্ট সময় লইয়া পূর্ণভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইজমা গঠিত হইয়া যায় ; ইহাই হানাফী, মালেকী এবং অধিকাংশ শাফিঈ-র মত। হাম্বলী এবং শাফিঈদের কতিপয় আইনতত্ত্ববিদ ইজমার পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্পর্কে এই অভিমত অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন, যে যুগে প্রশ্ন উত্থিত হয় এবং প্রশ্নের উপর আইনতত্ত্ববিদগণ একমত হন সেই যুগ অতিবাহিত না হইলে ইজমা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। তাহারা বলেন, যে সমস্ত আইনতত্ত্ববিদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন তাহাদের মত পরিবর্তনের আশংকা থাকে। সুতরাং যে সমস্ত আইনতত্ত্ববিদের ঐকমত্যের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠা হইবার কথা, তাহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন ইজমা পূর্ণরূপে গঠিত হইতে

www.pathagar.com

পারে না। তাহারা সকলে মরিয়া গেলে তবে তাহাদের মত পরিবর্তনের আশাংকা দূরীভূত হয় এবং তখনই পূর্ণ ইজমা গঠন সম্ভব হয়। ইমাম হাম্বলের অন্য একটি মতে দেখা যায় যে, কিয়াসের ভিত্তিতে যে ইজমা গঠিত হয় শুধু সেই ক্ষেত্রে তিনি আইনতত্ত্ববিদগণের তিরোধান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন; আল কুরআন ও আল-হাদীসের উপর যেখানে ইজমা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাহার মতে এই বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আশারী ইবনে ফারুক এবং সলিমুর রাদা (মুতাজিলা) মনে করেন যে, যুগ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে ঐ যুগের আইনতত্ত্ববিদগণের ঐকমত্যকে ইজমা গণ্য করা যায় না। ইমামুল হারামাইন বলেন, যে ইজমা নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহাকে তখনই সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা উচিত। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন, যে যুগে আইনতত্ত্ববিদগণ ঐকমত্যে উপস্থিত হন সেই যুগ অতিক্রান্ত হইলেই ঐকমত্যকে ইজমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। যে সমস্ত আইনতত্ত্ববিদ অভিমত দিয়াছিলেন তাহারা যদি মত পরিবর্তন করিয়া থাকেন এবং সেই যুগে অন্য কেহ বিরুদ্ধ মত না করিয়া থাকেন তবেই উহা ইজমারূপে গণ্য হইবে। এই মতের অনুসারিগণ বলেন, ইজমার উদ্ভবের জন্য যেমন ঐকমত্য প্রয়োজন, ইহা বলবৎ থাকার জন্যও তেমন ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যতদিন পর্যন্ত অভিমত প্রদানকারী আইনতত্ত্ববিদগণ বাঁচিয়া থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাহাদের মত পরিবর্তনের পরিস্থিতি অসম্ভব নয়। এমতাবস্হায় তাহাদের সকলের ইন্তিকালের পরই তাহাদের ঐকমত্যকে ইজমা গণ্য করা যায়. এই মত যাহারা অস্বীকার করেন তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। তাহারা বলেন, ইজমার শর্ত এমন কঠিন হইলে ইজমা আর কোনদিনই গঠিত হইবে না। তাহারা আরও বলেন, যে মুহূর্তে যুগের সকল আইনতত্ত্ববিদ ঐকমত্যে উপস্হিত হন সেই মুহূর্তে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং উহা সকলের উপর বাধ্যকর হয়। যাহারা অভিমত দিয়াছিলেন তাহারাও ঐ ইজমা দ্বারা বাধ্য হইয়া পড়েন। এমতাবস্হায় তাহাদের মত পরিবর্তনের আর অবকাশ থাকে না। তাহারা আরও বলেন যে, কুরআন হাদীসের যে সমস্ত উক্তির উপর ইজমা নির্ভরশীল, সেই সমস্ত উক্তির মধ্যে কোন পূর্বশর্ত নাই।

হযরত আবুবকর তাহার খিলাফতকালে যুদ্ধলব্ধ মাল সকল মুসলিমের মধ্যে সমান অংশে বিতরণ করিতেন। যাহারা আলিম বা যাহারা পুরাতন মুসলিম, তাহারা কিছু বেশী পাইতেন না। হযরত আবুবকরের এই বন্টন

www.pathagar.com

পদ্ধতির বিরুদ্ধে কেহ কোনদিন প্রতিবাদ করে নাই। হযরত উমর তাহার খেলাফতের সময় আলিম এবং পুরাতন মুসলিমদিগকে যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টন কালে কিছু বেশী বখরা দিতেন। তাহারা এই অসম বিতরণের বিরুদ্ধে তৎকালে কেহ কোন প্রতিবাদ করে নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, হযরত আবুবকরের সময় আইনতত্ত্ববিদগণ এক প্রকার বিতরণ পদ্ধতি মানিয়া লইয়াছিলেন তবুও এই ঐকমত্য পরবর্তী খলিফার জন্য বাধ্যকর হইবার মত প্রামাণ্যতা লাভ করে নাই।

ঐকমত্যের বিরোধিতা

সকল আইনতত্ত্ববিদ যখন কোন প্রশ্নে ঐকমত্য হন, তখন সেই যুগের কেহ বা পরবর্তী যুগের কেহ একভাবে ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন না। অবশ্য ঐকসত্য গঠিত হইবার পূর্ব হইতে যাহার ভিন্নমত ছিল বা ঐকমত্যের সময় যিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন। রসূলুল্লাহর (সঃ) আসহাবগণ একমত হইয়া যদি কোন নির্দেশ দিয়া থাকেন, তবে পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্যে কেহ বা তাহাদের উত্তরসুরি ভিন্নমত প্রকাশ করিবার অধিকার রাখেন না। ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যদি কেহ ভিন্নমতালম্বী থাকিয়া থাকেন, তবে তাহার ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার থাকে।

এককালের ইজমা পরবর্তীকালের ইজমা দ্বারা রদ হইতে পারে

এককালের ইজমা পরবর্তীকালের ইজমা দ্বারা রদ হইতে পারে। এইরূপ রদ হইলে পূর্ববর্তী ইজমা আর বলবৎ থাকে না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সঃ) আস হাবগণ কতৃক প্রতিষ্ঠিত ইজমা পরবর্তীকালে রদ করা যায় না। প্রসংগত স্মরণ রাখা উচিত যে, রসূলুল্লাহর জীবনকালে ইজমার মাধ্যমে আইনের সূত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না; সে সময় আল্লাহতালার আইন তাঁহারই মাধ্যমে প্রবর্তিত হইত। ইমাম শাফিই এবং ইবনে হামবলের মতে রসূলুল্লাহর আসহাবগণ যে প্রশ্নে একমত হইতে পারেন নাই, সেই প্রশ্ন ইজমার কোন স্হান নাই; কিন্তু হানাফী মতবাদে বলা হইয়াছে যে, আসহাবদের মধ্যে মতভেদ হইলে পরবর্তীকালে মুজতাহিদগণ ঐ প্রশ্নে একমত হইতে না পারার কোন কারণ নাই। মালেকীদের মতও এই প্রকার। তাহারা বলেন যে, এইরূপ ঘটনা বিরল।

www.pathagar.com

কোন বিশেষ যুগে যদি একটি প্রশ্ন সম্পর্কে দুইটি মত হইয়া থাকে তবে সেই প্রশ্নে তৃতীয় মত গ্রহণ সিদ্ধ নয়। গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত দুই প্রকার, যথা সন্তান প্রসব অথবা স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে চার মাস দশ দিন। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ বলেন যে, ইদ্দত এই উভয় সময়ের যেটি দীর্ঘতর সেটি পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অন্য আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, প্রসব হইলেই বিধবার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। এই দুইটি মতের বর্তমানে তৃতীয় মত (প্রসব না হইলে চার মাস দশ দিন অতীত হইলে ইদ্দত শেষ হইবে) অসিদ্ধ গণ্য হইবে।

ইজমার গঠন পদ্ধতি

ইজমা প্রকাশ্য সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহীত হইতে পারে। ইহাকে কওলী (قولی) বলে। আইনতত্ত্ববিদ যে আচরণ করিয়াছেন তাহার দ্বারাও ইজমা গঠিত হইতে পারে। ইহাকে ফেলি (فعلی) বলে। এই উভয় প্রকার ইজমা নিয়মিত আবার অনিয়মিত হইতে পারে। নিয়মিত ইজমাকে আজিমাত (عزيمة) এবং অনিয়মিত ইজমাকে রুখসাত (رخصة) বলে। কওলী ইজমাতে মুজতাহিদগণ এক বৈঠকে বসিয়া একমত হইয়া ভাষার মাধ্যমে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। একত্রে না বসিয়াও স্ব-স্ব স্থানে থাকিয়া কোন বিশেষ প্রশ্নে তাহাদের ব্যক্তিগত কিন্তু একমতবিশিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারেন। প্রধান মুজতাহিদগণ যে মত প্রদান করেন, অন্য মুজতাহিদগণ তাহা শুনিয়া চুপ থাকিতে পারেন। এই সকল পরিস্থিতিতে যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকেও কওলী ইজমা বলে। যে কওলী ইজমা এক বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে আজিমাত এবং অন্যভাবে যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে রুখসাত ইজমা বলে। যখন সকল মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ আইনের ব্যাপারে একই রকম আচরণ করেন কিংবা কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ যে আচরণ করেন, অন্যেরা তাহাতে প্রতিবাদ করেন না তখন তাহাকে ফেলি বলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ফেলি ইজমা আজিমাত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইজমা রুখসাত হয়। ফেলি এবং কওলী ইজমা সমভাবে বাধ্যকর এবং প্রামাণ্য। হানাফী, মালেকী এবং কিছু শাফিঈ আইনতত্ত্ববিদ আজিমাত এবং রুখসাত উভয় প্রকার ইজমাকে সিদ্ধ এবং বাধ্যকর মনে করেন। শাফিঈ, মালেকী এবং মুতাজিলি সম্প্রদায়ের কিছু কিছু আইনতত্ত্ববিদ রুখসাতে ইজমাকে একেবারেই অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহর আসহাবগণের মধ্য হইতে কোন খলিফা যদি কোন প্রশ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন কিংবা কোন আইন প্রবর্তন করেন এবং এই ব্যাখ্যাও প্রবর্তন করেন এবং এই ব্যাখ্যা ও প্রবর্তন তাহার খুতবায় ঘোষণা করেন এবং তাহার এই খুতবাতে কেহ যদি আপত্তি উত্থাপন না করেন তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে উক্ত প্রশ্নে ইজমা পতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নীতি রাষ্ট্র প্রধানদের বেলাতেও খাটে। ফখরুল ইসলামের ইহাই অভিমত।

যাহারা অনিয়মিত বা রুখসাত ইজমাকে সিদ্ধ বলিতে চান, তাহারা তাহাদের নীতি সম্পর্কে দুইটি যুক্তি উত্থাপন করেন। তাহারা বলেন যে, ইজমার জন্য সকল মুজতাহিদদের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রয়োজন হইলে কোনদিন মুসলিম বিশ্বে ইজমার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না; ইহাই তাহাদের প্রথম যুক্তি। তাহারা বলেন, যাহা অসম্ভব তাহা কখনও আইনের সূত্র হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তাহারা বলেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ প্রয়োজনবোধে তাহাদের ভিন্নমত যথাসময়ে এবং যথাস্থানে প্রকাশ করিতে বাধ্য, তাহারা যদি নীরব হইয়া থাকেন, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে তাহারা সম্মতি দিয়াছেন।

নীরবতা যে সম্মতির লক্ষণ নয় তাহার অনেক নযীর আছে। একবার হযরত উমর আসহাবগণের বৈঠকে প্রশ্ন করিলেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বিলম্বে বিতরণ আইনসম্মত কিনা। একজন ব্যতীত সকল আসহাব বলিলেন, এইরূপ বিলম্ব করা আইনসম্মত। হযরত আলী চুপ করিয়া রহিলেন। নীরব আলীকে লক্ষ্য করিয়া হযরত উমর পুনরায় এই প্রশ্ন করিলেন। হযরত আলী বলিলেন, বিলম্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বিতরণ আইনসিদ্ধ নয়। হযরত আলীর অভিমতই গৃহীত হয়। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হযরত আলীর নীরবতা তাহার সম্মতির লক্ষণ ছিল না। হযরত উমরের কাছে অভিযোগ করা হয় যে, একজন মহিলার স্বামী নিখোঁজ থাকা অবস্থায় ঐ মহিলা অন্য লোকের সাথে চলাফেরা করিতেছে এবং ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিতেছে। ঐ মহিলা গর্ভবতী ছিল এবং হযরত উমরের তিরস্কারে সে এতই ভীত হইয়া পড়ে যে তাহার প্রসব হইয়া যায়। হযরত উমর তখন আসহাবগণকে প্রশ্ন করেন, ঐ মহিলার গর্ভপাতের জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কিনা। একজন ব্যতীত সকল আসহাব একবাক্যে রায় দেন যে হযরত উমর যেহেতু সরল বিশ্বাসে ঐ মহিলার পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় তিরস্কার করিয়াছেন সেহেতু তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। হযরত আলী চুপ করিয়া ছিলেন

www.pathagar.com

কিন্তু তাহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল তখন তিনিই ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য হযরত উমরকে দায়ী করিলেন। হযরত আলীর এই অভিমত গৃহীত হয়। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন যে, ভয়ের কারণে অনেকে চুপ করিয়া থাকে, ইহাতে সম্মতি বুঝায় না।

ইমাম খুতবায় যে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, সে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় বিরোধিতা মোটেই হয় নাই এমন নহে। আসহাবগণ অনেক খুতবার বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে খুতবার সময় আসহাবদের নীরবতাকে সম্মতি মনে করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় আসহাবদের নীরবতাকে সম্মতি মনে করা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফাদের খেলাফতে পূর্ণ বাক-স্বাধীনতা ছিল, এমন দাবী অযৌক্তিক। যাহারা খুতবা শুনিতেন, সে যুগে তাহারা সকলে আলেম ছিলেন এমন মনে করাও ঠিক নহে।

আবু আলী ইবনে আবু হুরায়রা বলেন, মুজতাহিদের প্রদত্ত ফতোয়া প্রকাশিত হইলে এবং কেহ তাহার বিরোধিতা না করিলে ঐ ফতোয়া ইজমার মত কার্যকরী। তিনি অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলেন, কাজীর সিদ্ধান্তকে এইভাবে কার্যকর গণ্য করা যায় না।

ইজমা গঠনে মুজতাহিদের সংখ্যা

ইজমার জন্য, হানাফী এবং মালেকীদের মতে, খুব বেশী সংখ্যক মুজতাহিদের প্রয়োজন নাই। তবে তাহাদের সংখ্যা দুই বা তিনের কম হইলে চলে না। ইবনে জুরাইজ বলেন, কোন যুগে মাত্র একজন মুজতাহিদ থাকিলে তাহার অভিমতকে ইজমা গণ্য করা যায়।

আল কুরআন, হাদীস বা কিয়াসের উপর ইজমার বুনিয়াদ

আল কুরআন, আল-হাদীস বা কিয়াসের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মযহাবেরই এই মত।

মুতাজিলি এবং জাহেরিগণ মনে করেন, আহাদ হাদীস বা কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া ইজমা গঠন সিদ্ধ নয়। তাহারা বলেন, ইজমার কার্যকারিতা যেহেতু চূড়ান্ত তাই তাহার বুনিয়াদ চূড়ান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে, ইজমার শক্তি আসিয়াছে মুজতাহিদগণের ঐকমত্য হইতে, মুজতাহিদগণ কিসের

www.pathagar.com

উপর তাহাদের ইজমার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া নয়। বস্তুত প্রামাণ্য হাদীসের প্রামাণ্যতার বা কার্যকারিতার জন্য কোন ইজমার প্রয়োজন নাই। সুতরাং ইজমার ভিত্তি যে প্রামাণ্য হইতে হইবে এই দাবীর কোন অর্থ নাই। হযরত আবুবকরের নির্বাচন কিয়াসের ভিত্তিতে ইজমা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) জীবনকালে তিনি একবার হযরত আবুবকরকে নামাযে ইমামতি করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে আসহাবগণ কিয়াস করিলেন যে, নামাযে ইমামতি করিবার জন্য যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি মুসলিমদের সকল ব্যাপারে নেতৃত্ব দিবার যোগ্য। মাতাল হইবার অপরাধে আশি বার বেত্রাঘাতের আইনের ভিত্তি হইতেছে কিয়াস। কুৎসা রটনাকারীর শাস্তি যেহেতু এইরূপ সেহেতু মাতালের শাস্তিও এইরূপ হওয়া উচিত। কারণ মাতাল হইলে মানুষ তাহার সংযম হারাইয়া ফেলে।

ইজমার প্রমাণ

কোন প্রশ্নে যথার্থভাবে যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কি ভাবে প্রমাণ করা যায়? সার্বজনীনভাবে যে ইজমা স্বীকৃত তাহার জন্য পৃথক প্রমাণের আবশ্যক নাই। সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মযহাবই এই মত স্বীকার করেন। কিন্তু হানাফিগণ বলেন যে সবজনস্বীকৃত না হইলেও এবং সকলের জ্ঞানের মধ্যে না আসিলেও একটি বিশ্বাসযোগ্য খবরের উপর ইজমার প্রমাণ ন্যস্ত করা যায়। ইমাম গাজ্জালি এই মত সমর্থন করেন না।

ইজমার প্রতিক্রিয়া

ইজমাভিত্তিক আইন প্রামাণ্য এবং বাধ্যকর। ধর্মীয় ব্যাপারে, সেই ইজমা, যাহার গঠনের মধ্যে কোন দুর্বলতা নাই, চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ এবং বাধ্যকর। ইহার সিদ্ধতা অস্বীকারকারী কাফের বলিয়া গণ্য হইবে। শাফিঈ এবং মালেকিগণ তাহাদের মতবাদে এত কঠোর নয়। তাহারা বলেন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিনা, শরাব এবং সুদ সম্পর্কে যে সমস্ত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি না মানে সে কাফের। অন্য ক্ষেত্রে মতবিরোধকে কুফরীর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত পাঁচটি শর্ত প্রতিপালিত হইয়া থাকিলে, হানাফীদের মতে, ধর্মীয় ব্যাপারে ইজমাকে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যায়।

www.pathagar.com

১। ইজমা গঠনের পূর্বে কোন আসহাব বা মুজতাহিদ ভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই।

২। যে সমস্ত মুজতাহিদ ইজমা গঠনে শরীক হইয়াছিলেন পরবর্তীকালে তাঁহারা মত পরিবর্তন করেন নাই।

৩। ইজমা বহু লোকের পরিচিত।

৪। আল কুরআনের বা আল-হাদীসের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত।

৫। ইজমা গঠনের মধ্যে কোন অনিয়ম হয় নাই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইজমার শরীক হইবার যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করিবার কোন নিশ্চিত এবং কার্যকর পথ এবং পদ্ধতি কোথাও পাওয়া যায় না। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা শেষ হইবার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই অসুবিধার কথা কাহারও চিন্তার মধ্যে আসে নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
প্রথা এবং রীতি

প্রথা এবং রীতি

রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) আবির্ভাবকালে এবং তাহার পূর্বে আরব দেশে স্বাভাবিকভাবে অনেক প্রথা ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। এই প্রচলিত প্রথা এবং রীতিনীতির একটি বৃহৎ অংশ আল কুরআন বা আল-হাদীসের স্পষ্ট অনুজ্ঞা বা আদেশ দ্বারা রদ করা হয় নাই। আইনদাতা তাহার নীরবতার দ্বারা এইগুলিকে অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথা, উরফ তাআমুল, বা আদত (عادة عرف' تعامل،) সর্বতোভাবে আইনের একটি উৎসরূপে গণ্য হয়। আইনতত্ত্ববিদগণ ইহাকে ইজমার মর্যাদা দিয়াছেন। আল কুরআনের যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীসের যে সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ইজমাকে প্রামাণ্য গণ্য করা হয়, সেই সমস্ত আয়াত এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথাকেও প্রামাণ্য বলা হয়। হেদায়া বলে, স্পষ্ট আয়াত বা হাদীসের অনুপস্থিতিতে প্রথাকে ইজমার সমস্থানীয় মনে করা হয়।

আল কুরআনের কোন আয়াত বা সহি হাদীসের কোন পাঠকে প্রথা লংঘন করিতে পারে না। আল কুরআনে ও আল-হাদীসে যে আইন বর্তমান,

www.pathagar.com

প্রথা তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। অবশ্য প্রথাকে কোন আসমানী আইন বলা যায় না। ইজমায় মুজতাহিদগণের গবেষণার সম্পদ আছে, প্রথার মধ্যে তাহা নাই। তবুও কুরআন ও হাদীস বিরোধী না হইলে প্রথাভিত্তিক আইন সকলে মানিতে বাধ্য। কিয়াসের আইন অপেক্ষা প্রথার আইন উচ্চতর মর্যাদা পায়। ইসলামী আইনের গবেষকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইসলামী আইনের বিকাশে প্রথার অবদান অতি বৃহৎ। আসহাবদের এবং তাবাউনদের কালে যে প্রথা সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইত, সেগুলি আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুন্নী মুসলিমগণ মনে করেন, প্রথা এমন শক্তিমান যে উহার দ্বারা কিয়াস রদ হইয়া যায়। হানাফী আইনতত্ত্ব-বিদগণ প্রথাকে আইনের একটি উৎস মনে করেন।

প্রথা বলিতে এখানে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া উচিত। কোন বিশেষ ব্যবসায়ের মধ্যে কোন রীতির প্রচলন থাকিলে তাহাকে প্রথা বলা যায় না। সমগ্র দেশে বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বজন স্বীকৃতভাবে যাহার প্রচলন থাকে তাহাকে প্রথা গণ্য করা যায়। রসূলুল্লাহ্‌র বা আসহাবগণের সময় হইতেই যে ইহার প্রচলন শুরু হইতে হইবে এমন কোন স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও পাওয়া যায় নাই; কতদিন প্রচলিত থাকিলে একটি রীতিকে প্রথার আসন দেওয়া যায়, তাহার কোন সঠিক নিয়ম নাই। স্মরণ কালের মধ্যে যে রীতির উদ্ভব হয় এবং সেই সময় হইতে বরাবর যদি ইহা একটি এলাকার মুসলিম মানিয়া লয়, তবে এই রীতি প্রথার মর্যাদা পায়। রদ্দুল মোহতার বলে, যাহা সর্বদা আচরণ করা হয়, তাহাই প্রথা।

কয়েকজন মানুষ বা কয়েক শ্রেণীর মানুষ বা কয়েক মহল্লার মানুষ যে আচরণ করে, আইনের দৃষ্টিতে তাহা প্রথা নহে। একটি গ্রামের বা একটি শহরের আচরণ কখনো প্রথা হইতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুষ যাহা করে তাহাও আইনের চোখে প্রথা নয়।

এক দেশের প্রথা অন্য দেশের আইনকে প্রভাবিত করিতে পারে না। এক যুগের প্রথা অন্য যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। ভারতের পাঞ্জাবের এবং বোম্বাইয়ের খোজাদের মধ্যে হিন্দু প্রথা ইসলামী আইনকে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রথা এমন যাহা আল কুরআন ও আল-হাদীসের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ : বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত

প্রথম অনুচ্ছেদ কিয়াস

যে প্রশ্নে আল কুরআন ও আল-হাদীস নিশ্চুপ এবং ইজমা মূক, সেই প্রশ্ন যখন সমাধান চায় তখন কোথায় ইহা পাওয়া যায়? সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মযহাব একস্বরে বলেন, এই সময় কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে আল কুরআন এবং আল-হাদীস এবং ইজমা হইতে আলোক লইয়া।

কিয়াস শব্দের মূল অর্থ হইতেছে পরিমাপ, সমর্থন এবং সমতা।

হানাফিগণ বলেন, কিয়াস হইতেছে আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের মোকাবিলায় কুলাইয়া ওঠে না বা মূল আইনের শুধু ভাষা যখন তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করে না, তখন মূল আইন হইতে ইল্লাতের (علة) সূত্রে বা মাধ্যমে নূতন বিধি আহরণ করিতে হয়; ইহাতে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে তাহাই কিয়াস। মালেকিগণ বলেন, মূল আইন হইতে ইল্লাতের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তকে কিয়াস বলে। শাফিঈগণ বলেন, একটি পরিচিত জিনিসের সহিত অন্য পরিচিত জিনিস ইল্লাতের মাধ্যমে সমন্বয় করাকে কিয়াস বলে। সহজ কথায়, মূল আইন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই যুক্তির আলোকে নতুন প্রশ্ন সম্পর্কে মূলের ভাষা কুলাইয়া না উঠিলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে কিয়াস বলে। মূলের যে যুক্তি তাহাকে রুকন (ركن) বলে, আইনের পরিভাষায় ইহার নাম ইল্লাত। মূল আইনকে বিস্তৃত করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাকে হুকম (حكم) বলে। মনে রাখিতে হইবে যে, আইনের উৎস হিসাবে কিয়াসের স্থান আল কুরআন, আল-হাদীস এবং ইজমার পরে। কিয়াস ব্যাখ্যা নহে, অনুসিদ্ধান্ত। এই অনুসিদ্ধান্তের মূল হইতেছে কুরআন, হাদীস এবং ইজমা। আল কুরআন, আল-হাদীস ও ইজমাকে একত্রে ইসলামী আইনের পরিভাষায় উসূল (اصول) বা নাস (نص) বলে।

কিয়াসের পরিধি

মূল আইনে যে ভাষা আছে তাহার বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা বলে। মূল আইনে যাহা আছে কিয়াস তাহাকে বিস্তৃত করে। কিয়াসের দ্বারা নূতন

www.pathagar.com

আইন সৃষ্টি হয় না, নূতন আইন আবিষ্কার হয় মাত্র। ভাষার মধ্যে যাহা লুক্কায়িত থাকে ব্যাখ্যা তাহাকে টানিয়া বাহির করে, আর ভাষার মধ্যে যাহা থাকে না কিন্তু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ন্যায়সঙ্গত হয়, কিয়াস তাহাই আবিষ্কার করে। কিয়াসের মাধ্যমে আইন বিস্তৃত হয়, এই বিস্তৃতি কতদূর যাইতে পারে তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। উদার মতাবলম্বিগণ বিস্তৃতির কোন সীমারেখা টানিতে চাহেন না। যাঁহারা কিয়াসের ভূমিকাকে সংকীর্ণ করিতে চান তাঁহারা বলেন, মূল আইনের আদেশকে বিস্তৃত করা যায়, তাহার শর্ত বা কারণকে নয়। বিজ্ঞানের সহায়তায় তথ্য সম্পর্কে যে নবতর অভিজ্ঞতা জাগ্রত হইতেছে সেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কিয়াসের প্রয়োগ চলে না।

আইনের উৎসরূপে কিয়াসের মর্যাদা

আল কুরআন, আল-হাদীস বা ইজমার মর্যাদা কিয়াসের মর্যাদার উপরে। কিয়াসের এই নিম্ন মূল্যের কারণ অতি সুস্পষ্ট। কিয়াসের কোন আল্লাহ-প্রদত্ত বুনিয়াদ নাই, তাই অন্যের সহিত ইহার মূল্যের তারতম্য। আল কুরআন, আল-হাদীস এবং ইজমা আইনদাতার অভিপ্রায়জ্ঞাপক। কিন্তু কিয়াস মানবিক যুক্তির অবদান মাত্র। মূল আইনদাতা হইতেছেন আল্লাহ্‌তালা এবং তিনি অভ্রান্ত পথনির্দেশক। মানুষের যুক্তি অভ্রান্ত নয়। সুন্নী আইনতত্ত্ববিদগণের মতে আইনতত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্ত যেমন শুদ্ধ তেমনি ভ্রমাত্মক হইতে পারে। সেই কারণে বিচারকালে আইনতত্ত্ববিদের কিয়াস মানিতে কাযী সর্বদা বাধ্য নন; কাযী নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকার রাখেন। কিন্তু কোন একটি কিয়াসের উপর যদি সকল মুজতাহিদ এক মত হন তবে সেই কিয়াস অন্য প্রকৃতি পরিগ্রহ করে। তখন তাহা ইজমার পর্যায়ে উন্নীত হয়। আইনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বড়ই মূল্যবান, তবে এক্ষেত্রে সম্মতি প্রধান কথা, সম্মতির পশ্চাতের যুক্তি নয়।

কিয়াসের বিরুদ্ধে যুক্তি

জাহিরিগণ, হাম্বলীদের কেহ কেহ এবং ইবনে হাজাম বলেন, "জমির দখল নির্ধারণের মত অতি সংকীর্ণ ইহলৌকিক ব্যাপারে, যেখানে চক্ষু কর্ণ ব্যবহার করিয়া মানুষ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে, কিয়াসের ব্যবহার কোন প্রকারে চলিতে পারিলেও আইনের উৎস হিসাবে কিয়াসের কোন মূল্য নাই।

www.pathagar.com

আইনদাতা একমাত্র আল্লাহ্‌তালা। কিয়াসের অজুহাতে মানুষ আল্লাহ্‌-তালার একক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।" তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির সমর্থনে আল কুরআন হইতে নিম্নবর্ণিত বাণীসমূহের উদ্ধৃতি দেন।

আল কুরআনে বলা হইয়াছে, ১। প্রামাণ্য আইনরূপে মানুষের জন্য আল কুরআন প্রেরিত হইয়াছে, ২। আল কুরআনে সর্বপ্রকার বিধান রহিয়াছে, ৩। মৃতদেহ এবং জানোয়ারের প্রবাহিত রক্ত ছাড়া আর কিছুই মানুষের ভোগের জন্য ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালা হারাম করেন নাই, ৪। যাহা আল কুরআনে হারাম করা হয় নাই মানুষের জন্য তাহা হালাল এবং ৫। ইসরাইলিদের সব কিছুই সুশৃংখল ছিল; অতঃপর হেরেমদাসীদের সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং আল্লাহ্‌র বিধানে যাহা নাই তাহাই তাহারা সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা নিজেরা বিপথগামী হইল, অন্যকেও বিপথগামী করিল।

কিয়াসের সপক্ষে যুক্তি

সুন্নী আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহ কোন ক্ষেত্রে কিয়াসের পরিপন্থী নয়। মুসলিমদের পরিচালনার জন্য সর্বপ্রকার নির্দেশ আল কুরআনে বর্তমান। এই নির্দেশাবলীর কিছু স্পষ্ট, কিছু শুধু ইঙ্গিত-ধর্মী। নির্দেশ যেখানে ইঙ্গিতধর্মী সেখানে কিয়াসের অবকাশ অবশ্যই আছে। আল কুরআন যাহাকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করিয়াছে, কিয়াস তাহাকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করিতে পারে না; কিয়াসের মতলব এইরূপ নহে। ইসরাইলিদের সম্পর্কে যে এরশাদ হইয়াছে মুসলিমদের সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য নয়। ইসরাইলিদের লক্ষ্য করিয়া আল কুরআনে বলা হইয়াছে, "তাহারা পালাইয়া পার পাইবে না। তাহারা ভরসা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গ তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, কিন্তু যাহা তাহারা কল্পনা করে নাই সেইদিক হইতে তাহাদের উপর শাস্তি পৌঁছিল। তাহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের নিজেদের ঘর তাহারা নিজেরাই ভাঙিয়া ফেলিল। মুসলিমগণও এইরূপ করিয়াছিল, অতএব বিবেচনা করিয়া হুঁশিয়ার হইয়া যাও।"

এই আয়াত শরীফে দেখা যায় যে, আল্লাহতালা মুসলিমদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া ইসরাইলিদের উদাহরণ হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

করিতে বলিতেছেন যে, উদ্ধত অহংকারে আল্লাহ্‌তালার অবাধ্য হইবার শাস্তি অনিবার্য।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে দেখা যায় রসূলুল্লাহ্ মুয়াযকে ইয়ামনের শাসক নির্বাচিত করেন। সেই সময়ে রসূলুল্লাহ ও মুয়াযের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আলাপ হয় :

রসূলুল্লাহ্ : সমস্যা কিভাবে সমাধান করিবে?

মুয়ায : আল কুরআনের আলোকে।

রসূলুল্লাহ : উপস্থিত প্রশ্ন সম্পর্কে আল কুরআনে কিছু পাওয়া না গেলে কি করিবে?

মুয়ায : রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নত অনুসরণ করিব।

রসূলুল্লাহ্ : যদি সেখানে সদুত্তর না পাও?

মুয়ায : নিজের বিচার বুদ্ধি খাটাইব।

রসূলুল্লাহ্ : শোক্‌র আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ।

এই হাদীসে কিয়াসের স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ্ নিজেও কিয়াসের ব্যবহার করিতেন। একটি লোক আসিয়া রসূলুল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করিল, "হুজুর, আমার আব্বাজান সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মার জন্য আমার পক্ষে হজ্জ করা কি প্রয়োজন।"

রসূলুল্লাহ্ উত্তর দিলেন, "তোমার আব্বা দেনা রাখিয়া মারা গেলে তাহা শোধ করা কি তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইত?"

এখানে দেখা যাইতেছে যে রসূলুল্লাহ্ কিয়াসের মাধ্যমে লোকটিকে বুঝাইয়া দিলেন যে দেনা পরিশোধ করা যেমন প্রয়োজন, হজ্জ করাও তেমনি প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবাগণ সব সময়ে কিয়াসের ব্যবহার করিতেন এবং সে সময়ে কোন ব্যক্তি তাহাদের এই কাজকে অন্যায় বলেন নাই।

কিয়াসের শর্ত

(১) একটি বিশেষ সূত্র, বিধি বা আইনের বিধান হইতে যে কিয়াস করা হয় তাহা যদি একটি বিশেষ বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হয় তবে সেই কিয়াস বৈধ হইতে পারে না। অন্য কথায় কোন একটি বিশেষ বিষয়ে যদি কোন একটি বিধান দেওয়া থাকে, তবে সেই বিধানের উপর কিয়াসের প্রতিষ্ঠা হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খুজাইমা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাহার জন্য উহাই যথেষ্ট। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া যদি কিয়াস করা হয় যে, একজনের সাক্ষ্য দ্বারা দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে সেই কিয়াস বৈধ নহে। রসূলুল্লাহ্ যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা শুধু খুজাইমার সততার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক ব্যক্তি সম্পর্কে বা একটি বিষয় সম্পর্কে আল কুরআন ও হাদীসে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে কিয়াসের মাধ্যমে কোন সাধারণ নীতি প্রণয়ন করা যায় না। আল কুরআনে রসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অন্য সকলের উপর প্রয়োগ করা বৈধ নহে। এই কিয়াস অচল।

(২) যে আইনের উপযোগিতা বা কারণ বা ন্যায়পরতা সাধারণ মানবিক বুদ্ধির নাগালের মধ্যে নয়, কিংবা যে আইন কোন সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম তাহা কিয়াসের ভিত্তি হইতে পারে না। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যাকাতের জন্য মানুষের সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তরাধিকার আইনে স্বামীকে $\frac{1}{8}$ অংশ এবং স্ত্রীকে $\frac{1}{8}$ অংশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অংশ কেন ধার্য করা হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। সুতরাং, এই জাতীয় আইন কিয়াসের ভিত্তিতে হইতে পারে না। ইমাম আবু হানিফার মতে মাতলামি বা গীবতের জন্য আইনে হদের ব্যবস্থা আছে, ইহা অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে প্রসারণযোগ্য নহে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ মনে করেন যে, হদের শাস্তি অন্য ক্ষেত্রে কিয়াসের মাধ্যমে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, আইনের ভাষায় কাফন চোরকে ঠিক চোর বলা যায় না। কিন্তু তবুও কারফন চোকে হদের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কোন বাড়ী বা পশু বা যন্ত্র ভাড়া লইলে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়। ইহা আইনসম্মত। কিন্তু ইহা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। সাধারণ আইনে যে সম্পত্তি স্পর্শযোগ্য নয়, তাহা মূল্যায়ন করা যায় না। ভাড়ার চুক্তি এই সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম। ইমাম আবু হানিফার মতে অন্যায় দখলকারী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। ইমাম শাফিঈ বলেন যে, অন্যায় ভোগ দখলকারী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা এই কারণে বৈধ যে, ঐ অন্যায়কারী ব্যক্তি মালিকের স্বত্ব (মিলক ملك) নষ্টক্রমে তাহার মুনাফা (منافع) লুটিয়াছে।

(৩) হানাফী এবং মালেকীদের মতে আল কুরআন, আল-হাদীস এবং

www.pathagar.com

ইজমার উপর কিয়াসের ভিত্তি হইতে পারে। কতিপয় শাফিঈ ও হাম্বলীর মতে এক কিয়াসের উপর অন্য কিয়াসের প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে কিয়াস কোন সময় মূল আইন বা মূল আইনের কোন শব্দের ব্যতিক্রমধর্মী হইতে পারিবে না। মূল আইনে যাহা আছে কিয়াস তাহারই প্রসারিত প্রবাহ মাত্র, নূতন কিছু নয়।

হানাফী এবং মালেকিগণ এক কিয়াসের ভিত্তি অন্য কিয়াসের উপর স্থাপন করা অনুচিত মনে করেন। তাঁহারা বলেন, দ্বিতীয় কিয়াস যদি আইনের মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই অবস্থায় প্রথম কিয়াসই যথেষ্ট এবং সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কিয়াস একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। আর দ্বিতীয় কিয়াস যদি আইনের মূলের সহিত অসমঞ্জস হয়, তবে উহা অবৈধ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

ইমাম শাফিঈ বলেন, একটি জিনিসের পরিবর্তে সেই প্রকারের অন্য জিনিস সমপরিমাণে লওয়া বৈধ; বেশী লওয়া অবৈধ, কারণ তাহা রিবা। আইনে গমের কথা বলা হইয়াছে এবং বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, এক সের গমের পরিবর্তে সোয়া সের গম লওয়া রিবা। গম একটি খাদ্য। সুতরাং গম সম্পর্কীয় আইন অন্য খাদ্যের বেলায় প্রযোজ্য। সুতরাং পেয়ারার ক্ষেত্রেও এক সের পেয়ারার পরিবর্তে সোয়া সের পেয়ারা লওয়া অবৈধ।

ইমাম শাফিঈ-এর এই যুক্তি হানাফী এবং মালেকিগণ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। তাঁহারা বলেন, অত ঘুরিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অর্থ নাই। বিনিময়ের বস্তু সমপরিমাণ হইতে হইবে ইহাই যখন আইন, তখন ইহা যে কোন বস্তুর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিয়াস কোন অবস্থায় মূল আইনের সহিত অসমঞ্জস হইতে পারে না। আবার মূল আইনে যাহা স্পষ্ট তাহাতে কিয়াসের অবকাশ নাই। ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। যাহা মূল আইনের সহিত অসমঞ্জস তাহাকে স্বীকার করিতে হইলে অধীনকে স্থান দিতে হয় প্রধানের উপর। মূল আইনে যাহা আছে তাহাই যদি আবার কিয়াসের আইন বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তবে অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় মানিতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিয়াস-ভিত্তিক আইন প্রতিষ্ঠিত আইনের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র।

ইমাম শাফিঈ বলেন যে, খাদ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবার সূত্র প্রযোজ্য। তিনি বলেন, এক সের আলুর পরিবর্তে সোয়া সের আলু লওয়া অবৈধ। হানাফিগণ বলেন যে, ইমাম শাফিঈ-এর এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। হানাফিগণ

www.pathagar.com

বলেন, বিনিময়ের হারের পরিমাণগত যোগ্যতা দেখিলে চলিবে না। এক সের ভাল আলুর বদলে সোয়া সের খারাপ আলু লইলে পরিমাণগত বৈষম্য হয় কিন্তু গুণগত বৈষম্য হয় না।

ইমাম শাফিঈ বলেন, আইনের বিধান মতে যেহেতু তালাকের মাধ্যমে জিম্মি তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে সেহেতু এই স্পষ্ট আইনের ভিত্তিতে জিম্মি তাহার স্ত্রীকে জিহারের মাধ্যমেও বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারে। হানাফিগণ বলেন, ইমাম শাফিঈ-এর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। জিহারের পর তওবা বা কাফ্‌ফারার মাধ্যমে কোন মুসলিম জিহারের প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু অমুসলমানের উপর তওবা বা কাফফারার এই বিধান প্রযুক্ত হয় না।

ইমাম শাফিঈ বলেন, কিয়াস করিবার সময় যে আইনের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই আইনের ভাবগত অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইলেও উহার শব্দই অধিক মূল্যবান। তিনি বলেন, খামার শব্দের অর্থ মাদক। সুতরাং আল কুরআন যখন খামারকে নিষিদ্ধ করিয়াছে তখন সকল মাদক দ্রব্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে। হানাফিগণ এই অর্থ মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, খামার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বা আভিধানিক অর্থের দিকে বেশী জোর দিতে যাইয়া ইমাম শাফিঈ ভুল করিয়াছেন। খামার শব্দ দ্বারা সকলে কি বুঝিতেছে তাহাই দেখিতে হইবে, অন্য কিছু নহে।

(৪) আইনে যাহা বলা আছে কিয়াস দ্বারা তাহা পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইবে।

কোন ব্যক্তি একটি জিনিস খরিদ করিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ জিনিসটি পাইল না। সে পরে জিনিস পাইবার জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়া দিল; এই প্রকার বিক্রয়কে ইসলামী আইনে 'সালাম' বলে। সাধারণ আইনে বলা হইয়াছে যে, ক্রয় বিক্রয়ের বস্তুসমূহ আদান প্রদানের জন্য মৌজুদ থাকিতে হইবে। সালাম এই আইনের ব্যতিক্রম। কিন্তু সালাম ইসলামী আইনে সিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই ঘোষণার মূলে আছে একটি হাদীস। ঐ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, বিক্রীত বস্তুটি ভবিষ্যতে একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে প্রদানের অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রিম মূল্যে উহার ক্রয় বৈধ।

ইমাম শাফিঈ বলেন, ভবিষ্যতে বস্তুটি প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকিলেও অগ্রিম মূল্যে উহার ক্রয় বৈধ; এই কিয়াস মূল আইনের পরিবর্তন সাধন করিয়াছে বলিয়া ইমাম শাফিঈকে অভিযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

বিবাহ চুক্তির জন্য দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতির বিধান আইনে পাওয়া যায়। ইমাম মালিক বলেন যে, সাক্ষীর উপস্থিতি একমাত্র প্রচারের জন্য, বিবাহ চুক্তির জন্য উহা মৌলিক নয়। ইমাম মালিকের এই কিয়াসকে মূল আইনের সহিত পরিবর্তনধর্মী গণ্য করা হয়।

যাহাদের মধ্যে যৌন সংযোগ হইয়াছে তাহারা তাহাদের পরস্পরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনকে বিবাহ করিতে পারে না ; ইহাই স্পষ্ট আইন। ইমাম মালিক বলেন যে, বিবাহকালীন যৌন সংসর্গ হইলেই এই নিষেধ বলবৎ হইবে, অন্যথায় নয়। হানাফিগণ বলেন যে, ইমাম মালিক কিয়াসের মাধ্যমে নূতন ভাব আমদানী করিতেছেন, তাই ইহা বৈধ নয়।

ইল্লাত বা কার্যকরী কারণ এবং তাহার বৈশিষ্ট

এখন ইল্লাতের বৈশিষ্ট বর্ণিত হইতেছে। ইল্লাতকে (علت) বলা হইয়াছে মুয়াররিফ (معرف) অর্থাৎ যাহা পরিচয় করিয়া দেয়। ইল্লাতকে বলা হইয়াছে আলামত (علامت) অর্থাৎ চিহ্ন। ইল্লাতকে বলা হইয়াছে মুয়াসসির (موثر) অর্থাৎ যাহা অস্তিত্ব প্রদান করে। সদরুস শরীয়তের মতে প্রথম সংজ্ঞাটি সঠিক। কারণ মূল আইনের ভাষায় যাহা পরিস্ফুট ছিল না, ইল্লাতের দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের উপর তাহা প্রয়োগ করা হয় ; ফলে যাহা জানা ছিল না তাহার সহিত পরিচয় ঘটে। তাহার মতে দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি প্রথম সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তাহার মতে তৃতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ আইনদাতাই আইনকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, ইল্লাত নয়। সহজ ভাষায়, যে বিষয়, পরিস্থিতি এবং বিবেচনা আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনদাতার মনে কাজ করিয়াছিল, সেইগুলিকে ইল্লাত বলে। কোন আইনের ইল্লাত জানিতে পারিলে তালিলের (تعليل) মাধ্যমে সে আইনকে আইনতত্ত্ববিদগণ অন্য বিষয়ের উপরও প্রয়োগ করিতে পারেন। তালিল বলিতে কার্যকরী কারণের ভিত্তিতে যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বুঝায়।

সুন্নী সম্প্রদায়ের সর্বজনগৃহীত মতে, আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনদাতা সর্ব সময়েই একটি হিকমাত বা মাসলাহাত (حكمت مصلحت) সম্মুখে রাখেন। আধুনিক ভাষায় হিকমাত বা মাসলাহাতকে পলিসি বলা যায়। ক্ষতি এড়াইয়া অথবা স্পষ্ট সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া মানুষের কল্যাণ করিবার জন্যই হইতেছে এই পলিসি। আইনের ইল্লাত যদি এই

www.pathagar.com

পলিসিকে অগ্রসর করিয়া দেয় তবে সেই আইনকে ন্যায্য বা মুনাসিব (مناسب) আইন বলা যায়। আবু জায়দিনিদ-দাবুসি বলেন, যে ইল্লাত মানুষের সাধারণ জ্ঞানে ভাল মনে হয়, তাহাই ন্যায্য বা মুনাসিব।

আইনের উদ্দেশ্য দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় যথা, দ্বীনি (دينيه) এবং দুনিয়াবী (دنيويه)। আত্মার শৃংখলা বিধান এবং নৈতিক উন্নয়ন (رياضة النفس و تهذيب الاخلاق) দ্বীনি আইনের উদ্দেশ্য।

মানুষের বুদ্ধি, ধর্ম, সুনাম, বংশধারা, সম্পত্তি এবং জীবন সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী আইন প্রণীত হয়। এইগুলি সম্পর্কে আইনের বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয়। দুনিয়াবী আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে এইগুলি সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা প্রদান করা। যে বিধানের দ্বারা মানুষের মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং মানুষ যাহাতে অভাব হইতে মুক্তি পায় তাহার ব্যবস্থা করা আইনের পরিপূরক উদ্দেশ্য। উদ্দ্যেশ্যের অনেক স্তর আছে। অনেক উদ্দেশ্য পূর্ণ করা আইনের মৌলিক কর্তব্য। অনেক উদ্দেশ্য সাধন করা আইনের গৌণ দায়িত্ব। যে ব্যক্তি অন্যকে আঘাত করে বা হত্যা করে, আইন তাহার প্রতিশোধের বিধান দেয়; এই আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণের জীবন রক্ষা। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করে, সেই ব্যক্তিকে আইন স্বত্ববানের বরাবরে তাহার দখলিকৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করে, এই আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে সম্পত্তি রক্ষা। যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে, আইন তাহাকে শাস্তি দেয়; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বংশ রক্ষা। যে ব্যক্তি অন্যের অপযশ রটাইয়া বেড়ায় আইন তাহাকে সহ্য করে না, এই আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে সুনাম রক্ষা। যে ব্যক্তি মদ খাইয়া মাতাল হয়, আইন তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার বিধান দেয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মস্তিষ্ক অবিকৃত রাখা। আইনে জিহাদের বিধান আছে, ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম রক্ষা। অভিভাবকত্বের আইন, বিক্রয়ের আইন, লীজের আইন, চুক্তির আইন প্রভৃতি জরুরী আইনরূপে গণ্য হইতে পারে না, ইহারা পরিপূরক আইনরূপে খ্যাত। অবশ্য আইনের উদ্দেশ্য কোন্ ক্ষেত্রে মুখ্য এবং কোন ক্ষেত্রে গৌণ, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এক ক্ষেত্রে যাহা মুখ্য অন্য ক্ষেত্রে তাহা গৌণ হইতে পারে। সম্পত্তি রক্ষার জন্য ক্রয় বিক্রয়ের বিধান করা আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য গণ্য করা যাইতে পারে। মানুষকে অভাব হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে বিধান প্রয়োজন, তাহাকেও আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য গণ্য

www.pathagar.com

করা যায়। যাহা জরুরী তাহা অবশ্যই করা প্রয়োজন, তাহা ফেলিয়া রাখা যায় না। যাহা ন্যায্য তাহা পরে করিলেও চলে। আইন প্রবর্তনের সময় তাই জরুরী এবং ন্যায্য এই দুই-এর পার্থক্য বুঝিয়া লওয়া প্রায়াজন।

দ্বীনি এবং দুনিয়াবী আইনের সংঘর্ষ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আইনের উদ্দেশ্য যেমন দ্বীনি তরক্কী বা পারত্রিক উন্নয়ন তেমন দুনিয়াবী তরক্কী বা ঐহিক উন্নয়ন। কোন্ উদ্দেশ্য কোন্ অবস্থায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে কোনো সাধারণ সূত্র বা নীতি প্রদান করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়। রমযান মাসে রোযা রাখিলে ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু রোযার কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে মানুষের পাশবিক বৃত্তি প্রশমিত হয়, তাই আইন এই বিধানকে কল্যাণকর মনে করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মুসলিম যখন সফরে থাকে তখন তাহার শারীরিক অসুবিধার কারণে তাহাকে রোযার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাহার পক্ষে বাসস্থান পরিত্যাগ করা বিপদজনক, তাহার পক্ষে জুমআর নামায মসজিদে না পড়িলেও চলে। বস্তুত যেখানেই কোন কিছু কণ্টকর কাজের বিধান আছে সেখানে আরাম দিবার ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে।

সাধারণ পলিসির উপর কিয়াস অচল

সাধারণভাবে বলিতে গেলে আইনের পলিসির উপর নির্ভর করিয়া কিয়াসের মাধ্যমে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কোন আইনতত্ত্ববিদকে দেওয়া হয় নাই। এই ধরনের অধিকার দেওয়া হইলে অনেক দুঃসাধ্য জটিলতার সৃষ্টি হইবে। আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে সকল মানুষের জীবন রক্ষা। শুধু উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া কিয়াসের ভিত্তিতে বিধান প্রদান করিবার অধিকার প্রদত্ত হইলে জীবন রক্ষার নীতিতে আইনতত্ত্ববিদগণ জিহাদকে বেআইনী ঘোষণা করিতে পারিতেন। এই অধিকার আইনতত্ত্ববিদকে দেওয়া হয় নাই। জিহাদের প্রশ্নে তাহাকে ধর্ম রক্ষার কথা ভাবিতে হয় এবং ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্য বিবেচনার মধ্যে আনিলে জিহাদ আইনসংগত হইয়া পড়ে। জিহাদ দ্বারা ধর্ম সুরক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

ইল্লাত নির্দিষ্ট হইবে

সাধারণ আইন এই যে, কার্যকরী কারণ বা ইল্লাত নির্দিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে। চুক্তি করিতে হইলে পক্ষবৃন্দের সম্মতির প্রয়োজন। কিন্তু সম্মতি সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। সেই কারণে আইন বিধান দিয়াছে যে, সম্মতিকে নির্দিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার জন্য এক-পক্ষের প্রকাশ্য প্রস্তাব এবং অন্য পক্ষের প্রকাশ্য গ্রহণ থাকিতে হইবে। একইভাবে মানুষের অভিপ্রায় কোন নির্দিষ্ট বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। আইন তাই অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য মানুষের দ্বারা সংঘটিত বা তাহার সহিত যুক্ত কোন ঘটনা বা বিষয় বা কাজের উপর আশ্রয় লয়। দবির জাবেতকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করিয়াছে কি-না ইহা বুঝিবার জন্য দবিরের ব্যবহৃত অস্ত্রকে বিবেচনা করা যায়। অস্ত্রের প্রকৃতি দ্বারা দবিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে, তবে ব্যতিক্রম দ্বারা সাধারণ নীতি অপ্রমাণিত হয় না।

কার্যকরী কারণের ন্যায়ানুগতা

যে উদ্দেশ্যে আইন প্রযুক্ত হয় তাহা সব সময় যে সকলের জন্য কল্যাণ-কর হইবে এমন কোন কথা নাই। বেশীর ভাগ মানুষের জন্য কল্যাণকর হইলেই আইনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। সফরের সময় মানুষের কষ্ট এবং অসুবিধা হইতে পারে এই বিবেচনায় মুসাফিরকে রমযান মাসে রোযার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সকল মুসাফির যে সফরে কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করেন এমন নহে; অনেকে সফর করিতে ভালবাসেন এবং তাহাতে আরাম পান। অল্প লোকের এইরূপ হয় বলিয়া সকল লোকের কষ্ট এবং অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

আইনের মূল প্রসারণযোগ্য

কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ বলেন, আইন শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়; কি কারণে আইন জারি হইয়াছে তাহা মুখ্য প্রশ্ন নয়; সুতরাং কারণ বা উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আইনকে সম্প্রসারিত করা নীতি-সম্মত নহে। এই শ্রেণীর আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, কারণ বা উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আইনকে সম্প্রসারণ করা চলে না। অন্য দল বলেন যে,

www.pathagar.com

আইন শূন্যের উপর ঝুলিতেছে না। প্রত্যেক আইনের কারণ এবং উদ্দেশ্য আছে। সেই কারণ এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আইন সম্প্রসারণযোগ্য। শাফিঈ সম্প্রদায়ের লোক বলেন, কিয়াসের মাধ্যমে আইনকে সম্প্রসারণ করা যায় এবং তাহা করিতে হয় উদ্দেশ্য বা কারণের ভিত্তিতে। হানাফিগণ এই অভিমতের সহিত একমত কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, মূল আইনের মধ্যে সম্প্রসারণের অবকাশ খুঁজিয়া লইতে হয়। প্রসঙ্গত জানিয়া নেওয়া প্রয়োজন যে, একটি আইনের একাধিক কারণ বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। দুই কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। মুরতাদ হইলে বা খুন করিলে অপরাধী মৃত্যুদণ্ড পায়। সুতরাং মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কীয় আইনে কারণ একাধিক।

আইনের কারণ কি হইতে পারে

আইনের কারণ বস্তুর গুণ হইতে পারে। সেই গুণ বস্তুর সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত, আকস্মিক, প্রকাশ্য বা লুক্কায়িত হইতে পারে। হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সোনা এবং রূপার উপর যাকাত দিতে হয়। কেন হয়? হানা-ফিগণ বলেন যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য এমন বস্তু যাহার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় বা অন্য জিনিস পাওয়া যায়। সুতরাং স্বর্ণ এবং রৌপ্য অর্থের সমতুল্য। যে কারণে অর্থের যাকাত দিতে হয় সেই কারণে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের যাকাত দিতে হয়। মূল্য বহনের ক্ষমতা অর্থের যেমন আছে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তেমনি আছে।

কারণের সহিত মূলের যোগ

একটি বিষয় বা ঘটনার উপর যদি একটি আইন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই ঘটনা বা বিষয়কে ঐ আইনের কারণ বলা যায় কিনা তৎসম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, ঐ বিশেষ ঘটনাকে আইনের কারণ বলা সঙ্গত নয় এবং ঐ আইনকে সম্প্রসারণ করা বৈধ নয়। মালেকী এবং শাফিঈগণ বলেন যে, ঐ ঘটনা বা বিষয়কে আইনের কারণ বলা সঙ্গত এবং ঐ আইন সাধারণভাবে সম্প্রসারণযোগ্য না হইলেও উহা স্থানবিশেষে বিবেচনার অধিকারে আনা যায়। তবে সকল সম্প্রদায়ের লোক মনে করেন যে, কারণ সম্প্রসারণযোগ্য না হইলে আইনও সম্প্রসারণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

কারণ জানিবার উপায়

কোন কোন সময় আইনের কারণ আইনের ভাষার মধ্যেই দৃষ্ট হয়। চোরের চুরির দোষে হাত কাটিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে, এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হাত কাটিবার আইনের কারণ চুরি। মুয়াজ পর-দার গমন করিয়াছিল, তাই তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যা করা হইল। এখানে বুঝা যায় যে পর-দার গমনের জন্য হত্যা শাস্তির বিধান রহিয়াছে। এই দুই ক্ষেত্রে কিয়াসের অবকাশ নাই।

আইনের কারণ স্পষ্ট নাও হইতে পারে। যখন কোন বিশেষ প্রশ্নের জবাবস্বরূপ আইনের উদ্ভব হয় বা কোন বিশেষ ঘটনার উপর আইন জন্ম লাভ করে, তখন আইনের কারণ ঐ সমস্ত প্রশ্নের বা ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে। আল কুরআনে ওয়ারিশদের বর্ণনা দিবার পর বলা হইয়াছে যে হত্যাকারী ওয়ারিশ হইবে না। এখানে হত্যাই হইতেছে মিরাশ হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ। অশ্বারোহী সৈনিক দুইভাগ গনিমত পাইবে এবং পদাতিক একভাগ পাইবে, আল কুরআনের এই আইনের কারণ অতি সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিয়াছে তাহার নিপুণতার কারণে সে দুইভাগ পাইতেছে। ইজমার মাধ্যমেও আইনের কারণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আইনের কারণ অনুসন্ধান

মূল আইনের উদ্দেশ্য বা কারণ যদি আইনের ভাষার মধ্যে না পাওয়া যায় কিংবা ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে গবেষণার মাধ্যমে আইনের কারণ বা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে হয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য হইতেছে জনকল্যাণ। কারণ বা উদ্দেশ্যের জন্য আইন জারি করা হয় সেই কারণ এবং উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া মূল আইন হইতে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়। আইনের সহিত কারণ বা উদ্দেশ্যের যোগ যেখানে খুব ঘনিষ্ঠ সেখানে কিয়াসের ক্ষেত্র উর্বর।

আইনের কারণের মূল এবং শাখা

শিশু বা উন্মাদ সাধারণভাবে অসহায়। তাহারা অসহায় কেন? তাহারা অসহায় এই কারণে যে তাহাদের বিচার বুদ্ধি অতি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ।

www.pathagar.com

তাহাদের বিচার বুদ্ধি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ কেন ? তাহাদের বিচার বুদ্ধি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে তাহারা মন এবং শরীরের দিক হইতে শক্তিহীন। এখানে দেখা যাইতেছে শারীরিক বা মানসিক শক্তিহীনতা একটি মূল বস্তু, বিচার বুদ্ধির দুর্বলতা তাহার শাখা এবং শিশু ও উন্মাদের অসহায়তা তাহার প্রশাখা। আইনের কারণ বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এই উদাহরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইনের উদ্দেশ্য এবং কারণ যেমন ব্যাপক হইতে পারে আবার সংগে সংগে সংকীর্ণও হইতে পারে।

ত্যাগের নীতির মাধ্যমে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়

আইনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময় মনের মধ্যে এমন ভাব জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাকেই আইনের কারণ অনুমান করা হয়। কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে ঐ অনুমান সত্য নহে। এইভাবে একের পর এক অনুমান করিয়া এবং সেই অনুমান যাচাই করিয়া সত্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইভাবে গবেষণা চালাইয়া গেলে, অর্থাৎ প্রথমে অনুমান করিয়া পরে যাচাইয়ের মাধ্যমে সেই অনুমান পরীক্ষা বা ত্যাগ করিয়া আইনের যথার্থ কারণে গিয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভব। ইহাকেই ত্যাগের নীতি বলে। কোন কোন অনুমান বা ঘটনা বা বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে তাহা বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

কিয়াসের মূল্য

যে কিয়াস যথার্থ বিষয় এবং কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই কিয়াস সকল সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে সর্বতোভাবে সিদ্ধ। শাফিঈ এবং মালেকিগণ মনে করেন যে, আইনের কারণ পাওয়া গেলে সে স্থলে মুজতাহিদ কিয়াস করিতে বাধ্য। হানাফিগণ এইরূপ মনে করেন না। ভ্রাতা এবং পিতামহ ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য এই প্রশ্নে হযরত আলী ভ্রাতাকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন যে, পিতামহ হইতে ভ্রাতা নিকটতর আত্মীয়। তাহার এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলেন, পিতামহ হইতেছেন বৃক্ষের কাণ্ড এবং সেই কাণ্ড হইতে একটি শাখা বাহির হইয়াছে অর্থাৎ মৃতের পিতা জন্মিয়াছে এবং ঐ শাখা হইতে আবার দুইটি প্রশাখা বাহির হইয়াছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি এবং তাহার ভ্রাতা জন্মিয়াছে এবং এই কারণে তিনি ভ্রাতাকে পিতামহ হইতে নিকটতর আত্মীয় মনে করেন।

www.pathagar.com

ইমাম গাজ্জালী মনে করেন যে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কঠোর আইন করা যায়। মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে; সেই সংগ্রামে কিছু মুসলিম সৈন্য অমুসলিমদের হাতে বন্দী হইল। অমুসলিমগণ মুসলিম বন্দীদিগকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই অবস্থায় মুসলিম সৈন্যগণ কি করিবে? তাহারা অস্ত্র চালনা করিলে তাহাদের মুসলিম ভ্রাতাগণ নিহত হইবেন এই আশঙ্কায় তাহারা কি চুপ করিয়া থাকিবে? ইমাম গাজ্জালী বলেন, তাহাদের চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কল্যাণে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম ভ্রাতাকে নিধন করা অন্যায় নয়। একখানি নৌকায় পাঁচশ জন যাত্রী আছে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর নদীতে ঝড় উঠিল। বুঝা গেল যে, দুইজন যাত্রীকে নৌকা হইতে নদীতে ফেলিয়া না দিলে সকল যাত্রী ডুবিয়া মরিবে। এমতাবস্থায় কোন একজন যাত্রীকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া জায়েয হইবে না। এক্ষেত্রে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কল্যাণের কোন প্রশ্ন নাই।

কিয়াসের মূল্য

যে কিয়াস মজবুত এবং শক্ত কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কিয়াস মহামূল্যবান। যে কারণের উপর কিয়াস প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কারণ একাধিক আইনের মধ্যে পাওয়া গেলে তাহার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিয়াস মূল্যবান।

কিয়াসের মধ্যে সংঘর্ষ

যখন একই বিষয়ে দুইটি বিপরীতধর্মী কিয়াসের সন্ধান পাওয়া যায় তখন আইনতত্ত্ববিদ তাহাদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করিতে পারেন। একটি কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে কিয়াস অবশ্য-পালনীয় বিধি নয়। কিয়াস হইতেছে গবেষণার ফল। কিয়াসের মূল্য তাই গবেষকের জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। গবেষকের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্রান্ত নয়।

কারণ বা উদ্দেশ্যের সীমা

কোন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি অন্যের খাদ্য গ্রহণ করে তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায়। এই প্রকার

www.pathagar.com

আইনের উদ্দেশ্য কি ? ইহার উদ্দেশ্য এবং কারণ হইতেছে মানুষের সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র জ্ঞানে সম্মান করা। কোন মুসলিম যদি কোন কাফিরের সম্পত্তি গ্রহণ করে বা ধবংস করে, তবে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। মানুষের সম্পত্তির অধিকার সম্মান করা যদি আইনের উদ্দেশ্য বা কারণ হয় তবে বিধর্মীর সম্পত্তি লইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না কেন ? ইমাম শাফিঈ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সম্পত্তি রক্ষার নীতির ব্যতিক্রম আছে এবং বর্তমান উদাহরণ এই ব্যতিক্রম। হানাফিগণ বলেন যে, সম্পত্তি রক্ষার নীতি ঠিকই আছে শুধু বিধর্মী শত্রু এই নীতির আশ্রয় পায় না।

তীর ছুড়িবার আয়োজন করা হইল। ধনুকে টান দিবার সাথে সাথেই তাহার তার ছিড়িয়া গেল ; এইভাবে কাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে পারে। একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করিবার চুক্তি করা হইল। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন এই চুক্তি মূল্যহীন। মানুষ বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। তীর ছোড়া হইল কিন্তু ইহা অভীষ্টে পৌছিল না। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইল না। এক ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি বিক্রয় করিল। সে এই সম্পত্তির দখল দিতে পারিল না, বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বানচাল হইয়া গেল। তীর ছোঁড়া হইল এবং তাহা শত্রুকে আঘাত করিল কিন্তু শত্রুর গায়ে লৌহবর্ম থাকায় ইহা তাহাকে যখম করিতে পারিল না। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ফলবতী হইল না। এইভাবে এক ব্যক্তি এই চুক্তিতে পণ্য বিক্রয় করিল যে, নদীতে বন্যা হইলে বিক্রয় চুক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। নদীতে বন্যা হইল এবং তাহার বিক্রয় চুক্তি নষ্ট হইল।

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে উহাতে উদ্দেশ্য কি ভাবে ব্যর্থ হইতে পারে তাহা বুঝান হইয়াছে।

কিয়াসের উদাহরণ

হানাফিগণ মনে করেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়িবার পর আমীন অস্ফুটস্বরে বলিতে হয়। ইহার কারণ আমীন ইবাদতের অংশ। শাফিঈগণ বলেন, ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে আমীনকে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিতে হইলে নামাযের মধ্যে আযান আকামতের সময় আল্লাহ্ আক্‌বারকেও অস্ফুটস্বরে বলিতে হয়। কিন্তু আল্লাহ-আকবার ইবাদতের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ইহাকে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। নামাযের মধ্যেও আল্লাহ-আক্‌বারকে উচ্চস্বরে বলা হয়।

www.pathagar.com

হানাফিগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, আমীন এবং আল্লাহু-আক্‌বার একইভাবে ইবাদতের অংশ বটে কিন্তু আল্লাহু-আক্‌বারের অন্য উপযোগিতা আছে। নামাযের প্রারম্ভে মুসল্লিদিগকে আহ্‌বান করিবার জন্য এবং নামাজের মধ্যে উহা কোন স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য আল্লাহু-আকবার বলা হয়। এই কাজ অস্ফুটকন্ঠে উচ্চারণের মাধ্যমে করা যায় না।

শাফিঈগণ মনে করেন যে, বিবাহে দুইজন পুরুষ সাক্ষী থাকা প্রয়োজন। একজন পুরুষ এবং দুইজন নারীর উপস্থিতিতে বিবাহ হয় না। তাহারা বলেন, বিবাহচুক্তি আর সম্পত্তি সম্পর্কীয় চুক্তি এক নয়। হানাফিগণ বলেন যে, বিবাহচুক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। দুর্বল প্রমাণের উপরও বিবাহ দাঁড়াইতে পারে।

একজন স্ত্রীলোক সংবাদ পাইল যে তাহার স্বামী মারা গিয়াছে। এই সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিল এবং তাহার ঔরসে একটি সন্তানের জন্ম দিল। অতঃপর তাহার প্রথম স্বামী ফিরিয়া আসিল এবং ঐ স্ত্রীলোকের সন্তানটিকে দাবী করিল। হানাফিগণ ঐ সন্তানটিকে স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামীকে দিবে। হানাফিগণ বলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটিকে অঙ্কশায়িনী করিবার অধিকার তাহার প্রথম স্বামীর। সুতরাং সন্তান তাহার। শাফিঈগণের মতে ঐ সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর হইবে কারণ ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার সহিত শয্যা গ্রহণের ফলে সন্তান জন্মিয়াছে।

হানাফিগণ মনে করেন যে, ক্ষতযোনি (যাহার সহিত যৌন সংসর্গ হইয়াছে) নাবালিকার সম্পত্তির উপর অভিভাবকের অধিকার আছে। একই কারণে তাহার দেহের অভিভাবকত্বের অধিকারও অভিভাবক রাখে এবং তাহাকে সে বিবাহ দিতে পারে। শাফিঈগণ মনে করেন যে, এই যুক্তি সিদ্ধ নয়। নাবালিকার দেহের অভিভাবকত্বে অধিকার থাকায় অভিভাবক তাহার সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে পারে। নাবালিকা যতদিন কুমারী থাকে ততদিন এই নিয়ম চলে। ক্ষতযোনি নাবালিকাকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যায় না। হানাফিগণ উত্তরে বলেন যে, অভিভাবকত্বের আইন নাবালিকার কল্যাণের জন্য, সুতরাং নাবালিকা ক্ষতযোনি হউক অথবা অক্ষতযোনি হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

শাফিঈগণের মতে কোন অমুসলিম কুমারী যদি ব্যভিচার করে তবে তাহার শাস্তি বেত্রাঘাত এবং সেই কারণে কোন অমুসলিম মহিলা যদি

www.pathagar.com

ব্যভিচারিণী হয় তবে একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই তাহার প্রাপ্য ; শাফিঈগণের এই অভিমতের ভিত্তি হইতেছে মুসলিম ব্যাভিচারিণীর শাস্তির বিধান। তাঁহারা বলেন যে, মুসলিম বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর শাস্তি যেহেতু মৃত্যুদণ্ড এবং কুমারীর শাস্তি বেত্রাঘাত সেহেতু অমুসলিমদেরও অনুরূপ শাস্তি দেওয়া উচিৎ। হানাফিগণ মনে করেন যে, শাফিঈগণের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। মুসলিম কুমারীর ব্যভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত। যেহেতু মুসলিম বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর অপরাধ গুরুতর, সেই জন্য তাহাকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হয়। বেত্রাঘাতের গুরুতর দণ্ডই হইতেছে মৃত্যুদণ্ড।

শাফিঈগণের মতে যে ব্যক্তি অন্যের স্বত্বদখলীয় সম্পত্তিতে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া ভোগ দখল করিতে থাকে, আইন সেই ব্যক্তিকে তাহার অন্যায়ভাবে ভোগ দখলীকৃত সম্পত্তি সঠিক মালিকের বরাবর ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করে এবং যতদিন পর্যন্ত সে অন্যায়ভাবে ঐ সম্পত্তি নিজের ভোগ দখলে রাখিয়াছিল ততদিনের জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। শাফিঈগণ বলেন, যে ব্যক্তি চুক্তি ভংগ করে সে যেমন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, ঠিক তেমনিভাবে অন্যায় ভোগ দখলকারীও সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। হানাফিগণ বলেন যে, অন্যায়ভাবে ভোগদখলকারী ব্যক্তি সঠিক মালিকের বরাবরে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য, কিন্তু ভোগ দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার কোন দায়িত্ব তাহার নাই। সম্পত্তিতে যাহা উৎপন্ন হয় বা সম্পত্তি হইতে যাহা লাভ হয় তাহা কোন নিশ্চিত নির্ধারিত বস্তু নহে। তাঁহারা বলেন, যাহা নিশ্চিত এবং নির্ধারিত নয় তৎ-সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকিলে যাহা ন্যায্য তাহার বেশী দেওয়া হইয়া যাইতে পারে এবং বেশী দেওয়া কোনক্রমেই আল্লাহর আইনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। শাফিঈগণ বলেন, হানাফীদের এই মত ঠিক নয়। মাল বলিতে শুধু সম্পত্তি বুঝায় না, সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত মুনাফাও বুঝায়। ক্ষতিপূরণ বেশী দেওয়া হইয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় সম্পত্তির মালিককে একেবারে বঞ্চিত করা বিবেকসম্মত নহে।

শাফিঈগণ মনে করেন, যে মুহূর্তে অমুসলিম স্বামী বা স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে, সেই মুহূর্তে, তাহাদের মধ্যে সহবাস না হইয়া থাকিলে, তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে ; আর তাহাদের মধ্যে সহবাস হইয়া থাকিলে তিনমাস পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে। অমুসলিম রহিয়া যাওয়া স্বামী বা স্ত্রীকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

www.pathagar.com

হানাফিগণের মতে এই ক্ষেত্রে কাজী, যে স্বামী বা স্ত্রী অমুসলিম রহিয়া গিয়াছে, তাহার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হইবেন। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহারা বলেন, শাফিঈগণের মতবাদ ঠিক নহে কারণ ইসলাম গ্রহণের ফলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইল এমন মনে করা যায় না। হানাফিদের মতে ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি ইহাই বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসতিহসান

ইসতিহসান বা আইনগত ন্যায়পরায়ণতা

কিয়াসভিত্তিক আইন যদি কোন স্পষ্ট মূল আইনের বা স্পষ্ট ইজমার পরিপন্থী হয় তবে সকল মযহাবের মতে সেই কিয়াসভিত্তিক আইন অসিদ্ধ। কিয়াসভিত্তিক আইন যদি আইনতত্ত্ববিদগণের ধারণায় সংকীর্ণ বা অগ্রহণ-যোগ্য মনে হয় কিংবা আইনবিদ যদি মনে করেন যে ঐ আইন প্রয়োগ শুধু অসুবিধা এবং দুরবস্থা ডাকিয়া আনিবে, তবে সেইক্ষেত্রে হানাফিগণের মতে আইনবিদ ঐ কিয়াসভিত্তিক আইনকে উপেক্ষা করিয়া জনকল্যাণ ও সুবিচারের স্বার্থে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। যে নীতির বলে তিনি কিয়াসকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তাহাকে ইসতিহসান বলে। যাহা ভাল মনে করা যায় তাহাই ইসতিহসান।

ইসতিহসানের নীতি শুধু হানাফিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে নীতির বলে আইনবিদ তাহার ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারে, সেই নীতিকে হানাফিগণ ইসতিহসান বলেন। তাহাদের মতে কিয়াসভিত্তিক আইন অভ্রান্ত নয়। এমনকি ইজমাকেও অভ্রান্ত বলা যায় না। প্রয়োজন-বোধে ঐগুলির পরিবর্তে স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করাই ইসতিহসানের মূল মর্ম। হানাফিগণ বলেন যে, ইসতিহসানও এক প্রকার কিয়াস। তবে কিয়াস অপেক্ষা ইসতিহসানের এখতিয়ার ব্যাপক। ইমাম আবু হানিফা এই নীতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সুবিচার করিতে হইলে শুধু অনুকরণ এবং সদৃশ বিধান করিলেই চলিবে না, আইনকে উপযোগী এবং স্থিতিস্থাপক করিতে হইবে। ইমাম আবু হানিফার এই যুক্তি কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোক মানিয়া লইতে পারেন নাই। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইসতিহসানের নামে ফতোয়া দিবার অর্থ হইতেছে নতুন

www.pathagar.com

আইন প্রণয়ন করা। ইসতিহসানের বিরুদ্ধে যে নিন্দাবাদ করা হয় তাহার প্রতিক্রিয়ায় ইসতিহসানভিত্তিক আইনের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যায়। হানাফিগণ ইসতিহসানকে কিয়াস বলিয়া চালাইতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইসতিহসান এবং কিয়াস এক বস্তু নয়।

ইসতিহসান এবং কিয়াসের শ্রেণী

ইসতিহসানকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে

(ক) যাহা আইনবিদের মনে ন্যায্য মনে হয় এবং

(খ) যাহা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হইলেও আইনবিদদের বিচক্ষণ দৃষ্টির কাছে ন্যায্য মনে হয় না।

কিয়াসকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে

(১) কিয়াস দুর্বল হইতে পারে এবং

(২) কিয়াস আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল মনে হইলেও পরীক্ষায় ন্যায্য মনে হইতে পারে।

ক নীতি ১ নীতির উপর প্রাধান্য পাইবে এবং ২ নীতি খ নীতির উপর প্রাধান্য পাইবে।

বিখ্যাত তৌদিহ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, কিয়াস এবং ইসতিহসানের মধ্যে বিরোধ হইতে পারে না। বিরোধ হইলেই বুঝিতে হইবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গণ্ডগোল ঘটিয়াছে।

যতই দিন যাইতেছে সামাজিক জটিলতা ততই বাড়িতেছে এবং জটিলতা যতই বাড়িয়া যাইতেছে ততই কিয়াস দ্বারা সব সামলাইয়া উঠা যাইতেছে না। এই কারণেই ইসতিহসানকে অবলম্বন করিতে হইতেছে। ইসলামী আইনের পুস্তকাদিতে ইসতিহসানের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী আইনের অনেক শাখার উদ্ভব হইয়াছে ইসতিহসান হইতে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসতিসলাহ

ইসতিসলাহ

ইসতিহসান বা আইনসঙ্গত ন্যায়পরতার নীতির প্রবর্তক ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। অবস্থাবিশেষে যে সিদ্ধান্ত আইনানুগ এবং ন্যায়সঙ্গত তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই ইসতিহসানের মূল কথা।

www.pathagar.com

ইমাম মালেক প্রায় একই ধরনের নীতির প্রবর্তক ছিলেন। তাহার নীতিকে ইসতিসলাহ বলা হয়। যাহা জনকল্যাণমূলক, তাহাই গ্রাহ্য; ইহাই ইসতিসলাহের মূল বক্তব্য (مصالح المرسلة و ستصلاح)।

ইমামুল হারামাইনও এই মত পোষণ করিতেন। ইমাম মালিকের এই নীতি মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই। তাঁহার অনুসারিগণ মনে করিতেন যে, এই নীতি এতই অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট যে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন আইনগত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তাহারা এই নীতির সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মালেকী আইনবিদগণের একটি উদাহরণ হইতে ইহার প্রয়োগের অনুপযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে চুরি করে তাহার শাস্তি হইতেছে হস্তকর্তন। এই আইন হইতে ইসতিসলাহের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য চোরের উপর বল প্রয়োগ বৈধ। বলাবাহুল্য এই সিদ্ধান্ত ন্যায়সম্মত নহে। একজন নির্দোষ ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করার চাইতে একজন দোষী ব্যক্তির মুক্তি পাওয়া ভাল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইসতিদলাল

ইসতিদলাল

ইসতিদলাল (استدلال) শব্দের অর্থ হইতেছে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু অনুমান করা। তফসিরের ক্ষেত্রে হানাফী পণ্ডিতগণ এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ এই শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাদের মতে ইসতিদলাল বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তফসীর বা কিয়াসের আওতায় আসে না। ইহাকে যুক্তির মাধ্যমে নির্ণীত সিদ্ধান্ত বলা যায়। ইসতিদলাল তিন প্রকারের হইতে পারে—

১। একটি বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের যখন যোগ ঘটে এবং সেই যোগের পশ্চাতে কোন কার্যকরী কারণ থাকে না তখন সেই যোগের প্রকাশকে এক প্রকার ইসতিদলাল বলা যায়।

২। বিলোপ বা বিরতি যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া লইতে হয় যে কোন বস্তু বা তাহার অবস্থা বহাল আছে।

www.pathagar.com

৩। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে আইন প্রত্যাদিষ্ট তাহা প্রামাণ্য।

প্রথম প্রকারের ইসতিদলাল চার শ্রেণীর হইতে পারে—

(১) যখন দুইটি হাঁ-বোধক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এই প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যে ব্যক্তি সিদ্ধ তালাক দিতে পারে সে ব্যক্তি সিদ্ধ জেহারও করিতে পারে।

(২) যখন দুইটি না-বোধক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। বিনা নিয়তে অযু সিদ্ধ হইলে বিনা নিয়তে তায়াম্মুম সিদ্ধ।

(৩) যখন একটি হাঁ-বোধক বিষয়ের সহিত একটি না-বোধক বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যাহা হালাল তাহা হারাম হইতে পারে না।

(৪) যখন একটি না-বোধক বিষয়ের সহিত একটি হাঁ-বোধক বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যাহা হারাম তাহা হালাল নহে।

যাহার বিরতি বা বিলোপ প্রমাণ করা হয় নাই তাহা বহাল আছে, এই নীতি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে : এক ব্যক্তি নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাহার সংবাদাদি পাওয়া যাইতেছে না। শাফিঈগণের মতে আইনের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিকে জীবিত ধরিতে হইবে। অবশ্য তাহার মৃত্যু প্রমাণিত হইলে অন্য কথা। তাহার সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণ পাইবে না এবং সেই ব্যক্তি তাহার পূর্ববর্তীর মৃত্যুতে ওয়ারিশ হইবে। হানাফিগণ বলেন, বিরতি বা বিলোপ প্রমাণের অভাবে বিদ্যমানতার নীতি বর্তমান স্বত্বকে রক্ষা করে কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বত্ব সৃষ্টি করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণ পাইবে না। কিন্তু সে নিজে ওয়ারিশ, কাহারও ওয়ারিশ হইবে না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে আইন বলবৎ ছিল, সেই আইন সম্পর্কে হানাফীদের ধারণা অন্যরূপ। তাহারা বলেন, ঐ সমস্ত আইন আল কুরআনে সমর্থিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়।

কিয়াসের বাহিরে সকল প্রকার অনুসিদ্ধান্তকে ইসতিদলাল বলা যায়। কাজী ওদুদ বলেন যে, ইসতিদলালের মধ্যেই ইসতিহসান এবং ইসতিসলাহ বর্তমান।

www.pathagar.com

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ইজতিহাদ এবং তকলিদ

ইজতিহাদ ও তকলিদ

মুজতাহিদ বলিতে যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করে তাহাকে বুঝায়। ইজতিহাদ বলিতে প্রচেষ্টা বা প্রয়াস বুঝায়। আইনের ভাষায় ইজতিহাদের অর্থ ব্যাপক। আল কুরআন, হাদীস এবং ইজমায় যাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, সেই বিষয়ে সঠিক আইন নির্ণয়ের জন্য আইনবিদ যখন তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তখন তাহার এই কাজকে ইজতিহাদ বলা হয়। অন্য কথায় যে ক্ষেত্রে কোন স্পষ্ট আইন আল কুরআন, হাদীস বা ইজমার মধ্যে না পাওয়া যায় তখন সেই বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলে। ইজমার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তৎসম্পর্কে ইজতিহাদ সাধারণভাবে চলিবার কথা নয়। কিন্তু ইজমা গঠনের সময় কামেল মুজতাহিদগণ তাহাতে শরীক হইয়াছিলেন কিনা এই প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দেয়। মুজতাহিদ ফকীহ বা আইনবিদ নহেন। তাহার যোগ্যতা আরও অধিক। তাহাকে শুধু আইন জানিলে চলিবে না তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকিতে হইবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা সাধারণভাবে শুদ্ধ গণ্য হয় কিন্তু ইহা যে অশুদ্ধ হইতে পারে না এমন নহে। এই কারণে সিদ্ধান্তমূলক আইনকে অনুমান-ভিত্তিক আইন বলা হয়। যদি কোন আইনবিদ ভুল সিদ্ধান্ত করেন তবে তাহার দ্বারা তিনি গুনাহগার গণ্য হন না। তিনি সততার সহিত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই; ইহা দুর্ভাগ্য-জনক হইলেও পাপজনক নহে। সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের এখতিয়ারে। তাহাদের সিদ্ধান্তই একমাত্র অভ্রান্ত। সকল মযহাবের মতে আইনবিদগণের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। মুতাজিলাগণের মতে এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ।

মুজতাহিদগণের যোগ্যতা

ফখরুল ইসলামকে অনুসরণ করিয়া সদরুস-শরীয়ত বলেন, মুজতাহিদকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে—

(ক) তিনি আল কুরআনের আভিধানিক এবং আইনগত অর্থ সম্যক

www.pathagar.com

জানিবেন এবং বুঝিবেন। আল কুরআনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর জ্ঞান থাকিবে।

(খ) তিনি আল হাদীসের মূল পাঠ এবং তাহার সনদ বা প্রমাণ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখিবেন।

(গ) তিনি কিয়াসের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হইবেন।

জামাউল খাওয়ামি গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন যে, মুজতাহিদ নিম্ন-বর্ণিত গুণের অধিকারী হইবেন—

(ক) তিনি বালেগ, বুদ্ধিমান, ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বক্তব্যের মর্ম গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(খ) আরবী ভাষা, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

(গ) আল কুরআন, আল হাদীস এবং আইনতত্ত্বে তাহার জ্ঞান থাকিবে।

(ঘ) আইনদাতা কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিবার জন্য তিনি শরীয়তের প্রধান সূত্র সম্পর্কে অবহিত থাকিবেন।

ঙ) তিনি মনসুখ আইন সম্পর্কে জ্ঞান রাখিবেন।

(চ) তিনি আল কুরআনের শানে নযুল জানিবেন।

(ছ) তিনি হাদীসের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখিবেন। অর্থাৎ কোন্ হাদীস মজবুত এবং কোন্ হাদীস দুর্বল তাহা তিনি বুঝিবেন।

আইনতত্ত্ববিদকে তাসাউফ জানিতে হইবে, এমন নহে। সকল আইনের সর্বপ্রকার জ্ঞান থাকিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। তিনি নারী বা ক্রীতদাস হইতে পারেন। তাহার তাকাওয়া নাও থাকিতে পারে। তবে জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাহিদ (المجتهد المستقل) হইতে হইলে তাহার "ক" হইতে "ছ" পর্যন্ত গুণ থাকা প্রয়োজন।

তাজউদ্দিন সুবকি বলেন, মুজতাহিদ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। মুজতাহিদুল মযহাব (المجتهد المذهب) তাহার মযহাবের আইন কানুন এবং বিধি ব্যবস্থাই জানিবেন এবং ঐগুলি তিনি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখিবেন। মুজতাহিদুনিল ফুতেয়া (المجتهدون الفتياء) তকিত প্রশ্নের উপর ফতোয়া দিবার যোগ্যতা রাখিবেন। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে কোন্ মত গ্রহণযোগ্য তাহা তিনি বলিবার ক্ষমতা রাখিবেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ

www.pathagar.com

বলেন যে, আইনের বিশেষ শাখায় যাহারা ভাল জ্ঞান রাখেন তাহারাও মুজ-তাহিদ হইতে পারেন।

তকলিদ

কি কারণে বিধি বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জ্ঞান না রাখিয়া অন্যের অভিমত অনুসরণ করাকেই তকলিদ বলে। আইনতত্ত্বে তকলিদ বলিতে আইনবিদের মতের অনুসরণ বুঝায়। আল কুরআন, হাদীস বা ইজমাতে যাহার কোন স্পষ্ট ফয়সালা নাই, তৎসম্পর্কে আইনবিদ যে অভিমত প্রদান করেন তাহা গ্রহণ করার নাম তকলিদ। আল কুরআন, হাদীস এবং ইজমায় যাহার সমাধান আছে তৎসম্পর্কে অন্য কোন অভি-মতের অবকাশ নাই; সকলেই তাহা মানিতে বাধ্য। দেখা যাইতেছে যে যাহারা আইনবিদ নহেন, তকলিদ অর্থাৎ অনুসরণ তাহাদের জন্যই মাত্র। যিনি নিজে আইনবিদ তিনি স্বাধীন অভিমত পোষণ করিত পারেন। তাহার পক্ষে অন্যের অভিমত গ্রহণ করা হারাম। আইনতত্ত্ববিদ না হইয়া কেহ যদি আলেম হন এবং স্বাধীন মত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যদি তাহার থাকে, তবে তিনি নিজের মতেই থাকিবেন; অন্য আইনবিদের মত বিপরীত হইলেও তাহার টলিবার কোন কারন নাই। ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি হইতেছে মানুষের বিবেক। বিবেকবান ব্যক্তি তাহার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হইবেন আইনের ইহাই অভিপ্রেত।

তকলিদ সম্পর্কে প্রশ্ন

(১) সাম্প্রতিক কালে কোন মুসলিম কি প্রচলিত মযহাবের প্রতিষ্ঠিত আইন মানিতে বাধ্য? সে কি বলিতে পারে, কুরআন হাদীসে যাহা আছে তাহাই আমার আইন; যাহা উহাতে নাই তৎসম্পর্কে আমি আমার বিবেক মতই চলিব? আইনবিদগণ বা ইমামগণ যাহা বলিয়াছেন তৎদ্বারা আমি বাধ্য নই।

(২) তিনি কি বলিতে পারেন, চার মযহাবের মধ্যে যে সিদ্ধান্তের সহিত আমি একমত, তাহাই আমি গ্রহণ করিব? যে প্রশ্নে তাহারা ভিন্ন মত, সে প্রশ্নে আমি আমার বিবেক মত তাহাদের মধ্যে যাহাকে ভাল মনে করি তাহাকে গ্রহণ করিব?

(৩) তিনি কি বলিতে পারেন যদিও আমি এক মযহাবের লোক তবুও অন্য মযহাবের আইন গ্রহণ করিবার অধিকার রাখি?

www.pathagar.com

(৪) তিনি কি বলিতে পারেন আমি একজন কাজী, তবুও আমি আমার মযহাবের আইন মানিতে সর্বক্ষেত্রে বাধ্য নই; এমনকি যাহারা মামলা করিয়াছেন তাহাদের মযহাবের মতও আমি মানিতে বাধ্য নই।

সাধারণ মানুষের কর্তব্য

যিনি সাধারণ মানুষ অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ বা 'আমি (عامى) তাহার পক্ষে জ্ঞানী আইনবিদের অভিমত অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। তিনি দ্বীন এবং আইন সম্পর্কে কোন পড়াশুনা করেন নাই সুতরাং তাহার সম্মুখে জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইলে সদউত্তর খুঁজিয়া পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সেমতাবস্থায় তিনি যদি কোন প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তির মত অবহিত হন তবেই তিনি তাহার কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন বলিয়া ধরা যায়। মালেকী, শাফিঈ এবং আদি যুগের হানাফী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কোন আইনবিদের আশ্রয় গ্রহণ করা বৈধ।

আধুনিক আইনবিদগণ কি প্রাচীন ইমামদের মর্যাদা পাইতে পারেন

ইসলামী আইনের সুন্নী নীতিতে আধুনিক কালের আইনবিদকে মর্যাদা দেওয়া যাইবে না, এমন কোন কথা নাই। বরং হাম্বলিগণ বলেন, সর্বযুগে একজন মুজতাহিদ থাকিবেনই। অন্য সম্প্রদায়ের অনুসারিগণ বলেন, মুজতাহিদবিহীন যুগও হইতে পারে। কোন আইনবিদ এমন কথা বলেন নাই যে, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে আধুনিক আইনবিদের মত অগ্রাহ্য হইবে। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, স্বাধীন চিন্তার যুগ শেষ হইয়াছে; আইনের বিস্তৃতির বা উন্নয়নের আর কোন সুযোগ নাই। সৌভাগ্যের বিষয়ে কেহ এমন দাবী করেন নাই যে স্বাধীন চিন্তার আর প্রয়োজন নাই বা উহার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফখরুল ইসলাম এবং সদরুস শরীয়ত বলেন, রসূলুল্লাহ্‌র আসহাবগণের ব্যক্তিগত মত অন্য আইন-বিদদের মতের চাইতে যে শ্রেষ্ঠ এমন মনে করিবার কারণ নাই। এই অবস্থায় মযহাবের ইমামদের মত সর্বাবস্থায় মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহার বিপরীত কিছু করা যাইবে না এমন দাবী সমর্থনযোগ্য নয়। বাহারুল উলুম বলেন, নাসাফির পরে আর কেহ আইনবিদ হইবেন না এবং তাই তাহাদের একজনকে অনুসরণ করা কর্তব্য; কিন্তু তাহাদের এই দাবী

www.pathagar.com

একেবারেই অযৌক্তিক। রসূলুল্লাহ বলিয়াছেন, না জানিয়া তাহারা অভিমত দেয় এবং নিজেরা বিপথে যায় এবং অন্যদের বিপথগামী করে। কেহ কেহ বলেন যে, বর্তমান যুগে মুজতাহিদ হওয়া অসম্ভব না হইলেও কচিৎ সম্ভব। তাহাদের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। মুজতাহিদের যোগ্যতা এমন কিছু বিরাট নয় যে আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের তাহা থাকা অসম্ভব। ইজমার জন্য প্রতিযুগেই আইনবিদ থাকা প্রয়োজন। কিয়াসকেও আইনের জীবন্ত উৎস মনে করা হয়। আল কুরআন বলে তুমি যদি না জান তবে যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। কুরআনের এই নির্দেশে এবং ইজমা ও কিয়াসের প্রয়োজনে সবকালে মুজতাহিদ থাকা প্রয়োজন এবং সম্ভব। যাহারা বলেন যে, ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারা নিজেরাই যে মুজতাহিদ এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইজমা এবং কিয়াসের জন্য সর্বকালে আইনবিদের প্রয়োজন। একমাত্র তাঁহারাই এই কাজ করিতে পারেন। এমতাবস্থায় কেহ যদি বলেন যে, ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে তাহার কথার দ্বারা বুঝা যায় যে ইজমা ও কিয়াসের আর প্রয়োজন নাই। এই অবিশ্বাস্য অভিমত কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ওহির (وحی) সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন নতুনভাবে ইজমা ও কিয়াসের দরজা বন্ধ করিয়া দিলে শ্বাস-রুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হইবে। সুন্নী আইনতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী কিয়াসকে অভ্রান্ত মনে করা যায় না। কিয়াস ব্যবস্থার বিধান উন্মুক্ত না রাখিলে প্রাচীন কালের আইনবিদদের সেই সমস্ত অভিমত যাহার মধ্যে ভ্রান্তির সম্ভাব্যতাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, পরম প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে হয়। তকলিদ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ইহার অন্যবিধ আইনগত তাৎপর্য থাকিবার কথা নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের কাল হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সমাজ তাহাদের দ্বারা প্রবর্তিত বিধানসমূহ মানিয়া আসিতেছেন। ইমামগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা যে সমস্ত নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহারা যে সমস্ত ফতোয়া দিয়াছেন, মসলা মাসায়ালের উপর তাহারা যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাহা অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য শিয়াগণ ইহার ব্যতিক্রম। তাহাদের কালে এবং তাহাদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে সম্ভব এবং অসম্ভব এত মত জারি এবং জাহির হইয়াছিল

www.pathagar.com

এবং কিছুকাল টিকিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং এই ডামাডোলের মধ্যেও ইমামদের ফতোয়া বহাল ছিল যে মুসলিম সমাজের মনে তাহাদের ইমামের নীতিই একমাত্র টিকিয়া থাকার যোগ্য—এইরূপ ধারণা আসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইমামদের মতের প্রসারের অবকাশও রহিয়া গিয়াছিল। এই পরিস্থিতির ফলে সুন্নীদের পক্ষে তাহাদের ইমামদের প্রবর্তিত আইনের বিপক্ষে বা বিপরীতে যাওয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা মুখে ইমামদের আইনের প্রতিবাদের অধিকার স্বীকার করিলেও অন্তরে দৃঢ়তা ছিল না।

সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া হানাফিগণের মধ্যে যাহারা অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল তাহারা বলেন যে, সুন্নী মুসলিম হইতে গেলে চার ইমামের অন্তত একজনকে মানিতেই হইবে। যাহারা ইমামদের মধ্যে একজনকেও মানিতে প্রস্তুত নহেন তাহারা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত নন। সুন্নী সম্প্রদায়ের এই রক্ষণশীল দল বলেন যে যাহারা ইমামদিগকে মানেন না তাহারা গায়ের-মুকাল্লিদ (غير مقلد)। তাহারা নিজেদিগকে মুকাল্লিদ এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে গায়ের-মুকাল্লিদ এই কারণে বলেন যে, তাহারা অনুসারী এবং বিপক্ষরা অনুসারী নন। গায়ের মুকাল্লিদরা ওহাবী নামেও পরিচিত। আরবের আবদুল ওহাব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুরস্ক সরকারের বিরোধিতা করেন এবং সেই কারণে তাহার অনুসারিগণকে অনেক বিপদ বরণ করিতে হয়।

গায়ের মুকাল্লিদগণ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহলুল-হাদীস বা হাদীসের অনুসারী বলিয়া পরিচিত। আইনের উৎসরূপে তাহারা আল কুরআন ও হাদীসকে প্রামাণ্য মনে করেন। নীতিগতভাবে তাহারা ইজমা ও কিয়াসকেও আইনের উৎস মনে করেন। তাহারা হাদীসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন এবং কিয়াসকে সংকীর্ণভাবে। এইদিক দিয়া তাহারা ইমাম হাম্বলের শিক্ষার নিকটবর্তী হইয়া পড়েন। তাহারা কোন ইমামকে মানেন না। আইনবিদ যতই জ্ঞান-সমৃদ্ধ হন না কেন, তাহাকে তাহারা অভ্রান্ত মনে করেন না। ইমামগণ কোন হাদীসকে যয়ীফ মনে করিলে তাহারা সেই হাদীসকে অগ্রাহ্য মনে করেন না। ইমামদিগকে বা বিশিষ্ট আইনবিদগণকে তাহারা যে তুচ্ছ মনে করেন এমন নহে ; ইজমাকেও তাহারা অশ্রদ্ধা করেন না ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে তাহারা স্বাধীন মত অবলম্বনের অধিকার অব্যাহত রাখিতে চান। আহলুল-হাদীস সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মতে যে ওয়াকফ ওয়াকিফের পরিবার এবং বংশধরের উপকারের জন্য নিবেদিত, তাহা অসিদ্ধ। সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল ইমামগণ এই প্রকার ওয়াকফকে সিদ্ধ গণ্য করেন। আমাদের দেশের হানাফিগণ আহলুল হাদীস সম্প্রদায়ের লোককে নামাযের সময়ে "আমীন" উচ্চস্বরে উচ্চারণের জন্য এবং রুকুতে যাইবার পূর্বে হাত উঠাইবার জন্য, মসজিদে প্রবেশ অধিকার না দিবার দাবী করিয়া মামলা করিলে তাহারা পরাজিত হন।

এক মযহাবের অনুসারিগণ অন্য মযহাবের আইন অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। বস্তুতপক্ষে ইমাম চারজন হইলেও তাহারা যে প্রত্যেকে একটি করিয়া মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, আদি কিতাবসমূহে এমন কোন উল্লেখ নাই, বরং সুন্নীদের পূর্ণ নাম হইতেছে আহলুল-সুন্নতে ওআল জামাত অর্থাৎ সুন্নত এবং জামাতের অনুসারী। ইজমার জন্য সকল মযহাবের একমত হওয়া প্রয়োজন।

পরবর্তী যুগে ইমাম সাহেবদিগের শিষ্য ও অনুসারীবর্গ আপন আপন ইমামের প্রবর্তিত আইন ও দর্শনের উন্নয়ন ও বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। কালক্রমে তাহাদের আপন আপন ইমামের মতের ভিত্তিতে এক একটি বিশিষ্ট দর্শন গড়িয়া তুলেন। কিন্তু সেই সময় পরিস্থিতি এত দূর গড়ায় নাই যে ইমামদের অভিমতের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে এক ইমামের মত অন্য ইমামের অনুসারী গ্রহণ করিতে পারিবে না। বর্তমান যুগে তকলিদের আয়তন বড়ই বাড়িয়াছে। এক মযহাবের আইন অন্য মযহাবের অনুসারিগণ গ্রহণ করিতে নারাজ। প্রয়োজন মত এবং বিবেক-সম্মতভাবে এক মযহাবের আইন অন্য মযহাবের মধ্যে প্রয়োগের অধিকার হইতে আদালত এবং আইনবিদকেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

বিচারের ক্ষেত্রে তকলিদের প্রসার কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এখন আলোচনা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আইনের ভিত্তিতে বিচার কালে সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইলেও কাজী আইনের যে ব্যাখ্যা দেন তাহা আইনের প্রশ্নে সঠিক নাও হইতে পারে।

কাজী যে সিদ্ধান্ত দেন তাহা পক্ষবৃন্দের উপর বাধ্যকর। আইনবিদগণ যে বিধান দেন তাহাই আইন। কাজী যদি নিজে আইনবিদ হন তবে তাহার আইনসম্মত বিধান মর্যাদা পায়। কাজী যদি আইনবিদ না হন তবে তিনি আইনের প্রশ্নে আইনবিদের সহিত পরামর্শ করেন। কিছু দিন পূর্বেও মুসলিম সরকার কাজীকে আইনের প্রশ্নে পরামর্শ দিবার জন্য মুফতী

www.pathagar.com

নিয়োগ করিতেন। মুফতী নিয়োগের অবশ্য অন্য কারণও ছিল। বিজ্ঞ আইনবিদগণ কাজী হইতে চাহিতেন না এবং কাজীদের সততা সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। এই কারণেই মুফতী নিয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে অবশ্য বিখ্যাত কাজীদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আইনবিদরূপেও তাহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কাজী শুরাই, আবু ইউসুফ ও কাজী খান ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

আল কুরআন আল-হাদীস এবং ইজমার অনুপস্থিতিতে কাজী বা বিচারকের কর্তব্য

বিচারের ক্ষেত্রে আল কুরআন আল হাদীস এবং ইজমার নির্দেশ অমোঘ। কাজী বিচার করিবার সময় এই নির্দেশাবলী বিন্দুমাত্র খিলাফ করিবার অধিকার রাখেন না। এই সম্পর্কে কাজী যদি কোন ভুল করেন তবে যে মুহূর্তে আবিষ্কৃত হয় সেই মুহূর্তে শুধরাইয়া লইতে হইবে। কাজী নিজে তাহার সিদ্ধান্ত রদ করিয়া কিংবা তাহার পরবর্তী কাজী এই ভুল সিদ্ধান্ত রদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত দিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কুরআন, হাদীস বা ইজমার নির্দেশের ব্যত্যয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহা পরিবর্তনযোগ্য; যে কাজী বিচার করিয়াছেন তিনি নিজে উহা রদ করিতে পারেন বা তাহার পরবর্তী কাজী উহা রদ করিতে পারেন। এই পরিস্থিতি ব্যতীত কাজী তাহার নিজের হুকুম রদ করিতে পারেন না, তাহার পরবর্তী কাজীও পারেন না। আইনের ব্যাখ্যায় ভুল হইলে সেই ভুলও রদযোগ্য নহে।

মনে হইতে পারে, ইহা কেমন কথা? ভুল করিলে তাহা রদ করা যাইবে না, এমন নীতিকে ভাল বলা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আইন ব্যাখ্যার বা ভাষ্যের ক্ষেত্রে প্রায় সব সময়ই দ্বিমত পোষণ করা অসম্ভব নহে। এবং যেখানে দুইটি মত সম্ভব, সেখানে একটিকে যথার্থ ভুল বলা যায়। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যাহা দলিলে কাজীর হুকুমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে অপর মতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত। ইমাম আবু হানিফা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলেন, কাজী একবার সিদ্ধান্ত দিয়া ফেলিলে তাহা সে যতই ভুল হোক, সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী এবং বাধ্যকর হইবে। ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণ তাহার সহিত একমত নয়। হযরত উমরের একটি দৃষ্টান্ত হইতে এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর

www.pathagar.com

আবু দারদাকে কাজী নিযুক্ত করেন। একটি রায়ে এক ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইয়া খলিফা হযরত উমরের নিকট আবেদন করেন এবং বলেন যে, কাজী আবু দারদা যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন তাহা একান্তই ভ্রমাত্মক। ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথা শুনিয়া খলিফা হযরত উমর বলেন, আমি হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতাম না; তবুও আমি কাজীর সিদ্ধান্ত রদ করিতে পারি না। কাজী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাহার নিজের ব্যাখ্যার সহিত সংগতিপূর্ণ। তিনি কুরআন বা হাদীসকে অমান্য করেন নাই। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করিলেও আমি তাহার সিদ্ধান্ত রদ করিতে পারি না। কুরআন হাদীসের বিপরীত হইলে অন্য কথা হইত। আমি তাহার ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিব না। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের মতবাদ সুন্নী সম্প্রদায় পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করিয়া থাকে। আইনবিদরূপেও তাহারা তাঁহাকে অতি উচ্চে মর্যাদা দিয়া থাকে।

কিয়াসের ক্ষেত্রে এক মযহাবের কাজী অন্য মযহাবের অভিমত গ্রহণ করিবার নিরঙ্কুশ অধিকার রাখেন। তিনি অন্য মযহাবের কাজীর নিকট বিচার্য বিষয় বিচারের জন্য হস্তান্তর করিয়াও দিতে পারেন। হানাফী মযহাবের মতে মাতাল স্বামীর প্রদত্ত তালাক বৈধ বা দুইজন সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ অবৈধ বা পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদ করা অবৈধ। হানাফী কাজী তাহার মযহাবের মতকে উপেক্ষা করিয়া উন্মাদ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত তালাক অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন বা সাক্ষীহীন বিবাহকে বৈধ বলিতে পারেন বা পিতা কর্তৃক বিবাহ ছিন্ন করিয়া দিতে পারেন। এই অধিকার বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। আস-সিয়ারুল কবীর, জামিউল-ফতোয়া, খাজানুতুল-মুফতিঈন, মাজমাউল নাবাজিন, আল-জাখিরা, ফতোয়া রশীদুদ্দিন, সাইফুল ইসলাম আবদুল ওয়াবুশ-শাইবানি, সাইফুল ইসলাম আতা ইবনে হামজা এই মতের সমর্থক। কিন্তু কালক্রমে কাজীর এই অধিকার খর্ব হইতে থাকে। তাহারা জনসাধারণের আস্থা হারাইয়া ফেলিতে থাকেন; এই কারণে কাজীদের অধিকার খর্ব করিবার প্রশ্ন দেখা দেয়। তাই ইবনে হাম্মাম, যিনি হেদায়ার বিখ্যাত ভাষ্যকাররূপে বিখ্যাত, এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, বর্তমান যুগে এক মযহাবের কাজী অন্য মযহাবের অনুসরণ করিয়া কোন হুকুম দিতে পারিবেন না। অন্যায় প্রলোভনের বশীভূত হইয়া

www.pathagar.com

কাজী যেন হুকুম না দেন সেই কারণেই তাহার অন্য মযহাবের মত গ্রহণ করার অধিকার হরণ করা হয়। এই অধিকার হরণের অন্য কারণও আছে। সুলতান যখন তাহাকে এক মযহাবের আইন অনুযায়ী বিচার করিবার জন্য কাজী নিযুক্ত করিয়াছেন তখন অন্য মযহাবের মত অনুসরণ করিবার অধিকার তাহার থাকা উচিৎ নয়। কাজীর অধিকার হরণ করিবার পশ্চাতে আরো যুক্তি আছে। ইমাম আবু হানিফা যে সময় কাজীদের অধিকার বিস্তৃত রাখিয়াছিলেন সেই সময় প্রায় সব কাজী মুজতাহিদ এবং আইনবিশারদ ছিলেন ; সে দিন আর নাই।

আদি যুগে কাজী আইনবিশারদ না হইলে, আইনের প্রশ্নে তিনি যে কোন মযহাবের আইনবিদের সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার রাখিতেন। বর্তমান কালে তাহার সেই অধিকার সংকুচিত হইয়াছে।

ইবনে হাম্মামের সময় হইতে শুরু করিয়া বাহারুর রায়েক এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরী পর্যন্ত কাজী তাহার মযহাবের মত মানিতে বাধ্য। হানাফী হইলে তিনি ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের মত মানিতে বাধ্য। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তকলিদের ব্যাপকতা প্রসার লাভ করিতে থাকে। অবশেষে তুরস্কের সুলতান এই হুকুম দেন যে কাজিগণ অন্য কাহারও দুর্বল অভিমত গ্রহণ করিবেন না। অবশেষে আল্লামা কাসিম তকলিদকে তাহার বর্তমান মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেন

মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিভাগ

(১) মুজতাহিদুন ফিশ্-শারি (مجتهدون في الشرع)। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিঈ এবং হাম্বলকে এই শ্রেণীর মুজতাহিদ বলা হয়। তাহারা প্রত্যেকেই একটি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আইন সম্পর্কে তাঁহারা বিধান দিবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁহাদের এখতিয়ার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ বা প্রশ্ন নাই। আল কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে অথবা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিতে অথবা হাদীসের তফসীর করিতে অথবা ইহাদের সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে তাঁহাদের অধিকার এতই বিস্তৃত যে এই সমস্ত কাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট সীমা মানিয়া চলিতে তাহারা বাধ্য নন। আইন সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ বা ব্যাখ্যা প্রদান প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের অভিমত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। বস্তুত ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, উরফ্

www.pathagar.com

ইসতিদলাল এবং ইসতিসলাহ যে আইনের উৎস ইহা তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের প্রভাবে এইগুলি আইনের উৎসরূপে মর্যাদা এবং স্বীকৃতি পাইয়াছে।

(২) মুজতাহিদুন ফিল-মযহাব (مجتهدون فى المذهب)। তাহারা মুজতাহিদুন-ফিল-শারি-এর শিষ্যবর্গ। তাঁহারা তাঁহাদের আপন আপন মযহাবের আইন সম্পর্কে বিধান দিবার অধিকার রাখেন। তাহাদের মধ্যে হানাফী সম্প্রদায়ের আবু ইউসুফ, মুহম্মদ, জুফার, হাসান ইবনে জিয়াদ প্রসিদ্ধ। শাফিঈ সম্প্রদায়ে নবাবী, ইবনুস, সালাহ এবং সুয়ুতী প্রধান। মালিকী সম্প্রদায়ে ইবনে আবদুল বার এবং আবু বকর ইবনুল আরাবী বিখ্যাত। তাঁহারা তাঁহাদের ওস্তাদের নীতি মানিয়া চলিতেন এবং ওস্তাদগণ যে বিধান দিয়াছেন, ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহার প্রসার ঘটাইতেন। এই কাজ করিতে গিয়া তাঁহারা সময় সময় তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে যাইতেন। সাধারণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর নীতি অবশ্যপাল্য মনে করিতেন না। যে যুক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের শিক্ষকগণ কোন নীতিতে পৌঁছিতেন সেই যুক্তিকে তাঁহারা অভ্রান্ত মনে করিতেন না।

(৩ মুজতাহিদুন ফিল-মাসাল (مجتهدون فى المسائل) উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মুজতাহিদগণ যে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট সমাধান দেন নাই সেই সমস্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহের উপর তাহারা বিধান দিবার অধিকার রাখেন। কোন নীতি বা সূত্র সম্পর্কে তাহারা বিধান দিতে পারিতেন না। যে সমস্ত প্রশ্ন পূর্বে উত্থিত হয় নাই সেই সমস্ত প্রশ্নের উপর তাহারা আলোকপাত করিতে পারিতেন। খাসসাফ, তাহাবী, সারাখশী, কারখী, বাজদাবী, হালবানী এবং কাজী খান এই শ্রেণীর মুজতাহিদ। কোন কোন আইনবিদের মতে নাসাফিও এই শ্রেণীতে পড়ে। তাহারা সকলেই হানাফী।

উপরে যে তিন শ্রেণীর মুজতাহিদগণের কথা বলা হইল তাহারা প্রকৃতপক্ষে তকলিদ পন্থী। তাহারা কোন নূতন আইন বা বিধান প্রণয়ন করেন নাই। তাহারা আইন বা আইনের বিধানকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে ঐগুলির ভিত্তিতে অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কখনো কখনো মুজতাহিদদের বিরোধের সমাধান দিয়াছেন। যেহেতু তাহারা কোন নূতন বিধান প্রদান করেন নাই সেহেতু তাহাদিগকে মুকাল্লিদ (مقلد) বলাই সংগত।

www.pathagar.com

কেহ কেহ বলেন, মুজতাহিদ দুই রকমের হইতে পারে ঃ

(১) মুজতাহিদনুল মুতলাক (مجتهدون المطلق) ঃ তাহারা প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদ।

(২) মুজতাহিদনুল-মুকায়্যিদ (مجتهدون المقيد) ঃ তাহারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিধান প্রদান করিবার অধিকার রাখেন। ইহাদিগকে আবার নিম্নবর্ণিত চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

(১) আসহাবুহ-তাখরীজ (اصحاب التخريج) ঃ তাহাদের কাজ হইল প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদগণ প্রদত্ত আইন হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং যে প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নাই তাহা ব্যাখ্যা করা। আবু বকরুর রাজী এই শ্রেণীর মুজতাহিদ।

(২) আসহাবুত-তারজীহ্ (اصحاب الترجيح) ঃ যেখানে দুইটি মতের মধ্যে সংঘর্ষ দৃষ্ট হয় সেখানে উৎকৃষ্টটি ইহারা বাছিয়া বাহির করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন এই মত উৎকৃষ্ট বা এইমত শুদ্ধ বা এইমত লোকগ্রাহ্য। কুদুরী এবং হেদায়ার গ্রন্থকার এই শ্রেণীতে পড়েন।

(৩) আসহাবুত-তাসহীহ (اصحاب التصحيح ঃ আইনের কোন বিশেষ পাঠকে ইহারা মজবুত বা যয়ীফ বলিতে পারেন। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বা দুর্বল তাহা তাহাদের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। সদরুশ শরীয়ত, আল-মোখতার এবং কান্জ এই শ্রেণীতে পড়ে।

(৪) একটি বিশেষ আইনের বিধান মজবুত কি যয়ীফ তাহা বলিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা যাহাদের নাই কিন্তু যাহারা মজতাহিদগণ কোন্ নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারেন, তাহারা এই শ্রেণীর মুজতাহিদ। পূর্ববর্ণিত মুজতাহিদগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারা উহা মানিয়া লন। পূর্ববর্ণিত মুজতাহিদগণ যে প্রশ্ন সম্পর্কে কোন প্রকার আলোকপাত করেন নাই, সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণ তাহাদের পূর্বসূরীর প্রদত্ত বিধান হইতে কিয়াসের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ করেন। এইভাবে নীতি নির্ধারণের সময় তাহারা সমাজের রীতি-নীতি এবং পরিবর্তন পরিস্থিতি প্রভৃতি বিবেচনা করেন। দুররুল মোখতার-এর প্রণেতা বলেন, 'আমরা এই শ্রেণীর মুজতাহিদ।'

www.pathagar.com

মুজতাহিদগণের বিধানের প্রতিবেদন

হানাফী মযহাবের আইনে বিধানসমূহের শ্রেণীবিভেদ আছে। এই শ্রেণীবিভেদ করিবার কারণ আছে। ইমাম আবু হানিফা বা তাহার শিষ্য আবু ইউসুফ এবং মুহম্মদ এবং জুফার যে বিধান প্রদান করেন নাই, পরবর্তীকালে তাহা তাহাদের নামে চালাইয়া দিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। এই জন্যই এই সতর্কতার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আল-মাবসুত, আজ-জিয়াদাত, আল-জামিইস সাগীর, আস-সিয়ারুস সাগীর এবং আল-জামিউল কবীর গ্রন্থাবলী ইমাম মুহম্মদের রচিত বলিয়া বলা হয়। এই বইগুলিতে ইমাম আবু হানিফা এবং তাহার শিষ্যগণের প্রদত্ত বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জামিউস সাগীর এবং জামিউল কাবীর ছাড়া অন্য পুস্তক পাওয়া যায় না। এই পুস্তকগুলির মধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে জাহিরুল রেওয়ায়েত বা প্রকাশ্য প্রতিবেদন কিংবা মাসাউদুল উসূল বা প্রতিষ্ঠাতাদের বিধান বলে। কিসানিয়াত, হারুনিয়াত, জুরজানিয়াত, রুকায়াত এবং আল-মোহরার গ্রন্থাবলী হাসান ইবনে জিয়াদ কর্তৃক রচিত বলিয়া বলা হয়। এই পুস্তকগুলির প্রামাণ্যতা বড়ই দুর্বল। এই পুস্তকগুলি পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ইমাম মুহম্মদ এবং আবু ইউসুফের শিষ্যবর্গের মধ্যে আছে ইমাম ইবনে ইউসুফ, ইবনে রুস্তম, মুহম্মদ ইবনে সাবা, আবু সোলায়মানাল জুরজানী, আবু হাফসিনিল বুখারী। তাহাদের উত্তরসুরিগণের মধ্যে আছে মুহম্মদ ইবনে সালমা, মুহম্মদ ইবনে মোকাতিল, নাসির ইবনে ইয়াহিয়া এবং আবু নাসরিনিল কাসিম ইবনে সালাম। ইহাদের বিধান আবু লায়েস এবং অন্যান্য পণ্ডিত সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে মাজমা উন নাবায়িন, আল ওয়াকিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাদের বিধান সংকলিত হয়। এই পুস্তকগুলি পাওয়া যায় না।

কাজী খানের ফতোয়া এবং আল-খোলাসা গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা এবং তাহার শিষ্যবর্গের বিধান সংগৃহীত হয়। কিন্তু সেই সংগ্রহের মধ্যে যেমন মজবুত বিধান আছে তেমনি যয়ীফ বিধানও আছে।

হাকিম-উস শহীদের আলকাফী একখানি প্রামাণ্য কিতাব। এই কিতাবের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন শামসুল আয়িম্মা সারাকসী। এই ভাষ্যের নাম

www.pathagar.com

আল মাবসুত। আল্লামা তারসুরি বলেন, আল মাবসুত অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা সকলেরই মানা উচিত।

আইনের গ্রন্থের মধ্যে যেমন মতন্ বা শুধু আইনের বিধান সম্পর্কিত গ্রন্থ আছে তেমনি ভাষ্যমূলক গ্রন্থও আছে। কুদুরী, হেদায়া, কানজ এবং বেকায়া, মত্ন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ফতহুল কাদীর এবং বাহারুর রায়েক ভাষ্য-শ্রেণীর গ্রন্থ। ভাষ্যের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থও আছে, যেমন রদদুল মোহতার। ফতোয়া কাজী খান এবং ফতোয়া আলমগিরীতে শুধু ফতোয়ার সংকলন দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্তব্য

অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ কাজীদের সিদ্ধান্ত মতলব মাফিক হইবার কথা। ইহা যাহাতে না হইতে পারে এবং হইলেও যাহাতে ইহার প্রবণতা না বাড়িয়া যায়, সেইজন্য বিচারের ক্ষেত্রে তকলিদের নীতি প্রবর্তন করা হইয়াছিল। যোগ্য ব্যক্তিকে কাজী নিয়োগ করিলে এবং অন্যভাবে দুর্নীতি রোধ করিতে পারিলে তকলিদের নীতির প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়িত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় খোলাফায়ে রাশেদীনদের কাল এবং পরবর্তী যুগের দু'একজন খলিফা ব্যতীত অন্য সময়ে রাষ্ট্র প্রধানগণ ইসলামী আইনের উপর পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন নাই। তাঁহারা সব সময় আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নাই এবং নিজেরা ইসলামী আইন মানিয়া চলেন নাই।

তকলিদের সপক্ষে যাহারা আছেন, তাহারা বলিতে চাহেন যে, তকলিদ আইনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতি আনে। ইহা সত্য হইলেও তকলিদের ক্ষতিকর দিক এত প্রবল যে শুধু নিশ্চিতির কারণে তকলিদকে সমর্থন করা যায় না। তকলিদের ফলে আইনে অগ্রসরমানতা এবং উন্নয়নের পথ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইজমা দ্বারা আইনের নিশ্চিতি প্রদান করা যায়; সুতরাং নিশ্চিতির জন্য তকলিদের উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নাই।

তকলিদের সমর্থনে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুন্নী আইনবিদগণ তকলিদ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, দীর্ঘ কাল ধরিয়া সকলের এই সমর্থনকে ইজমা গণ্য করা যায়। এই যুক্তি গ্রহণ-যোগ্য নহে। যেহেতু তকলিদ একটি পন্থা সেহেতু ইহাতে ইজমা হয় না। তবে দীর্ঘকাল জনগণ আইনের যে ব্যাখ্যা মানিয়া আসিয়াছে, সেই ব্যাখ্যার

www.pathagar.com

বিপরীতে আকস্মিক রায় দেওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তকলিদকে সমর্থন করা যায়। প্রথা যে আইনের উৎস ইহা সকলে স্বীকার করেন। এক অর্থে তকলিদকে প্রথার পর্যায়ে ফেলা যায়।

তকলিদকে যদিও আপাতদৃষ্টিতে খুবই সংকীর্ণ এবং রক্ষণশীল মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা ততদূর সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল নাও হইতে পারে। যাঁহারা তকলিদপন্থী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, মুফতী ও কাজিগণ আইন প্রয়োগের সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করিতে পারেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, মুজতাহিদগণ যে প্রশ্নের উত্তর দেন নাই সেই প্রশ্ন বিচারাধীন হইলে মুফতী এবং কাজিগণ সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আর কয়েকটি অবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত ইমাম আবু হানিফা এবং তাহার শিষ্যগণ বিপুল পরিমাণ প্রশ্নে একমত হইতে পারেন নাই; দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, তাহা প্রাচীন যুগে অজানা ছিল; তৃতীয়ত, মুজতাহিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানাবলীর মধ্যে কোন্‌টি সহীহ তাহা লইয়া বিবাদের অন্ত নাই। এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করিলে তকলিদের প্রভাব কমিয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা এবং তাহার শিষ্যবর্গ অথবা কাজী খানের সময় হইতে ইসলামী আইন স্থানু হইয়া আছে এইরূপ উক্তি বাস্তবতাবর্জিত। ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত বিধানে তামাদী আইনের কোন স্থান নাই। কিন্তু আধুনিক হানাফী আইনবিদগণ তামাদী আইনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাজীরের নীতির অনুসরণে শাস্তির আইনেও আধুনিক সুন্নী আইনবিদগণ পরিবর্তন আনিয়াছেন। অবশ্য এ কথা মানিতে হইবে যে, ইসলামী আইনের উন্নতি খুবই শ্লথ হইয়াছে। তবে এই শ্লথতার কারণ ইসলামের কোন বিধান নয়, প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং মুসলিমদের বিদ্যা বুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

কার্য, অধিকার এবং দায়িত্ব

কার্য, অধিকার এবং দায়িত্ব

আইনকে সদরুশ-শরীয়ত অনুযায়ী দুইভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আসে সেই সমস্ত আইন যাহারা সংজ্ঞা দেয় এবং দ্বিতীয় ভাগে আসে সেই সমস্ত আইন যাহারা শুধু ঘোষণা করে। যে আইন সংজ্ঞা দেয় সে আইন অন্য আইনের সহিত যুক্ত নয়। এই আইন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাজের গুণের সংজ্ঞা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই আইন কোন্ কাজ ফরয অর্থাৎ অবশ্যপাল্য এবং কোন্ কাজ হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ তাহা বলিয়া দেয়। এই আইন কাজের আইনগত প্রতিফল বলিয়া দেয়। দাম্পত্য স্বত্ব, জমির উৎপন্ন ফসলের উপর স্বত্ব প্রভৃতি ইহার আওতায় পড়ে।

কাজের শ্রেণীবিন্যাস

আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে কাজ, অধিকার এবং দায়িত্ব সৃষ্টি করা। এইগুলিকে তাই আইনবিদগণ বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

স্বভাবগত, আইনগত, শরীরগত এবং মস্তিষ্কগত

কাজকে প্রথমে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা—প্রকৃতিগত (হিস্সী حسی) এবং আইনগত (শর্ঈ شرعی)। দেহের (আফালুল জাওয়ারিহ افعال الجوارح) এবং মনের (আফালুল কালব افعال القلب) কাজ প্রকৃতিগত কাজের অন্তর্ভুক্ত। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনকে দেহের কাজ বলা হয়। পানাহার, কথোপকথন, মারামারি প্রভৃতিকে দেহের কাজ বলা যায়। যিনি দেহের কাজ করেন তিনি যেমন তাহার কাজ বুঝিতে পারেন, তাহার পার্শ্বস্থিত অন্য ব্যক্তিও তাহার কাজ দেখিতে পান। মস্তিষ্কের কাজের মধ্যে পড়ে বিশ্বাস, স্বীকৃতি, অভিপ্রায়, ইচ্ছা প্রভৃতি। এই কাজ যিনি করেন তিনি যে উহা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারেন। তাহার এই কাজ অন্যে বুঝিতে

www.pathagar.com

পারেন না। দুনিয়ার বিচার-আদালত মস্তিষ্কের কাজ সম্পর্কে কোন বিচার করিতে পারে না। বিচার করিতে গেলে বিচার্য বিষয়কে জানিতে হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের জ্ঞান জানা যায় না। যে ব্যক্তি একাধিক ভগবানকে স্বীকার করে সে ব্যক্তির অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন দুনিয়ার আদালতে তাহার বিচার হয় না। স্বীকৃতি তাহার মস্তিষ্কের ব্যাপার, সেই মস্তিষ্কে বিচারকের প্রবেশাধিকার নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌তালা তাহার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই ব্যক্তি তাহার এই বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন কিংবা যে মুহূর্তে তাহার এই বিশ্বাস আচরণে প্রতিভাত হয় সেই মুহূর্তে সে বিচারের আওতায় আসিয়া পড়ে। যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় তাহা লইয়া অনায়াসে বিচার চলে। কথায় এবং আচরণে কোন ব্যক্তি মুশরিক প্রতীয়মান হইলে বিচারক তাহাকে অমুসলিম ঘোষণা করিতে পারেন। দবির সাবেতের ঘড়ি চুরি করিবার অভিপ্রায় করিল, এই অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে অপরাধমূলক। কিন্তু অপরাধমূলক হইলে যেহেতু ইহা মস্তিষ্কের ব্যাপার তাই বিচারক ইহার নাগাল পায় না। আইন তাই এ সম্পর্কে নীরব থাকিতে চায়। কিন্তু দবির যখন তার এই অভিপ্রায়কে কাজে পরিণত করে তখন আইন তাহার উপর চড়াও হয়।

এতক্ষণ প্রকৃতিগত কাজের কথা বলা হইল, এইবার আইনগত কাজের কথা বলা যাইতেছে। এক বা একাধিক ব্যক্তির একাধিক কাজের সম্মিলনকে আইনগত কাজ বলা হয়। ঈমান, সালাত, চুক্তি, বিদ্রোহ প্রভৃতিকে আইনগত কাজ বলা যায়। যে সমস্ত উপাদান লইয়া আইনগত কাজের সৃষ্টি হয় সেই সমস্ত কাজকে বহির্জগতে অস্তিত্বশীল হইতে হয়।

শরীরগত কাজকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা— উচ্চারণ (কওল قول) এবং আচরণ (আমল عمل)। উচ্চারণ বলিতে যেমন কথিত শব্দ বুঝায় তেমনি কথিত শব্দের স্থলবর্তী অন্যসব কিছুকেও বুঝায়। সুতরাং লিখন বা ভঙ্গি প্রদর্শন উচ্চারণের অন্তর্ভুক্ত। আচরণ বলিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি বা গতির বিরতি বুঝায়। ভ্রমণ, শিকার, মারামারি, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা প্রভৃতি আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক কাজ

কাজকে আবার ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক এই দুইভাগে ভাগ কর হইয়াছে। আইনগত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছপ্রসূত এবং অনিচ্ছাকৃত কাজের

www.pathagar.com

মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। সমস্ত ঐচ্ছিক কাজকে ইসলামী আইনে তাসাররুফাত (تصرفات) বলা হয়। ইচ্ছা এবং শক্তির ব্যয়কে তাসাররুফাত বলে। শরীয়তভিত্তিক বা আইনভিত্তিক কাজকে তাসাররুফাতুশ-শারই' (تصرفات الشرع) বলে।

ইনশাআত, আখবারাত এবং ইতিকাদাত

আইনগত কাজকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আসে সেই সমস্ত কাজ যাহারা কোন ফলকে উৎপাদন করে। ক্রয়, বিক্রয়, বিবাহ ও তালাক এই শ্রেণীর কাজ। এই শ্রেণীকে ইনশাআত (انشات) বলে। যে কাজ কোন ঘটনার বর্ণনা দেয় তাহা আখবারাত (اخبارات) নামে পরিচিত। সাক্ষ্য দেওয়া (শাহাদাত شهادت) বা স্বীকৃতি (ইকরার) প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাজ। ইতিকাদাত বলিতে ঈমান বুঝায়। ইহা পাকা কি কাঁচা তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

ইসবাতাত এবং ইসফাতাত

আইনগত কাজকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যে কাজ কোন অধিকার বা দায় সৃষ্টি করে তাহাকে ইসবাতাত বলে। বিক্রয়, ইজারা দান প্রভৃতি ইহার আওতায় আসে। যে কাজ অধিকার বা দায়কে নষ্ট বা খর্ব করে তাহাকে ইসফাতাত বলে। দাবী ত্যাগ, তালাক এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

প্রত্যাহারযোগ্য এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য কাজ

এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি প্রত্যাহার করা যায়। যেমন—বিক্রয়, ইজারা প্রভৃতি। আবার এমন অনেক কাজ আছে যাহা প্রত্যাহার করা যায় না, যেমন তালাক, কসম প্রভৃতি। যে কাজ আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাহাকে উকুদাত (عقودات) বলে। চুক্তিকে আইনের ভাষায় উকুদাত বলা হয়। যে কাজ চুক্তিকে রদ বা নষ্ট করে তাহাকে ফুসুখাত (فسوخات) বলে। বিক্রয় রদ ইহার উদাহরণ।

কাজের আইনগত প্রতিক্রিয়া

আইনগত প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ হইতে দেহগত কাজকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে পড়ে সেই সমস্ত কাজ যাহাদের সম্পর্কে এক দিকে

www.pathagar.com

যেমন আইনের আদেশ আছে অন্য দিকে তেমনি তাহারা নিজেরা আরেকটি আদেশের কারণ হইয়া পড়ে ; ব্যভিচার একটি দেহগত কাজ। আইনের দৃষ্টিতে ইহা হারাম। ইহা আরেকটি আইনের কারণ এবং সেই আইনটি হইতেছে ব্যভিচারের শাস্তি। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সেই সমস্ত কাজ যেগুলি সম্পর্কে আইনের বিধান বর্তমান কিন্তু যেগুলি অন্য আইনের কারণ নহে। আহার গ্রহণ স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য ওয়াজিব, রোযা রাখা অবস্থায় হারাম কিন্তু এই বিধান ভঙ্গ করিলে কোন শাস্তির বিধান নাই। আইনগত কাজের মধ্যেও এইরূপ বিভাগ সম্ভব। বিক্রয় একটি আইনগত কাজ ; ইহা জায়েজ এবং মুবাহ। ইহার ফলস্বরূপ মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। নামায একটি আইনগত কাজ। ইহা কখনো ফরয এবং কখনো নফল কিন্তু ইহা কখনো অন্য কোন আইনের জন্ম দেয় না।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কাজের শ্রেণীবিন্যাস

কাজের উদ্দেশ্য যেমন ইহলৌকিক হইতে পারে তেমনি পারলৌকিকও হইতে পারে। ধর্মীয় কর্তব্য পালনেরও একটি ইহলৌকিক দিক আছে। যেখানে কোন ধর্মীয় কর্তব্য পালনের আদেশ আছে সেখানে ঐ আদেশ প্রতিপালন করিলে, আদেশ পালনের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। পারলৌকিক উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ হইতে কাজকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা হইয়াছে।

যে কাজ এমন প্রকৃতির যে উহা না করা হইতে করা ভাল এবং উহা না করা নিষিদ্ধ তাহাকে ফরয বলে। না করার নিষেধসম্বলিত আদেশ যেখানে আল কুরআন ও হাদীস হইতে উদ্ভূত সেখানে ঐ কাজকে ফরয বলা হয়। ফরয হইতেছে এমন আদেশ যাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে। ইহা প্রথম স্তরের নির্দেশ। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তরের নির্দেশকে বলে ওয়াজিব (واجب)। যে কাজের আদেশের ভিত্তি অনুমানমূলক প্রমাণ তাহাই ওয়াজিব। এই দুই প্রকার কাজই প্রত্যেক মুসলিম করিতে বাধ্য। যিনি ইহা করিবেন তিনি পারলৌকিক পুরস্কার বা ইহার সওয়াব (ثواب) পাইবেন। যিনি উহা করিতে ইচ্ছাপূর্বক বিরত হইবেন তিনি পারলৌকিক শাস্তি বা আযাব (عذاب) পাইবেন। সওয়াব এবং আযাবের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ফরয ওয়াজিবের মধ্যে কোন তফাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু

www.pathagar.com

ইহাদের মধ্যে মৌলিক তফাৎ বিদ্যমান। যিনি বলেন যে, ফরয অবশ্য প্রতি-পাল্য নয় তিনি কাফির ; কিন্তু যিনি বলেন যে, ওয়াজিব অবশ্য প্রতিপাল্য নয় তিনি দোষী হইলেও কাফির নয়। ফরয কাজের মধ্যে পড়ে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত। পরিবার প্রতিপালন, পিতামাতার সেবা প্রভৃতি ওয়াজিব। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য অবশ্য প্রতি-পাল্য, কিছু লোকে ইহা পালন করিলেই আইনের উদ্দেশ্য সাধন হয়। জিহাদ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইগুলিকে ফরযে কেফায়া বলে। যে কাজ এমন প্রকৃতির যাহা না করার চেয়ে করা ভাল কিন্তু না করা নিষিদ্ধ নহে এবং যাহা রসূলুল্লাহ (সঃ) অথবা তাঁহার আসহাবগণ করিয়াছেন সেই কাজকে সুন্নত বলে। অন্যগুলিকে মন্দুব, মোসতাহাব বা নফল ' نفل ' مستحب مندوب) বলে। ওয়াকফ করা, দান করা, দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া, ফরয বাদে অন্য নামায পড়া, রমযান মাস ছাড়া অন্য সময় রোযা রাখা, রোগীর সেবা করা এই পর্যায়ে পড়ে। যে কাজ করা হইতে না করা ভাল এবং যাহা করা নিষিদ্ধ তাহা হারাম। যে কাজ করা হইতে না করা ভাল কিন্তু নিষিদ্ধ নহে সেইগুলি দুষণীয় বা মকরুহ (مكروه)। যে কাজ মকরুহ কিন্তু হারামের কাছাকাছি তাহাকে বলা হয় মকরুহ তাহারিমি (مكروه تحريم)। যে মকরুহ কাজ হালালের কাছাকাছি তাহাকে বলা হয় মকরুহ তানজিহি (مكروه تنزيه)। এমন অনেক কাজ আছে যে সম্পর্কে আইন উদাসীন। এইগুলিকে বলা হয় মুবাহ বা অনুমতিপ্রাপ্ত। বিক্রয়, ইজারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাজ।

ইহলৌকিক উদ্দেশ্যের নিরিখে কাজের শ্রেণীবিন্যাস

আইনগত কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—সহীহ, ফাসিদ এবং বাতিল।

আইন যে সমস্ত উপাদান দাবী করে এবং আইন যে সমস্ত শর্ত আরোপ করে, তাহা যাহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাকে আইনগত কাজ বলে। যে কাজের মধ্যে এমন গুণ থাকে, যাহা আইন দাবী করে সে কাজকে সহীহ (صحيح) বলে ; এইরূপ গুণ না থাকিলে তাহাকে ফাসিদ (فاسد) বলা হয়। কিন্তু যে কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান (আরকান) এবং প্রতিপালিত শর্তাদি (শারায়েত شرائط) বিদ্যমান নাই তাহাকে বাতিল বলে। যে কাজ ফাসিদ তাহা শুধু গুণের দিক হইতে ত্রুটিমুক্ত। যে কাজ বাতিল তাহা

www.pathagar.com

কাজই নহে। যে কাজ সহীহ তাহাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। কিন্তু যে কাজ বাতিল তাহা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে অক্ষম। যে কাজ ফাসিদ সে কাজও উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পরে কিন্তু সব ব্যাপারে নয়। সহীহ এবং ফাসিদ কাজ আইনত সিদ্ধ এবং কার্যকরী, কিন্তু কাজ যেখানে ফাসিদ সেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দের সেই কাজের ফল হইতে কিছু পরিমাণে বঞ্চিত করিতে পারে। শাফিঈ সম্প্রদায়ের লোক মনে করে যে, কাজ হয় সহীহ না হয় বাতিল। তাহাদের মতে ফাসিদ কাজও বাতিল গণ্য হইবার দাবী রাখে। তাহারা মনে করেন যে, হানাফী সম্প্রদায় যাহাকে ফাসিদ বলেন তাহার মধ্যে আইন-ভিত্তিক সমস্ত উপাদান না থাকায় বাতিল গণ্য হইবে। কোন কোন হানাফী আইনবিদ ফাসিদ বলিতে বিশেষ স্থানে বাতিল বুঝাইতেছেন; হেদায়ার গ্রন্থকার তাহাদের মধ্যে একজন; ফাসিদ বলিতে এমন কাজ বুঝায় যাহা হইলে পক্ষবৃন্দ সরিয়া যাইতে পারেন। মুসলিম আইন সম্পর্কীয় ইংরেজী গ্রন্থসমূহে ফাসিদ কাজকে অসিদ্ধ, ভ্রমাত্মক বা পরিত্যাজ্য বলা হইয়াছে।

সংগঠিত কার্যকর এবং বাধ্যকর কাজ

আইনের পরিভাষায় ইহলৌকিক আদান প্রদানকে মুয়ামিলাত (معاملات) বলে। আদান প্রদানের সমস্ত উপাদন বিদ্যমান থাকিলে উহাকে সংগঠিত মুনআ'কিদ (منعقد) কাজ বলে। এই শ্রেণীর কাজ যদি বাঞ্ছিত আইনগত কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় তবে তাহাকে কার্যকরী নাফিজ (نافض) কাজ বলে। যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা মালিক, সেই ক্রয় বিক্রয় কার্যকর। কিন্তু যে ক্রয় বিক্রয়ে সম্পত্তির মালিক পক্ষ নয় তাহা অকার্যকর। যে চুক্তির আদান প্রদান বাতিল তাহা সর্বদাই অকার্যকর। যে চুক্তি সহীহ তাহা সর্বদাই কার্যকর। যে আদান প্রদানে পক্ষবৃন্দ আইনের প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য হইয়া পড়ে তাহাকে বাধ্যকর (লাজিম لازم) কাজ বলে। ওয়াকফ করিয়া তাহা প্রত্যাহার করা যায় না।

ইহলৌকিক আদান প্রদানের মৌলিক উপাদান

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহলৌকিক আদান প্রদানের মধ্যে তিনটি মৌলিক উপাদান অবশ্যই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। প্রথম উপাদান হইতেছে আদান প্রদানের পক্ষবৃন্দের যোগ্যতা। আদান প্রদানের পক্ষবৃন্দকে

www.pathagar.com

অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের হইতে হয়। দ্বিতীয় উপাদান হইতেছে, যে বস্তু লইয়া আদান প্রদান হইতেছে তাহা আদান প্রদানের উপযুক্ত হইবে, তৃতীয় উপাদান হইতেছে পক্ষবৃন্দের সম্মতি। নাবালকের দান অবৈধ, কারণ সম্পত্তি বিষয়ে কোন কিছু করিবার আইনভিত্তিক যোগ্যতা তাহার জন্মে নাই। মৃত পশু বিক্রয়কে বাতিল গণ্য করা হয়, কারণ ইসলামী আইনে মৃত পশু বিক্রয়যোগ্য নহে। নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বাতিল। সম্মতি সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র এই যে, চুক্তির ব্যাপারে সকল পক্ষকেই সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু যে কাজ শুধু স্বত্ব বিলোপের জন্য করা প্রয়োজন তাহাতে সম্পত্তির মালিকের সম্মতিই যথেষ্ট।

শর্ত

পূর্বে যে তিনটি উপাদানের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত শর্ত যুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সৎ নহে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে সততা যোগ্যতার একটি শর্ত। স্বর্ণের বদলে একই পরিমাণ না হইলে স্বর্ণ বিক্রয় অবৈধ। দেখা যাইতেছে ইহা বিক্রয় বা চুক্তির বস্তু সম্পর্কীয় শর্ত। সম্পত্তি ত্যাগের চুক্তিতে মালিকানা সামগ্রিক-ভাবে ত্যাগের অভিপ্রায় স্পষ্ট হইতে হইবে। দানের ক্ষেত্রে দখলার্পণ পূর্ণ হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে এই সমস্ত শর্ত কাজের সহিত যুক্ত।

অভিপ্রায় নির্ণয়ের সূত্র যেমন জটিল তেমন সূক্ষ্ম। তবে সাধারণ সূত্র এই যে, কাজের ফল হইতে অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। কোন ব্যক্তি যখন কাজ করে তখন তাহার অভিপ্রায় থাকে যে ঐ কাজের স্বাভাবিক ফল হউক। পারলৌকিক কাজের অভিপ্রায় অতি মূল্যবান। উহাতে অভিপ্রায় গোপন করা যায় না।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ : গণঅধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকার

মুসলিম আইনবিদগণ অধিকারকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা আল্লাহ্‌র অধিকার (হক্‌কুল্লাহ حقوق الله) এবং মানুষের অধিকার (হক্‌কুল এবাদ حقوق العباد)। হক্‌কুল্লাহ্‌র মধ্যে সেই সমস্ত অধিকার পড়ে যাহাতে সমাজ সামগ্রিকভাবে উন্নত হয়। এইগুলিকে আল্লাহ্‌র অধিকার বলিবার কারণ আছে। এই অধিকারের কল্যাণ অতি বৃহৎ এবং ব্যাপক এবং এই অধিকার ভংগ করার বিপদ সাংঘাতিক। এই কারণেই এই অধিকারকে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র অধিকার বলা হয়। এই অধিকার প্রতিপালনে আল্লাহর কোন উপকার হয় না ; তিনি সকল উপকারের উর্ধ্বে। আল্লাহ্‌র অধিকারকে গণ-অধিকার বলা যায়। ইসলামী আইনে ফরয ইবাদতকে সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর গণ্য করা হয়। গণ-অধিকারের সহিত ব্যক্তিগত অধিকারের পার্থক্য বৃহৎ। গণ-অধিকার প্রতিপালন করাইবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের আর ব্যক্তিগত অধিকার আদায় করিবার দায়িত্ব ব্যক্তির। গণ-অধিকার ভংগ হইলে ব্যক্তিস্বার্থ আহত হয় কিন্তু সেই কারণে উহাকে ব্যক্তিগত অধিকার বলা যায় না। গণ-অধিকার ভংগ হইলে আহত ব্যক্তি ভংগ-কারীর অপরাধ মাফ করিয়া দিতে পারে না। ব্যক্তিগত অধিকার ভংগ হইলে আহত ব্যক্তি আঘাতকারীর অপরাধ মাফ করিয়া দিতে পারেন, আবার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারেন।

মুসলিম আইনবিদগণ অধিকারকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করিয়াছেন ঃ

(১) যে অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার সেই অধিকারকে গণ-অধিকার বলা যায়। গণ-অধিকারের উদ্দেশ্য গণমানবের কল্যাণ। চুরির জন্য চোরকে শাস্তি প্রদান একটি গণ-অধিকার। যাহার দ্রব্য চুরি গিয়াছে তিনি চোরকে ক্ষমা করিতে পারেন না।

(২ যে অধিকার ব্যক্তিগত তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কার্যকর করিতে পারেন। চুক্তি প্রবল করা অথবা সম্পত্তি রক্ষা করা প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত অধিকার বলা যায়। যিনি আহত বা সংক্ষুব্ধ তিনি কেবল এই অধিকার আদায়ের যোগ্যতা রাখেন। ইচ্ছা করিলে তিনি অপর পক্ষকে মাফ করিয়া দিতে পারেন।

(৩) এমন কতিপয় ক্ষেত্র আছে যেখানে গণ-অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকার মিশিয়া গেলেও গণ-অধিকার প্রবল থাকে। এই শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পড়ে ব্যভিচারের তোহমতকারীকে শাস্তি দিবার অধিকার। হানাফিগণ বলেন যে, এইরূপ তোহমত দ্বারা সমাজের অধিকারকে আঘাত করা হয় এবং যাহার সম্বন্ধে তোহমত দেওয়া হয় তাহাকেও আঘাত দেওয়া হয়। হানাফীদের মতে এই ক্ষেত্রে গণ-অধিকার প্রবল এবং সেই কারণে আহত ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ মাফ করিয়া দিতে পারেন না। শাফিঈ-গণ বলেন যে, এই ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ মাফ করিয়া দিতে পারেন। তাহাদের মতে এই অধিকারকে ব্যক্তিগত অধিকার বলাই সংগত।

www.pathagar.com

(৪) এমন কতিপয় ক্ষেত্র আছে যেখানে গণ-অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকার মিশিয়া গেলেও ব্যক্তিগত অধিকার প্রবল গণ্য হয়। খুন বা অন্যান্য দৈহিক আঘাতের জন্য কিয়াসের অধিকার এই পর্যায়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর বর্তায় আবার খুন হওয়ার কারণে মৃত ব্যক্তির যে সমস্ত ওয়ারিশ ক্ষতিগ্রস্ত বা দুঃখিত হইয়াছেন তাহারাও আঘাতকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার পান। যে ব্যক্তির দেহ আঘাত পাইয়াছে জীবিত থাকিলে সেই ব্যক্তিও অনুরূপ অধিকার লাভ করে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবলতর এবং আহত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারিগণ অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন কিংবা রক্ত মূল্য গ্রহণ করিতে পারেন।

গণ-অধিকারের উপ-শ্রেণী

উপরে বর্ণিত প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর গণ-অধিকারকে নিম্নবর্ণিত আটটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। ইবাদত (عبادات) ঃ ইহার মধ্যে আসে ঈমান এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য পাঁচটি কর্তব্য। যথা—সালাত (صلوة), যাকাত (ذكوة), সাউম (صوم), হজ্জ (حج) এবং জিহাদ (جهاد)।

২। কামিল উকুবাত (كامل عقوبات) অর্থাৎ পূর্ণ শাস্তি ঃ এই উপশ্রেণীতে পড়ে চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপানজনিত মাতলামি এবং তোহমতের জন্য হদ।

৩। কাসির উকুবাত (قاصر عقوبات) অর্থাৎ লঘু শাস্তি ঃ ওয়ারিশ যদি তাহার পূর্ববর্তীকে হত্যা করে তবে সে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত হয়। এই শাস্তিকে লঘু বলা হয়, কারণ ইহার দ্বারা কোন দৈহিক বেদনা দেওয়া হয় না।

৪। ইবাদত এবং উকুবাতের অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলিয়া যায়; ফরয তরক করিলে অর্থাৎ যাহা অবশ্য প্রতিপাল্য তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে কাফ্ফারা দিবার দায়িত্ব এই পর্যায়ে পড়ে। ইহা একদিকে যেমন ইবাদত অন্যদিকে তেমন উকুবাত। রোযা রাখা বা দরিদ্র ভোজন দ্বারাই কাফ্ফারা দেওয়া হয়।

৫। ইবাদতমূলক শুল্ক ঃ ঈদুল-ফিতরের সময় ফিতরা দেওয়াকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

www.pathagar.com

৬। মালিকানার সহিত যুক্ত শুল্ক ঃ বিশেষ প্রকারের জমির জন্য এক দশমাংশ কর প্রদান (উশর عشر) এই পর্যায়ে পড়ে।

৭। শাস্তিমূলক শুল্ক ঃ অমুসলিমদের নিকট হইতে যে ভূমিকর (খিরাজ خراج) আদায় করা হয় তাহা এই উপশ্রেণীতে আসে।

৮। এমন কতিপয় অধিকার আছে যাহা একেবারেই স্বতন্ত্র। জিহাদের অধিকারকে নিশ্চিতরূপে গণ-অধিকার বলা যায়। জিহাদে যে মালমাত্তা (গনিমত) প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে সমাজের সকলের অধিকার থাকা উচিত কিন্তু আইনে গনিমতের এক পঞ্চমাংশ সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকে এবং অবশিষ্টাংশ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা বিদ্যমান। স্বর্ণ বা রৌপ্য খনিতে যাহা পাওয়া যায় তাহার উপর সকলের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু আইন সমাজকে মাত্র এক পঞ্চমাংশ লইতে এবং খনির মালিককে অবশিষ্টাংশ লইতে বিধান দিয়াছে।

অনির্ভর এবং নির্ভর অধিকার

এমন অনেক অধিকার আছে যাহার সহিত কোন কর্তব্য যুক্ত নয়। এইগুলিকে অনির্ভর অধিকার বলা যায়। আবার এমন অনেক অধিকার আছে যাহা প্রতিপালনের জন্য এক ব্যক্তির বরাবরে অন্য ব্যক্তিকে কিছু করিতে হয়। পাশ্চাত্য আইনতত্ত্বে এই অধিকারকে জন-অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকার বলা হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার এবং প্রতিস্থাপিত অধিকার

ইসলামী আইনবিদদের মতে অধিকারকে আসল (اصل) অথবা মৌলিক এবং প্রতিস্থাপক (খালফ خلف) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। সালাতের পূর্বে পানি দিয়া অযু করিবার অধিকারকে আসল অধিকার বলা যায়। অসুস্থতার জন্য মাটি দিয়া তায়াম্মুম করাকে প্রতিস্থাপিত অধিকার বলা যায়। দবির সাবেতের নিকট হইতে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিল। ঐ দ্রব্যগুলি আপন দখলে পাইবার অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা যায়। কিন্তু সাবেত ঐ দ্রব্যগুলি দবিরের বরাবরে অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে দবির সাবেতের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের এই অধিকারকে প্রতিস্থাপিত অধিকার বলা যায়। অধ্যাপক

www.pathagar.com

হল্যাণ্ড যাহাকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অধিকার বলিয়াছেন তাহাকে মৌলিক এবং প্রতিস্থাপিত অধিকার বলা যায়।

ব্যক্তিগত অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস

গণ-অধিকারকে যে সমস্ত শ্রেণী বা উপশ্রেণী বা বিভাগে বিভক্ত বা বিন্যস্ত করা যায়, ব্যক্তিগত অধিকারকেও সেইভাবে বিভক্ত বা বিন্যস্ত করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে আইনবিদগণ এত বিস্তৃত শ্রেণীবিন্যাস করেন নাই।

আইনের উদ্দেশ্যের নিরিখে ব্যক্তিগত অধিকারকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে প্রথমত এই অধিকারকে দুইভাগে করা যায়। প্রথম ভাগে আসে অতি আবশ্যকীয় ব্যক্তিগত অধিকার। দেহ এবং সম্পত্তির অধিকারকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে চুক্তি প্রবলের অধিকার।

বিষয়বস্তুর নিরিখে ব্যক্তিগত অধিকারকে নিম্নবর্ণিত ছয়ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। আত্মরক্ষার অধিকার (নাফস نفس)

২। সুনাম রাখার অধিকার (হুরমত حرمة)

৩। মালিকানার অধিকার (মিল্‌ক ملك)

৪। পারিবারিক অধিকার—ইহার মধ্যে পড়েঃ

(ক) দাম্পত্য অধিকার (জাউজিয়াত زوجية)

(খ) অভিভাবকত্বের অধিকার (বিলায়ত ولاية)

(গ) সন্তান এবং দরিদ্র আত্মীয়দের অধিকার এবং

(ঘ) খিলাফত এবং মিরাসের অধিকার

৫। আইনানুগ কাজ করিবার অধিকার (তাসাররুফ)

৬। চুক্তিমূলক কাজ করিবার অধিকার।

প্রতিস্থাপক অধিকার

যাহার বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগ করা হয় তাহাকে মনে রাখিয়া প্রতিস্থাপক আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আইনের আদর্শের মাধ্যমে এই অধিকার পালন করিতে বাধ্য করা হয়। আইনের আদেশ দ্বারা আল্লাহতালার

www.pathagar.com

প্রতি কর্তব্য পালন করিতে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য করা হয়। সালাত আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য, কর প্রদান রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য, সন্তান পালন সন্তানের প্রতি কর্তব্য। স্বীকৃতি দ্বারাও অধিকার সৃষ্টি করা যায়। দবির বলিল যে, সে সাবেতের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইয়াছে। এই স্বীকৃতির ফলে দবিরের বিরুদ্ধে সাবেতের অধিকার জন্মে। অন্যের অধিকার ভংগ করার ফলেও বিশেষ ব্যক্তির বরাবরে ব্যক্তিগত অধিকার জন্মে। অন্যের দৈহিক নিরাপত্তায় আঘাত করিলে কিংবা তাহার কাজে বাধা দিলে কিংবা তাহার সুনাম নষ্ট করিলে কিংবা তাহার পারিবারিক সম্পর্কে উপদ্রব করিলে কিংবা তাহার স্বত্ব দখলে ব্যাঘাত ঘটাইলে আঘাতকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আহতদের অধিকার জন্মে।

দায়িত্বের শ্রেণীভেদ

হানাফী আইনবিদগণ দায়িত্বকে দুই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। দায়িত্ব কি কি উপাদানে গঠিত হয় তাহাই দেখা হইতেছে প্রথম দৃষ্টিকোণের নিরিখ। দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপালন করিতে হয় তাহা আলোচনা করা হইতেছে দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণের নিরিখ। যে উপাদানে দায়িত্ব গঠিত হয়, তাহা সাধারণভাবে সময়ের অনুগত নহে। কিন্তু দায়িত্ব প্রতিপালনের ব্যাপারে সময়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইবাদত করার দায়িত্ব অনন্তকাল হইতেই বিরাজমান। কিন্তু মানুষ যখন বালেগ হয় এবং ইবাদতের সময় যখন উপস্থিত হয় কেবল তখনই ঐ দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে হয়। ইবাদতের যে একটি দায়িত্ব ইহা বুঝিয়া লওয়াই প্রথমে প্রয়োজন। দায়িত্বের স্বীকৃতির পর উহা পালনের প্রশ্ন আসে। কিন্তু দায়িত্ব তখনই প্রতিপাল্য হয় যখন দায়ী ব্যক্তি উহার যোগ্য হন এবং দায়িত্ব পালনের সময় উপস্থিত হয়।

দবির কিছু দ্রব্য সাবেতের কাছে বিক্রয় করে। কিন্তু বিক্রয়-মূল্য নির্দিষ্ট করা হয় না। ক্রেতা সাবেত দ্রব্যগুলি আপন দখলে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা দবির উপযুক্ত মূল্য পাইতে অধিকার লাভ করে এবং সাবেতের উপর দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিবার দায়িত্ব বর্তায়। এই দায়িত্ব সময়নিরপেক্ষ। যে মুহূর্তে দবির সাবেতের কাছে মূল্য দাবী করে সেই মুহূর্তে সাবেত উহা প্রদান করিবার জন্য দায়ী হয়।

www.pathagar.com

কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, দায়িত্বকে উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণদ্বয়ে ভাগ করিবার কোন হেতু নাই। দায়িত্বের মূল্য ইহার প্রতিপাল্যতায়। যেখানে প্রতিপালনের অঙ্গীকার নাই সেখানে দায়িত্বের স্বীকৃতি অর্থহীন। দায় স্বীকার করা বলিতে দায় প্রতিপালন করিবার প্রতিশ্রুতি বুঝায়। এমতাবস্থায় দায়িত্ব সময়নিরপেক্ষ, ইহা বলিবার মধ্যে কোন যুক্তি নাই।

দায় শোধের শ্রেণী

দায়িত্ব প্রতিপালনকে দায় শোধও বলা যায়। যাহা করার জন্য যখন কেহ দায়-আবদ্ধ তখন তিনি যদি ঠিক তাহাই করেন তবে তাহার সেই কাজকে সুনির্দিষ্ট দায় শোধ (আদা اداء) বলে। আর তিনি যদি তৎপরিবর্তে অন্য কিছু করেন তবে তাহাকে অনির্দিষ্ট (কাদা قضاء) দায় শোধ বলে। এই শ্রেণীবিন্যাস আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব বা মানুষের প্রতি দায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সুনির্দিষ্ট দায় শোধ নিখুঁত বা খুঁতযুক্ত (কামেল বা কাসের كامل او قاصر) হইতে পারে। ক্রেতাকে যখন বিক্রীত বস্তুটি প্রদান করা হয় বা অন্যায় দখলকারী যখন দখলকৃত বস্তুটি মালিকের বরাবরে ফিরাইয়া দেয় তখন তাহার এই কাজকে নিখুঁত দায় শোধ বলে। খুঁতযুক্ত দায় শোধ অনির্দিষ্ট দায় শোধের সমতুল্য।

যে জিনিস দিয়া দায় শোধ করিতে হয় তাহা না দিয়া আকৃতি ও প্রকৃতিতে সমতুল্য অন্য বস্তু দিয়া দায় শোধ করাকে অনির্দিষ্ট দায় শোধ বলে। আইন ইহাকে শুদ্ধ ঘোষণা করে। আইন আরও বলে যে, আকৃতিতে সমতুল্য না হইলেও প্রকৃতিতে সমতুল্য বস্তু দিয়া দায় শোধ করা যায়। যে বস্তু অপহরণ করা হইয়াছে, সেই বস্তু ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িলে অপহরণকারী তাহার মূল্য দিয়া দায় মুক্ত হইতে পারে।

যে ক্ষেত্রে সমতুল্য জিনিস পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে হানাফীদের মতে দায় শোধের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দায়িত্বের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নহে সে ক্ষেত্রে মূল্য দিয়া দায় শোধ করা যায়।

অধিকার এবং দায়িত্বের উৎস হস্তান্তর এবং বিলোপ

অধিকার এবং দায়িত্বের উৎস হস্তান্তর ও বিলোপের বিধান ঘোষণাকারী আইনে পাওয়া যায়। একটি বিষয়ের সহিত আরেকটি বিষয়ের সংযোগের

www.pathagar.com

উপর ঘোষণাকারী আইনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। দুইটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ যদি এই প্রকৃতির হয় যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত তাহা হইলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপাদান (রোকন ركن) বলা হয়। দুইটি বিষয়ের যোগ যদি এই প্রকৃতির হয় যে একটির কারণে অপরটি ঘটে তবে প্রথমটিকে কার্যকরী কারণ (ইল্লাত علة) বলা হয়। দুইটি বিষয়ের যোগ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাৎক্ষণিকভাবে নয় দূরবর্তীভাবে একটি বিষয় অপরটির উদ্ভব ঘটায় তখন প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সবাব (سبب) বলা হয়। যদি একটি বিষয়ের অস্তিত্ব অন্য বিষয়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয় তবে দ্বিতীয় বস্তুকে প্রথম বস্তুর শর্ত (شرط) বলা হয়। যখন একটি বিষয়ের অস্তিত্ব অন্য বিষয়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয় না বটে কিন্তু অন্য বিষয়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে তখন একটি বস্তুকে অপর বস্তুর আলামত (علامت) বলা হয়। আল্লাহ্ তালার তৌহিদের স্বীকৃতি (তসদীক تصديق) ঈমান বা বিশ্বাসের আবশ্যকীয় উপাদান। যেখানে এই স্বীকৃতি নাই সেখানে ঈমান নাই। হানাফিগণ অবশ্য স্বীকৃতিকে আবশ্যিক উপাদান মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, ঈমান কলবে থাকিলেই হইল, মুখে বলা ভাল কিন্তু না বলিলে বেঈমান হইবার কারণ নাই।

কার্যকর কারণের প্রকারভেদ

কার্যকর কারণের প্রকার নিম্নবর্ণিত উদাহরণসমূহ হইতে বুঝা যাইবে। মালিকানা স্বত্বের হস্তান্তর সাফ বিক্রয় দ্বারা করা যায়; এই ক্ষেত্রে বিক্রয় হইতেছে হস্তান্তরের কার্যকর কারণ। এই ক্ষেত্রে কার্যকর কারণ একটি আইনের বিধান মাত্র। বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দাম্পত্য সহবাস আইনসঙ্গত হয়। এখানে বিবাহ হইতেছে দাম্পত্য সহবাস আইনসঙ্গত হইবার কার্যকর কারণ। এ ক্ষেত্রে কার্যকর কারণ আইনের আদেশ বলবৎ করে। খুন করিলে খুনী ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ লওয়া যায়। এখানে প্রতিশোধ হইতেছে খুনের কার্যকর কারণ।

প্রস্তুতকারী কারণ

যখন কোন ঘটনার দুইটি কারণ থাকে তখন যে কারণটি নিকটবর্তী তাহাকে কার্যকর কারণ এবং যে কারণটি দূরবর্তী থাকে তাহাকে প্রস্তুতকারী কারণ বলে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী কারণের দ্বারা কার্যকরী কারণের

www.pathagar.com

উদ্ভব হয় সেক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী কারণকে কার্যকর কারণ বলা হয়। দবির তাহার গরুর পাল লইয়া সাবেতের ধানের ক্ষেত নষ্ট করিল। এ ক্ষেত্রে যদিও সাবেতের ধানের ক্ষেত গরুর পদভারে পিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কারণে গরুর পদচারণাকে ক্ষেত নষ্ট হইবার নিকটবর্তী কারণ বলা যায় তবুও যেহেতু দবির গরুগুলিকে সাবেতের খেতে লইয়া গিয়াছিল তাই সে উহার জন্য দায়ী হইবে। জায়েদ হারুণ নামক একটি বালকের হাতে ছুরি দিল। হারুণ ছুরি দিয়া তাহার হাত কাটিয়া ফেলিল। এ ক্ষেত্রে জায়েদের কোন দোষ নাই। কারণ হারুণ নিজের ইচ্ছায় তাহার হাত কাটিয়াছে। কিন্তু হারুণ যদি নিজের ইচ্ছায় না হইয়া অন্যভাবে ছুরিতে কাটা পড়িত তবে জায়েদ দায়ী হইত। কোন ব্যক্তি যদি চোরকে একটি বস্তু দেখাইয়া দেয় এবং চোর সেই বস্তু চুরি করে, তবে শুধু দেখাইয়া দিবার জন্য সে মালিকের কাছে দায়ী হইবে না।

কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার ঘরে পদার্পণ কর তবে তুমি তালাকপ্রাপ্ত হইবে। যে মুহূর্তে ইহা বলা হয় সেই মুহূর্ত হইতে স্বামীর এই ঘোষণাকে প্রস্তুতকারী কারণ বলা যায়। স্ত্রী ঘরে ঢুকিবার পর তালাক হইয়া গেলে স্বামীর ঘোষণাকে কার্যকর কারণ বলা হয়।

আইন আমলে আনিতে হইলে তাহার প্রত্যক্ষ কারণ থাকা চাই। ওয়াকত উপস্থিত হইলে তবে নামায পড়িতে হয়, সম্পত্তি থাকিলে যাকাত দিতে হয়, রমযান মাস আসিলে রোযা রাখিতে হয়; জমিতে ফসল হইলে খাজনা দিতে হয়, চুরি বা খুন করিলে শাস্তি পাইতে হয়। এই সমস্ত উদাহরণের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি আইন বলবৎ হইয়াছে। তবে আইন বলবৎ হইবার পূর্বে ঘটনা ঘটিয়াছে।

কতিপয় আইন এমন ঘটনা বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যাহা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। এমন অনেক আইন আছে যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। সালাত আদায় করিবার জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে কিন্তু সময়ের নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নাই। স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ মিরাস দেওয়া হইয়াছে, এই বিশেষ অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণ সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

শর্ত

শর্ত অনেক প্রকৃতির হইতে পারে। নিম্নবর্ণিত প্রকৃতি সম্বলিত আইনের শর্তগুলি প্রধান—

www.pathagar.com

(১) যথার্থ শর্ত

ইহা সেই প্রকারের শর্ত যাহার উপর অন্য কিছু নির্ভরশীল। সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া হস্তান্তরের অধিকারের একটি শর্ত। যে ব্যক্তি সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন সেই ব্যক্তি হস্তান্তর করিবার অধিকার রাখে। যিনি সুস্থ মস্তিষ্ক নন, তিনি হস্তান্তর করিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মস্তিষ্কের সুস্থতা এমন একটি শর্ত যাহার উপর হস্তান্তরের অধিকার নির্ভরশীল। বিবাহের জন্য দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন; ইহাই হানাফীদের মত। এ ক্ষেত্রে যদি বিবাহে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত না থাকে তবে সে বিবাহ বৈধ নহে। দেখা যাইতেছে যে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি এমন একটি শর্ত যাহার উপর বিবাহের বৈধ্যতা নির্ভরশীল। কোন কোন সময় মানুষ নিজেই কোন কাজের জন্য যথার্থ শর্ত সৃষ্টি করিতে পারে। এক ব্যক্তি বলিল যে, সে যে মহিলাকে বিবাহ করিবে সেই মহিলার সহিত তাহার বিবাহ ছিন্ন হইয়া যাইবে। হানাফীদের মতে বিবাহ করিবামাত্র তাহার বিবাহ ছিন্ন হইয়া যায়।

(২) কার্যকরী কারণমূলক বা প্রস্তুতিমূলক শর্ত

ইহা সেই প্রকৃতির শর্ত যাহা কোন ঘটনার কার্যকর কারণ। দবির সাবেতের অজ্ঞাতসারে তাহার জমিতে একটি গভীর গর্ত খনন করিল। সাবেত তাহার জমিতে পদচারণা করিবার সময় সেই গর্তে পড়িয়া মরিয়া গেল। সাবেতের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে তাহার দেহের ওজন। সে ভারী ছিল বলিয়াই গর্তের মধ্যে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। তাহার পদচারণাও তাহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। ঐ জমিতে সে ভ্রমণ না করিলে তাহার মৃত্যু হইত না। কিন্তু তাহার দেহের ওজন বা ভ্রমণকে তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা যায় না। দবির সাবেতের মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে। সে অন্যায়ভাবে সাবেতের অজ্ঞাতসারে তাহার জমিতে গর্ত খনন করিয়াছিল। সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যে অবস্থার শিকারে পরিণত হওয়া সাবেতের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এই অবস্থাকে কার্যকরী কারণমূলক শর্ত বলা যায়।

(৩) এমন অনেক শর্ত হইতে পারে যাহা শুধু নামে শর্ত, কাজে নয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আইনভিত্তিক যোগ্যতা

আইনভিত্তিক যোগ্যতার সংজ্ঞা

সংজ্ঞাদানকারী আইন এবং ঘোষণাদানকারী আইন এবং আইনের উদ্দেশ্য محكوم فيه আলোচনা করিবার পর মুসলিম আইনবিদগণ ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তির উপরেই আইন প্রযুক্ত হয় (মাহকুম আলাইহি محكوم عليه)। সেই কারণেই ব্যক্তি সম্পর্কে মুসলিম আইনবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় জিম্মা (ذمة) বলে। জিম্মা বলিতে কোন ব্যক্তির আইন-ভিত্তিক উপযুক্ততা বুঝায়। জিম্মা এমন একটি গুণ যাহা তাহাকে অধিকার (মালাহু ماله) দেয় এবং দায়িত্বশীল (মা আলাইহি ما عليه) করে।

ধারণ এবং প্রয়োগের যোগ্যতা

আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে পড়ে অধিকার এবং দায়িত্ব ধারণের যোগ্যতা। ইহাকে ধারক যোগ্যতা বা আহলিয়াতুল ওয়াজুব (اهلية الوجوب)বলে। দ্বিতীয় ভাগ পড়ে অধিকার বলবৎ করিবার এবং দায়িত্ব প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা। ইহাকে প্রয়োগের যোগ্যতা বা আহলিয়াতুল আদাউ (اهلية الاداء) বলে। ইসলামী আইনের ধারণায় প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে আইনভিত্তিক যোগ্যতার অধিকারী। এই অধিকার যেমন একদিকে তাহাকে সুবিধা দেয় তেমনি অন্যদিকে তাহাকে দায়ী করে। মানবিক মর্যাদার জন্য এই সুবিধা ও দায়িত্ব স্বাভাবিক। এই অধিকার মানব প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন। তাহার জন্মলগ্নেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। জন্মলাভের পর মানুষের বিকাশের সহিত এই অধিকারেরও বিকশ ঘটিতে থাকে। মানবিক বৃত্তি যতই বিকাশিত হইতে থাকে এই অধিকারও ততই স্পষ্ট হইতে থাকে। যে কালে মানবশিশু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে সে সময় তাহার যোগ্যতা ক্ষীণ থাকে। জন্মের সাথে সাথে তাহার ধারক যোগ্যতা পূর্ণতা পায়। প্রয়োগের যোগ্যতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বালেগ হইলেই তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

www.pathagar.com

আইনভিত্তিক যোগ্যতার উপর প্রভাব

যে শিশু, তাহার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বিস্তৃত নয়। সুতরাং বয়স মানুষের আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। আরও অনেক পরিস্থিতি আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে প্রভাবিত করিতে পারে। যে ব্যক্তি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তাহার যোগ্যতা সীমিত। যে লোক উম্মাদ তাহার একই অবস্থা। যাহার মস্তিষ্ক অপরিণত তাহারও যোগ্যতা খর্বিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ বা অপরিণত বুদ্ধি হওয়ার কারণে যোগ্যতা প্রভাবিত হয়। ধর্মত্যাগ, কুফর, মৃত্যুকালীন ব্যাধি, দেউলিয়াত্ব প্রভৃতিও মানুষের আইন-ভিত্তিক যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি বালেগ এবং যাহার বুদ্ধি পরিণত এবং যে স্বাধীন এবং যে ইসলামে বিশ্বাসী এবং যে দেউলিয়া নয় এবং যাহাকে মৃত্যু ব্যাধি আক্রমণ করে নাই সেই ব্যক্তি আইনভিত্তিক যোগ্যতার পূর্ণ অধিকারী।

কৃত্রিম ব্যক্তি

খুবসম্ভব প্রাচীন আইনতত্ত্ববিদগণ বর্তমানে যাহাকে কৃত্রিম বা আইন-ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব বলা হয় তাহার স্বীকৃতি দেন নাই। আল্লাহ্‌তালার যে অধিকার তাহা আল্লাহ্‌তালার পক্ষে ইমামের মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সমাজ আদায় করে। আইন মানুষের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং মানুষ মরিয়া গেলে তাহার সকল প্রকার আইন-ভিত্তিক অধিকার বিলুপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করিতে হয়। দাফন কাফন ব্যতীত মৃত ব্যক্তি যে দায় বা ঋণ রাখিয়া যায় তাহা তাহার সম্পত্তি হইতে পরিশোধযোগ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মৃত ব্যক্তিও অধিকার ও দায়ের ধারক হইতে পারে। প্রাচীনকালে অছির মাধ্যম ব্যতীত মসজিদে হিবা আইন সিদ্ধ হইত না কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ কৃত্রিম ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। মসজিদ এমন একটি ব্যক্তিত্ব। সরাসরি মসজিদের বরাবরে তাহারা হিবা সিদ্ধ করিয়াছেন।

পরিস্থিতিগত আইনভিত্তিক যোগ্যতার বিভাগ

সবদিক দিয়া পূর্ণতম যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তির কাজও পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। যে কাজ করা হইল, তাহার পূর্বেকার বা

www.pathagar.com

তৎকালীন অবস্থা ঐ কাজকে প্রভাবিত করিতে পারে। ঐ অবস্থা বা পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে। আইন না জানিয়া বা অন্যের দ্বারা প্ররোচিত বা প্রতারিত হইয়া বা ঘটনা না জানিয়া বা সবকিছু না বুঝিয়া যে কাজ করা হয় সে কাজ যোগ্য ব্যক্তি করিয়া থাকিলেও স্বাভাবিক পরিস্থিতির কাজের সমতুল্য নয়।

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ এই সমস্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতিকে বিবেচনার অধীনে আনিয়াছেন। যে সমস্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতি মানুষের আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে কিম্বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যোগ্য মানুষের কাজের আইনভিত্তিক প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, সেই সমস্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতিকে আইনতত্ত্ববিদগণ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগে আসে মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত পরিস্থিতিসমূহ। এইগুলি বিধাতার সৃষ্ট পরিস্থিতি। শৈশব, জড়বুদ্ধি, উন্মাদ রোগ, ভ্রান্তি, রোগ, নিদ্রা, মূর্ছা, ব্যাধি এবং মৃত্যুকে এই প্রকার পরিস্থিতি বলা হায়। আইনের ভাষায় ইহার নাম সামাবি (سماوی)। দ্বিতীয় ভাগে আসে সেই সমস্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতি যাহা মানুষের সৃষ্ট। ইহার মধ্যে আসে ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, দাসত্ব, পানোন্মত্ততা, দুর্বুদ্ধি, ভ্রম এবং যুলুম— ইহাকে বলে মাকসুবা (مکسوبه)

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, ধর্ম ত্যাগ এবং মৃত্যু কিছু কিছু অধিকার ও দায়িত্ব এক হইতে হরণ করিয়া অন্যের উপর আরোপ করে।

ধর্মত্যাগ এবং মৃত্যু মানুষের সকল প্রকার অধিকার হরণ করে না।

কাজের সহিত মনের এবং ইচ্ছার সম্বন্ধ

মানুষের কাজ কতদূর স্বাধীন এবং কতদূর নিয়তির অধীন তাহা লইয়া মুসলিম আইনবিদদের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হইয়াছে। মানুষ যদি নিয়তির অধীন হয়; তবে যে কাজ সে করে তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার কাজ নয়, অন্যের কাজ। তাই সে ক্ষেত্রে তাহার কাজের জন্য তাহাকে দায়ী করা চলে না। আবার মানুষ যদি পূর্ণভাবে স্বাধীন হয় তবে যাহা সে ইচ্ছা করে তাহা সে করিতে পারে না কেন? এই প্রকার প্রশ্নাবলী মুসলিম আইনবিদদের মনে আলোড়ন জাগাইয়াছে এবং তাঁহারা এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

হানাফীদের মতে মানুষ যাহা করে তাহার কিছু অংশ তাহার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত এবং কিছু অংশ আল্লাহতালার ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া। কোন কাজ সে করিবে কি করিবে না, ইহা মানুষের ক্ষমতার এলাকায় পড়ে। করা বা না করার এই সিদ্ধান্তকে ইচ্ছা বা এখতিয়ার (اختیار) বলে। ইচ্ছার পরে আসে অভিপ্রায়। ইচ্ছা করিবার পর ঈপ্সিত কাজ করিতে চাহিলে মানুষ যাহা করে তাহাকে বলা হয় অভিপ্রায় বা ইরাদা বা কাসদ (ارادت قصد)। যাহা অভিপ্রায় করা হয়, সম্পাদনের সময় সাধারণত সেই কাজ সম্পন্ন হয়। ইহাই সাধারণ ঘটনা। সাধারণভাবে অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হইয়া অভিপ্রেত কাজ নিষ্পন্ন হইবার পশ্চাতে অনেক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে। সেই পরিস্থিতিসমূহের উপর মানুষের অধিকার নাও থাকিতে পারে। কখনও কখনও যাহা ঘটা স্বাভাবিক নয়, অভিপ্রায়ের ফলে তাহাও ঘটিয়া যায়। অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা এই সমস্ত ঘটনার উদাহরণ। যাহা মানুষ করিতে অভিপ্রায় করে এবং সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী সর্বপ্রকার উদযোগ গ্রহণ করে তাহা যে সব সময় করা যায় এমন নহে। করিতে চাহিলেই কাজ হয় না। করা এবং কাজ হওয়া এই দুয়ের মধ্যে অন্য শক্তির প্রভাব থাকা সম্ভব। মুসলিমগণ মোজেজায় বিশ্বাসী এবং সেই কারণে তাহারা মাঝে মাঝে এই মত ব্যক্ত করে যে, অভিপ্রায় করার এবং কাজ করার অধিকার মানুষের এবং ফল দিবার অধিকার আল্লাহ্‌তালার। এই প্রসঙ্গে তাফতাজানী বলেন, মানুষ কাজ করিয়া যে ফল পায় তাহা সর্বতোভাবে মানুষের নিজস্ব নহে, এই যুক্তি সঠিক নয়। প্রকৃত সত্য হইতেছে এই যে, মানুষ যাহা করে তাহা তাহার অভিপ্রায়েরই ফল, তবে আল্লাহ্‌তালা ইচ্ছা করিলে স্বভাবের বিরুদ্ধেও ঘটনা ঘটাইতে পারেন।

অভিপ্রায় এবং সম্মতির পার্থক্য

ইসলামী আইনের পরিভাষায় অভিপ্রায় এবং সম্মতি একার্থবোধক নয়। অভিপ্রায় করা এবং সম্মত হওয়া দুইটি পৃথক মানসিক ভাব। যে কাজ করিতে অভিপ্রায় করা হয়, সেই কাজ করিতে যে সম্মত হওয়া গিয়াছে তাহা নাও হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে: "দবির সাবেতকে বলিল, সাবেত, তুমি ঐ গাছটি কেটে ফেল, যদি না কাট তবে আমি মেরে তোমার হাড় ভেঙে দেব।" সাবেত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, তাহার সামনে

www.pathagar.com

দুইটি পথ খোলা আছে, হয় তাহাকে গাছ কাটিতে হইবে, না হয় তাহাকে হাড়-ভাঙ্গা প্রহার সহ্য করিতে হইবে। এই অবস্থায় পড়িয়া সাবেত গাছ কাটিবার পথ বাছিয়া লইল। আইনের পরিভাষায় সে গাছ কাটিবার অভিপ্রায় করিল। অভিপ্রায় করিয়া থাকিলেও সে গাছ কাটিতে সম্মত হয় নাই। সাবেতের গাছ কাটাকে আইনের পরিভাষায় সম্মত কাজ বলা চলে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইসলামী আইনবিদগণের মতে, মনের যে অবস্থা তাহার দেহকে কাজে লাগায় সেই অবস্থাকে অভিপ্রায়ের অবস্থা বলে। বাধ্য হইয়া যে কাজ করিতে হয় তাহা অভিপ্রেত হইলেও সেই অভিপ্রায় বিশুদ্ধ নহে, তাহা ত্রুটিপূর্ণ বা ফাসিদ। যে কাজের পশ্চাতে ইচ্ছা নাই তাহাকে অনৈচ্ছিক কাজ বলা হয়। নিদ্রাবস্থায় বা পানোন্মত্ত অবস্থায় বা ভ্রান্তিকালীন অবস্থায় বা মূর্ছার অবস্থায় মানুষ যে কাজ করে তাহা অনৈচ্ছিক, সেখানে তাহার ইচ্ছার অবকাশ নাই।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য করা হয় না। আইনের পরিভাষায় এখতিয়ার, ইরাদা এবং কাসদ প্রায় একই অর্থ বহন করে।

কাজের উদ্দেশ্যের মুকাবিলায় অভিপ্রায়

প্রায় সব কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে, এই উদ্দেশ্যকে মহল (محل) বলা হয়। কাজের ব্যাপারে অভিপ্রায়কে নিষ্পন্ন হইতে হইলে দেহকে এবং মহলকে গতিশীল হইতে হয়। কখনও কখনও কাজের ফলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য প্রভাবিত না হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অন্য উদ্দেশ্য প্রভাবিত হইতে পারে। কাজ করিবার সময় উহা নিষ্পন্নের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় সেই উপায়ের প্রতিক্রিয়ায় অনভিপ্রেত উদ্দেশ্য নিষ্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। কাজ করিতে গেলে যে সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় তৎসম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলেও অনভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যাইতে পারে। অনেক সময় এক করিতে আর এক হইয়া যায়। উপায়ের বা উপাদানের ব্যবহার সঠিক না হইলে বা সম্যক পরিস্থিতি অবহিত না হইতে পারিলে এইরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়া যাইতে পারে। উপায় এবং উপাদানের অযথা ব্যবহার বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা যদি মনোযোগের অভাব বা বিচার বুদ্ধির অভাবে বা অভিনিবেশের অভাবে ঘটিয়া থাকে তবে সেই অভাবকে অবহেলা বলা হয়।

www.pathagar.com

এইরূপ কাজকে হেলার কাজ বা অসর্তকের কাজ (তুরুকু—তারওয়া (طروق تروا) বলা হয়। যেখানে অবহেলা নাই কিন্তু অনভিপ্রেত ঘটনা কোন কাজের ফলে ঘটিয়াছে সেখানে উহাকে ভ্রমাত্মক ঘটনা বা দুর্ঘটনা (খাতা خطا) বলা হয়।

এখতিয়ার, নিয়ত এবং আকাঙ্ক্ষা

আমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করি সেই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে থাকে কোন কিছুর আকাঙক্ষা বা শওক شوق)। শওক আবার আমাদের এখতিয়ার বা ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের ইচ্ছার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য কখনও কখনও একই হয়। এমতাবস্থায় ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের আইন একই অর্থে গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়কে উদ্দেশ্য এক না হইয়া যখন ভিন্ন হয়, তখন আমাদের ইচ্ছার উদ্দেশ্যকে কাজের নিয়ত বলা হয়। দুইটি উদাহারণ দেওয়া যাইতেছে। দবির সাবেতের নিকট তাহার বাড়ী দশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে অভিপ্রায় করিল। এই ক্ষেত্রে সাবেতের সহিত বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের বাসনাকে দবিরের অভিপ্রায় বলা হয়। সাবেতের নিকট হইতে টাকা লইয়া দেনা শোধ করিবার জন্য দবিরের বাসনাকে তাহার নিয়ত বলা হয়। জাহেদ ইচ্ছা করিলে যে সে তাহার বাড়ীখানি কেরামতের বরাবরে দান করিবে। এই ক্ষেত্রে দানকে সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত অবশ্য-পাল্য কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য পালনের বাসনাকে জাহেদের অভিপ্রায় বলে। এ ক্ষেত্রে কেরামতের উপকার করা কিম্বা পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সওয়াব অর্জন করাই হইতেছে জাহেদের নিয়ত। নিয়ত ইহলৌকিক হইতে পারে বা পারলৌকিক হইতে পারে। নিয়ত প্রশংসামূলক হইতে পারে আবার প্রতারণামূলক হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি হয় সেই ক্ষেত্র ছাড়া নিয়ত প্রায় সর্বত্রই ধর্মীয় তাৎপর্যে চিহ্নিত হয়। দ্বিপ্রহর হইতে দুইটার মধ্যে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, স্পষ্টতই তাহার নিয়ত হইতেছে জোহরের সালাত আদায় করা। অনেক সময় নিয়তের অর্থ খুব স্পষ্ট বুঝা যায় না। কোন নিয়তে কাজ করা হইয়াছিল তাহা সব সময় বুঝিতে পারা যায় না। রহমত তাহার স্ত্রীকে বলিল, তোমার সহিত আর আমার কোন কাজ কারবার রহিল না। কি নিয়তে কেরামত এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট

www.pathagar.com

নহে। কেরামত তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাহিতেছিল কিনা ইহাই এখানে প্রশ্ন। কেরামত যখন এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল তখন তাহার ইচ্ছার অভাব ছিল না। ইচ্ছা না থাকিলে মুখগহ্বরে তাহার জিহ্বা গতি পাইত না।

ইচ্ছার দ্বারা যেমন কাজ সাধিত হয় তেমনি আইনগত প্রতিক্রিয়াও ঘটিয়া থাকে। ঠিক একইভাবে সম্মতি দ্বারা কাজ সাধিত হয় আবার আইনগত প্রতিক্রিয়াও ঘটে। কোন কোন সময় যুগপৎভাবে মানুষ কাজ করিতে ইচ্ছা করে এবং সম্মত হয়। কিন্তু সে উহার আইনগত প্রতিক্রিয়ার অভিপ্রায় করে না বা সম্মত হয় না। আগেই বলা হইয়াছে যে বাধ্য হইয়া যে ব্যক্তি কাজ করে, সে ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে ঐ কাজ করিতে অভিপ্রায় করে। অবশ্য এই অভিপ্রায় নির্মল নয়, দূষিত। যে ব্যক্তি বাধ্য হইয়া কাজ করিয়াছে সে আইনের দৃষ্টিতে উহা করিতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত কাজের আইনগত প্রতিক্রিয়াতে সম্মত হয় নাই বা উহা অভিপ্রায় করে নাই। কোন ব্যক্তি উপহাস ছলে যদি কোন সাংঘাতিক বাক্য উচ্চারণ করে, আইনের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি ঐ বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য অভিপ্রায় করিয়াছিল এবং সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ বাক্য উচ্চারণের যে আইনগত প্রতিক্রিয়া, তাহা ঐ ব্যক্তি অভিপ্রায় করে নাই বা উহাতে সম্মত হয় নাই।

অভিপ্রায় এবং সম্মতি কখন পূর্ণ হয়

ইসলামী আইনে অভিপ্রায়, সম্মতি এবং নিয়ত সম্পূর্ণ পৃথক অনুভূতি। অভিপ্রায় এবং সম্মতি থাকিলে যে নিয়ত থাকিবে এমন নহে। অভিপ্রায়কে আবার তিন দিক হইতে বিবেচনা করা যায়, কাজের দিক হইতে, উদ্দেশ্যের দিক হইতে এবং আইনগত প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই তিনের বিচারে অভিপ্রায় টিকিয়া থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পূর্ণ অভিপ্রায় বলিয়া গণ্য হয় না। সম্মতির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। নিদ্রাবস্থায়, মূর্ছাবস্থায়, বিস্মরণ অবস্থায় বা পানোন্মত্ত অবস্থায় অভিপ্রায় প্রায় থাকে না, সম্মতিও নয়। বাধ্য হইয়া বা ভ্রান্তিবশত যে কাজ করা হয় সেই কাজের পশ্চাতে অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা দূষিত বা অপূর্ণ; সেখানে সম্মতির একান্তই অভাব। উপহাসোচ্ছলে যে কাজ করা হয় সেখানে অভিপ্রায় এবং সম্মতি সম্পূর্ণ অপূর্ণ।

www.pathagar.com

বিচার এবং জ্ঞান

অন্যের কথা বা কাজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেক সময় মানুষ কাজ করিয়া থাকে। যে কথা এবং কাজ এই প্রভাব সৃষ্টি করে, তাহা যদি সত্যের বিপরীত হয় এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা বলিয়াছে বা কাজ করিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি সত্য অবস্থার সহিত পরিচিত থাকে তবে ঐ ব্যক্তি প্রতারণার দোষে দোষী। প্রতারণা (গুরুর غرور) মুসলিম আইনবিদগণের মতে মানুষের বিচার বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ইহা তাহার অভিপ্রায়কে অপ্রত্যক্ষভাবে এবং দূরবর্তীভাবে প্রভাবিত করে। প্রতারণায় প্রভাবিত হইয়া কোন কাজ করিলে যে ব্যক্তি উহা করিয়াছে ঐ কাজের জন্য এবং কাজের প্রতিক্রিয়ার জন্য ঐ ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং সম্মতি ছিল বলিয়া আইন ধরিয়া লয়। যে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়াছে, সে প্রতারণার নিয়তে তাহা করিয়াছে, অভিপ্রায়ে নয়। অনেক সময় না জানিয়া এবং না বুঝিয়া মানুষ অনেক কাজ করে বা কাজ করা হইতে বিরত থাকে। যে কাজ সে করে বা যে কাজ হইতে সে বিরত থাকে তাহার প্রকৃতি বা প্রতিক্রিয়া যদি সে না জানে তবে সেখানে একটি বৃহৎ আইনের প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ তাহার এই অজ্ঞানতা কতদূর পর্যন্ত অজুহাতরূপে দাঁড়াইতে পারে?

উদাহরণসমূহ

নানা অবস্থায় এবং নানাভাবে মানুষের আইনভিত্তিক যোগ্যতা প্রভাবিত, খর্বিত, ব্যাহত, সংকুচিত বা নষ্ট হইতে পারে। এই হ্রাস বা বিলোপ বা সংকোচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে হইতে পারে, পরিস্থিতির প্রভাবে হইতে পারে, অন্যভাবেও হইতে পারে।

বিস্মরণ

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মতে বিস্মরণ একটি দৈব ঘটনা। আল্লাহ্‌তালার হুকুমে মানুষের উপর এই অভিশাপ নামিয়া আসে। মানুষের দ্বারা এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষের এখতিয়ার বা ইচ্ছা থাকে না কিন্তু আইনভিত্তিক যোগ্যতা থাকে। মানুষের যে কাজ কেবল আল্লাহ্‌তালার অধিকারভুক্ত, সেই সমস্ত কাজের ব্যাপারে বিস্মরণকে একটি উপযুক্ত অজহাত গণ্য করা হয়। রমযান মাসে রোযা

www.pathagar.com

অবস্থায় কিছু খাইয়া ফেলিলে বা পান করিলে এবং তাহা বিস্মরণের কারণে হইলে ঐ নিয়ম ভংগের প্রশ্নে বিস্মরণকে অজুহাত খাড়া করা যায়। কিন্তু যে কাজের দ্বারা অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়—সেই কজের ক্ষেত্রে বিস্মরণকে অজুহাত খাড়া করা চলে না। ইসলামী আইন মানবাধিকারকে অক্ষয় রাখিতে চায়। যে ব্যক্তির কাজে এই মানবাধিকার আহত হয় সেই ব্যক্তি অপরাধী কি অপরাধী নন ইসলামিক আইন তাহা দেখিতে চায় না। যে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে অন্যের ফসল নষ্ট করে সেই ব্যক্তি ভ্রমবশত উহা করিয়া থাকিলেও তজ্জন্য দায়ী হইবে।

নিদ্রা

মানুষের জীবনে নিদ্রা একটি বিশেষ অবস্থা। মানুষ যতক্ষণ এই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নিদ্রিত থাকে ততক্ষণ সে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদির স্বেচ্ছা পরিচালনা দ্বারা কিছুই করিতে পারে না। তাহার শরীরের ঐচ্ছিক গতি বন্ধ হইয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে তাই সে আইনভিত্তিক কাজ করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। নিদ্রাকালে মানুষ কথা বলিতে পারে না এবং যদিও সে এই অবস্থায় কথা বলে তবুও সেই কথার পশ্চাতে তাহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বা সম্মতি থাকে না। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যে কথা বলে বা যে শব্দ উচ্চারণ করে সেই কথা বা শব্দের কোন আইনগত মূল্য নাই। নিদ্রা অবস্থায় দান, বিক্রয়, স্বীকৃতি, তালাক, ধর্মত্যাগ প্রভৃতির কোন আইনগত প্রতিক্রিয়া নাই। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি অন্যের কোন ক্ষতি করে তবে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। বিস্মরণের কারণে কাহারও ক্ষতি করিলে যেমন তাহার জন্য মূল্য দিতে হয় তেমনভাবে নিদ্রা অবস্থায় ক্ষতি করিলেও একই নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের দায় আসিয়া পড়ে।

মূর্ছাবস্থা

পীড়ার কারণে যখন কোন ব্যক্তি মূর্ছিত হয় তখন ঐ ব্যক্তি তাহার ইচ্ছাশক্তি হারাইয়া ফেলে। সে কিছু দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে বা করিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার এই মূর্ছাবস্থা থাকে ততক্ষণ নিদ্রিত মানুষের মত তাহাকে বিবেচনা করিতে হয়। নিদ্রিত মানুষের উপর যে আইন প্রযোজ্য, মূর্ছিত মানুষের উপরও সেই আইন প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

ভ্রম

যে কাজ করিলে অপরাধ হয়, ভ্রমবশত সেই কাজ করিলে তাহাকে হদ বা প্রতিশোধের শাস্তি দেওয়া হয় না। কিন্তু ভ্রমবশত সে যদি অন্যের ক্ষতি বা লোকসান করে তবে সেই ক্ষেত্রে ভ্রমকে কোন অজুহাতরূপে খাড়া করা যাইবে না। কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত ব্যক্তির উপর ঔদার্য প্রদর্শন আইনসিদ্ধ।

হানাফীদের মতে ভ্রমবশত তালাক সিদ্ধ। দবির তাহার স্ত্রীকে বলিতে চাহিল, তোমাকে শাড়ি দিলাম, কিন্তু ভুল করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, তোমাকে তালাক দিলাম। হানাফীদের মতে দবিরের এই উক্তির দ্বারা তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে। শাফিঈগণ হানফীদের এই অভিমত সমর্থন করেন না। হানাফিগণের যুক্তি খুব সরল। তাহারা বলেন, মানুষ তাহার কাজের বা কথার ফল পাইবে। তাহার কাজের বা কথার পশ্চাতে কি তথ্য লুক্কায়িত, তাহা অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। অনুসন্ধান করিলেও যে মানুষের মানসিক অভিপ্রায় জানা যাইবে এমন নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। মানুষ কোন সময় আপন অভিপ্রায় মূলে কাজ করিয়াছে এবং কোন্ সময় ভ্রমবশত কাজ করিয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা অতি দুরূহ। সুতরাং যাহা সাধারণ এবং স্বাভাবিক তাহা আইন মানিয়া লয়। একজন বালেগ সুস্থ বুদ্ধির মানুষ যাহা বলিয়াছে বা করিয়াছে তাহা আপন অভিপ্রায়ে করিয়াছে বা বলিয়াছে, ভ্রান্তিবশত নহে; এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। শাফিঈগণ হানাফীদের এই যুক্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহারা বলেন, ভ্রমবশত উচ্চারিত তালাকের পশ্চাতে অভিপ্রায় না থাকায় উহা অকার্যকর। নিদ্রিত মানুষের উচ্চারিত তালাক অভিপ্রায়হীনতার কারণে হানাফিগণ অকার্যকর মনে করেন; একই সূত্র অনুযায়ী ভ্রমবশত উচ্চারিত তালাকেও অভিপ্রায়হীনতার কারণে অকার্যকর মনে করা উচিত। এই যুক্তির উত্তরে হানাফিগণ প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলেন, নিদ্রাবস্থা এবং ভ্রমাবস্থা সমপর্যায়ের নহে। ইহা নির্দ্বিধায় এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানুষ নিদ্রাবস্থায় তাহার ইচ্ছাশক্তি হারায় কিন্তু ভ্রমাবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ-মুক্ত হওয়া যায় না। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য হানফিগণ বলেন, বিক্রয়ের আদান প্রদানকে ভ্রম অসিদ্ধ করে। বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার অভিপ্রায় এবং সম্মতি উভয়েরই প্রয়োজন। ভ্রমবশত যে বিক্রয় চুক্তি হয়, তাহাতে সম্মতি

www.pathagar.com

থাকে না। সেই কারণেই এই আদান প্রদান অসিদ্ধ। হানাফিগণ মনে করেন যে, সম্মতি মনের ব্যাপার হইলেও মুখে উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য শাফিঈদের অভিমতই অধিক যুক্তিসম্মত।

পানোন্মত্ততা

পানোন্মত্তাবস্থায় মানুষ তাহার বিচার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। সে আসমান ও জমিনের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। মানুষের আইনভিত্তিক যোগ্যতার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বুঝিবার জন্য আইন তাহার পানোন্মত্ততার কারণ অনুসন্ধান করে। পানীয়ের অভাবে তৃষ্ণায় মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মদ্য পান করিয়া কিংবা স্বাস্হ্য রক্ষার জন্য ঔষধরূপে মদ্য বা অন্য কোন নেশাকর দ্রব্য পান বা আহার করিয়া পানোন্মত্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি যে কাজ করে তাহার আইনগত কোন প্রতিক্রিয়া নাই। তৃষ্ণায় মুমূর্ষ হইয়া পড়িলে কিংবা স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে মদ্য পান বা অন্য নেশাকর দ্রব্য পান করা অসিদ্ধ নহে। সিদ্ধ পানীয় গ্রহণের ফলে যে উন্মত্ততা আসে তাহা মূর্ছা অবস্হার সমতুল্য বলা যাইতে পারে। তাই এই অবস্হায় দান, বিক্রয়,ওয়াক্ফ, তালাক প্রভৃতি যাহাই করা হউক না কেন, তাহার কোন আইনগত প্রতিক্রিয়া নাই। অবশ্য পানোন্মত্তাবস্হায় কাহারও অধিকার নষ্ট করিলে তাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাইতে হকদার হয়।

কিন্তু স্বেচ্ছায় হউক বা জবরদস্তিমূলে হউক নিষিদ্ধ মদ্য বা "খামর' পান করিয়া পানোন্মত্ত হইলে কোন ব্যক্তি তাহার আইনভিত্তিক যোগ্যতা হারায় না। এই ব্যক্তি যে আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-তালাক এবং ধার-কাজ করে তাহার সবগুলি আইনগতভাবে সিদ্ধ। ইহাতে তাহার স্বার্থহানি হইলেও তার কাজ অসিদ্ধ নহে। এই অবস্হায় সে যদি কোন অপরাধ করে তবে সে সেই অপরাধের জন্য দায়ী হইবে। চুরি, ডাকাতি, খুন, জিনা বা মানহানি যাহাই সে করুক না কেন পানোন্মত্ততার অজুহাতে সে রেহাই পাইবে না। আইনের এই নীতির কারণ খুব স্পষ্ট। মানুষ যখন বালেগ হয়, তখন আইন তাহাকে সব অধিকার এবং দায়িত্বের ধারণ এবং বহনের যোগ্যতা দেয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজের ইচ্ছায় নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ বা পান করিয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংশতা ঘটায়, তবে বুদ্ধির অভাবের কারণে তাহাকে কোন দায় বা দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। দ্বীন ইসলাম নেশা করিতে মানুষকে নিষেধ করিয়াছে। সেই নিষেধ অমান্য

www.pathagar.com

করিয়া নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া অপরাধ কারিয়া উন্মত্ততার কারণে রেহাই পাওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। এমন কি আল্লাহ্ তায়ালা পানোন্মত্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানহীন মনে করেন না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—"হে মুসলিম তোমরা যখন পানোন্মত্ত তখন নামাযের কাছে যাইও না।" কোন কাফির যদি পানোন্মত্ত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহাকে মুসলিম গণ্য করা হইবে। পানোন্মত্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি ভুল করিয়া কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাহাকে ধর্মদ্রোহী বলা যাইবে না।

পানোন্মত্তাবস্থায় স্বীকৃতি কার্যকর কিনা এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যে স্বীকৃতি প্রত্যাহারযোগ্য সেই স্বীকৃতি সাধারণত গ্রাহ্য নয়। জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পর যদি ঐ ব্যক্তি তাহার স্বীকৃতি মানিয়া লয় তবেই উহা গ্রাহ্য হয়। কিন্তু যে স্বীকৃতি প্রত্যাহারযোগ্য নয় সে স্বীকৃতি সিদ্ধ এবং কার্যকর তবে ঐ স্বীকৃতির কারণে ঐ ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হইলে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত থাকে।

উপহাস ঃ উপহাসকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় হজল বলে। প্রত্যেকটি শব্দের বা বাক্যের বা অভিব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কোন ব্যক্তি যখন কোন শব্দ, বাক্য বা অভিব্যক্তি উচ্চারণ করে কিন্তু ইহা চাহে না যে সেই শব্দের বা বাক্যের বা অভিব্যক্তির দ্বারা উহার যথার্থ অর্থ বাহিত হউক সেই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঐ ব্যক্তি যাহা উচ্চরণ করিয়াছে তাহা উপহাস, সত্য নয়। শব্দের দ্বারা যাহা বাহিত হয়—তাহা যদি কোন ব্যক্তি বুঝাইতে না চাহে তবে সেই ব্যক্তি উপহাস করে। শব্দের যে অর্থ তাহা আরোপ না করিয়া যে ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করে সে ব্যক্তি উপহাস করে। যে ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির অভিপ্রায় যদি অনুমানের বিষয় হয় তবে শব্দকে উহার স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করিতে হয়। আইন মানুষের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিতে যায় না। যাহা ব্যক্ত আইন তাহাই মানিয়া লয়। সুতরাং মানুষের গোপন অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিবার দায়িত্ব আইন গ্রহণ করে না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে। যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবগ কোন আদান-প্রদানের পূর্বে এইরূপ অভিপ্রায় ঘোষণা করে যে, তাহারা যাহা বলিবে তাহা স্বাভাবিক অর্থ বহন না করিয়া অন্য অর্থ বহন করিবে তবে সে ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহৃত শব্দ আইনের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অর্থ ধারণ করিবে না। দুই ব্যক্তি যদি চুক্তি করে যে তাহারা যে অর্থে একটি আদান-প্রদানের দলিলে শব্দ ব্যবহার

www.pathagar.com

করিবে সেই অর্থ স্বাভাবিক নয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ চুক্তিতে শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহীত হইবে না। দুই ব্যক্তি যদি এমন সিদ্ধান্তে একমত হয় যে, তাহারা সব আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিয়া একটি চুক্তি করিবে কিন্তু ঐ চুক্তি কার্যকরী হইবে না, তবে সে চুক্তি কার্যকর হয় না। প্রকাশ্য চুক্তির পূর্বে গোপন চুক্তি থাকিতে পারে এবং সেই গোপন চুক্তি আইনে অগ্রাহ্য নয়। কোন প্রকাশ্য চুক্তির পশ্চাতে ঐকমত্যভিত্তিক গোপন চুক্তি থাকিলে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রকাশ্য চুক্তি পক্ষবৃন্দের অভিপ্রায় অনুযায়ী হয় নাই কিংবা ঐ চুক্তির প্রতিফলে তাহারা সম্মত হয় নাই।

আইনের এই নীতি মনে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রথম ভাগে আসে বিক্রয়, লিজ, হিবা, ওয়াক্ফ, বিবাহ, তালাক প্রভৃতি। ইহার মধ্যে বিক্রয়, লিজ এবং হিবা রদযোগ্য কিন্তু বিবাহ এবং তালাক রদযোগ্য নয়। উদাহরণ দ্বারা ইহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে। জাহেদ তাহার একখানি জমি কবিরের বরাবরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে কবির উহা লইতে সম্মত হইল। কিছুদিন যাইবার পর জাহেদ এবং কবির একমত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, জমিখানি সম্পর্কে সাফ কবলা বা বিক্রয় দলিল করা হইবে কিন্তু উহা বন্ধকী দলিলরূপে গৃহীত হইবে। এইভাবে সাফ কবলা হইয়া গেল এবং তাহার পর জাহেদ এবং কবির সিদ্ধান্ত করিল যে, ঐ গোপন চুক্তি কার্যকরী করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই এবং দলিলে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই কার্যকরী হইবে। এমতাবস্থায় সাফ কবলাখানি বিক্রয় দলিলরূপে গণ্য হইবে। কিন্তু জাহেদ এবং কবির যদি তাহাদের পূর্বের চুক্তিকে কার্যকর রাখিতে চায় তবে কবির বা জাহেদ যে কোন একজনের উদ্যোগে সাফ কবলাখানি বন্ধকী দলিলরূপে গৃহীত হইবে। প্রকাশ্য দলিলের পূর্বে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই ঐকমত্য সম্পর্কে জাহেদ এবং কবির বলিতে পারে যে সাফ কবলাখানি যখন সম্পাদিত হইয়াছিল তখন তাহারা পূর্ব ঐকমত্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল কিংবা দলিল হইবার পর তাহারা ঐ পূর্ব চুক্তি বহাল রাখিতে চাহে না, সেই ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতে সাফ কবলাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পূর্বের ঐকমত্যকে অকার্যকর গণ্য করিতে হইবে। সাফ কবলা সম্পন্ন হইবার পর যদি কবির বলে যে, সাফ কবলার পশ্চাতে গোপন চুক্তি কার্যকর আছে এবং জাহেদ যদি বলে যে ঐ গোপন চুক্তি

www.pathagar.com

অকার্যকর হইয়া গিয়াছে সে ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানিফার মতে বিক্রয় চুক্তিকে আইনগ্রাহ্য গণ্য করিতে হইবে। ইমাম আবু হানিফার শিষ্যদ্বয় সাফ কবলাকে আইনগ্রাহ্য মনে করেন না। তাহারা বলেন, কোন চুক্তিকে বিচার করিতে হইলে অভিপ্রায় দেখিতে হয়। এই ক্ষেত্রে কবির এবং জাহেদের অভিপ্রায় ছিল বন্ধক দেওয়া, বিক্রয় করা নয়। সুতরাং এই আদান-প্রদানকে বিক্রয় গণ্য করা অনুচিত। পরবর্তীকালে পক্ষবৃন্দ অস্বীকার করিলেও এই আদান-প্রদানকে বিক্রয় বলা যুক্তিসংগত নহে। তবে উভয় পক্ষ যদি এক-মত হইয়া বলে যে, তাহারা বন্ধকের চুক্তি আর কার্যকরী করিতে চাহেন না তবে এই আদান প্রদানকে বিক্রয় গণ্য করা যায়। এই চুক্তিতে মূল্যের ক্ষেত্রে দলিলে যাহা লিখিত থাকে তাহাই গ্রাহ্য হয়।

এমন অনেক চুক্তি আছে যাহা রদযোগ্য নহে। ইহার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে অন্য কথা। তালাক প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তির কোন আইনগত মূল্য নাই। যে বিশেষ শব্দাবলী উচ্চারণ করিলে তালাক হইয়া যায়, সেই বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিলে তালাক কার্যকরী হইবে। ইহা কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রকৃতি ধারণ করে। যেরূপ কাজ করিবে সেইরূপ ফল পাইবে, ইহাই কার্যকারণ নীতির মূল কথা। যে ব্যক্তি তালাকের শব্দাবলী উচ্চারণ করে সে ব্যক্তি একটি কার্য করে। এবং যেহেতু সে কার্য করে সেহেতু সে প্রতিফল পাইবেই। ধরিয়া লইতে হয় যে, কার্যের ফলের উপর তাহার সম্মতি ছিল। তাহার কার্যে যে প্রতি-ক্রিয়া হইবে সেই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাহার সম্মতি না থাকিতে পারে। পূর্বে কোন চুক্তি থাকিলে সেই চুক্তি ইহাই প্রমাণ করে যে, তাহার কাজের প্রতিক্রিয়ায় সে সম্মত ছিল না। কিন্তু অসম্মতিতে তাহার কাজের আইন-ভিত্তিক কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। তালাকের জন্য আনুষ্ঠানিক শব্দাবলী উচ্চারণের সাথে সাথে উহা কার্যকরী হইয়া যায় এবং উহা আর রদযোগ্য থাকে না। তালাক উচ্চারণ করিবার পূর্বে উহা রদ করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও উহা রদযোগ্য হয় না। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, বিবাহ এবং তালাক এবং কসমে মানুষ যাহা বলিবে তাহাই কার্যকরী হইবে, অক-পটভাবে হউক বা উপহাস ছলে হউক ইহাতে কেন তারতম্য হইবে না।

এই সমস্ত আদান-প্রদানের সহিত যদি সম্পত্তির যোগ থাকে তবে সাধারণভাবে প্রকাশ্য চুক্তির পশ্চাদস্থিত পূর্বচুক্তি অগ্রাহ্য হইবে। বিবাহের সময় মোটেই দেনমোহর দেওয়া হইবে না এইরূপ পূর্বচুক্তি অগ্রাহ্য হইবে।

www.pathagar.com

কিন্তু দেনমোহরের পরিমাণ সম্পর্কে পূর্বচুক্তি থাকিলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই পূর্বচুক্তি যদি পক্ষবৃন্দ অস্বীকার করে তবে প্রকাশ্য চুক্তি কার্যকর হয়। ইকরামের সহিত রমিসার বিবাহ হইল। এই বিবাহে দুই হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য হইল। কিন্তু বিবাহের পূর্বে তাহারা একমত হইয়াছিল যে দেনমোহরের পরিমাণ এক হাজার টাকা হইবে। বিবাহের পর তাহারা উভয়েই বলিল যে, বিবাহের সময় তাহারা তাহাদের পূর্বচুক্তিকে আমলে আনে নাই কিংবা তাহারা তাহাদের পূর্বচুক্তিতে কি পরিমাণ টাকা দেনমোহর নির্ধারিত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে তবে শিষ্য মুহাম্মদ বর্ণিত ইমাম আবু হানিফার মতে দেনমোহর হইবে এক হাজার টাকা এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে হইবে দুই হাজার টাকা। গোপন পূর্বচুক্তির সময় দেনমোহরের পরিমাণে ভিন্নমত দেখা দিলে চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া যথাযথ দেনমোহর নির্ধারিত করিতে হইবে।

যে ক্ষেত্রে চুক্তির বিনিময় পণ থাকে, সে ক্ষেত্রে পূর্বচুক্তি মূল্যবান হইয়া পড়ে এবং সেই প্রকার চুক্তি সাধারণত রদযোগ্য হয় না। বিবাহের পূর্বে দবির তাহার ভাবী-স্ত্রীর নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া তাহার সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইল যে, স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পাইবে। তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বে দবির এবং তাহার ভাবী স্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা কার্যকরী হইবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ খুনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ লইয়া যদি তাহাদের প্রতিশোধের অধিকার ছাড়িয়া দেয় তবে প্রতিশোধের সময় উপস্থিত হইলে এই পূর্বচুক্তি কার্যকরী গণ্য হইবে। পরবর্তীকালে তাহারা এই পূর্বচুক্তি প্রত্যাহার করিলে কিংবা এই পূর্বচুক্তির শর্ত সম্পর্কে ভিন্নমত হইলেও এই চুক্তির কার্যকারিতা নষ্ট হইবে না। অগ্র-ক্রয়ের অধিকারী বা শাফি তাহার দাবী বা তলব উপহাস স্থলে করিলে সেই দাবী কার্যকর হইবে না। কোন মহাজন যদি তাহার খাতককে মুক্তি দেয় কিন্তু সেই মুক্তির পশ্চাতে ইহার অকার্যকরতার গোপন ঐকমত্য থাকে, তবে এই মুক্তি কার্যকর হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগে আসে আখবারাত বা স্বীকৃতি ও প্রমাণ। উপহাসস্থলে কোন স্বীকৃতি প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে।

তৃতীয় ভাগে পড়ে ইতিকাদাত বা বিশ্বাসের বিষয়। কুফরী অর্থবাহক শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ব্যক্তি উহা করে সেই ব্যক্তি কুফরীর অপরাধে অপরাধী হয়। কুফরীর অভিপ্রায় না করিয়াও কুফরীর শব্দ উচ্চারণ করিলে

www.pathagar.com

অপরাধ হয়। উপহাসছলেও ইসলামের অবমাননাকর কোন কিছু আইন-সিদ্ধ নহে। ইহাতে ইসলামের উপর মানুষ শ্রদ্ধা হারায়। যাহা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করে তাহা কুফরীর শামিল গণ্য হয়। কুফরী শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না; উহার প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোন কাফির যদি ঈমান দ্যোতক কোন বাক্য উচচারণ করে, তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। বিনা অভিপ্রায়েও এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে ঐ একই প্রতিক্রিয়া হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মুসলিম বলিয়া গণ্য হয়। কলেমা উচ্চারিত হইবার সাথে সাথেই উহার প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া যায়। ইসলাম যাহাতে বুলন্দ হয়, আইন তাহাতে সমর্থন দেয়।

বল প্রয়োগ: বল প্রয়োগ বিবেচনা করিতে হইলে উহা তিনদিক হইতে দেখিতে হয়। বল প্রয়োগের কারণে বাধ্য হইয়া যে কাজ করা হয় তাহা কি সিদ্ধ বা কার্যকর? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। যে ব্যক্তি বল প্রয়োগ করিয়াছে সেই ব্যক্তি আহত ব্যক্তির নিকট কতদূর দায়ী? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। যাহার উপর বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে এবং যে তৃতীয় ব্যক্তি কোনভাবে আহত হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বল প্রয়োগকারীর দায়িত্ব কতদূর? ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন।

বল প্রয়োগ মানুষের স্বাধীনতাকে আহত করে। আরব পণ্ডিতগণের মতে ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যে বল প্রয়োগ দ্বারা লক্ষিত ব্যক্তির জীবন বা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাশের আশংকা থাকে সেই বল প্রয়োগকে বাধ্যকর চাপদায়ক বল প্রয়োগ মালজিউন (ملجى) বলা হয়। যে বল প্রয়োগ বন্দিতে কারারুদ্ধ করা বা আটক করা বা প্রহার করার আশংকা করা হয় তাহাকে চাপহীন বল প্রয়োগ বা গাইরু মালজিউন (غير ملجى) বলে। উভয় প্রকার বল প্রয়োগ লক্ষিত ব্যক্তির সম্মত হইবার ক্ষমতা নষ্ট করে। প্রথম প্রকার বল প্রয়োগ তাহার অভিপ্রায় বা এখতিয়ারকেও নষ্ট করে। আইন ভঙ্গ করিবার জন্য কেহ যদি বল প্রয়োগ করে তবে সেই বল প্রয়োগের মাত্রা দেখিয়া বিষয়টি বিবেচনা করিতে হয়। বল প্রয়োগের দ্বারা যদি জীবন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাশের আশঙ্কা না থাকে তবে ঐরূপ অবস্থায় আইন ভঙ্গ করিলে বল প্রয়োগের অজুহাত টেকে না। বল প্রয়োগ দ্বারা অতি গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে তজ্জন্য কোন ব্যক্তি আইন ভঙ্গের অধিকার পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে কাজ সে করিয়াছে তাহা সে ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে বা সন্তুষ্টির সহিত করিয়াছে এমন ধরিয়া লওয়া যায় না।

www.pathagar.com

কাজের প্রকৃতি দিয়াও বাধ্যতামূলক কাজের প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করা যায়। জীবন রক্ষার জন্য মদ খাইলে কিংবা রোযা ভাঙিলে কোন গোনাহ্ হয় না।

হানাফিদের মতে বলে প্রয়োগ মানুষের এখতিয়ার বা অভিপ্রায়কে নষ্ট করে না। যাহার উপর বল প্রয়োগ করা হয় তাহার সম্মুখে দুইটি পথ খোলা থাকে। প্রথমটি হইতেছে যুলুম সহ্য করা আর দ্বিতীয়টি হইতেছে অনভিপ্রেত কাজ না করা। অবশ্য বল প্রয়োগ মানুষের অভিপ্রায়কে দূষিত করে এবং সম্মতিকে নষ্ট করে।

অনেক চুক্তি আছে যাহা সিদ্ধ হইবার জন্য সম্মতির উপর নির্ভরশীল হয়। দান বা বিক্রয় বা লীজ বা স্বীকৃতি বা দাবী-ত্যাগ সম্মতি ছাড়া হয় না। যুলুমের ভয়ে এইসব চুক্তি করা হইলে তাহা দূষিত গণ্য হয়। কিন্তু এই দূষিত চুক্তি পরে সমর্থন দ্বারা ত্রুটিমুক্ত করা যায়। কিন্তু যে সমস্ত কাজ প্রত্যাহারযোগ্য নয়, বাধ্য হইয়া করিলেও সেই সমস্ত কাজ কার্য করীহয়। তালাক ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে সম্মতির অভাব ও ইহার কার্যকারিতা নষ্ট করে না।

কিন্তু বিখ্যাত গ্রন্থ তৌদিহ প্রণেতা বলেন, উপহাসছলে তালাক উচ্চারণ করিলে উহা অভিপ্রায়মূলক এবং সম্মতিমূলক বলা যায়। কিন্তু বাধ্য হইয়া তালাক উচ্চারণ করিলে উহা অভিপ্রায়মূলক বলা যায় না। সুতরাং ঐ তালাক গ্রহণযোগ্য নয়।

দবির তাহার বালেগা স্ত্রীকে বলিল, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দিবে এবং আমি তোমাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিব। বল প্রয়োগের ভয়ে দবিরের স্ত্রী উহাতে সম্মত হইল। দবিরের স্ত্রী এই ক্ষমতাবলে তালাক দিল। এই তালাক কার্যকরী হইবে কিন্তু দবিরের স্ত্রী এক হাজার টাকা দিতে বাধ্য হইবে না। আকবর বশিরকে তাহার (বশিরের) জমি জাহেদের নিকট বিক্রয় করিতে এবং দখলার্পণ করিতে বাধ্য করিলে এই ক্ষেত্রে আকবর দখলার্পণ করিয়াছে ইহা ধরা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে বিক্রয় রদ হইয়া যাইবে কিন্তু ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্ন আসিবে না।

শাফিঈদের মতে ন্যায় কাজের জন্য যুলুম প্রয়োগ করা হইয়াছে কিনা তাহার নিরিখে যুলুমের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিতে হয়। অমুসলিম দেশের কোন অমুসলিম যদি যুলুমের ভয়ে ভীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে তবে সেই ধর্মান্তর সিদ্ধ গণ্য হইবে কিন্তু মুসলিম দেশের অমুসলিম যদি যুলুমের ভয়ে

www.pathagar.com

ভীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহা সিদ্ধ হইবে না। ইসলামে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের মত থাকিতে দাও। কোন দেউলিয়া ব্যক্তিকে তাহার দেনা শোধ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইলে সেই আদেশের ভয়ে বিক্রয় সিদ্ধ গণ্য হইবে। ভাল কাজের জন্য যুলুম অসিদ্ধ নহে।

ভাল কাজের জন্য না হইলে বলপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া কাজের অনুপাতে নির্ণীত হয়। কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যাহা বাধ্য হইয়া করিলে যে ব্যক্তি উহা করে সে মুক্তি পাইবে তবে সেই কাজ করিলে তাহার কোন আইনগত প্রতিক্রিয়া হয় না। কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে উহাকে বল প্রয়োগের কাজ বলিয়া গণ্য করা যায় তবে ঐ কাজের জন্য বল প্রয়োগকারী দায়ী হইবে। এই কাজের জন্য যে ব্যক্তি কাজ করিয়াছে সেই ব্যক্তি দায়ী হইবে না। আকবর বলিল, বশির, তুমি নঈমের খড়ের ঘর পোড়াইয়া দাও নতুবা আমি তোমাকে খুন করিব। মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া বশির নঈমের ঘর পোড়াইয়া দিল। ঘর পোড়াইবার জন্য আইন আকবরকে দায়ী করিবে। কিন্তু যে কাজের জন্য বল প্রয়োগকারীকে দায়ী করা যায় না, সেই কাজের কোন আইনভিত্তিক কার্যকারিতা থাকে না। স্বীকৃতি এই প্রকার কাজ। এই কারণেই শাফিঈদের মতে বাধ্য হইয়া তালাক দিলে বা দোষ স্বীকার করিলে তাহা কার্যকর হয় না। কিন্তু যুলুমের ভয়ে খুন করিলে খুনী ঐ খুনের জন্য দায়ী হয়।

প্রতারণা

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ আইনতত্ত্ব আলোচনাকালে প্রতারণা শিরোনামে তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন নাই। যে সব কাজ প্রতারণার আওতায় পড়ে সেই সমস্ত কাজ সম্পর্কে তাহারা আলোচনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের এইরূপ কাজের তালিকা সম্পূর্ণ নহে। প্রতারণা মানুষের অভিপ্রায় বা সম্মতিকে প্রভাবিত করে না। প্রতারণা মানুষের বিচার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সেই কারণে প্রভাবিত হইয়া তালাক দিলে সেই তালাক বৈধ। বিক্রয় বা লিজের ক্ষেত্রে প্রতারণার উপাদান থাকিলে ঐ প্রকার চুক্তি প্রতারিত পক্ষের উদযোগে রদযোগ্য হয়।

আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা

আইন ব্যাখ্যা করাকে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত আইন ব্যাখ্যা করে সে অশেষ সওয়াব বা পার-

www.pathagar.com

লৌকিক পুরস্কারের অধিকারী হয়। যিনি আইন ব্যাখ্যা করেন তিনি হাকীম বা বিচারক। তাঁহার আদেশকে তাই বিচারভিত্তিক কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়। যে বিচারক বা আইনতত্ত্ববিদ আইন ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া আল কুরআনের কোন আয়াত, কোন বিখ্যাত হাদীস বা ইজমার বিরুদ্ধে রায় দেন, তিনি ক্ষমার যোগ্য নন। অন্য কথায় কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে দাবী প্রতি-ষ্ঠার জন্য আল কুরআন দুইজন সাক্ষীর প্রমাণ দাবী করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বাদীর হলফ এবং একজন সাক্ষীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক যদি ডিক্রি দেন তবে তাহা কার্যকরী নহে। এক ব্যক্তি খুন হইল; সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চাশবার হলফ লইয়া বলিল যে, আসামী ঐ ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক আসামীকে রক্তমূল্য দিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ কার্যকরী নয়। কারণ রসূলুল্লাহের এক বিখ্যাত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার ফরিয়াদীর উপর ন্যাস্ত এবং আসামীকেই হলফ হেওয়া উচিৎ ছিল।

কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে কোন আইন বা নীতির উল্লেখ আল কুরআন বা হাদীসে বা ইজমায় পাওয়া যায় না; সেই সমস্ত বিষয়ে কাজী তাহার নিজস্ব অভিমতের উপর ভিত্তি করিয়া রায় বা ডিক্রি দিতে পারেন এবং সেই ডিক্রি বা রায় কার্যকর হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারক আইনে অজ্ঞ থাকিলেও তাহার রায় বা ডিক্রি গ্রাহ্যতা হারায় না। যে বিষয় সম্পর্কে আল কুরআন, আল-হাদীস এবং ইজমা নীরব সে বিষয়ের উপর কোন সিদ্ধান্তকে একেবারে অভ্রান্ত বলা যায় না। সেই কারণে বিচারকের মতকেই গ্রহণ করিতে হয়।

এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আইন সম্পর্কে নিদারুণ অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এক ব্যক্তি দুইজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া নিহত হইল। সেই দুইজনের একজন খুনী ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিল। অন্য ব্যক্তি মাফ করিয়া দিল না। এমতাবস্থায় কোন কোন আইনতত্ত্ববিদের মতে দ্বিতীয় ব্যক্তি রক্ত-মূল্য পাইতে পারে। অন্য আইনতত্ত্ববিদগণের মতে কেহই রক্তমূল্য পাইবে না। এখানে আইনের অবস্হা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত অবস্থায় বিচারক রক্তমূল্যের ডিক্রি দিবেন না। আইনের সূত্র সম্পর্কে অনিশ্চিতি থাকিলে ক্ষেত্র-বিশেষে আসামী সেই অনিশ্চিতির ফায়দা পায়। অমুসলিম দেশের একজন কাফির ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম দেশে আসিল এবং ইসলামী বিধান না জানিয়া মদ খাইল। ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম

www.pathagar.com

মদ্যপায়ীকে শাস্তি দেয়ঃ কিন্তু এই ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে নও মুসলিম মদ্যপান করার জন্য শাস্তিযোগ্য হইবে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি মুসলিম রাষ্ট্রে আসিয়া জেনা করিত তবে সে শাস্তি হইতে রেহাই পাইত না। জেনা করা সব ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং জেনার অপরাধজনকতা সম্পর্কে অজ্ঞতা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার দোহাই দিয়া এই ক্ষেত্রে মাফ পাওয়া যায় না।

তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা

উপরে যাহা বলা হইল তাহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়। প্রত্যেক মুসলিম তাহার ধর্মীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান রাখিবে, ইসলাম ইহাই প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশা বহির্ভূত অবস্থা মার্জনীয় নয়। তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম বালিকাকে যদি তাহার পিতা বা পিতামহ ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক বিবাহ দেয়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর সে ঐ বিবাহ অস্বীকার করিতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম বালিকাকে কোন নিম্নশ্রেণীর পুরুষের সহিত বা খুব অল্প দেনমোহরের বিনিময়ে যদি তাহার পিতা বা পিতামহ বিবাহ দেয় তবে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া, কোন কোন আইনতত্ত্ববিদের মতে, সে তাহার বিবাহ রদ করিতে পারে। বিবাহের ঘটনা সম্পর্কে যদি এই বালিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং সেই অজ্ঞতার কারণে বালেগ হইবার পর বিবাহকে অস্বীকার করিতে ব্যর্থ হয় তবে সে পরবর্তী কালে যখন বিবাহের ঘটনা জানিতে পারে তখন ঐ বিবাহকে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ঐ বালিকা বিবাহের ঘটনাজানিত অথচ এই সম্পর্কে তাহার আইনগত অধিকার জানিত না সেই কারণে বালেগ হইবার পর বিবাহ অস্বীকার না করিয়া থাকিলে পরবর্তীকালে সে উহা করিতে পারিবে না। আইনের অজ্ঞতা সাধারণভাবে কোন অজুহাত নয়। শরীফ তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে ইহা জানিতে না পারিয়া যদি অগ্রক্রয়ের অধিকারী কোন ব্যক্তি আইনভিত্তিক দাবী বা তলব করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহার অগ্রক্রয়ের অধিকার নষ্ট হইবে না। মালিক তাহার অধিকার হরণ করিয়াছে এই বিষয়ে অবহিত না হইয়া এজেন্ট যদি তাহার কাজকর্ম যথারীতি চালাইয়া যায় তবে তাহার কাজের জন্য মালিক দায়ী এবং বাধ্য থাকিবে।

www.pathagar.com

বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা ত্রুটি

বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা ত্রুটি মানুষের যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। মানুষ পরিপক্ক বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। অপরিণত অবস্থা হইতে সে পরিণত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। এক দেশে এক এক সময়ে মানুষের বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে। পরিবেশের ভিন্নতার কারণেও মানুষের বুদ্ধির পরিপক্কতা ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত হয়। আইন এইরূপে অনিশ্চিতির উপর কোন সূত্রকে ছাড়িয়া দিতে পারে না, তাই সে একটি বিশেষ বয়সকে বুদ্ধির পরিপক্কতার সময় বলিয়া নির্ধারণ করিয়া দেয়। বয়স সেই পর্যন্ত পৌঁছিলে মানুষকে পরিণত বুদ্ধি মনে করা হয়। এই বয়সের আগে মানুষকে নাবালক (সগির صغير) এবং এই বয়স অতিক্রম হইলে মানুষকে বালেগ বলা হয়। কিন্তু যে নাবালক তাহারও যে বুদ্ধি আছে ইসলামী আইন তাহা অস্বীকার করে। শিশু সম্পর্কে ইসলামী আইন বলে যে, সে বুদ্ধিতে অপরিণত, দৈহিক বুদ্ধিতে অপুষ্ট এবং অভিপ্রায়ের শক্তিতে দুর্বল। বালেগ হইবার পরও কোন কোন মানুষের বুদ্ধি অপরিণত থাকিয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকে জড়বুদ্ধি (মাতু ماتوه বলা) হয়। নির্বোধ এবং বেপরোয়া (সাফিহ-য়) سفيه মানুষকেও যোগ্যতার প্রশ্নে দুর্বল গণ্য করা হয়। রোগের কারণে মানুষ তাহার বুদ্ধি হারাইতে পারে, এরূপ মানুষকে উন্মাদ মাজনুন (مجنون) বলা হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত সেই ব্যক্তিকেও বুদ্ধির এবং যোগ্যতার প্রশ্নে দুর্বল এবং খর্ব গণ্য করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু-ব্যাধি মানুষের দৈহিক এবং মানসিক শক্তি খর্ব করিয়া ফেলে মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সকল যোগ্যতার অবসান হয়।

শিশু

যে শিশু মাতৃগর্ভে জীবন্ত, আইনের চোখে সে একজন ব্যক্তি। এবং যেহেতু সে ব্যক্তি তাই সে আইনভিত্তিক কিছু যোগ্যতার অধিকারী। স্বভাবতই গর্ভস্থ শিশুর জীবন তাহার মায়ের উপর নির্ভরশীল। সেই কারণে তাহার আইনভিত্তিক যোগ্যতা ত্রুটিমুক্ত নহে। গর্ভস্থ শিশু স্বত্বলাভের অধিকার রাখে। সে উত্তরাধিকার পায়। তাহার অধিকার থাকিলেও দায়িত্ব নাই। গর্ভস্থ শিশুর অভিভাবক শিশুর পক্ষে যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তবে তাহার মূল্যের জন্য শিশুর সম্পত্তি দায়ী হইবে না।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু কিছু কিছু দায়িত্বের অধীনে আসিয়া পড়ে। যে দায়িত্ব তাহার পক্ষে প্রতিপালন সম্ভব, আইন তাহাকে সেই দায়িত্ব দেয়।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে যে সমস্ত কাজ এবং আদান-প্রদান নাবালকের উপকারে আসে সেই সমস্ত কাজ এবং আদান-প্রদান শিশুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। যে সমস্ত কাজ এবং আদান-প্রদান শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী সেই সমস্ত কাজ এবং আদান-প্রদান শিশুর পক্ষে গ্রাহ্য নয়। শিশু যদি কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের দ্বারা অপর ব্যক্তির এমন স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় যাহা শিশুর সম্পত্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যায় তবে শিশু তাহার কাজের জন্য দায়ী হইবে। শিশুর অভিভাবক এই প্রকার দায়িত্ব শিশুর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালন করিতে পারেন। যে কাজের জন্য অন্যের ক্ষতি হয়, সে কাজ যখন শিশু করে তখন তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় অবশ্য সেই কারণে শিশুকে অপরাধী বলা যায় না। সুতরাং এই ক্ষতিপূরণ অপরাধের জন্য নয়, ক্ষতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। শিশু তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনকে ন্যায্য মত খরচ দিতে বাধ্য। এই সম্পর্কে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর যে আইন প্রযোজ্য হয়, শিশুর উপরও সেই আইন প্রযোজ্য হয়। দরিদ্র পিতা মাতা এবং স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব আইন ধনবান ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়াছে ; ঐ ব্যক্তি শিশু হইলেও তাহার উপর এই আইন প্রযোজ্য। কিন্তু যে দায়িত্ব শাস্তিমূলক, শিশু সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে বাধ্য নয়। রক্তমূল্য দিবার দায়িত্ব তাহার নাই।

গণ-অধিকার সম্পর্কে শিশুর দায়িত্ব

শিশু নামায, রোযা বা হজ্জ করিতে বাধ্য নয়। যাকাত দিবার দায়িত্বও তাহার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌র হক আদায় করিতে শিশু বাধ্য নহে। আল্লাহ্‌র হক শরীর দিয়া এবং অর্থ দিয়া আদায় করা যায়। কোনভাবে সে ইহা করিতে বাধ্য নয়। যেহেতু সে শিশু, তাই তাহার শারীরিক দায়িত্ব নাই এবং সেই কারণে নামায, রোযা বা হজ্জ তাহার উপর বাধ্য নহে। যেহেতু যাকাত একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব, তাই শিশুকে ইহাও প্রতিপালন করিতে হয় না। হদের শাস্তি তাহার উপর প্রযুক্ত হয় না। রমযানের ফিতরা তাহাকে দিতে হইবে কিনা এ সম্পর্কে দুইটি অভিমত বর্তমান। ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ বলেন যে, ইহা তাহাকে দিতে হইবে কিন্তু মুহাম্মদ বলেন যে, ইহা তাহাকে দিতে হইবে না। তবে সকলের মতে তাহার সম্পত্তির উপর যে কর প্রভৃতি ধার্য আছে তাহা তাহাকে দিতে হয়।

www.pathagar.com

শিশুর কাজের এবং চুক্তির যোগ্যতা

শিশুর যখন বুদ্ধি হয় তখন সে আইনভিত্তিক কাজ করিতে পারে এবং চুক্তিও করিতে পারে ; কিন্তু তাহার এই ক্ষমতা অতি দুর্বল প্রকৃতির। যাহা করিলে তাহার সুবিধা হয় তাহা সে করিতে পারে। অভিভাবকের অনুমতি না লইয়াই সে দান গ্রহণ করিতে পারে। সে যদি কোথাও চাকুরী করিয়া থাকে তবে সে তাহার বেতন আদায় করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। তবে চাকুরী করিবার সময় সে দুর্ঘটনার শিকার হইয়া পরিলে তজ্জন্য তাহার নিয়োগ-কর্তা দায়ী হইবে না। সে তাহার ব্যবসার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারে ; এই নিয়োগের জন্য তাহার অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হয় না কিন্তু এজেন্টদের কাজের জন্য শিশু বাধ্য হয় না। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য শিশু যাহাতে সুযোগ পায় এই কারণে আইন তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্তু যে কাজে তাহার ক্ষতি হয় সেই কাজ নিজে বা অভিভাবকের অনুমতি লইয়া সে করিতে পারে না। সে দান করিতে পারে না, ওয়াকফ করিতে পারে না, টাকা ধার দিতে প্যার না বা তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। সে উইল করিতেও পারে না। যে সমস্ত আদান-প্রদানের মধ্যে লাভ এবং লোকসান উভয়ের সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিপক্কতার নিরিখে শিশুকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। যে শিশুর বুদ্ধি পরিপক্ক, সে তাহার অভিভাবকের অনুমতি লইয়া এই সব আদান-প্রদানে শরীক হইতে পারে। এইভাবে শরীক হইলে ঐ শিশু তাহার কাজের লাভ লোকসানের ফল পাইবে। ইহাতে যদি মোটা লোকসান হইয়া যায় তাহা হইলেও ইমাম আবু হানিফার মতে শিশু তজ্জন্য দায়ী হইবে। আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ অন্য মত পোষণ করেন। নাবালক লোকসান করিয়া তাহার সম্পত্তি তাহার অভিভাবকের নিকট বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সিদ্ধ ; কিন্তু এই মত সহীহ নহে। যে শিশু একেবারে অপরিপক্ক বুদ্ধি, সে চুক্তি করিতে পারে না। চুক্তি করিলে তাহা আইনে গ্রাহ্য হয় না। যে শিশু লাভ এবং লোকসানের পার্থক্য বুঝে না বা ক্রয় ও বিক্রয়ের তফাৎ হৃদয়ঙ্গম করে না সেই শিশুর বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। বুদ্ধির পরিপক্কতা যাচাইয়ের ইহাই একটি উপায়। অভিভাবক ছাড়া নাবালক বিবাহ করিতে পারে না। শাফিঈদের মতে যে নাবালকে। পূর্বে বিবাহ হইয়াছে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিতে পারে।

www.pathagar.com

শিশুর দীন

পিতা মাতা যে ধর্মাবলম্বী শিশুকেও সেই ধর্মাবলম্বী মনে করা হয়। পিতা মাতা ইসলাম ত্যাগ করিলে শিশুও মুসলিম রাষ্ট্রের হিফাযত হারায়। পিতা মাতার যে কোন একজন মুসলিম হইলে বা থাকিলে শিশু মুসলিম থাকিয়া যায়।

ধর্মান্তরের প্রতিক্রিয়া

হানাফীদের মতে বুদ্ধিমান শিশুর ধর্মান্তরিত হইবার অধিকার আছে। এইরূপ কোন বুদ্ধিমান অমুসলিম নাবালক যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে অমুসলিম স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং অমুসলিম আত্মীয়বর্গ হইতে উত্তরাধিকার লাভের অধিকার সে হারায়। ইসলাম গ্রহণের ফলে সে যে পারলৌকিক সম্পদ পায় সে তুলনায় তাহার ইহলৌকিক লোকসান নগণ্য। অধিকন্তু তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবার কারণ তাহার নিজের ইসলাম গ্রহণ নয় বরং তাহার স্ত্রীর কুফরী। কোন নাবালক মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে তবে ইহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রতিক্রিয়া কার্যকরী হইবে; তবে এইজন্য তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাইবে না। বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করিলে এই কারণে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় যে, সে অমুসলিমের পক্ষ লইয়া মুসলিমের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না। নারী-ধর্মত্যাগীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। নাবালক অবস্থায় ধর্মত্যাগ করিয়া বালেগ হইবার পরও সে যদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করে তবুও তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে না। নাবালক অবস্থায় ধর্মত্যাগ আইনগ্রাহ্য কিনা ইহা লইয়া দ্বি-মত আছে এবং যেখানে দ্বিমত আছে সেখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

অমুসলিম নাবালকের স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে ঐ নাবালক বালেগ হইবার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহার স্ত্রীকে ঘরে রাখিতে পারে। ঐ নাবালক যখন বালেগ হয় তখন কাজী তাহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত করিবেন। ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হইলে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে। কাফিরের ঘরে কোন মুসলিম মহিলার পক্ষে স্ত্রীরূপে বাস করা খুবই কঠিন।

বালেগ হইবার পুরুষের নিম্নতম বয়স বারো এবং নারীর নয়। উভয়ের উর্ধ্বতম বয়স পঞ্চদশ।

www.pathagar.com

উন্মাদ

যে ব্যক্তি উন্মাদ, আইনের চোখে সে অপরিণত-বুদ্ধি শিশুর সমান। তবে উন্মাদ ব্যক্তি যে সময় সুস্থ থাকে সে সময় তাহার কাজ আইনসিদ্ধ গণ্য হয়। অমুসলিম পাগলের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করিলে পাগলেও অভিভাবককে তাহার পক্ষে ইসলাম গ্রহণে দাওয়াত দেওয়া হবে। এই দাওয়াত গৃহীত না হইলে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে। পাগলের পিতা-মাতা যদি তাহাকে মুসলিম রাষ্ট্রে ফেলিয়া যায় তবে তাহাকে মুসলিম গণ্য করা হইবে।

জড়বুদ্ধি

যে ব্যক্তি কখনো বুদ্ধিমানের মত এবং কখনো পাগলের মত কথা বলে এবং তাহার কথার মধ্যে সমাঞ্জস্য থাকে না তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি-প্রাপ্ত নাবালকের যে যোগ্যতা, জড়বুদ্ধিরও সেই যোগ্যতা। অমুসলিম জড়-বুদ্ধির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করিলে পাগল সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহার সম্পর্কেও সেই ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। এই ক্ষেত্রে সে শিশুর উপর প্রযোজ্য আইন দ্বারা শাসিত হইবে না।

দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি

একেবারে জড়বুদ্ধি না হইয়া বুদ্ধির দৌর্বল্যের কারণে মানুষ মূর্খ হইতে পারে। সাধারণ যুক্তি বা কাণ্ডজ্ঞান যাহা নির্দেশ করে, মূর্খের কাজে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। মূর্খ ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে যত্ন এবং সাবধানতার প্রয়োজন তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে না। যথেষ্ট ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে অপব্যয় করিয়া সে তাহার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে জড়বস্তু নয় তাই সে আইনভিত্তিক যোগ্যতা হারায় না। আল কুরআন নির্দেশ দিয়াছে যে, বালেগ হইবার পরও কোন ব্যক্তিকে বুদ্ধিতে অপরিপক্ক দেখা গেলে সেই ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার হস্তে প্রদান করা উচিত হইবে না। সেই অবস্থায় যতদিন পর্যন্ত না তাহার বুদ্ধি পরিণত হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহার সম্পত্তি তাহাকে না দেওয়াই বিধেয়। তাহার বয়স পাঁচিশ বৎসর হইলে তাহাকে পরিণত বুদ্ধি ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু পঁচিশ বৎসরের পরেও যদি তাহাকে অপরিণত বুদ্ধি দেখা যায় তবে তাহাকে কাজীর সাধারণ তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত। তাহার নিজের স্বার্থ এবং জনস্বার্থ রক্ষার জন্য চুক্তি এবং ক্রয়

www.pathagar.com

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের প্রয়োজন। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে এইরূপ অবস্থায় অভিভাবকত্ব আইনানুগ কিন্তু আবশ্যক নহে। সকল ইমাম অবশ্য এক ব্যাপারে ঐকমত্য যে যাহার বয়স পঁচিশের উর্ধে সে যদি অপরিণত বুদ্ধির হয় তবে কাজী আদেশ দিয়া তাহাকে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বিলি বন্দোবস্ত করিতে নিষেধ করিতে পারেন। নিষেধ না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা অটুট থাকে। এই ঐকমত্যের একটি ব্যতিক্রম আছে এবং সেই ব্যতিক্রম মত হইতেছে ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শিষ্য মুহাম্মদের। মুহাম্মদের মতে দুর্বল-বুদ্ধি ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় অকার্যকর।

দেউলিয়া (মুফলিস مفلس)

যে ব্যক্তির সম্পদের তুলনায় দেনা বেশী কিংবা যাহার সম্পদ ও দেনা এক সমান, সেই ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলে। দেউলিয়ার মহাজনগণের আবেদনে কাজী নিষেধাজ্ঞা দিয়া দেউলিয়ার সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার হরণ করিতে পারেন। ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনের দেনা শোধ করিবার আদেশও কাজী দিতে পারেন। দেউলিয়া না হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তি মহাজনকে ঠকাইবার জন্য বেনামা করিয়া রাখিবার উদ্যোগ করে বা অন্য প্রকার প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় করিয়া রাখিবার উদ্যোগ করে তবে তাহার এই সমস্ত আদান-প্রদানের উপর কাযী নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারেন।

অযোগ্য বৃত্তিধারী ব্যক্তি

যাহারা বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত হইতে চাহেন তাহারা যদি সেই বৃত্তি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও পরিমিত যোগ্যতা অর্জন করেন তবেই তাহারা সেই বৃত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ বৃত্তিতে যোগদান করিবার অধিকার দেওয়া যায় না। যিনি ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই তাহাকে ডাক্তারী করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ইসলামী আইন অযোগ্য ব্যক্তিকে এইরূপ কাজে নিয়োজিত হইবার পথে বাধা দিবার অধিকার রাষ্ট্রকে অর্পণ করিয়াছে।

দাসত্ব

দাসত্ব একটি অযোগ্যতা। আইন এই অযোগ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। আদিতে আইনদাতার অধিকারকে অস্বীকৃতির শাস্তিস্বরূপ দাসত্ব বন্ধন

১৩—

www.pathagar.com

সৃষ্টি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি আইনের ভাষায় অস্বীকারকারী বা কাফির। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌-তায়ালার আইনের অনুগত হইতে অস্বীকার করে সে ব্যক্তিও অস্বীকারকারী। আর যে ব্যক্তি অস্বীকারকারী সে ব্যক্তি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি সাধারণ সবল সুস্থ মানুষের মত সর্ব ব্যাপারে যোগ্যতা রাখে না। তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। সেই ব্যবস্থাই হইতেছে দাসত্ব। যে ব্যক্তি সর্বত্রুটিমুক্ত স্রষ্টার সার্বিক অধিকারকে অস্বীকার করে, সে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের সহস্র প্রমাণকেও অস্বীকার করে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু প্রমাণ নির্ভুলভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও শক্তিমত্তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে; এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাহাকে অস্বীকার করে সে নিজেকে নিম্নস্তরের জীবে নামাইয়া লয়। আর যে নিম্নস্তরের জীব, সে সম্পূর্ণভাবে নিজের মালিক নয়। আইন সেই ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যের অধীন করিয়াছে। এই কারণে যে মুসলমান আযাদ, সে কোনদিন দাস হইতে পারে না। কিন্তু যে অমুসলিম দাস সে মুসলিম হইলেও দাস থাকিয়া যাইতে পারে। দাস সৃষ্টি করিবার অধিকার গণ-অধিকাররূপে গণ্য কিন্তু দাস মালিকের সম্পদ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দাসত্ব হইতেছে অজ্ঞানতার শাস্তি, অস্বীকারের প্রতিফল। সুতরাং কোন ব্যক্তি আংশিকভাবে দাস এবং আংশিক-ভাবে মুক্ত হইতে পারে না। এই কারণে যে ব্যক্তির পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত সে যদি স্বীকার করে যে, তাহার অর্ধাংশ দাস, তবে সে পূর্ণদাসরূপে গণ্য হইবে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার দাসকে আংশিকভাবে মুক্ত করিয়া দেয় তবে সেই ব্যক্তি আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদের মতে পূর্ণভাবে মুক্ত হইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে দাসকে আংশিকভাবে মুক্ত করা যায় কিন্তু একজন দাস একাধিক ব্যক্তির সম্পদ হইতে পারে না; ইহা সর্বজন সমর্থিত। দাস প্রথা সম্পর্কে আল কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং সমসাময়িক ইতিহাস অন্য ভাবেও বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং সেই বিশ্লেষণে পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে যুদ্ধবন্দীগণ, চুক্তির বা জন্য পদ্ধতির মাধ্যমে, পরাজিত রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তিত না হইলে তাহারা দাসে পরিণত হইত।

দাসমুক্তি

দাস তাহার মনিবের সম্পদ। সুতরাং মনিব তাহাকে মুক্তি দিতে পারে। বস্তুত ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইসলামী আইন উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশে ভরপুর।

www.pathagar.com

দাসের অধিকার

যেহেতু ক্রীতদাস তাহার মনিবের সম্পদ সেহেতু সে কোন সম্পত্তির অধিকার লাভ করিতে পারে না। হজ্জ করিবার দায়িত্ব তাহার নাই। দাস অবশ্য তাহার মালিকের জন্য সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে এবং মালিকের অনুমতি লইয়া সে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারে।

বিবাহ এবং তালাকের অধিকার

একমাত্র সম্পত্তির অধিকার ছাড়া দাস অন্য কোন প্রকার অযোগ্যতার অধীন নয়। দাস বিবাহ করিতে এবং তালাক দিতে পারে। মনিবের অনুমতি না লইয়া বিবাহ করিলে, স্ত্রী তাহার পাওনা আদায় করিবার জন্য স্বামীকে বিক্রয় করিতে পারে না। মনিবের অনুমতি লইয়া বিবাহ করিলে স্ত্রী তাহার দাস স্বামীকে তাহার পাওনা আদায় করিবার জন্য বিক্রয় করিতে পারে। বিবাহে এবং তালাকে দাসের অধিকার আযাদ মুসলিমের অর্ধাংশ। চারটির পরিবর্তে দাস দুইটি বিবাহ করিতে পারে। তিন তালাকের পরিবর্তে দুই তালাক দিলে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। দাসের স্ত্রীর ইদ্দতকাল দুই তোহর। যে ব্যক্তির আযাদ বিবি আছে সে ব্যক্তিকে দাসী বিবাহ করিতে পারে না। আযাদ মুসলিম কোন দাসীকে বিবাহ করিয়া থাকিলে পরবর্তীকালে আযাদ মহিলাকে বিবাহ করিতে পারে।

ব্যক্তিগত অধিকার

হানাফীদের মতে নিজের শরীর এবং দেহ রক্ষার অধিকার সকল দাসের আছে। এই বিষয়ে সে আযাদ মুসলিমের মতো। সে মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে তাই সে এই অধিকার পায়। কোন ব্যক্তি যদি দাসকে হত্যা করে বা আঘাত করে তাহা হইলে সে শাস্তির যোগ্য হয়। দাস যদি হত্যা, আঘাত বা চুরির অপরাধ স্বীকার করে তবে সে শাস্তির যোগ্য হয়। কিন্তু আযাদ মুসলিম যে শাস্তি পায় দাস তার অর্ধেক শাস্তি পায়।

দাস কোন অবস্থাতেই আযাদ মানুষের মত পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পায় না। সে অভিভাবক, মোতোয়াল্লি বা কাযী হইতে পারে না। সে সাক্ষ্য দিতে পারে না।

www.pathagar.com

অমুসলিম

অমুসলিমের আইনভিত্তিক যোগ্যতা পূর্ণ নহে, আংশিক। যে অমুসলিম সে অজ্ঞ। সেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তির আইনভিত্তিক যোগ্যতা পূর্ণ হইতে পারে না।

ইসলাম কি ?

যে ব্যক্তির ঈমান আছে সেই ব্যক্তি মুসলিম। ঈমান বলিতে আইনের ভাষায় এক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মুহাম্মদের (সঃ) রিসালতের প্রতি বিশ্বাস বুঝায়। এই দুইটির যে কোনটিতে যাহার বিশ্বাস দুর্বল সে ব্যক্তি মুসলিম নহে। অমুসলিমগণকে পাঁচভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আসে স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী দল, ইহারা নাস্তিক বা দাহরিয়াতুন (دهرية); দ্বিতীয় ভাগে আসে মাজুসী (مجوسى) বা সানাবিয়াতুন (ثنوية); ইহারা আল্লাহ্‌তায়ালার একত্বকে অস্বীকার করে এবং দুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তৃতীয় ভাগে আসে দার্শনিকগণ (ফালাসিফাতা فلاسفة)। তাহারা এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রিসালতে বিশ্বাস করে না। চতুর্থ ভাগে আসে মূর্তিপূজকগণ (ওয়াসনিয়াতুন وثنية), ইহারা স্রষ্টার অস্তিত্বে এবং রিসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করে না। পঞ্চম ভাগে আসে সেই দল যাহারা এক আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়তকে স্বীকার করে কিন্তু বল যে, ইসলাম সকলের উপর বাধ্যকর নহে; ইহারা এক বিশেষ শ্রেণীর ঈসায়ী দলভুক্ত (عيسوية)।

মুসলিমদের মযহাব

বিশ্বের মুসলিম বহুভাগ এবং উপভাগে (মযহাবে) বিভক্ত। অবশ্য সকল মযহাবের মুসলিমগণ আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহিদেও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়তে বিশ্বাসী। কিন্তু এই মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও অনেক ব্যাপারে এবং বিষয়ে তাহাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখা যায়। সুন্নীগণ, বিশেষত তাহাদের মধ্যে রক্ষণশীল দল, অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মুসলিমদিগকে মতভ্রষ্ট মনে করেন। কাহাকেও মতভ্রষ্ট বলিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ প্রমাণ করা আবশ্যক, সে আলোচনার স্থান এখানে নাই। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এই ভ্রষ্টতা দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে দূর কল্পনামূলক আর একটি হইতেছে রাজনীতিমূলক। মুতাজিলা মতবাদ এবং দর্শন প্রথম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

ইসলামের আদি যুগে খারিজিগণের ভিত্তি ছিল দ্বিতীয়টি, মূলগতভাবে শিয়াদের উৎপত্তিও রাজনৈতিক।

সুন্নীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে তাহাদের মতবাদ হইতে যাহারা যতবেশী দূরে, তাহারা ততবেশী মতভ্রষ্ট। আল্লাহ্তায়ালার সিফাত ও তকদীরের প্রশ্নে মুতাযিলাগণ সুন্নীদের মতবাদ হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। এই কারণে কখনো কখনো সুন্নীগণ মুতাযিলাগণকে প্রায় কাফির আখ্যা দিয়া ফেলেন। অনেক মুসলিম লেখক খুব অল্প কারণেই অন্যকে কাফির বলিয়াছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ আইনতত্ত্ববিদগণের মতে ধর্মীয় ব্যাপারে মতবিরোধের কারণে সহজে এবং সহসা কাহাকেও কাফির বলা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং প্রামাণ্য হাদীসের দ্ব্যর্থহীন আদেশকে কেহ তুচ্ছ করে, ততক্ষণ তাহাকে কাফির বলা যায় না। ইবনে আবেদীন বলেন যে, মুজতাহিদগণ এমন আলগাভাবে কাহাকেও কাফির বলেন নাই। যাহারা মুজতাহিদ নন তাহারাই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী-গণকে যখন তখন অসংকোচে কাফির বলিয়াছেন। আল-মাজমা গ্রন্থের ভাষ্যকার ইবনে মালিকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইবনে আবেদীন বলেন যে, রাফেদি ও খারেজিগণের সাক্ষ্যগ্রহণীয়। যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় তাহারা কাফির নহেন। রাফেদিগণ হযরত আবুবকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমানের খেলাফতে বিশ্বাস করে না।

বর্তমান মুসলিম বিশ্ব শিয়া এবং সুন্নী এই দুই বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। শিয়া-গণের পৃথক হইবার কারণ মূলত দুইটি। হযরত আবু বকরের (রাঃ) নির্বাচন বৈধ কিনা এবং রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ)বংশধরদের মধ্যে খিলাফত সীমা-বদ্ধ থাকিবে কিনা এই দুই প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে মুসলিম বিশ্ব শিয়া ও সুন্নীতে ভাগ হইয়া যায়। রাজনৈতিক কারণে জন্ম হইলেও পরবর্তী যুগে শিয়া সম্প্রদায় তাহাদের আপন ধর্মশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের আইন-তত্ত্ব সুন্নীদের আইনতত্ত্ব হইতে পৃথক। তাহারা সুন্নী আইনবিদদের মতবাদ মানে না। সুন্নীদের মতে ইজমা আইনের একটি বৃহৎ উৎস। এই ইজমা বা মতৈক্যের উপরই ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলা-ফত প্রতিষ্ঠা হয়। শিয়া সম্প্রদায় ইজমা বা মতৈক্যকে আইনের উৎস বলিয়া স্বীকার করেন না। শিয়াদের মধ্যে কেহ কেহ ইজমাকে স্বীকার করেন কিন্তু ইজমা বলিতে তাহারা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশধরদের মধ্যে মতৈক্য বুঝেন।

www.pathagar.com

সুন্নিগণ চার মযহাবে বিভক্ত এবং এই মযহাবগুলি হইতেছে হানাফী, শাফিঈ, মালেকী এবং হাম্‌বলী। তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ খুব গভীর নহে।

অমুসলিম আইন ও প্রথা

যে সমস্ত অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে সেই সমস্ত অমুসলিমের উপর মুসলিম আইন প্রযুক্ত হয়। তবে এই প্রয়োগ সার্বিক নহে।

যে অমুসলিম প্রজা বা জিম্মি মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে কিন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালার তৌহীদ এবং হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়তকে অস্বীকার করে, সে অজ্ঞ। তাহার অজ্ঞতার জন্য সে রেহাই পায় না। কিন্তু তাহার যে মতবাদ সম্পর্কে ইসলাম কঠোর নহে অথবা তাহার যে মতবাদ সম্পর্কে ইসলামের নীতি নিশ্চিত নহে, তাহার সে মতবাদ লইয়া সে মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করিতে পারে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন, অমুসলিমগণ যাহাতে বিশ্বাস করে তাহাতে তাহাদের থাকিতে দাও। তাহাদের এই সমস্ত মতবাদের কারণে তাহারা শাস্তিযোগ্য হয় না। ইমাম শাফিঈ বলেন, অমুসলিম মদ্যপানের জন্য শাস্তি পায় না। ইমাম আবু হানিফা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলেন যে, অমুসলিম মদের ব্যবসা করিতে পারে এবং তাহার মদের দোকান নষ্ট হইলে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নিষিদ্ধ সম্পর্কের মহিলাকে বিবাহ করিতে পারে এবং মুসলিম রাষ্ট্র সেই বিবাহকে কার্যকর গণ্য করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে তাহার পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কুফরীর আমলে তাহার যৌন বিহারকে ব্যভিচার মনে করা হয় না। আবু ইউসুফ এবং মুহম্মদ, ইমাম আবু হানিফার সাথে এই প্রশ্নে একমত। কিন্তু তাহারা বলেন যে, ঐ স্ত্রী মুসলিম রাষ্ট্রে মামলা করিয়া তাহার স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ আদায় করিতে পারে না। একমাত্র হযরত আদমের সময় ছাড়া নিষিদ্ধ সম্পর্কের নারী পুরুষের বিবাহ আইন সমর্থিত ছিল না। সুতরাং নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিবাহে স্ত্রীর অধিকার বলবৎ করিবার ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্র যদি কোন সাহায্য করে তবে তাহা ঐ প্রথা সমর্থনের শামিল হইবে। ইমাম আবু হানিফা তাহার নিজ মত সমর্থন করিয়া বলেন, অমুসলিমদের মধ্যে নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিবাহ সমর্থন করিলে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারকেও স্বীকার করিতে হয় নতুবা অসহায়া নারী ভরণ-পোষণের অভাবে মরিয়া যাইতে পারে।

www.pathagar.com

অমুসলমানদের যে আইন বা প্রথা মুসলিমদের আইন ও প্রথার সহিত মিলিয়া যায়, সেগুলি কার্যকরী করিতে কোন বাধা নাই। অমুসলিমদের যে আইন বা প্রথা তাহাদের আইনবিরোধী, মুসলিমগণ তাহা গ্রাহ্য করে না। মানুষের অধিকারের পক্ষে যে ইসলামী আইন প্রচলিত, মুসলিম রাষ্ট্র সেই আইন অমুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে। আল্লাহতায়ালার অধিকার সম্পর্কে ইসলামে যে আইন বিদ্যমান, সেদিকে অমুসলিমগণকে আহবান করা যায় কিন্তু সেগুলি পালন না করিলে অমুসলিমগণ রাষ্ট্রের হাতে শাস্তি পায় না।

ধর্মত্যাগী

যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করিয়া কুফরীর মধ্যে প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি ইসলামী আইনের হিফাযতের বাহিরে চলিয়া যায়। তবুও ইসলামী আইন তাহার প্রতি কিছু কিছু উদারতা প্রদর্শন করে। তাহাকে দ্বীন ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিতে আহবান করা হয়। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে তাহার মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তাহা নিরসন করা হয়। অতঃপর তাহাকে দ্বীন ইসলামে ফিরিয়া আসিবার জন্য তিন দিনের সময় দেওয়া হয়। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই মেয়াদের মধ্যে ঐ ধর্মত্যাগীকে যদি কোন মুসলিম হত্যা করে, তবে সেই মুসলিম ঘাতককে অন্যায়কারী মনে করা হইলেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। যে ব্যক্তি আইনের হিফাযতের বাহিরে গিয়াছে, তাহাকে হত্যা করিলে কোন শাস্তি হইবার কথা নয়। ধর্মত্যাগীকে শাস্তিকাল পর্যন্ত তাহার সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখিতে দেওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফার শিষ্য-দ্বয়ের মত ইহাই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে ধর্মত্যাগ করিবামাত্রই তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীদের হাতে চলিয়া যায়। পরবর্তী যামানায় এই বিষয়ে নূতনভাবে আল কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং ইরতিদানের প্রতিফল বিষয়ে নূতন অভিমত প্রদত্ত হইয়াছে। এই অভিমতে বলা হইয়াছে যে ইরতিদাদের সহিত জিহাদের বিরোধিতা যুক্ত হইলেই তবে শাস্তি প্রয়োগের অধিকারের উদ্ভব হইতে পারে, অন্যথায় নয়।

মতভ্রষ্ট ব্যক্তি

যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে মতভ্রষ্ট তাহারা যেহেতু আল্লাহতায়ালার তৌহীদে এবং রসুলের (সঃ) নবুয়তে বিশ্বাস করে তাই ইসলামী আইন তাহাদের

www.pathagar.com

উপর প্রযুক্ত হয়। তাহাদের আইনভিত্তিক যোগ্যতা মতবিরোধের কারণে খর্ব হয় না। কিন্তু ইসলামী আইন তাহাদের উপর কতদূর প্রয়োগ করা যাইবে সেই প্রশ্ন ইমামের শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহারা যদি সার্থক-ভাবে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাহাদের উপর আইন প্রয়োগ করিবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইমাম অবশ্য তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য লড়াই করিতে পারেন।

মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ

যিনি মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত হন তিনি শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আইনভিত্তিক যোগ্যতা একে-বারেই লোপ পায় না। সম্ভব হইলে তাহার জন্য ফরয ইবাদত অবশ্য প্রতিপাল্য হয়। যদি ব্যাধি এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, তাহার ফলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তবে যে সময় ঐ ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে, সেই সময় হইতে তাহার উত্তরাধিকারিগণ ও মহাজনগণ তাহার সম্পর্কে স্বার্থযুক্ত হইয়া পড়েন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ এবং মহাজনগণের স্বার্থ পরিপক্ক হয়।

মৃত্যু ব্যাধি

মৃত্যু ব্যাধি বলিতে কি বুঝায়, তাহা লইয়া এই উপ-মহাদেশের উচ্চ আদালত সমূহে অনেক আলোচনা হইয়াছে। মৃত্যু ব্যাধি হইতেছে একপ্রকার ব্যাধি। যে ব্যাধিতে মৃত্যুর আশংকা প্রবল এবং যাহার ফলে মৃত্যু ঘটিয়া যায় তাহাকেই মৃত্যু ব্যাধি বলে। কিন্তু ব্যাধি যদি দীর্ঘদিনের হয় এবং উহা যদি দিনের পর দিন এমনভাবে না বাড়ে যে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর আশংকা প্রবল হয় এবং অবশেষে ঐ ব্যক্তি যদি ঐ ব্যাধিতে মারা না যায় তবে তাহাকে মৃত্যু ব্যাধি বলা যায় না। সাধারণভাবে আক্রমণের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে মারা গেলে ঐ ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধি বলা হয়। আল-মাজ্জাল্লার সম্পাদকগণ বলেন, যে ব্যাধিতে মৃত্যুর আশংকা প্রবল এবং যে ব্যাধিতে আক্রান্ত পুরুষ তাহার বাড়ীর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে পারে না এবং যে ব্যাধিতে আক্রান্ত নারী তাহার ঘরের কাজ দেখাশুনা করিতে পারে না, সেই ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধি বলে। সম্পাদক মনে করেন যে, এই ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু আক্রমণের তারিখ হইতে এক বৎসরের

www.pathagar.com

মধ্যে মৃত্যু না ঘটিলে ঐ ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধি বলা যায় না। ব্যাধি যদি এমন প্রকৃতির হয় যে উহা সারিয়াও সারে না এবং এইভাবে বৎসর কাল কাটিয়া যায় তবে সেই ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধি বলা যায় না। এইরূপ রোগগ্রস্ত অবস্থায় তিনি যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান করেন তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ গণ্য হয়। কিন্তু তাহার এই পুরাতন ব্যাধি যদি বাড়িয়া যায় এবং পরিশেষে উহাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে রোগ বৃদ্ধির দিন হইতে ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইমাম শাফিঈ এবং হাম্বলী বলেন, যে ব্যাধিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয় তাহাকে মৃত্যু ব্যাধি বলে। মৃত্যুর পর ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধিরূপে চিহ্নিত করা যায়, কি কি ব্যাধিকে মৃত্যুব্যাধি বলা যায় তাহার তালিকা ইমামদ্বয় দিয়াছেন কিন্তু অবশেষে তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র চিকিৎসকগণই মৃত্যু ব্যাধিকে চিহ্নিত করিতে পারেন।

ফাতিমা বিবির কেসে (৩১ কলিকাতা ৩১৯) বলা হইয়াছে যে, মৃত্যু ব্যাধির চিহ্ন কোন বিশেষ প্রকৃতি বহন করে না। এই অভিমত শুদ্ধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যাধি মানুষকে তাহার সাধারণ কাজ-কর্ম করিবার অধিকারকে হরণ করে এবং যে ব্যাধিতে মৃত্যুর আশংকা অতি প্রবল সেই ব্যাধিকেই মৃত্যু ব্যাধি বলে। কুলছুম বিবির কেসে (১০ সি, ডব্লিউ, এন ৪৪৯) বলা হইয়াছে, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় আইন তাহাকেই গ্রহণ করে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আশংকা করে তবে সেই আশংকার ভিত্তিতে ঐ ব্যাধিকে মৃত্যু ব্যাধি বলা যায় না। রোগী যাহাই ভাবুক না কেন, তাহার দ্বারা ব্যাধির প্রকৃতি নির্ণীত হয় না। যে কারণে মৃত্যু ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার আইন খর্ব করিয়াছে সেই কারণ অতি স্পষ্ট। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ শারীরিক এবং মানসিক-ভাবে এমন দুর্বল হইয়া পড়ে যে, ঐ ব্যক্তি তাহার কার্য দ্বারা তাহার পার-লৌকিক স্বার্থ বিনষ্ট করিতে পারে।

মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর তাহার উত্তরাধিকারিগণের এবং মহাজনগণের স্বার্থ বর্তিয়া যায়। মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। মৃত্যু ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উপর, দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবার পর, নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ

www.pathagar.com

করে। মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তাহার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির সম্পর্কে এবং মহাজনদের পাওনা প্রভাবিত করিয়া কোন আদান-প্রদান বা বিক্রয়াদি করিতে পারে না। যে সময় তাহার মৃত্যু ব্যাধি শুরু হয় সেই সময় হইতেই তাহার এই অক্ষমতা কার্যকরী হয়। মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বংশ রক্ষার প্রয়োজনে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু পরিমাণের বাহিরে মোহরানা ধার্য করিবার অধিকার তাহার নাই। মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রয়োজন সেই পর্যন্ত যাইতে পারেন। তাহার বাহিরে নয়।

যে আদান-প্রদান রদযোগ্য, মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সেই সব আদান-প্রদান আহত ব্যক্তির উদ্যোগে রদ করা যায়। তাহার মহাজনগণ এই সময়কালীন আদান-প্রদানকে নাকচ করিতে পারেন। মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি একজন মহাজনকে টাকা দেন কিংবা একজন মহাজনের বা উত্তরধিকারীর নিকট সম্পত্তি বিক্রয় করেন তবে অন্য মহাজনগণ এবং উত্তরাধিকারিগণ এই আদান-প্রদানকে রদ করিতে পারেন সকল। উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি একজন উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি অর্পণ করে, তবে সেই অর্পণ বাতিল হইবে।

মৃত ব্যক্তি

মৃত্যর সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির অধিকার এবং দায়িত্বের উপর যে আইনগত প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা দুইদিক হইতে বিবেচনার যোগ্য। প্রথম দিক হইতেছে পারলৌকিক। মানুষ এই দুনিয়ায় যে ভাল কাজ করিয়াছে তাহার জন্য পুরস্কার এবং যে মন্দ কাজ করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি, মৃত্যুর পরে আত্মিকভাবে পায়। দ্বিতীয় দিক হইতেছে ইহলৌকিক। যে কাজ করিবার দায়িত্ব পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত, মৃতুর পরে স্বাভাবিকভাবে কোন ব্যক্তির সেই দায়িত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং যে ইহলৌকিক দায়িত্ব ব্যক্তিগত, মৃত্যুর সাথে সাথে তাহা অস্তিত্ব হারায়।

কিন্তু যে দায়িত্ব সম্পত্তি সম্বন্ধীয়, সে দায়িত্ব মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হইয়া যায় না। কোন ব্যক্তি যদি কোন জিনিসের আমানতদাররূপে ঐ জিনিস আমানত রাখিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর দ্বারা সেই আমানত নষ্ট হয় না। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী হইতে ঐ আমানতকৃত বস্তু বা সম্পত্তি ফেরত লওয়া যায়। আমানতদার মারা গিয়াছেন এই অজুহাতে

www.pathagar.com

ঐ বস্তু বা সম্পত্তি আমানতকারীর নিকট ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে অন্যায় দখলকারীর মৃত্যু হইলে মালিক সেই বস্তু বা সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারেন। যে বস্তু বা সম্পত্তি প্রত্যার্পণযোগ্য নহে বা যে বস্তু বা সম্পত্তি প্রত্যার্পণের দায়িত্ব ছিল না সেই বস্তু বা সম্পত্তি প্রত্যার্পণের প্রশ্ন মৃত্যুর পর উঠিতে পারে না। কিন্তু দেনা রাখিয়া মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ঐ দেনার জন্য দায়ী হয়। যে দায়িত্ব ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর নির্ভরশীল, সেই দায়িত্ব মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হইয়া যায়। আত্মীয় পোষণের দায়িত্ব এই পর্যায়ে ফেলা যায়। জীবিতকালের কোন কাজের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকিলে আহত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তাহার সম্পত্তি হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। দবির সাবেতের জমিতে একটি গর্ত খুড়িল, সাবেত তাহা জানিত না। সাবেত সেই জমিতে তাহার নিজের গরু ছাড়িয়া দিয়াছিল। গর্তে পড়িয়া সাবেতের গরু মারা গেল। যেদিন সাবেতের গরু মারা যায় তাহার আগেই দবিরের মৃত্যু হইয়াছে। এমতাবস্হায় দবিরের সম্পত্তি হইতে সাবেত ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে।

মৃত্যুর পরেও তাহার সম্পত্তির উপর মৃত ব্যক্তির কিছু অধিকার থাকিয়া যায়। তাহার দাফন কাফনের খরচ তাহার সম্পত্তি হইতে দিতে হয়। তবে তাহার কোন সম্পত্তি দেনার জন্য জামানত থাকিলে সেই দেনা শোধ করিয়া দাফন-কাফনের খরচ লইতে হয়। তাহার দেনা প্রভৃতির জন্য তহোর সম্পত্তি দায়ী। মৃত্যুর পরেই মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সেই কারণে ইসলামী আইন উত্তরাধিকারের বিধান দিয়াছে। তাহার দাফন-কাফন এবং দেনা শোধ প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য তাহার উত্তরাধিকারী আইনত দায়ী।

যে ব্যক্তি হত হয়, তাহার ওয়ারিশগণ ঘাতকের উপর প্রতিশোধ লইবার অধিকার রাখে। হত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে নিজে এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ ঘাতকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।

আইনের উপর চুক্তি-স্থানের প্রভাব

চুক্তির স্হান অনেক সময় ইসলামী আইনের প্রয়োগকে প্রভাবিত করে। এমন অনেক চুক্তি আছে যাহা সাধারণত ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু উহা

www.pathagar.com

যদি দারুল হরবে (অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রে) একজন মুসলিম এবং আরেকজন কাফিরের মধ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবে ঐ মুসলিম তাহার এই চুক্তির ফায়দা পাইতে অধিকারী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দারুল ইসলামে (মুসলিম রাষ্ট্রে) যাহা বলবৎযোগ্য ছিল না দারুল হরবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) তাহা বলবৎযোগ্য হয়। আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এইরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সাধারণভাবে দারুল হরবে অমুসলিমের সম্পত্তি প্রতারণামূলে গ্রহণ করা আশ্রিত মুসলিমের পক্ষে নিষিদ্ধ। অমুসলিমের সম্মতি লইয়া দারুল হরবে তাহার সম্পত্তি মুসলিম গ্রহণ করিতে পারে। আইনে যাহাকে সাম্ভাব্য চুক্তি বলে, মুসলিম রাষ্ট্রে তাহা সহীহ নহে, তাহা ফাসিদ, কিন্তু দারুল হরবে এই প্রকার চুক্তি সিদ্ধ।

একটি বীমা কোম্পানী অমুসলিম রাষ্ট্রে বীমা ব্যবসা করিতেছে। পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রে একটি ফার্ম আছে। সেই ফার্মের মালিক একজন মুসলিম এবং অন্য একজন অমুসলিম। ঐ ফার্মের অমুসলিম অংশীদার উক্ত বীমা কোম্পানীতে তাহার ব্যবসায়ের জন্য বীমা করিল। পরিপক্ক হইবার পর সেই বীমায় যে অর্থ পাওয়া গেল তাহার একাংশ গ্রহণ মুসলিম অংশীদারের পক্ষে হালাল হইবে। এখানে যেহেতু চুক্তি করা হইয়াছিল অমুসলিম রাষ্ট্রে এবং কোন পক্ষে প্রতারণা ছিল না, তাই মুসলিম অংশীদার বীমার পলিসির মুনাফা লইতে পারিবে। মুসলিম রাষ্ট্রে এইরূপ কোন চুক্তি হইলে তাহা সিদ্ধ হইত না।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
মালিকানা

সূচনা

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ উসূলে যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন সেই সমস্ত বিষয় এতক্ষণ আলোচিত হইল। এখন আধুনিক আইনতত্ত্ববিদগণের মতে যে সমস্ত বিষয় আইনতত্ত্বের এলাকায় পড়ে; সেই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইবে। উসূল সাধারণত আইনের উৎস লইয়া আলোচনা করে। সংগে সংগে আইন যে পদ্ধতিতে আহরিত এবং প্রযুক্ত হয় সেই পদ্ধতির বিশুদ্ধতাও বিবেচনা করে। প্রসঙ্গত আইনের সাধারণ মতবাদ এবং প্রত্যয় সম্পর্কেও ইহাতে আলোচনা হয়।

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ আইনকে নিম্নবর্ণিত ভাগসমূহে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ

(১) মুয়ামালাতের আইন অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানের আইন ;

(২) মুনাকাহাত-এর আইন অর্থাৎ বিবাহের আইন বা পরিবার আইন ;

(৩) উকুবাত বা শাস্তির আইন ;

(৪) আদাবুল কাজী অর্থাৎ বিচারকের নীতিমালা এবং

(৫) আস-সিয়ার অর্থাৎ প্রশাসনিক আইন এবং মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্কীয় আইন।

ইবাদতের আইন এখানে আলোচিত হইবে না।

মালিকানা

মালিকানার বিষয় মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এই বিষয়কে মিলক (ملك) বলা হয়। বাংলায় ইহাকে স্বত্ব বলা যায়। যে পার্থিব বিষয়ে মানুষের আকাঙক্ষা অপরিসীম তাহা মিলক। এক মানুষের সহিত অন্য মানুষের যাহা লইয়া বেশী আদান-প্রদান তাহা মিলক। মিলক দেহযুক্ত পদার্থ লইয়া কারবার করে। কিন্তু বস্তুগত বা দেহগত আকারবিহীন অনেক কিছুকে আইনতত্ত্ববিদগণ মিলকের আওতায় আনিয়াছেন।

www.pathagar.com

মিল্‌ক বলিতে একটি সম্পর্ক বুঝায়। এই সম্পর্ক মানুষ এবং বস্তুর (শাইউন شيء) মধ্যে অবস্থান করে। এই সম্পর্কের অবস্থিতির ফলে মানুষ বস্তুকে তাহার পূর্ণ ক্ষমতা এবং শাসনে রাখিতে পারে। এই সম্পর্কের ফলে মানুষ বস্তুকে অন্যের শাসন এবং অধিকার হইতে দূরে রাখিতে পারে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহি বিকায়াতে সদরুশ শরীয়ত এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। কোন বস্তুর উপর পূর্ণ অধিকারকে মিল্‌ক বলা যায়, তাফতাজানী এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। বস্তুর উপর যে ব্যক্তির এই প্রকার চরম শাসন এবং অধিকার থাকে, সেই ব্যক্তিকে মালিক বা স্বত্ববান ব্যক্তি বলা হয়। যে বস্তুর উপর মালিকের অধিকার বিস্তৃত হয় সেই বস্তুকেও মিলক বলা হয়।

যে বস্তুর উপর মিলক বা স্বত্ব বিস্তৃত হইতে পারে তাহা তিন প্রকার হইতে পারে ঃ যথা মাল, মানফাত এবং মুতাত (مال ‘ منفعت متعت)। মাল বলিতে দেহবিশিষ্ট বস্তু বুঝায়। মানফাত বলিতে মাল হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বুঝায়। জমির ফসল এবং মানুষের শ্রম ইহার আওতায় আসে। মুতাত বলিতে দাম্পত্য সংসর্গ বুঝায়। বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় ইহা বিশদভাবে বিবেচনা করা হইবে।

মাল বা দেহবিশিষ্ট পদার্থের উপর যে মিল্‌ক বা স্বত্ব তাহা তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—মিলকুর রাকবা এবং মিলকুল ইফাদ এবং মিলকুত তাসাররুফ (ملك الرقبه - ملك اليد - ملك التصرف) ঃ স্বত্বের যে অধিকার, উহাকে মিলকুর রাকবা বলে। দখলের যে অধিকার উহাকে মিলকুল ইয়াদ বলে। আদান-প্রদানের যে অধিকার উহাকে মিল্‌কুত তাসাররুফ বলে।

মাল

যাহা মজুদ করা যায় এবং আবশ্যক কাজে যাহা ব্যবহারে আনা যায় এবং যাহা মানুষের আকাঙক্ষার বস্তু এবং যাহা এক মানুষ অন্যকে দিতে পারে এবং যাহা হইতে এক মানুষ অন্যকে বঞ্চিত করিতে পারে, তাহাকে মাল বলে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দাম্পত্য সংসর্গ কিংবা জমির ফসল মালের আওতায় পড়ে না। আল-হাবি বলেন, মাল এমন বস্তুর নাম, যাহা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা মানুষ নিজের ইচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারে। আল-হাবি বলেন, মানুষ কোনদিন মাল হইতে পারে না, সেই কারণে ক্রীতদাস মাল নহে। রদ্দুল মুহতার-এর রচয়িতা বলেন, যে বস্তু মানুষ তাহার সুবিধামত ব্যবহার করিতে পারে তাহাকেই মাল বলে,

www.pathagar.com

নষ্ট করিবার অধিকার না থাকিলেও তাহা মালরূপে গণ্য হয়। তিনি বলেন জানোয়ারকে বিশেষ কারণ ব্যতীত হত্যা করা নিষিদ্ধ কিন্তু তবুও জানোয়ারকে তাহার মালিকের মাল বলা হয়।

মাল শব্দটি সম্পত্তির সহিত একার্থক নহে। মাল সংকীর্ণ অর্থ বহন করে। যাহা স্পর্শযোগ্য এবং দেহযুক্ত তাহাই শুধু মাল। সম্পত্তি ভবিষ্যৎ ফসল বা মানফাত, স্বত্ব বা মিলকের বিষয়বস্তু হইতে পারে কিন্তু তাহা মাল নহে।

যাহাতে মানুষ কোন উপকার পায় না তাহা মাল নহে। সব মানুষের উপকারে আসিতে হইবে, মালরূপে গণ্য হইবার এমন কোন পূর্বশর্ত নাই। কিছু মানুষের উপকারে আসিতে পারিলেই তাহা মালরূপে গণ্য হইবার দাবী রাখে। শুকর এবং মদ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ; কারণ উহারা অপবিত্র (নাজিসুন বি আইনিহি نجس بعينه)। কিন্তু যেহেতু অমুসলিমগণের নিকট উহা নিষিদ্ধ নহে সেহেতু উহাদিগকে মালরূপে গণ্য করা হয়। মৃতদেহ এবং মানুষের রক্ত কাহারও উপকারে লাগে না তাই উহারা মাল নহে। যে জিনিসের মূল্য এতই তুচ্ছ এবং নগণ্য যে উহা ধর্তব্য গণ্য করা হয় না সে জিনিসকে মাল বলা হয় না। অন্যের জমি হইতে একমুঠি মাটি লইলে চুরি হয় না। রুটির একটুকরা ভাংগা কণা লইয়া বিক্রয়ের চুক্তি হয় না।

যাহা মাল হইতে পারে না

এমন অনেক বস্তু এবং ফায়দা আছে যাহা আইন একজনকে ব্যবহার করিতে দেয় না। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের জন্য এইগুলির উপর জনসাধারণের অধিকার স্বীকার করা হয় (আল আশইয়াউল মুবাহাতুল উসুমিয়া الاشياء المباحات العمومية)। বাতাস, আলো, আগুন, ঘাস, নদী, সমুদ্রের পানি এবং জনসাধারণের রাস্তা প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ। এইগুলি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। জনসাধারণের ব্যবহারকে কোন ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া কোনব্যক্তি এইগুলি অধিকার করিতে পারে না।

আলো এবং বাতাস

আলো এবং বাতাস ভোগ করিবার অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না। অবশ্য সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজনে এই অধিকার খর্ব হইতে পারে।

www.pathagar.com

আগুন

মরুভূমিতে আগুন জ্বালাইয়া সেই আগুন পোহাইবার অধিকার সকলের আছে কিন্তু ছাই লইয়া যাইবার অধিকার সকলের নাই।

ঘাস

কোন ব্যক্তির জমিতে যদি ঘাস জন্মে এবং সেই ঘাস রক্ষা করিবার জন্য যদি কোন দেয়াল বা বেড়া না থাকে তবে অন্য ব্যক্তি সেই ঘাস কাটিয়া লইয়া গেলে জমির মালিক ক্ষতিপূরণ পায় না। তবে চাষ করিয়া ঘাস জন্মাইলে উহা সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়।

পানি

সাধারণভাবে পানি সকলের সম্পদ। কিন্তু যে মুহূর্তে মূল আধার হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই মুহূর্তে ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া যায়। কলসীর পানিতে সকলের অধিকার থাকে না। আহরণের স্থলের সাথে মূল আধারের যদি যোগ থাকে তবে ইহার উপর সীমিত গণ অধিকার থাকিয়া যায়। কূপ বা পুকুর এইরূপ সম্পদের উদাহরণ।

পানির ব্যবহার দুই প্রকারের হইতে পারে। যথা—শুরব এবং শুফাত (شرب - شفعت)। জমিতে সেচের জন্য বা কলের চাকা ঘুরাইবার জন্য যে পানির দরকার তাহাকে শুরব বলে। পান করিবার জন্য বা জানোয়ারকে পান করাইবার অন্য পানির ব্যবহারকে শুফাত বলে।

সমুদ্রের বা বড় নদীর বা ছোট নদীর পানি ব্যবহার করিবার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু এইগুলি হইতে ছোট খাল কাটিয়া শিল্প কারখানা বা কৃষিকাজের জন্য পানি লইয়া যাওয়া হইলে সেই খলের উপর সকলের অধিকার নাই। কিন্তু খাল কাটিয়া পানি লইবার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। এমনভাবে খাল কাটিয়া পানি লওয়া চলিবে না, যাহাতে নদীর নাব্যতা নষ্ট হয় বা অন্যের ব্যবহার সংকুচিত হয়। নদীর পানির উপর সকলের সমান অধিকার। সেই সমান অধিকার যাহাতে নষ্ট বা খর্ব হয় এমনভাবে কোন ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিবার অধিকার রাখে না।

যে স্রোত কোন ব্যক্তির জমিতে উৎপত্তি হইয়া তাহার জমিতে শেষ হয়, ঐ স্রোত সাধারণের সম্পত্তি নহে, উহা ব্যক্তিগত সম্পদ। ঐ জমির মালিকগণ ঐ সোতকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। ঐ জমির মালিক

www.pathagar.com

একাধিক হইলে ইজমালি সম্পত্তি যে ভাবে ব্যবহার করিতে হয় ঐ স্রোতের পানিও সেভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। এককভাবে একজন মালিক অন্য মালিকের অধিকারকে সংকুচিত করিতে পারে না। জনসাধারণ ঐ স্রোতের পানি পান করিবার এবং জানোয়ারকে পান করাইবার অধিকার রাখে এবং সেই উদ্দেশ্যে মালিকের জমির উপর দিয়া জনসাধারণ যাইতে পারে। যে পানি ভূগর্ভ হইতে উঠে না বা ঝর্ণা দ্বারা পুষ্ট হয় না সেই পানির উপর জনসাধারণের কোন অধিকার নাই।

ঝর্ণা হইতে সংগ্রহ করিয়া যে পানি পুকুরে বা কূপে জমা করা হয়, অভাবের সময় সেই পানি জনসাধারণ পানের জন্য ব্যবহার করিতে পারে। তবে মালিকের যাহাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে তাহারা সযত্ন থাকিতে বাধ্য।

চারণভূমি এবং বন

যে জনপদের সন্নিকটে চারণভূমি বা বন থাকে, সেই জনপদের অধিবাসিগণ ঐ চারণভূমি বা বন ব্যবহার করিতে পারে। উচ্চস্বরে চীৎকার করিলে মানুষের কণ্ঠধ্বনি যতদূর পৌঁছিতে পারে ততদূর পর্যন্ত জনগণ ঐ চারণভূমি ও বন ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু এই বনভূমি বা চারণভূমি যদি কোন ব্যক্তিগত স্বত্ব দখলে থাকে, তবে উহা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয় না। বৃহৎ নদীর প্রস্থ যতখানি তাহার অর্ধের পরিমাণ তীরস্থ জমি সর্বদাই জনসাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। উহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা অর্জন করা করা যায় না।

জনসাধারণের রাস্তা

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বড় রাস্তা জনসাধারণের গমনাগমনের জন্য ব্যবহার্য। অন্য যে কোনভাবে ইহার ব্যবহার আইনানুগ নহে। তবে মানুষের যাতায়াতকে কোনক্রমে বন্ধ বা সংকুচিত না করিয়া প্রয়োজনমত অন্য কাজও ইহার উপর করা যায়। কোন ব্যক্তি রাস্তার উপর দোকান খুলিতে পারে না, আইনে সম্পূর্ণরূপে ইহা নিষিদ্ধ। প্রদর্শনের জন্য জিনিস মেলিয়া রাখাও আইনসম্মত নহে। কিন্তু যাহার বাড়ী রাস্তার ধারে, তিনি তাহার বাড়ী মেরামত করিবার জন্য মেরামতের সরঞ্জামাদি পথিকের যাতায়াতের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া রাস্তার উপর রাখিতে পারেন। রাস্তার উপরের শূন্যস্থানও জনধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। উহাতে বাধা সৃষ্টি করিবার অধিকার কাহারও নাই।

www.pathagar.com

উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠান

জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সম্পত্তি উৎসর্গ করা যায়। মসজিদ, বিদ্যালয়, সরাইখানা, হাসপাতাল এবং অন্যান্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এইভাবে উৎসর্গ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং উৎসর্গকারীর শর্ত এইগুলির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। ওয়াকিফ যে শর্ত আরোপ করিয়া কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন সাধারণভাবে সেই শর্তের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়; ব্যবহার বিধিও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে। কোন কোন সম্পত্তির উপর জনসাধারণের অধিকার থাকিলেও তাহা শর্তযুক্ত এবং সীমিত। জনসাধারণ ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু সেই ব্যবহার অবাধ নহে। কূপের পানি এইপ্রকার সম্পত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অনেক জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি আছে, যাহার উপর সকলের অধিকার সমান।

প্রকৃতির বহু সম্পদ প্রাথমিকভাবে জনসাধারণের। প্রকৃতির এই সম্পদকে মানুষ ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে আনিতে পারে কিন্তু তাহা আনিবার পূর্বে ইহাদের উপর জনসাধারণের অধিকার থাকিয়া যায়। পতিত জমি (মাওয়াত موات) আকাশের পাখী বা বনের পশু (সাইদ صيد) সমুদ্রের বা নদীর মাছ এবং বনের গাছ প্রকৃতির সম্পদ। এইগুলিকে মুবাহাত (مباحات) বলে। ইহাদের উপর সকলের সমান অধিকার।

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি

সম্পত্তিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা—স্থাবর এবং অস্থাবর (গাইরু-মনকূল এবং মনকূল غير منقول এবং منقول)। জমি এবং তদউপরস্থ দালান-কোঠাকে স্থাবর সম্পত্তি বলা হয়। তাহাদিগকে আকার (عقار) বলা হয়। অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরযোগ্য। ইহাদিগ কে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। অস্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলা যায়। স্থাবর সম্পত্তি সাধারণভাবে ধ্বংসশীল নয়। অস্থাবর সম্পত্তি ধ্বংসশীল; সেই কারণে ইহার ক্রেতা দখল না পাইয়া ইহাকে বিক্রী করিতে পারে না। দখল পাইবার আগে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যাইবার আশংকা কম। অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে ধ্বংস হইয়া যায়। অনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

কালের জন্য ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। ব্যবহারে আসিয়া যাইবার পর ইহার চিরকালীন স্থায়িত্ব থাকে না। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে ইহার স্থায়িত্বকে বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু জমিকে ধ্বংস না করিয়া উহাতে ফসল উৎপন্ন করা যায় বা উহার উপর ইমারত নির্মাণ করা যায়। এই কারণে অস্থাবর সম্পত্তি সাধারণভাবে ওয়াকফ করা যায় না। তবে কোন কোন অস্থাবর সম্পত্তি প্রথার ভিত্তিতে ওয়াক্ফ করা যায়। ভূ-সম্পত্তি সর্বদাই ওয়াক্ফ করা যায়। যাহা জমির সহিত যুক্ত তাহা জমির অংশ বলিয়াই গণ্য হয়। সে কারণে জমি হস্তান্তরিত হইলে উহার সহিত যুক্ত সবকিছুই হস্তান্তরিত হইয়া যায়। জমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোন বস্তু আর উহার অংশ থাকে না।

অস্থাবর সম্পত্তিকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ

১। মাকিলাত (مكيلات) পাত্রে ওজন করিয়া ইহা বিক্রয় হয়। যেমন—গম, বালি।

২। মাউজুনাত (موزونات) বাটখারা ওজনে ইহা বিক্রয় হয়। যেমন—সোনা, রুপা, তেল।

৩। আদাদিয়াত (عدديات) গণনা করিয়া ইহা বিক্রয় হয়। যেমন-- ফল।

৪। মাজরূআ'ত (مذروعات) ইহা লম্বায় মাপিয়া বিক্রয় হয়। যেমন- কাপড়।

মাকিলাত, মাউজুনাত, আদাদিয়াত এবং মাজরূ আ'তকে একত্রে মুকাদ্দারাত (مقدرات) বলা হয়। সোনা-রূপাকে নুকুদ (نقود) বলা হয়।

৫। উরূদ (عروض) সাধারণ দ্রব্য। যেমন—আসবাব।

৬। হাইওয়ানাত (حيوانات) জানোয়ার।

সদৃশ এবং বিসদৃশ

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মতে সম্পত্তির যে বিভাগটি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যবহ, তাহা হইতেছে সম্পত্তিকে সদৃশ এবং বিসদৃশ এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ। দুইটি জিনিস যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাহার একটির সদৃশ আর একটি বাজারে পাওয়া যায় তবে সেই জিনিসগুলিকে সদৃশ বা মিসলী (مثلي) বলা হয়। সদৃশ জিনিস ওজন করিয়া বা গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয়

www.pathagar.com

করা যায়। যে জিনিসের সদৃশ কিছু বাজারে পাওয়া যায় না তাহাকে বিসদৃশ (কিমী (قيمى) বলে। সদৃশ এবং বিসদৃশ উভয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আমলে আনা হয় না। বিসদৃশ সম্পত্তি সাধারণত ওজনে বা গনিয়া বিক্রয় করা যায় না। জমি, বাড়ী, জানোয়ার প্রভৃতি এই শ্রেণীর সম্পত্তি।

নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট সম্পত্তি

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ সম্পত্তিকে অন্য দুইভাবে ভাগ করিয়াছেন। যথা—নির্দিষ্ট বা আইন (عين) এবং অনির্দিষ্ট বা দাঈন (دين)। যে জিনিসের আদান-প্রদান বা বিনিময় সেই জিনিস দিয়াই হয় তাহাকে নির্দিষ্ট সম্পত্তি বলা হয়। আমার কলমটি কেহ চুরি করিয়া লইয়া গেলে আমি আমার সেই নির্দিষ্ট কলমটি ফেরৎ পাইতে হকদার। যাহা নির্দিষ্ট নহে তাহাই অনির্দিষ্ট সম্পত্তি।

যে সম্পত্তি সদৃশ তাহা সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট গণ্য করা হয়। সোনা এবং রূপাকে এই কারণে সদৃশ সম্পত্তি বলা হয় যে এই জাতীয় জিনিস বাজারে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির সোনা চুরি যায় সে ব্যক্তি সোনা পাইতে হকদার হয়; কিন্তু যে খণ্ড চুরি গিয়াছিল সেই খণ্ডই যে তাহাকে পাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। একই কারণে সোনা ও রূপাকে অনির্দিষ্ট সম্পত্তি বলা হয়। ধান, চাউল এবং তৈলও এই শ্রেণীতে পড়ে। কবির এক ব্যাগ মুদ্রা লইয়া বাজারে আসিল। দবির তাহার মুদ্রা কবিরের কাছে এই শর্তে বিক্রয় করিল যে কবির তাহার ব্যাগ হইতে পঞ্চাশটি মুদ্রা তাহাকে (দবিরকে) দিবে। কবির ব্যাগ হইতে না দিয়া তাহার পকেট হইতে মুদ্রা দিয়া তাহার পাওনা শোধ করিতে পারে, ইহাতে দবির আপত্তি করিতে পারে না। আমিরের গুদাম হইতে বশির একশ' মন চাউল ক্রয় করিল কিন্তু চুক্তিতে চাউলের কোন বর্ণনা থাকিল না। এমতাবস্থায় বশির জিদ ধরিয়া বলিতে পারে না যে, আমীরকে তাহার গুদাম হইতেই চাউল দিতে হইবে, অন্য কোন স্থান হইতে আনিয়া দিলে চলিবে না। আমীর যে-কোন ভাবে বশিরের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পারে। আকবর হুমায়ুনকে একশ' টাকার পাঁচখানি নোটে মোট পাঁচশত টাকা ধার দিল। টাকা ফেরৎ লইবার সময় আকবর বলিতে পারে না যে তাহাকে একশত টাকার পাঁচখানা নোট দিতেই হবে। এক টাকার পাঁচ'শ খানি নোট দিলে চলিবে না।

www.pathagar.com

আকবর এক টাকার পাঁচ'শ খানা নোট দিয়া তাহার দেনা শোধ করিতে পারে। তবে বিশেষ চুক্তিমূলে এইসব জিনিস নির্দিষ্টভাবে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত দ্রব্য অপরকে দিতে বাধ্য তাহার দায়িত্বের উপর নির্দিষ্টতা নির্ভর করে। দেনাকে সর্বদা অনির্দিষ্ট সম্পত্তি বলা হয়।

সম্পত্তির ব্যবহার ও ভোগ

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে সম্পত্তির উপর ব্যক্তির যথেচ্ছ ভোগ দখলের অধিকার বুঝায়। যিনি সম্পত্তির মালিক তিনি উহা যে কোন ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য তাহার এই অধিকার দুইভাবে সীমিত হইতে পারে। যে ব্যবহার অন্যের পক্ষে ক্ষতিজনক, কোন সম্পত্তির মালিক তাহার সম্পত্তিকে সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারেন না। ইহাই সম্পত্তির উপর অবাধ ভোগের ক্ষেত্রে মালিকের প্রথম বাধা। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র মালিককে তাহার সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করিতে পারেন। মালিক ইহা মানিতে বাধ্য। জমি জমার ক্ষেত্রে মালিকের ব্যবহারের অধিকার এই দুইভাবে সীমিত হয়। তবে সাধারণভাবে প্রত্যেকে তাহার নিজের জমিখানিকে, যে ভাবে তাহার পক্ষে সব চাইতে সুবিধাজনক হয় সেইভাবে ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারেন; ইহাতে তাহার প্রতিবেশীর কিছু ক্ষতি বা অসুবিধা হইলে কিছু আসে যায় না। তবে তিনি তাহার সম্পত্তি ব্যবহারের দ্বারা প্রতিবেশীর সম্পত্তি নষ্ট কিংবা একেবারেই মূল্যহীন করিতে পারেন না। দবির তাহার বাড়ীর সামনে ফলের দোকান করিল। এমতাবস্থায় তাহার প্রতিবেশী কবির তাহার বাড়ীর সামনে একই প্রকার ফলের দোকান করিলে দবিরের ফলের তেজারতি ব্যাহত হইতে পারে, কিন্তু তৎজন্য কবিরকে ফলের দোকান করিতে আইন বাধা দেয় না। প্রতিবেশীর বাড়ীর পার্শ্বে এমন কারখানা করা যায় না যাহার ফলে প্রতিবেশীর স্বাভাবিক অবস্হান বিঘ্নিত হয়। কিন্তু যেখানে কারখানা আছে তাহার পার্শ্বে গিয়া কেউ বশত বাড়ী নির্মাণ করিয়া অবশেষে বলিতে পারে না যে, কারখানার শব্দে তাহার রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হইতেছে। কোন জিনিস কতখানি বিরক্তিকর তাহা নির্ভর করে পরিস্হিতির উপর। যে কাজ বা কাজের ধারা প্রতিবেশীকে গুরুতররূপে এবং প্রকাশ্যভাবে আঘাত করে (দারারুন ফাহিশুম ضرر فاحش) সেই কাজকে বিরক্তিকর বলা যায়। নিজের জমিতে পানি

www.pathagar.com

জমা করিয়া প্রতিবেশীর জমি ভাসাইয়া দেওয়া বা নিজের জমিতে গভীর গর্ত খুঁড়িয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর ভিত দুর্বল করিয়া দেওয়া আইনসিদ্ধ নহে। প্রতিবেশীর বাড়ীতে আলো এবং বাতাস প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের জমিতে উচ্চ ইমারত নির্মাণ আইনে সিদ্ধ নহে। রাষ্ট্র সম্পত্তির মালিকের উপর সম্পত্তির জন্য ট্যাক্স বা কর বসাইতে পারে।

সম্পত্তির পশ্চাৎ ভার

সম্পত্তির মালিক তাহার সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে পারে বা লীজ দিতে পারে। খাইখালাসী বন্ধক হইলে এবং দখলী লীজ হইলে ঐ সম্পত্তির উপর মালিকের স্বত্ব থাকে কিন্তু দখল থাকে না। নাবালক বা উন্মাদ ব্যক্তিগত-ভাবে তাহাদের সম্পত্তি নিজ দখলে রাখিতে পারে না বা উহা হস্তান্তর করিতে পারে না। ক্রীতদাসের জীবননাশ করিবার অধিকার মালিকের নাই। যে সব জিনিসের অস্তিত্ব নষ্ট করিবার অধিকার মালিকের সাধারণভাবে থাকে, বন্ধক দেওয়া হইলে বা লীজ দেওয়া হইলে সেই অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়া যায়।

একক এবং যৌথ মালিকানা

মালিকানা একক বা যৌথ হইতে পারে। যখন কোন সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বত্বাধিকারে থাকে তখন সেই সম্পত্তিকে যৌথ সম্পত্তি বলা হয়। ইহার অপর নাম শিরকাতুল মিলক (شركة لملك) ইজমালী সম্পত্তির প্রত্যেক অণুতে প্রত্যেক মালিকের অধিকার আছে। প্রত্যেক শরীক তাহার অংশ বিক্রয় করিতে পারে। কোন শরীক মারা গেলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার অংশ পায়। প্রকৃতিগতভাবে ইজমালী সম্পত্তিতে কোন শরীকের একক দখল থাকিতে পারে না। এই কারণে অধিকার সম্পর্কে একটি গোলযোগ উপস্থিত হয়। আইনের পরিভাষায় ইহাকে মুশা বলে।

ইজমালী সম্পত্তির শরীকগণ কিভাবে সম্পত্তি ভোগ করিবে তাহার নীতি খুবই সাধারণ। শরীকগণ মিলিয়া মিশিয়া, যাহার যে পরিমাণ অংশ আছে তিনি সেই পরিমাণ অংশ এবং যে ভাবে ভোগ করিলে সকলের সুবিধা হয় সেইভাবে ব্যবস্থা করিয়া ভোগ করিবেন। চার শরীকের একবাড়ী হইলে সকল শরীকই একটি ড্রইং রুম বা একটি প্রবেশ পথ ব্যবহার

www.pathagar.com

করিতে পারেন। সম্পত্তি হইতে আয় হইলে নিজেদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া লইবেন। নিজের বুদ্ধি, মেধা, অর্থ বা শ্রম খাটাইয়া কোন শরীক যদি ইজমালী সম্পত্তি হইতে বেশী লাভ উঠান, তবে সেই লাভের উপর অন্য অলস শরীকগণ লোভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা করিতে গিয়া তিনি যদি লোকসান করিয়া বসেন তবে তিনি তাহার জন্য দায়ী হইবেন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বা সংস্কারের জন্য যে খরচ হয় তাহা সকল শরীকই বহন করিতে বাধ্য।

সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া লইয়া আপন অংশ স্বীয় দখলে লইবার অধিকার সকল শরীকের আছে।

সুখাধিকার

মালিকানা না থাকিলেও সম্পত্তির উপর অন্য প্রকারের অধিকার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বরাবরে উদ্ভব হইতে পারে। পথের অধিকার (হক্কুল মারুর حق المرور), পানির স্রোতের অধিকার (হক্কুল মাজরা حق المجرى) এবং পানি বাহির করিয়া দিবার অধিকার (হক্কুল মাসিল حق المسيل) এই পর্যায়ে পড়ে। এই অধিকারকে ইংরেজী আইনে ইজমেন্ট বলা হয়। এই অধিকারের প্রকৃতি বদলানো যায় না। অব্যবহারের দ্বারা এই অধিকার নষ্ট হইতে পারে।

শুফা

বিক্রয় মূল্য দিয়া ক্রেতার নিকট হইতে সম্পত্তি ক্রয় করিবার অধিকারকে শুফা বলা হয়। ইসলামী আইন এই অধিকারের স্বীকৃতি দিয়াছে।

শুফার অধিকারের উদ্ভব

পূর্ণ এবং সিদ্ধ বিক্রয়ের উপরেই শুফার অধিকার বলবৎ হয়। যে হস্তান্তর বিক্রয় নয় তাহার উপর শুফার প্রয়োগ নাই। হেবার ক্ষেত্রে তাই শুফার দাবী চলে না। শর্তযুক্ত বিক্রয় বা অসিদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুফা প্রযোজ্য হয় না। হিবাবিল এওয়াজ-এর ক্ষেত্রে শুফার অধিকার প্রয়োগ করা যায়, কারণ সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে হিবাবিল এওয়াজকে বিক্রয় বলা যায়। কোন কোন মালিকী আইনতত্ত্ববিদের মতে লীজের ক্ষেত্রের শুফার অধিকার প্রযোজ্য হয়। শুধু বিক্রয়ের অভিপ্রায় দেখা দিলে শুফার

www.pathagar.com

অধিকার প্রয়োগ করা যায় না। বিক্রয় যখন যথার্থই সুসম্পন্ন হয় তখনই শুফার অধিকারের উদ্ভব হয়।

অগ্রক্রয়ের অধিকারী

বিক্রিত সম্পত্তির সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণই শুফার অধিকার লাভ করেন। সকল মজহাবপন্থিগণ একমত যে, ইজমালী সম্পত্তির এক শরীক তাহার অংশ বিক্রয় করিলে অন্য শরীকগণের বরাবরে শুফার অধিকারের উদ্ভব হয়। এক শরীক এজমালী সম্পত্তির এক অংশ বিক্রয় করিলে অন্য শরীক তাহ অগ্র ক্রয় করিতে পারে। হানাফিগণের মতে, বিক্রিত সম্পত্তির সন্নিহিত জমির মালিক শুফার অধিকার রাখেন। বিক্রিত সম্পত্তির উপর যাহাদের পথের অধিকার ও পানির অধিকার আছে, তাহারাও হানাফীদের মতে শুফার অধিকার পাইয়া থাকেন। শুফার অধিকার যে নীতির উপর প্রতি-ষ্ঠিত তাহা অতি সরল। ইজমালী সম্পত্তির প্রত্যেক অণুতে সকল শরীকের অধিকার বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এক শরীক ইজমালী সম্পত্তির কিছু অংশ অন্য শরীকের বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে না। যাহারা দীর্ঘদিন পাশাপাশি সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পরিচিতি ঘটিয়াছে। কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে ইহার মধ্যে ঢুকাইতে যাইবার পূর্বে পরিচিতদের মধ্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব করা যুক্তিসঙ্গত। হানাফিগণ প্রতিবেশীকেও এই অধিকার দিয়াছেন। এতদসম্পর্কিত ইসলামী আইনের নীতির দাবীর অনুসরণে হানাফিগণ প্রতিবেশীগণকে শুফার অধিকার দিয়াছেন।

এজমালী সম্পত্তির শরীকের অধিকারীর শুফার দাবী সর্বাগ্রে গণ্য। তাহার পর আসে সুখাধিকার ভিত্তিক স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণের দাবী এবং সর্বশেষে আসে প্রতিবেশিগণ। একই শ্রেণীতে একাধিক শাফী বা শুফার দাবীদার থাকিলে, তাহারা সকলেই হানাফিদের মতে সমান অংশ পাইবে। শাফিঈ এবং হাম্ব-লীদের মতে অগ্রক্রয়ের অধিকার শরীকদের অংশ মোতাবেক হইবে। তাহাদের মতে একমাত্র শরীক ছাড়া অন্য কাহারও শুফার অধিকার নাই।

শুফার শর্ত

হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, শুফার অধিকার প্রকৃতিতে নাজুক। এবং সেই কারণে ইহার ব্যবহারের জন্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে সবিশেষ সাবধান হইতে হয়।

www.pathagar.com

এই অধিকার সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে মুহূর্তে শুফার অধিকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হন, সেই মুহূর্তে তাহাকে শুফার দাবী জানাইতে হইবে। ইহাকে বলা হয় তালাবুল মুয়াসিবাত (طلب المواثبة)। অতঃপর অগ্রক্রয়ের অধিকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রেতা বা ক্রেতার সম্মুখে বা ঐ সম্পত্তির উপরে তাহার দাবী উচ্চারণ করিবেন। এই কাজকে তালাবুত তকরীর ওয়াল ইশহাদ (طلب التقرير والاشهاد) বলে। তাহার এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা যদি সম্পত্তি তাহাকে অর্পণ না করে তবে অগ্রক্রয়ের অধিকারী অনতিবিলম্বে আদালতে মামলা দায়ের করিবেন। ইহাকে তালাবুল খুসুমাত (طلب الخصومت)বলে। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আদালত যাইতে এক মাস দেরী হইলে এই দাবী তামাদী হইয়া যায়। কিন্তু বিলম্বের যদি যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে তবে দাবী তামাদি হইবে না। যে এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত, বিক্রয়ের সময় যদি অগ্রক্রয়ের অধিকারী সেই এলাকায় না থাকেন কিংবা তিনি যদি এই ক্রয়-বিক্রয়ের খবর না পান তবে বিলম্বের কারণে তাহার অধিকার নষ্ট হয় না। তিনি যদি কোন প্রতারণার শিকার হন কিংবা তিনি যদি বিক্রিত সম্পত্তির ঠিকানা বা মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে ব্যর্থ হন তবে বিলম্বের কারণে তাহার দাবী নষ্ট হইবে না। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম হাম্বল বলেন, শুফার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও যদি বিলম্ব ঘটে তাহাতেও দাবী নষ্ট হইবে না। যে মূল্য সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে সেই মূল্য ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, তবেই সম্পত্তি অগ্রক্রয় করা যাইবে। ভুলবশত বা প্রতারণা মূলে বেশী মূল্য দেওয়া হইলে যাহা অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

অগ্রক্রয়ের অধিকার মালিকের যথেচ্ছ বিক্রয়ের অধিকারকে খর্ব করে এই কারণে হানাফি আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে এড়াইবার কৌশল বাতলাইয়াছেন। তবে তাহারা এই কৌশলকে প্রশংসা করেন নাই। মালিকী, হাম্বলী এবং শাফিঈগণ এই কৌশলকে সমর্থন করেন না। হানাফীদের মতে মুসলিম এবং অমুসলিম সকলেরই অগ্রক্রয়ের অধিকার আছে। হাম্বলীদের মতে মুসলিমের বিরুদ্ধে অমুসলিম এই অধিকার পায় না।

এই উপমহাদেশে মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য সব স্থানে মুসলিমদের মধ্যে এই অধিকার স্বীকৃত। প্রথামূলে হিন্দুদের মধ্যেও এই অধিকার স্বীকৃত।

www.pathagar.com

দখল

দখলকে ইসলামী আইনের ভাষায় ইয়াদ বা কবদা (يد و قبضه) বলা হয়। দখল আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দখলের অধিকার সর্বতোভাবে স্বত্বাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দখলের মাধ্যমে স্বত্ব অর্জন করা যায়। দখলের সহিত স্বত্ব মিলিত হইলে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়। কিন্তু স্বত্বহীন দখল একেবারে তুচ্ছ নয়। স্বত্ববান ব্যক্তি স্বত্বহীন দখলকারীকে তাহার সম্পত্তি হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে কিন্তু স্বত্ববান ব্যক্তি ছাড়া স্বত্বহীন দখলকারকে কেহই তাড়াইতে পারে না।

দখল দুই প্রকারের হইতে পারে। যথা---হাকীকী (حقيقى) এবং হুকমী (حكمى)। যাহা হাতে লওয়া যায় বা পকেটে রাখা যায়, তাহাকে হাকীকী দখল বলা যায়। কিন্তু জমি, বাড়ী, জাহাজ এমনকি টেবিল চেয়ারও এইভাবে দখল লওয়া যায় না। উহাদিগকে হুকমী দখল করা যায়। নিজের ঘরে মানুষ রাখিয়া বা তালাবন্ধ করিয়া হুকমী দখল করা যায়। নিজের অধিকারে রাখিবার এবং অন্যকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকারকে দখলের অধিকার বলা যায়। দবিরের বাড়ীতে তাহার দোস্ত জাহেদ আসিল। জাহেদ দবিরের বাড়ীতে এক রাত কাটাইল। জাহেদের এই অবস্থানকে দখল বলা যায় না। জাহেদ নিজের অধিকারে ঐ বাড়ীতে থাকিতে চাহে নাই বা দবিরকে ঐ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার অভিপ্রায় করে নাই। যে ব্যক্তি অনুমতি লইয়া দখল করে সে ব্যক্তি প্রকৃত দখলকার নয়। কিন্তু জাহেদ যদি কোন দাবীমূলে দবিরের বাড়ীতে আসিয়া দবিরকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ বাড়ী দখল করে, তবে জাহেদ সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত দখলকার গণ্য হইবে। অভিপ্রায় থাকিলেও জাহেদ যদি দবিরকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে ব্যর্থ হয় তবে বাড়ীর দখল দবিরের থাকিয়াই যাইবে। দখলের অধিকার এবং দখল এক বস্তু নহে। যে ব্যক্তি অন্যায় দখলকারী সে ব্যক্তিও দখলকার। প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধেও তাহাকে দখলকার বলা যায়।

দখলী স্বত্ব

শুধু দখলেরও মূল্য আছে। দখলের মাধ্যমেও একপ্রকার স্বত্ব অর্জন করা যায়। ইহাকে দখলী স্বত্ব বা মিলকুল ইয়াদ (ملك اليد) বলে। যে ব্যক্তি সম্পত্তিতে স্বত্ববান, সেই ব্যক্তিও আদালতের সাহায্য না লইয়া অন্যায় দখলকারীকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি দখলে থাকে আইন

www.pathagar.com

তাহাকে স্বত্ববান বলিয়া অনুমান করে। প্রকৃত স্বত্ববান ব্যক্তির দায়িত্ব হইতেছে আইনের এই অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করা। স্বত্বের প্রমাণ তাহাকেই উপস্থাপন করিতে হয়। যে ব্যক্তি দখলে থাকে তাহাকে জুল-ইয়াদ বলা হয়। যতই দিন যাইতে থাকে ততই জুল-ইয়াদ-এর অধিকার মজবুত হইতে থাকে এবং মালিকের অধিকার হ্রাস পাইতে থাকে। অন্যায় দখল কালে সম্পত্তি সম্পর্কে স্বত্ববান ব্যক্তি কোন ক্ষতির অভিযোগ উত্থাপন করিলে সেই প্রশ্নে দখলকারীর বক্তব্য আদালত গ্রাহ্য করেন। হানাফীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অন্যায় দখলকার হইতে মালিক কোন ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন না। একখানি জমির উপর আকবর ইমারত নির্মাণ করিয়া সেখানে বসবাস করিতে লাগিল। এই জমির উপর আকবরের দখলিস্বত্বের উদ্ভব হইল। বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। আকবর জুল-ইয়াদরূপে গাছ-গাছালি লাগাইয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। ইমারত নির্মাণ এবং গাছ-গাছালি লাগানোর ফলে তাহার স্বত্ব পাকিতে লাগিল। তাহার স্বত্ব দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিবার মূলে আছে এই সম্পর্কে তাহার বাহ্যিক ব্যবহার জাহিরুল হাল (ظاهر الحال)। অবশেষে ইমরান এই জমি দাবী করিল। বিলম্বের কারণে তাহার স্বত্বের দাবী এতদিনে দুর্বল হইয়া গিয়াছে। মুসলিম আইনের আধুনিক ভাষ্যকারগণ বলেন যে, দীর্ঘ বিলম্বের কারণে ইমরানের দাবী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারেন এবং গ্রাহ্য করিলেও প্রতি-কার দিতে বিরত থাকিতে পারেন। আবার আদালত যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, ইমরান তাহার জমি ফেরৎ পাইবে তবে সে ক্ষেত্রে আকবর জমির উপর ইমারত নির্মাণ করিতে এবং বৃক্ষাদি রোপন করিতে যে খরচ করিয়াছে তৎ-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে। ইমরান কোন অবস্থায় মূল্য না দিয়া ঐ ইমারত এবং বৃক্ষাদিসহ জমি ফেরৎ পাইতে পারেন না। এমতাবস্থায় জমির দাম দিয়া আকবর ইমরান হইতে কিনিয়া লইতে পারেন। সম্পত্তি যদি অস্থাবর হয় এবং সেই সম্পত্তির উন্নতিকল্পে অন্যায় দখলকার যদি কোন অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে তবে স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ অস্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে হইলে পূর্বে অন্যায় দখলকারীর ব্যয় পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি যদি উহা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে তিনি ঐ সম্পত্তি ফেরৎ পাইবেন না। তিনি অবশ্য উহার মূল্য উদ্ধার করিতে পারেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অন্যায় দখলকারকে একমাত্র স্বত্ববান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তাহার দখল হইতে উঠাইয়া দিতে পারে না। স্বত্ববান

www.pathagar.com

ব্যক্তি সম্পত্তি হিফাজতে রাখিবার জন্য আইনের কাছে যে সাহায্য দাবী করিতে পারে অন্যায় দখলকারীও আইনের কাছে অনুরূপ সাহায্য দাবী করিতে পারে। শক্তি প্রয়োগে সে নিজের দখল বজায় রাখিতে পারে। কেহ তাহার দখলে বাধা দিলে সে আইনগত সকল প্রতিকার পাইতে পারে। তাহার দখল নষ্ট হইলে সে উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারে বা ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে।

অন্যায় দখলকারীর দায়িত্ব

যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করে, সে স্বত্ববান ব্যক্তির কাছে ঐ সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য দায়ী হয়। দোষে বা বিনাদোষে ঐ সম্পত্তি যদি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয় তবে দখলকার দায়ী হয়। যে ব্যক্তি মালিকের বিনানুমতিতে এবং মালিককে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে মালিকের সম্পত্তি দখল করে তাহাকে অন্যায় দখলকার বা গাসিব (غاصب) বলে। যে ব্যক্তি আইনগতভাবে চুক্তি মূলে দখলে আসে এবং চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূর্বোক্ত অভিপ্রায় দখল বজায় রাখে সেই ব্যক্তিকে গাসিব বলা হয়।

স্বত্বমূলে দখল

স্বত্ববানের বিরোধিতা না করিয়া তাহার অনুকূলে বা পোষকতায় যে ব্যক্তি দখল করে সেই ব্যক্তির দখলকে মালিকের দখল গণ্য করা হয়। বন্ধক গ্রহিতা বা লিজ গ্রহিতার দখলকে সীমিত অর্থে তাহাদের দখল গণ্য করা হয়, মালিকের নয়। সেই কারণে লিজভুক্ত বা রেহেনভুক্ত সম্পত্তিকে দান করিতে হইলে উহা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। বন্ধক গ্রহিতা বা লিজ গ্রহিতার নিকট হইতে মালিক তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ফেরত পাইতে পারে না। যে চুক্তিমূলে রেহেন বা লিজ হইয়াছিল সেই মোতাবেক মালিককে দখল পাইতে হয়।

পূর্ণ বা অপূর্ণ দখল

দখলকে সেই সময় পূর্ণ বলে যখন মালিক বা তাহার লোক এককভাবে সম্পত্তি দখল করিতে পারে। মূশা বা এজমালি সম্পত্তির ক্ষেত্রে দখল অপূর্ণ থাকে। যৌথ সম্পত্তিতে সকল শরীকের প্রবেশের অধিকার থাকে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মালিকানা অর্জন

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ আদি অর্জন এবং দীর্ঘাধিকার

অর্জনের পদ্ধতি

প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু শক্তি লইয়া পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে। এই শক্তি যেমন দৈহিক তেমনি মানসিক। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শক্তি যেভাবে খুশী, ব্যবহার করিতে পারে। শক্তির এই ব্যবহারকে তাহার মৌলিক ও মানবিক অধিকার গণ্য করা যায়। এই অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ সম্পত্তি অর্জন করে, হস্তান্তর করে এবং নষ্ট করে।

আল মাজাল্লা মালিকানা অর্জনের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই তিনটি হইতেছে ইহরাজ (احراز), নকল (نقل) এবং খলফ (خلف)। যে বস্তু অন্যের মালিকাধীন নয়, সেই বস্তু গ্রহণ করিয়া বা দখল করিয়া উহার মালিক হওয়া যায়। ইহাকে ইহরাজ বলে। প্রাচীনকালে ইহাই অর্জনের সাধারণ পন্থা ছিল। মালিকের নিকট হইতে হস্তান্তর মূলে গ্রহণ করিয়া সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, ইহাকে নকল বলে। উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় ইহাকে খলফ বলে। খলফ পারিবারিক আইনের অন্তর্ভুক্ত।

আদি অর্জন

যে সম্পত্তি জনসাধারণের ভোগে ব্যবহার্য নহে তাহার কোন মালিক না থাকিলে উহা গ্রহণ করিয়া বা দখল করিয়া ঐ সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। মালিকহীন সম্পত্তিকে পাশ্চাত্য আইনের পরিভাষায় রেস নালিয়াস (Resnullius) বলে। রেস নালিয়াস-এর প্রকৃতির উপর উহার গ্রহণের পদ্ধতি নির্ভর করে। পর্বতের উপর যে গাছ জন্মে, তাহা রেস নালিয়াস রূপে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি নিজে ঐ গাছ কাটে কিংবা ভৃত্য বা শ্রমিক দ্বারা কাটাইয়া লয় সেই ব্যক্তি ঐ গাছ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। আকাশের পাখীকে যে ব্যক্তি উড়িয়া যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে সেই ব্যক্তি উহা

www.pathagar.com

গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করিবার জন্য যদি আরও কৌশলের প্রয়োজন থাকে তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ কৌশল অবলম্বিত হয় ততক্ষণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না। মাছ যতক্ষণ পানির এত গভীরে থাকে যে তাহাকে বিনা কৌশলে ধরা যায় না ততক্ষণ ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। গাছ যে ভাবে গ্রহণ বা দখল করা যায় ঘাসও তেমনভাবে গ্রহণ বা দখল করা যায়। যেখান হইতে সরবরাহ আসে সেস্হান হইতে পানি সরাইয়া লইয়া উহার দখল গ্রহণ করা লায়। বৃষ্টির পানি কলসীতে বা ট্যাঙ্কে জমাইয়া রাখিয়া দখল করা যায়। কূপ বা পুকুরে যে পানি পাওয়া যায় ঐ পানির উৎস ভূগর্ভ। পুকুরের বা কূপের পানির সহিত ভূ-গর্ভের স্রোত বিচ্ছিন্ন হয় না। এই কারণে কূপ বা পুকুরের পানির দখল সাধারণত একক হয় না। যে পতিত জমির কোন মালিক নাই বা যে পতিত জমি চারণভূমি বা বনভূমি নয় সেই পতিত জমি সংস্কার করিয়া রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে দখল করা যায়। চাষের জন্য বা সেচের জন্য প্রস্তুত করাকে সংস্কার করা বলে। দেয়াল দিয়া বা বেড়া দিয়া ঘিরিয়াও দখল করা যায়।

দীর্ঘাধিকার

দীর্ঘদিন দখল করিয়া অন্যের সম্পত্তির উপর মালিকানা অর্জন করা যায় না। ইসলামী আইনে দীর্ঘাধিকার ভিত্তিক অর্জনের অধিকার স্বীকৃত নয়। কিন্তু তুরস্কে এবং ইজিপ্টে আধুনিক কালে অপ্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘাধিকারের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানার্জন সম্ভবপর করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেশের কাযীদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যে সমস্ত মানুষের সম্পত্তিতে দীর্ঘদিনের দখল নাই সেই সমস্ত মানুষের মামলা, বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না। তাহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে রাষ্ট্রপতি যেমন কাযী নিয়োগ করিতে পারেন তেমন তাহার বিচারের এলাকাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। নির্দিষ্ট করিয়া দিবার সময় তিনি কাযীকে বলিতে পারেন যে, কাযী দীর্ঘকালের বেদখলকারীর মামলা গ্রহণ করিবেন না।

দীর্ঘাধিকারের ভিত্তিতে মালিকানা অর্জন করা যায় না কিন্তু সুখাধিকার (easement) অর্জন করা যায়। অন্যের জমির উপর দিয়া পথের অধিকার (বর্ত্ম-স্বত্ব) বা পানি নিষ্কাশনের এবং মহিলাদের পর্দার অধিকার অর্জন করা যায়। পর্দার অধিকারকে প্রাচীন আইনতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেন নাই। কতদিন ভোগ করিলে সুখাধিকার অর্জন করা যাইবে তাহা ইসলামী আইন

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই তবে এই ভোগকে প্রাচীন হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি নূতন ইমারত বানাইবার সময় তাহার বাড়ীর পানি অন্যের জমির উপর দিয়া বাহির করিয়া দিবার দাবী করিতে পারে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি

চুক্তি

হস্তান্তরের মাধ্যমেই সকল প্রকার সম্পত্তিতে বেশীর ভাগ মালিকানা অর্জন করা হয়। যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তির মালিক সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে প্রথম ব্যক্তির মালিকানা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর বর্তিয়া যায়। এই হস্তান্তর চুক্তির মাধ্যমে হইতে হয়।

ইসলামী আইনে চুক্তি

চুক্তির আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে আকদ (عقد)। আক্‌দ বলিতে বন্ধন বুঝায়। প্রস্তাব (ইজাব ايجاب) এবং গ্রহণ (কবুল قبول) এই দুই উপাদানের বন্ধনকে আক্‌দ বলা হয়। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ চুক্তিকে আরও সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে চুক্তির চারটি স্তর আছে। এই চারটি স্তর হইতেছে ফাআলিয়া (فاعلية), মাদ্‌দিয়া (مادية), সুরিয়া (صورية) এবং গাঈয়া (غائية)। চুক্তি যাহারা করেন তাহাদের কাজকে ফাআলিয়া বলে। চুক্তির যাহা সার অর্থাৎ প্রস্তাব এবং গ্রহণ তাহাকে মাদ্‌দিয়া বলে। চুক্তির মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাকে সুরিয়া বলে। চুক্তির যে উদ্দেশ্যে তাহাকে গাঈয়া বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক চুক্তিতে,

(১) দুইটি পক্ষ থাকিবে এবং
(২) এক পক্ষ প্রস্তাব দিবে এবং অন্য পক্ষ গ্রহণ করিবে এবং
(৩) উভয় পক্ষের মনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং
(৪) তাহাদের মতৈক্যের ফলে একটি আইনগত প্রতিক্রিয়া হইবে।

চুক্তির মৌলিক উপাদান হইতেছে প্রস্তাব এবং গ্রহণ। ইহার কোন একটির অভাবে চুক্তি নিষ্পন্ন হয় না। আকবর তাহার সম্পত্তি বশিরের নিকট বিক্রয় বা দান করিতে চাহিল। বশির তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। এইক্ষেত্রে বিক্রয় বা দান নিষ্পন্ন হয় নাই।

www.pathagar.com

দুই পক্ষের যে সমান সুবিধা বা লাভ থাকিতে হইবে চুক্তির মধ্যে এমন কিছু নাই। হিবা বা দানও এক প্রকার চুক্তি; কিন্তু ইহাতে একমাত্র দান গ্রহিতার লাভ।

ইসলামী আইনে চুক্তির মূলকথা হইতেছে যে ইহার দ্বারা দুই পক্ষের মতৈক্যের ফলে কোন সম্পত্তির উপর একটি আইনগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবর একটি সম্পত্তি বশিরের নিকট বিক্রয় করিল। আকবরের দিক হইতে সে ঐ সম্পত্তির মালিকানা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে দিতে সম্মত হইল। বশিরের দিক হইতে সে সমস্ত দায় সহ ঐ সমস্ত লইতে এবং আকবরকে বিক্রয়মূল্য দিতে সম্মত হইল। সম্পত্তি যদি জমি হয় তবে দায় বলিতে খাজনা প্রভৃতি বুঝায়, সম্পত্তি যদি জানোয়ার হয় তবে দায় বলিতে তাহার যত্ন লওয়া এবং খাওয়ানো বুঝায়। বিক্রয় না হইয়া দান হইলে দান গ্রহিতা দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কৃতজ্ঞতা এমন একটি মহান গুণ যাহা ইসলামী আইন অস্বীকার করে না।

আইনগত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই সম্পর্ক পূর্ণ করা, এই দুইটি কাজ ইসলামী আইনে এক নহে। চুক্তিকে পূর্ণ করিবার পদ্ধতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কোন বস্তু হস্তান্তর করিতে হইলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ বস্তুর দখল হস্তান্তরিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর পূর্ণ হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষবৃন্দ দখল হস্তান্তর ব্যতিরিকে শুধুমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি নিষ্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে শুধু এক পক্ষের লাভ হয়, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির দখলার্পণ না হইলে চক্তি কার্যকর হয় না। দানের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্পত্তিটি দানগ্রহীতার দখলে অর্পিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না এবং সেই কারণে দান দখলার্পণ না হইলে দান সিদ্ধ হয় না। কিন্তু জামিনের চুক্তিতে এইরূপ দখলার্পণের প্রশ্ন উঠে না। ওয়াক্ফ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা গ্রহণ করিবার জন্য মোতোয়াল্লি থাকা প্রয়েজন।

চুক্তির গঠন পদ্ধতি

ইসলামী আইনে চুক্তি করিবার জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নাই। যাহার প্রয়োজন তাহা হইতেছে চুক্তির পক্ষবৃন্দের ঘোষণা। প্রথম ঘোষণাকে প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় ঘোষণাকে গ্রহণ বলে। প্রস্তাব এবং গ্রহণ একই মজলিসে হওয়া আবশ্যক। মজলিসকে অবশ্য উদার অর্থে গ্রহণ করিতে

www.pathagar.com

হয়। দবির কবিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নিকট তিন হাজার টাকায় তাহার অশ্ব বিক্রয় করিবার কথা ঘোষণা করিল। দবিরের এই ঘোষণাকে প্রস্তাব বলে। কবির ঘোষণা করিল যে, সে তিন হাজার টাকা মূল্যের বিনিময়ে দবিরের অশ্ব লইবে। কবিরের এই ঘোষণাকে গ্রহণ বলে। কবির কোন ঘোষণা না করিয়া যদি স্থান ত্যাগ করিত, তবে কোন চুক্তি হইত না। দবির তাহার ঘোষণা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুক্ত রাখিতে বাধ্য নয়। কবির ভিন্ন-স্থানে অবস্থান করিলেও দবির তাহার অশ্ব কবিরের নিকট তিন হাজার টাকায় বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দূত বা পত্র মাধ্যমে প্রেরণ করিতে পারিত এবং দবিরের প্রস্তাব পাইবামাত্র কবির যদি উহা গ্রহণ করিত তবে চুক্তি হইয়া যাইত। যে স্থানে বসিয়া এবং যে সময় কবির প্রস্তাব পাইয়াছিল সেই স্হানে এবং সেই সময়ে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে হইত। কবির যদি কিছুই না বলিত বা অস্বীকার করিত তবে চুক্তি হইত না। গ্রহণ অবশ্যই প্রস্তাবের মর্মানুসারে হইতে হইবে। যে শর্তের সহিত প্রস্তাব দেওয়া হইবে, সেই শর্তের সহিত উহা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত শর্তের উপর দুইটি মনকে মিলিতে হইবে, তবেই চুক্তি হইবে।

চুক্তি করিবার সময় পক্ষবৃন্দ স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। কখনো কখনো তাহাদের ভাষা অস্পষ্ট হইতে পারে। যেখানে ভাষা স্পষ্ট, সেখানে চুক্তির পক্ষবৃন্দের অভিপ্রায় বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই। ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেই তাহাদের অভিপ্রায় নিহিত থাকে। কিন্তু ভাষা যেখানে অস্পষ্ট সেখানে পক্ষবৃন্দের অভিপ্রায় জানিতে সন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। মূল কথা হইল পক্ষবৃন্দের মনের মিলন। চুক্তি নির্ণয় কল্পে ইহাই একমাত্র প্রশ্ন।

চুক্তির শর্ত

চুক্তির প্রথম শর্ত হইতেছে চুক্তির পক্ষবৃন্দের আইনভিত্তিক যোগ্যতা। যাহারা চুক্তি করিতেছেন তাহারা যদি অযোগ্য হন তবে চুক্তি হয় না। অযোগ্য ব্যক্তিদের চুক্তি আদি হইতেই বাতিল গণ্য হয়। চুক্তির জন্য সম্মতির প্রয়োজন। সম্মতি দিতে হইলে বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধিহীনের সম্মতির কোন আইনগত মূল্য নাই। সম্পত্তি যেখানে দান করা হইতেছে সেখানে দাতাকে পরিপক্ক বুদ্ধির মানুষ হইতে হইবে।

চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে ইহার বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা। যাহা লইয়া চুক্তি করা হইতেছে তাহা যদি চুক্তির অনুপযুক্ত হয় তবে সেই চুক্তি সর্বতোভাবে

www.pathagar.com

আদিতে বাতিল। এইস্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে একটি মূলভাব বর্তমান। সেই মূলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। সকল প্রকারের হস্তান্তরের মধ্যে সেই মূলভাবের প্রভাব বিদ্যমান। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মতে সেই মূলভাব হইতেছে দখলার্পণ ; অর্থাৎ যিনি যাহা হস্তান্তর করিতেছেন তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট অর্পণ করিবেন। কালক্রমে এই নীতির রূঢ়তা নমনীয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রভাব একেবারে কোন সময়েই মুছিয়া যায় নাই। লীজ এবং ইজারা প্রভৃতির ক্ষেত্রে হস্তান্তরের সময় হাতে হাতে কিছু অর্পণ করা যায় না। তবুও কালক্রমে এই প্রকার চুক্তিও ইসলামী আইনে সমর্থন লাভ করিয়াছে। ওয়াক্ফ এবং দানের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের এই মূলভাব অতি স্পষ্ট। যাহা দান বা ওয়াকফ করা হয় তাহা প্রথমত স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি হইবে এবং দ্বিতীয়ত, দান বা ওয়াকফের সময় অস্তিত্বশীল থাকিবে এবং তৃতীয়ত, দাতা বা ওয়াকিফ তন্মুহূর্তে সকল প্রকার স্বত্বাধিকার নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবে। উইলের ক্ষেত্রে অবশ্য নালিশযোগ্য দাবীও হস্তান্তর করা যায়। তাহার কারণ উইল এবং মিরাস প্রায় একই প্রকৃতির।

চুক্তির সময় যাহার অস্তিত্ব অবর্তমান, তাহা লইয়া চুক্তি করা যায় না। যাহা বিক্রয় করা হইবে তাহা যদি বর্তমান না থাকে তবে ঐ বস্তু লইয়া চুক্তি করা ইসলামী আইনে অসিদ্ধ। চুক্তিতে এবং সেই কারণে ক্রয় বিক্রয়ে উভয় পক্ষের মনের ঐক্যের প্রয়োজন এবং যাহা ক্রয়-বিক্রয় হইবে তাহার উপর মনের ঐক্য প্রয়োজন। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার উপর মনের ঐক্য বা সম্মতি ইসলামী আইন স্বীকার করে না। চুক্তি সম্পূর্ণ হইবার পরে এমনকি বস্তু দখল লইবার পরও ক্রেতা কয়েকটি বিশেষ কারণে চুক্তিকে অস্বীকার করিতে পারেন। কারণগুলির মধ্যে একটি হইতেছে বিক্রিত সম্পত্তির ত্রুটি। ক্রয় করিবার সময় যদি ক্রেতা সম্পত্তি না দেখিয়া থাকেন এবং দেখিয়া থাকিলেও যদি ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত না হইয়া থাকেন তবে তিনি চুক্তি নাকচ করিতে পারেন। ক্রেতা যাহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন তিনি যদি তাহা না পাইয়া থাকেন তবে সেই ক্রয়চুক্তিতে তিনি বাধ্য নন। এখানে প্রতারণা বা সাবধানতার কোন প্রশ্ন নাই। এখানে বিক্রেতা বলিতে পারেন না যে তিনি কোন প্রতারণা করেন নাই অথবা ক্রেতা সতর্ক হইলেই ত্রুটি দেখিতে পাইতেন। এইসব কথা বলিয়া তিনি চুক্তি বহাল রাখিতে পারেন না। অবশ্য স্পষ্টভাবে দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়া যে ক্রয়চুক্তি করা হয় তাহা ক্রেতা রদ করিতে

www.pathagar.com

পারেন না। বিক্রেতা তাহার সম্পত্তির জন্য যে কোন মূল্য দাবী করিতে পারেন। আইন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। প্রতারণা করিয়া যদি ঠকাইবার উদ্দেশ্যে ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রভাবিত করেন এবং প্রভাবিত হইয়া বিক্রেতা যদি অল্পমূল্য লইতে স্বীকৃত হয় তবে সেই চুক্তি রদযোগ্য হয়। যখন বিনিময় করা হয় তখন বিনিময়ের উভয় বস্তুকেই সমমূল্যের হইতে হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যে একেবারে কম হইলে আইন হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

যে সমস্ত শর্ত বা সীমা চুক্তিতে নাও থাকিতে পারে

চুক্তির প্রকৃতির উপর তাহার শর্ত এবং সীমা নির্ভর করে। যে শর্ত এক পক্ষের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক, সেই শর্তকে যদি চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করা হয় তবে সেই চুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। যে শর্ত চুক্তির পরিপন্থী তাহা চুক্তিকে দুষিত করে। দান বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির মুহূর্তেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সেই কারণে যদি বলা হয় যে দান বা বিক্রয় ভবিষ্যতের একটি তারিখে কার্যকর হইবে তবে সেই দান বা বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। দান বা ওয়াকফকে সিদ্ধ হইতে হইলে শর্তহীন এবং অবাধ হইতে হয়। কিন্তু উইলের ক্ষেত্রে খাজনা গ্রহণের অধিকার একজনকে এবং জীবন স্বত্ব অন্য-জনকে দেওয়া যায়। উইলের ক্ষেত্রে যিনি সম্পত্তির প্রথম প্রাপক হইবেন তাহাকে উইলকারীর মৃত্যুর সময় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। একজনের পর অন্যজন পাইবে এইরূপ ভাবে দান বা বিক্রয় করা যায় না। যাহা দান বা বিক্রয় হয় তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব দানগ্রহীতা বা ক্রেতার কাছে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় ক্রমিক পর্যায়ে পাইবে এমন শর্তে একাধিক ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করা যায় না। ওয়াকফের বেলায় হস্তান্তরের তাৎপর্য অন্যরূপ। ওয়াকফ দ্বারা সম্পত্তিকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা হয়। এই স্থায়ীভাবে ধৃত সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে ওয়াকফের মূল কথা। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হইতে যাহারা উৎপাদনের অংশ পাইবেন তাহারা প্রায় বৃত্তিভোগীর মত। বৃত্তিভোগিগণ ক্রমিক পর্যায়ে হইতে পারে; তাহাতে কোন বাধা নাই। বৃত্তিভোগিগণ স্বত্বভোগী নহেন। ইসলামী আইনের পরিপন্থী না হইলে যে কোন প্রশংসনীয় কাজে ওয়াকফ করা যায়।

www.pathagar.com

চুক্তির সহিত যে শর্ত অনুকূল তাহা সিদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত পণ না দেওয়া হয়, ততদিন বিক্রীত সম্পত্তির দখল ক্রেতা পাইবে না—এই প্রকার শর্ত বৈধ। বিক্রয় মূল্যের জামানতের জন্য কোন দ্রব্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখিবে – এই প্রকার শর্ত বৈধ। চুক্তির সহিত প্রথাগতভাবে যে সমস্ত শর্ত আনুষংগিক, তাহা বৈধ। এই শর্তে পোষাক বিক্রয় করা যায় যে প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা উহা রিফু করিয়া দিবে। তালাচাবি বিক্রয় কালে বিক্রেতা উহা যথাস্থানে লাগাইয়া দিবে এমন ব্যবস্থা চুক্তির মধ্যে হইতে পারে।

যে শর্ত কোন পক্ষের উপকারে না আসে তাহা বলবৎযোগ্য নয়। যে শর্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ না হইয়া উহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং যে শর্ত চুক্তির অনুকূল নহে তাহা বলবৎযোগ্য নয়। দান করিবার সময় দানকৃত সম্পত্তির ব্যবহার-বিধি বলিয়া দিলে ঐ ব্যবহার বিধি সম্পর্কে শর্তটি বলবৎযোগ্য হয় না।

যৌথ চুক্তি

একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন। ঠিক একই ভাবে চুক্তির প্রতিটি পক্ষে একাধিক ব্যক্তি থাকিতে পারেন। এইরূপ চুক্তিকে যৌথচুক্তি বলে। চুক্তিমূলে যাহা পাওয়া যায়, যৌথ চুক্তিতে তাহার উপর সকলের মালিকানার উদ্ভব হয়। যদিও যৌথ চুক্তির ফলে সকলেই মালিক হয় তবুও ঐ চুক্তি কার্যকর করিবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের প্রতি-নিধিরূপে কাজ করিতে পারেন। সুতরাং চুক্তিকে কার্যকরী করিবার জন্য যেকোন একজন অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকারকারী পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। সেই মামলায় সকল অঙ্গীকারগ্রহীতার সকলকে পক্ষ করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু চুক্তি কার্যকরী হইবার পরে যে ফল লাভ হয় তাহাতে সকলের অংশ মোতাবেক অধিকার জন্মে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ব্যক্তি এমন কিছু করিতে পারেন না যাহার দ্বারা অন্যের স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে। একজন যৌথ মহাজন খাতককে ঋণ শোধ করিবার জন্য সময় মঞ্জুর করিতে পারেন না।

চুক্তির শ্রেণীবিন্যাস

ইসলামী আইনে চুক্তিকে নিম্নবর্ণিত চার শ্রেণীতে বিভক্তি করা হইয়াছে ঃ

(১) সম্পত্তি হস্তান্তর। সম্পত্তি হস্তান্তরকে আবার চার উপ-বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

(ক) বিক্রয়--বিক্রয়ে বিনিময়-মূল্য থাকিতে হইবে।

(খ) হিবা—হিবাতে কোন বিনিময়-মূল্য নাই।

(গ) উৎসর্গ—কোন সম্পত্তিকে ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার নামে উৎসর্গ করা যায়।

(ঘ) উইল -ইহার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সৃষ্টি করা যায়।

(২) উৎপাদ হস্তান্তর। সম্পত্তিতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই উৎপাদ বলে। এই শ্রেণীকে আবার দুই উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) ইজারা—স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্থের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া যায়। খিদমতের জন্য চুক্তি করা যায়। মাল বহন বা সম্পত্তি হিফাজতের জন্য অর্থের বিনিময়ে চুক্তি হইতে পারে। গৃহের কাজ বা বৃত্তি-মূলক কাজের জন্য চুক্তি হইতে পারে।

(খ) আরিয়াত এবং ওয়াদিয়াত—কর্জকে আরিয়াত এবং আমানতকে ওয়াদিয়াত বলা হয়।

(৩) রেহেন এবং জামানত। রেহেন এবং জামানতের মাধ্যমে অর্থ লাভ করার জন্য চুক্তি হইতে পারে। প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারিত্বের জন্য চুক্তি হইতে পারে।

(৪) বিবাহ।

বিক্রয়, বিবাহ, হিবা এবং ওয়াক্‌ফ কোন সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। লিজ, জামানত এবং ওয়াসিয়াত সম্ভাবনার উপর নির্ভর-শীল হইতে পারে।

অধীন-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয়

যে স্বত্ব বা অধিকার ব্যক্তিগত প্রকৃতির বা অধীন, সেই স্বত্ব বা অধি-কার হস্তান্তরযোগ্য নয়। এই স্বত্ব বা অধিকার চুক্তির দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, আবার আইনের মাধ্যমে উদ্ভব হইতে বারে। যেভাবেই হোক না কেন, যেহেতু এই অধিকার ব্যক্তিভিত্তিক তাই ইহা হস্তান্তরযোগ্য নয়। কিন্তু স্বত্ব-বান বা অধিকারী ব্যক্তি সম্পত্তি দিলে ইহা হস্তান্তরযোগ্য হয়। এইরূপ হস্তান্তরকে হাওয়ালাত (حوالة) বলে। হাওয়ালাত বলিতে নবায়ন বুঝায়। বশির আকবরের নিকট হইতে কিছু অর্থ ধার করিল। আকবর সগীরের

www.pathagar.com

নিকট হইতে কিছু অর্থ ধার করিল। এমতাবস্থায় এই তিন ব্যক্তি এই মর্মে সম্মত হইতে পারে যে, সগীর তাহার পাওনা আকবরের নিকট হইতে আদায় না করিয়া বশিরের নিকট হইতে আদায় করিবে। সাধারণভাবে প্রমিসরি নোট বা বিল অব একচেঞ্জ (সুফনজা سفتجة) আইনগ্রাহ্য দলিল নয়। কিন্তু কোন দেশে যদি এই সমস্ত হুণ্ডি প্রচলিত থাকে তবে সেই সমস্ত দেশে এই-গুলি আইনসম্মত হইবে। এই সমস্ত অধিকার আইনের মাধ্যমে অন্যের উপর বর্তাইবে।

বিক্রয়

সমপরিমাণ বা সমতুল্য সম্পত্তির বিনিময়ে কোন স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তর করাকে বিক্রয় বলে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় বিক্রয় বাই (بيع) নামে অভিহিত হয়। স্পর্শযোগ্য সম্পত্তিকে মাল বলে। দৈনন্দিন জীবনে হস্তান্তরের সকল বস্তুকে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকিলে মাল হস্তান্তর না হইলেও বিক্রয় সম্পূর্ণ হইতে পারে। তবে যে কোন অবস্হাতেই উভয় পক্ষের সম্মতি ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই ঘোষণা ভাষার দ্বারা হইতে পারে আবার আচরণের দ্বারাও হইতে পারে।

যাহা মাল নহে তাহা বিক্রয়ের বস্তু হইতে পারে না। হানাফীদের মতে যাতায়াতের অধিকার মাল না হইলেও ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। কিন্তু কোন দেশে যদি শুধু স্বত্ব বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত থাকে তবে সেই দেশে উহা আইন-সিদ্ধ গণ্য হয়। প্রথার স্হান কিয়াসের উপরে। হেদায়া বলে, কিয়াসকে প্রথা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে মাল না হইলেও স্বত্ব বা অধিকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য হয়।

বিক্রয়ের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় বিক্রয় চার প্রকার হয়ঃ

(১) বাই (بيع) বা প্রকৃত বিক্রয়। ইহাতে বিশেষ দ্রব্য মূলের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়।

(২) বিনিময় বা মুকাইদা (مقايضه)। ইহাতে একটি নির্দিষ্ট বস্তু অন্য একটি নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়।

www.pathagar.com

(৩) সরফ (صرف) ইহাতে মূল্যের বিনিময়ে মূল্য বিক্রয় করা হয়।

(৪) সালাম (سلم) ইহাতে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে মূল্য বিক্রয় করা হয়।

ইসলামী আইনে কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয় (মাবিয়া مبيع) এবং কোন বস্তু মূল্য (সামান ثمن) তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। ইহা লইয়া ইসলামী আইনে অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইসলামী আইনে যাহা বিক্রয় হয় তাহা ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধার করা যায় কিন্তু মূল্যের বেলায় অন্যরূপ হয়। বিক্রীত বস্তু নষ্ট হইয়া গেলে চুক্তি ব্যর্থ হয় কিন্তু মূল্য নষ্ট হইয়া গেলে চুক্তি ব্যর্থ হয় না। আদান-প্রদানের বিষয়বস্তু অসমপ্রকৃতির হইলে উহাদিগকে বিক্রীত বস্তু গণ্য করা হয়। আদান-প্রদানের বস্তু সমপ্রকারের হইলে উহাদিগকে মূল্য গণ্য করা হয়।

বিক্রয়ের শর্ত

বিক্রয়ের জন্য দুইটি অবশ্য পালনীয় শর্ত বিদ্যমান। এই দুইটি শর্ত বিক্রয়ের বিষয়বস্তুভিত্তিক। প্রথম শর্ত হইতেছে এই যে বিক্রয়ের বিষয়বস্তু, সালাম বিক্রয় ব্যতীত, বিক্রয়কালে অস্তিত্বশীল হইবে। দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে এই যে, ইসতিসনা বিক্রয় ব্যতীত, বিক্রয়কালে বিক্রয়ের বস্তু ক্রেতার দখলে অর্পণযোগ্য হইবে। পুকুরের মাছ সহজে দখল দেওয়া যায় না সেই কারণে পুকুরের মাছ বিক্রয় আইনসম্মত নহে। সর্বাবস্থায় বিক্রয়ের বিষয়বস্তুকে পরিচিত এবং নির্দিষ্ট হইতে হইবে অন্যথায় বিক্রয় ত্রুটিপূর্ণ গণ্য হইবে।

যে আদান-প্রদানের মধ্যে ঝুঁকি থাকে বা যাহার মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে সেই আদান-প্রদান আইনসম্মত নহে। গাভীর ওলানস্থিত দুধ বিক্রয় তাই আইনসম্মত নহে। নিষ্কাশনের জন্য খাত নাই, এমন স্থানে পানি নিষ্কাশনের অধিকার ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য নহে। যে আদান-প্রদানের ভিত্তি হইতেছে সম্ভাবনা বা লটারী জাতীয় কিছু বা জুয়া, তাহা ইসলামী আইনে অসিদ্ধ গণ্য হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রচলিত মুজাবানা এবং মুনাবাদা এই নীতির ফলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে।

সালাম

সালাম একটি আরবী শব্দ; ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে অগ্রিম। যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভবিষ্যতে লাভ করিবার আশায় অপর কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে মূল্য প্রদান করে, তখন তাহাদের এই আদান-প্রদানকে সালাম বলে। যে বস্তু বা দ্রব্যের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হয়, চুক্তির সময় তাহার অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে। ঐ বস্তুকে পাইবার জন্য যে ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিয়াছে নির্দিষ্ট দিনে বস্তুটি তাহার কাছে পৌঁছিলেই আইনের দাবী মিটিয়া যায় এবং এই আদান-প্রদান সিদ্ধ গণ্য হয়। সালাম-বিক্রয়ে চুক্তির সময় মূল্য প্রদান করা হয় এবং বিক্রীত দ্রব্যের হস্তান্তরের জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে মূল্য মনে করা হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান হইলে ইহার প্রত্যেকটিকে অপরটির মূল্য গণ্য করা হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত আর প্রায় সবকিছুই সালাম-বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হইতে পারে। যে বস্তু গালাইয়া বা ওজন দিয়া বিক্রয় করা হয় তাহা সালাম-বিক্রয়ের আওতায় আসিতে পারে। শিল্পগতভাবে, গুণগতভাবে এবং পরিমাণগতভাবে যে বস্তুর বর্ণনা করা যায় তাহা সালাম-বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হইতে পারে। হানাফীদের মতে জানোয়ারকে এইভাবে বিক্রয় করা যায় না। শাফিঈগণ মনে করেন যে, জানোয়ারকেও এইভাবে বিক্রয় করা যায়। হানাফিগণ বলেন যে, জানোয়ারকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা কঠিন। শাফিগণ ঐ প্রশ্নের মধ্যে যাইতে চাহেন না। তাহারা বলেন, যে বস্তু ক্রেতার দখলে অর্পণ করা যায় তাহা বিক্রয় সিদ্ধ। তাহারা আরও বলেন যে, নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে বস্তুটির অস্তিত্ব না থাকিলেও চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। হানাফিগণ বলেন, যেদিন চুক্তি হয় এবং যেদিন দখল বুঝাইয়া দেওয়া হয় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সকল সময়ের জন্য বস্তুটিকে অস্তিত্বশীল হইতে হইবে। শাফিঈগণ এই ব্যাপারে অনেক উদার। তাহারা এতদূর যাইতে চাহেন যে তাহাদের মতে এই চুক্তির মধ্যে দখল বুঝাইয়া দিবার দিন স্থির থাকিবারও প্রয়োজন নাই। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সালাম চুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত সাতটি শর্ত পূর্ণ হইবে ঃ

(১) বস্তুটির মূল নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে। শস্য বলিলে চলিবে না, বলিতে হইবে গম বা যব।

(২) বস্তুটি যে বিশেষ প্রকৃতির, তাহার বর্ণনা থাকিতে হইবে। খালের পানিতে বা বৃষ্টির পানিতে সেচ দেওয়া হইলে কোন প্রকার সেচের জমিতে ঐ গম বা যব জন্মিয়াছে তাহা বলিতে হইবে।

(৩) বস্তুটির গুণ বলিতে হইবে। মোটা দানার না চিকন দানার তাহা স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে।

www.pathagar.com

(৪) পরিমাণের উল্লেখ থাকিতে হইবে। কত মণ বিক্রয় করা হইল তাহা নির্দিষ্ট হইতে হইবে।

(৫) দখল বুঝাইয়া দিবার তারিখের উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৬) দখল কোন স্থানে দেওয়া হইবে তাহারও উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৭) পরিবহনের খরচ লাগিবে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

সালাম চুক্তিতে কোন পক্ষ চুক্তি রদের অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। তবে বিষয়বস্তু যদি ত্রুটিপূর্ণ বাহির হয় তবে সেই কারণে চুক্তি রদ হইতে পারে। এই আদান প্রদানে ক্রেতা জিনিসের দখল পাইবার পূর্বে উহা বিক্রয় করিতে পারেন না।

ইসতিসনা

কোন শিল্পী বা কারিগরের সহিত কোন দ্রব্য নির্মাণ করিবার জন্য যে চুক্তি করা হয়, তাহাকেই সাধারণভাবে ইসতিসনা বলা হয়। এই চুক্তিতে বিক্রয়ের বিষয়বস্তু চুক্তির সময় আদন-প্রদান হইতেই পারে না। ইহার মূল্য অগ্রিম না দিলেও চলে। ব্যাবসায়ের প্রয়োজনে এই জাতীয় আদান-প্রদান সিদ্ধ গণ্য হয়। রসূলুল্লাহ্‌র জামানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই আদান-প্রদান ইজারা এবং বিক্রয় উভয় প্রকৃতির গুণ বহন করে। কোন পক্ষের মৃত্যু হইলে এই চুক্তি বাতিল হইয়া যায়, আবার ক্রেতা যদি দেখে যে বস্তুটি তাহার আদেশমাফিক হয় নাই তবে সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে।

সরফ

কোন বস্তু যখন সমশ্রেণীর অন্য এক বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তখন সেই বিক্রয়কে সরফ বলে। স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই শ্রেণীর বস্তু। এই বিক্রয়ে দুইটি শর্ত অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হয়। প্রথম শর্ত হইতেছে এই যে, উভয় বস্তুরই দখলার্পণ হইতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে এই যে, উভয় বস্তু ওজনে সমান হইতে হইবে। স্বর্ণ বা রৌপ্য যখন মুদ্রা বা অলংকারে রূপান্তরিত হয় তখনও তাহাদের উপর এই শর্তাবলী প্রযুক্ত হয়। তাহারা সব সময়েই মূল্যরূপে পরিগণিত হয়। যখন স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে এবং রৌপ্য স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়, আইন তখন যাহাতে এই বিক্রয় নিরপেক্ষ হয় সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখে। এই বিক্রয়েও চুক্তির সময় উভয় বস্তুর

www.pathagar.com

দখলার্পণ আবশ্যক। রিবা (ربوا) নীতির প্রয়োগের কারণে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে এই শর্তসমূহ আরোপিত হয়।

রিবা

রিবা শব্দের অভিধানিক অর্থ হইতেছে বৃদ্ধি। বাংলা ভাষায় ইহাকে সুদ বলা হয়। রিবার নীতি সাধারণভাবে বিক্রয়ের উপর প্রযুক্ত হয়। ইসলামী আইনে কর্জও এক প্রকার বিক্রয়। যে পরিমাণ অর্থ ধার করা হয়, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। অর্থের বদলে অর্থ প্রদানকে তাই ইসলামী আইনে কর্জ গণ্য করা হয়। ইহার উপর রিবার নীতি প্রযুক্ত হয়। রিবার নীতি একটি হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হাদীসে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, "স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য. গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ, প্রকৃতিতে এক, পরিমাণে এক, হাতে হাতে বিক্রয় কর ; বস্তুনিচয়ের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকিলে যথা ইচ্ছা কিন্তু হাতে হাতে বিক্রয় কর।" এই হাদীস সাধারণভাবে সুন্নী সম্প্রদায় প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু হযরত উমর এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন বলিয়া দাবী করা হয় তাহা হাদীসটির পরিপন্থী। হযরত উমর বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ রিবা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেন নাই। আল কুরআনে ইহা দ্ব্যথ বোধক রহিয়া গিয়াছে।

আল কুরআন রিবাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

রিবার নীতির উপর যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে। ইহার উপর প্রবল মতানৈক্য বিদ্যমান। মুসলিম বিশ্বে ইহার প্রচলনও নানাবিধ। প্রাচীন কালে হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন যে, একই প্রকৃতির দুইটি বস্তু আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে বিক্রয় নিষ্পন্ন হয় তাহাতে পরিমাণের সমতা থাকিতে হইবে, উভয় বস্তুকে সমপরিমাণের হইতে হইবে। প্রাচীন শাফিঈ আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, রিবা মাত্র তিন প্রকার বস্তু বিক্রয়ের উপর প্রযুক্ত হয়। যথা—খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণ এবং রৌপ্য।

আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয়ের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য থাকিলে উভয় বস্তুর পরিমাণের সমতা রক্ষা আইনের নির্দেশ নয়। কিন্তু উভয় বস্তু একই প্রকৃতির হইলে তাহাদের পরিমাণ বা ওজন একই হইতে হইবে। কিন্তু চুক্তির সময় দখলার্পণ আবশ্যক। আদান-প্রদানের বস্তু যদি ভিন্ন প্রকৃতির হয় এবং ওজন দিয়া যদি তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় না করা হয় তবে সে মুনাফা আইনসঙ্গত হয়। এইরূপ চুক্তিতে দখলার্পণ বিলম্বে করা যায়।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্‌র জামানায় গম, জব, খেজুর এবং লবণ পাত্রের মাপে বিক্রয় করা হইত। এইগুলির উপর রিবার নীতি প্রযোজ্য। পাত্রে না বিক্রয় করিয়া গম ওজনে বিক্রয় করিলে তাহার উপর রিবার নীতি প্রযুক্ত হয়। দারুল হরবে অমুসলিমের সহিত মুসলিমের তেজারতিতে রিবার নীতি প্রযুক্ত হয় না। অবশ্য আবু ইউসুফ এবং শাফিঈ এই মত পোষণ করেন না।

রিবার নীতি অনেক জটিলতার সৃষ্টি করিতে থাকে। এই জটিলতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আইনতত্ত্ববিদগণ অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে শুরু করেন। একটি কৌশলের নাম হইতেছে বাঈ-উল-ওয়াফা (بيع الوفاء)। ইসলামী আইনে জরুরিয়াতের প্রয়োজনে নীতিকে নমনীয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

বাঈ-উল-ওয়াফা

বাই-উল ওয়াফা এক প্রকার রেহেন। ইহাতে বিক্রীত সম্পত্তি ক্রেতার দখলে চলিয়া যায়। কিন্তু শর্ত থাকে যে, যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পত্তির মূল্য ফেরত দিবে তখন ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রেতার বরাবরে ফিরাইয়া দিবে। ইহাকে বিক্রয় বলা যায় এই কারণে যে, ক্রেতা সম্পত্তির দখলে থাকিবে। ইহাকে ত্রুটিযুক্ত বিক্রয় বলা যায় এই কারণে যে পক্ষবৃন্দ এই চুক্তিকে নাকচ করিতে পারে। ইহাকে রেহেন বলা যায় এই কারণে যে, ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না। যে কারণে বাঈ-উল-ওয়াফা সিদ্ধ গণ্য করা হয় সেই কারণে সরকারী জামানতে বা সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ খাটানকে সিদ্ধ বলা যায়। মুসলিমগণ এই প্রকার আদান-প্রদান বহুলভাবে করিয়া আসিতেছেন এবং ইহা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

সিদ্ধ বিক্রয়ের প্রতিক্রিয়া

বিক্রয়চুক্তি নিষ্পন্ন হইবা মাত্র সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রেতার স্বত্বাধীনে চলিয়া যায় এবং বিক্রেতা মূল্য পাইতে হকদার হয়। এই চুক্তি অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে রদসাপেক্ষ। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রেতা মূল্য প্রদান করে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সম্পত্তিতে দখল চাহিতে পারেন না। মূল্যের জন্য বিক্রেতার কাছে সম্পত্তি জামানত থাকে। ধারে বিক্রয় হইলে মূল্য বাকী থাকার কারণে সম্পত্তির উপর বিক্রেতার কোন স্বত্ব থাকে না।

www.pathagar.com

বিক্রীত বস্তু দখলার্পণের জন্য যে খরচের প্রয়োজন পড়ে তাহা বিক্রেতা বহন করিতে বাধ্য। মূল্য দিবার ক্ষেত্রে যদি কিছু আনুষংগিক খরচ হয় তাহা ক্রেতা দিবেন। ক্রেতা পরিবহনের খরচ বহন করিবেন এবং বিক্রেতা রেজিষ্ট্রেশনের খরচ বহন করিবেন।

কোন দ্রব্য বিক্রয় হইলে তাহার সহিত নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বস্তুও বিক্রয় হইয়া যায়।

(১) বিক্রীত দ্রব্যের সহিত যে বস্তুর যাইবার প্রথা বিদ্যমান তাহা বিক্রীত গণ্য হয়।

(২) বিক্রীত বস্তুর যাহা অংশ বা বিক্রীত বস্তুকে আহত না করিয়া যাহা ছিন্ন করা যায় না, তাহা বিক্রীত হইয়া যায়।

(৩) স্থায়ীভাবে আটকানো বস্তুগুলিও বিক্রীত গণ্য হয়।

(৪) বিক্রয়ের চুক্তির ভাষায় আওতার মধ্যে যাহা আসে তাহা বিক্রীত হইয়া যায় এবং

(৫) চুক্তি সম্পাদানের পর যাহা যুক্ত হয় তাহা বিক্রীত গণ্য হয়।

বিক্রয় রদ

নিম্নবর্ণিত কারণে বিক্রয় রদ (ফেসখ فسخ) গণ্য হয় বা করা যায় ঃ

(১) পূর্বে চুক্তি থাকিলে সেই মোতাবেক বিক্রয় রদ করা যায় (খেয়ারুশশর্ত (خيار الشرط)

(২) চুক্তি থাকিলে, ত্রুটি দেখা গেলে বা বিক্রীত বস্তু দখলার্পণের পূর্বে নষ্ট হইয়া গেলে বা কোন প্রকার প্রতারণা ঘটিলে চুক্তি রদ করা যায়। (খেয়ারুল আঈব خيار العيب)

(৩) পক্ষবৃন্দের সম্মতি মতে চুক্তি রদ করা যায় (খেয়ারুত তাগরির (خيار التغرير) ।

হিবা

বিনিময়ে কিছু না পাইয়া সম্পত্তির মালিক যখন তাহার সম্পত্তিকে অন্যের বরাবরে হস্তান্তর করে তখন সেই হস্তান্তরকে ইসলামী আইনে হিবা বলে। দাতা প্রস্তাব করিবেন এবং দানগ্রহীতা গ্রহণ করিবেন তবেই হিবা হইবে। তবে হিবাকে সম্পূর্ণ হইতে হইলে দখলার্পণ অত্যাবশ্যক। যতক্ষণ না পর্যন্ত দখলার্পণ করা হয় ততক্ষণ হিবা কার্যকরী হয় না। দান ঘোষণার

www.pathagar.com

পর কিন্তু দখলার্পণের পূর্বে দাতার মৃত্যু হইলে ঐ সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারী পায়। তবে দান ঘোষণার বরাবরে পরবর্তীকালে দখলার্পণ করা হইলে নতুন কোন ঘোষণার প্রয়োজন নাই।

মুশার দান

হানাফিগণের মতে হিবার মাধ্যমে যে দান করা হয়, তাহা পৃথক এবং নিরঙ্কুশ হইতে হইবে। তাহা না হইলে দান ত্রুটিপূর্ণ বা অসিদ্ধ হইবে। যে সম্পত্তি বিভাগযোগ্য তাহা ভাগ না করিয়া দান করিলে সেই দান অসিদ্ধ গণ্য হয়। হানাফীদের মতে এজমালী সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের দান সিদ্ধ নহে। মুশা-র শাব্দিক অর্থ গোলমাল। এজমালী সম্পত্তির স্বত্বের মধ্যে সর্বদাই গোলমাল দেখা যায়। প্রত্যেক শরীকের অধিকার এজমালী সম্পত্তিতে সর্বত্র। এজমালী সম্পত্তির অনু-পরমাণুতে প্রত্যেক শরীকের সমান অধিকার। এইখানেই গোলমালের কারণ। তবে পরবর্তীকালে যৌথ সম্পত্তি ভাগ করিয়া দান গ্রহীতার বরাবরে দানকৃত বিভক্ত অংশ নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে দান সিদ্ধ। হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় গাছের ফল এবং মাঠের শস্য এবং ভেড়ার লোম মুশা বলিয়া গণ্য হয়। শাফিঈ এবং মালেকিগণ বলেন যে, মুশার দান সিদ্ধ। যে সম্পত্তি বিভাগযোগ্য নহে সেই সম্পত্তির অংশ বিভাগ না করিয়াও দান করা যায়। সকল সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন। অবিভাগযোগ্য এজমালী সম্পত্তির অংশ দানের বেলায় দখলার্পণের শর্ত পূর্ণ হইতে হইবে। তবে এক্ষেত্রে দখলের প্রকৃতি হইবে সম্পত্তির প্রকৃতির অনুরূপ।

বস্তুত দখল কি ভাবে লইতে বা দিতে হইবে তাহা অবস্থা এবং পরিস্থিতির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। দানের বিষয়বস্তুতে যদি দান গ্রহীতার দানকালে দখল থাকে তবে ঘটা করিয়া আর দখল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। দানের বিষয়বস্তু যদি নাবালক দানগ্রহীতার অভিভাবকরূপে দাতার দখলে থাকে তবে দখল বুঝাইয়া নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সম্পত্তি যদি রেহেন গ্রহীতা বা অনাধিকারীর দখলে থাকে তবে মুক্ত করিবার পর ঐ সম্পত্তি দান করা যায়, তাহার পূর্বে নয়।

দখলের প্রকৃতি

দখল যে সব সময় একেবারে বস্তুগত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। দখল সাংকেতিকও হইতে পারে। দাতা দান করিবার পর দান

www.pathagar.com

গ্রহীতার অনুকূলে দখল ছাড়িয়া দিলেই দান সিদ্ধ হয়, দান গ্রহীতা সেই মুহূর্তে দখলে না আসিলেও দান অসিদ্ধ হয় না। দান গ্রহীতাকে দখল গ্রহণ করিবার সুযোগ করিয়া দিলেই দাতার কর্তব্য নিঃশেষ হয় এবং দান সিদ্ধ হয়; ইমাম আবু হানিফা বলেন, দাতা একখণ্ড বস্ত্র দান করিলে এবং দান গ্রহীতা উহা গ্রহণ করিয়াছেন বলিলেই দান সিদ্ধ হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তির প্রকৃতির উপর কিভাবে দখল দেওয়া হইবে তাহা নির্ভর করে। দানের বিষয়বস্তু যদি বাড়ী হয় তবে তালাচাবি হস্তান্তর করিয়া দখল দেওয়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি তাহার কন্যাকে বাড়ী দান করে এবং দখল বুঝাইয়া দেয় এবং পূর্বাপর কন্যার সহিত ঐ বাড়ীতে বাস করিতে থাকে, তবুও ঐ দান সিদ্ধ হইবে।

সকল সম্পত্তি দানের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। আইন এই বিষয়ে অনেক বাধানিষেধ আরোপ করিয়াছে। দানের সময় দানের বিষয়বস্তুকে দৃশ্যত অস্তিত্বশীল হইতে হইবে। তিলের মধ্যস্থ তৈল বা দুধের মধ্যস্থ মাখন দান করা যায় না। দানের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হইতে হইবে। দাতা তাহার পাওনাকে দান করিতে পারেন না। তবে দাতা যদি দান গ্রহীতাকে পাওনা আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং খাতক তাহা মানিয়া লন, তবে সেই পাওনার দান সিদ্ধ হয়। কিন্তু খাতকের বরাবরে মহাজন তাহার দেনা দান করিতে পারেন। এই দান প্রকৃতপক্ষে দাবীত্যাগ মাত্র। মুসলিম আইনে যে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হইতে পারে, শাফিঈ এবং মালেকীগণের মতে সেই সম্পত্তি দানের বিষয়বস্তু হইতে পারে। রায়ত বা ভাড়াটিয়ার দখলস্থিত সম্পত্তি দান করা যায়।

দানের পরিধি

সম্পত্তির দেহকে দান গ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তর করার নাম দান। সুতরাং সম্পত্তি দান করিবার পর বা দান করিবার সময় সমস্ত স্বত্বাধিকার দান করিতে হয়। দাতা যদি কোন বাধা বা সীমা সৃষ্টি করেন তবে সেই বাধা বা সীমা অকার্যকর হয়। কোন দাতা যদি বলেন যে, তিনি তাহার সম্পত্তি অন্য এক ব্যক্তিকে আজীবন ভোগ করিবার জন্য দান করিতেছেন, তবে ঐ দান সিদ্ধ গণ্য হইবে, তবে ঐ দান দানগ্রহীতার জীবনে শেষ হইয়া যাইবে না। হানাফী, শাফিঈ এবং হাম্বলী আইনতত্ত্ববিদগণ এই মত পোষণ করেন। কোন সম্পত্তির উৎপন্ন শস্য দান করা হইলে ঐ দানকে কর্জ গণ্য

www.pathagar.com

করা হয়। মালেকীগণের মতে দানের মাধ্যমে দানগ্রহীতার বরাবরে জীবন স্বত্ব সৃষ্টি করা যায় এবং জীবন কাল পর্যন্ত নিজের অধিকার বজায় রাখিয়া কিংবা একটি বিশেষ সময় কাল পর্যন্ত ভোগের অধিকার অব্যাহত রাখিয়া দান করা যায়। হানাফীদের মতে এমন ব্যবস্থা করিয়া দান করা যায় যে দানগ্রহীতা দাতাকে তাহার জীবনকালে ভরণ-পোষণ দিবে বা তাহার দেনা শোধ করিবে। এই প্রকার শর্তসম্বলিত দান বৈধ।

শর্তাধীন দান অবৈধ

দান হইতেছে পূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক হস্তান্তর; সুতরাং ভবিষ্যতে কার্যকরী হইবার শর্তাধীন করিয়া দান করা যায় না। দান অন্য কোন প্রকারে শর্তাধীন হইতে পারে না। দবির তাহার দোস্ত আকবরকে বলিলেন, আপনার মরণের পূর্বে যদি আমার মরণ হয় তবে আমার সম্পত্তি আপনার হইবে। এই প্রকার ঘোষণাকে রুকবা দান বলা হয়। ইহা সিদ্ধ নহে। শর্তাধীন দান এবং শর্তযুক্ত দান এক নহে। শর্তাধীন দান একেবারেই বাতিল। শর্তযুক্ত দানের শর্ত বাতিল কিন্তু দান সিদ্ধ। কোন বিনিময়ের চুক্তিতে শর্তযুক্ত দানের শর্ত বাতিল কিন্তু দান সিদ্ধ। কোন বিনিময়ের চুক্তিতে শর্ত আরোপ করিলে সেই শর্ত সিদ্ধ হইতে পারে। রমিসা তাহার স্বামীকে বলিলেন, আমি যদি মরিয়া যাই তবে আপনি আমার মোহরানার দায় মুক্তি পাইবেন; এই ঘোষণার দ্বারা মোহরানার যে দান সূচিত হয় তাহা অসিদ্ধ, কারণ ইহা শর্তাধীন।

দানগ্রহীতা সম্পর্কীয় শর্ত

দ্বিপাক্ষিক দানের ক্ষেত্রে সাধারণত দানগ্রহীতা নিজেই দানের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। তাহার প্রতিনিধি বা অভিভাবকও এই গ্রহণের কার্য করিতে পারেন। দান যেমন ব্যক্তিকে করা যায়, তেমনি দাতব্য উদ্দেশ্যেও করা যায়। দাতব্য উদ্দেশ্যে পূর্ণ দানকে আইনের পরিভাষায় সাদাকা বলা হয়। সাদাকা এবং ওয়াকফ এক বস্তু নহে। সাদাকাতে সম্পত্তির সব কিছুই দান করা হয় কিন্তু ওয়াকফে সম্পত্তিকে চিরতরে আল্লাহ্ তায়ালার নামে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার উৎপন্ন শস্য বা মুনাফা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। কোন ব্যক্তিকে যখন দান করা হয় তখন সেই ব্যক্তিকে দুনিয়ায় অস্তিত্বশীল হইতে হয়। অজাত শিশুর বরাবরে দান সিদ্ধ নহে। জীবনকালের জন্য মাত্র স্বত্ব অর্পণ করিয়া এবং দানগ্রহীতার জীবন শেষ হইলে অন্য ব্যক্তির উপর দান বর্তাইবার

www.pathagar.com

শর্ত দিয়া যে দান করা হয় তাহা সিদ্ধ নহে, কলিকাতা হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। (36 cal. 431)

দান প্রত্যাহার

দান প্রত্যাহারের অধিকারকে রাজাআত (رجعت) বলে। হানাফীগণের মতে দাতা তাহার দান প্রত্যাহার করিবার অধিকার রাখেন। দখল বুঝাইয়া দিবার পরও দাতা তাহার দান প্রত্যাহার করিতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যাহার না করা হয় ততদিন দানগ্রহীতা সম্পত্তির উপর স্বত্ব এবং দখল পরিচালনা করিতে পারেন। হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, যেহেতু দান একটি পণহীন হস্তান্তর, সেহেতু ইহা প্রত্যাহারযোগ্য। একটি হাদীসে দানের প্রত্যাহারকে ঘৃণ্য কাজ বলা হইয়াছে ; তবু হানাফীগণ বলেন যে, ইহা বৈধ। তাহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, হাদীস দান প্রত্যাহারকে ঘৃণ্য বলিয়াছে, নিষেধ করে নাই। হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ প্রত্যাহারের উপর এত বাধা নিষেধ অর্পণ করিয়াছেন যে ইহার কার্যকারিতা খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নবর্ণিত আটটি অবস্থায় দান প্রত্যাহার করা যায় না ঃ

(১) দানগ্রহীতা যদি সম্পর্কে ভ্রাতা, ভগ্নি বা তাহাদের সন্তান, চাচা, চাচী, মামা, মামী, খালা খালু, বা পূর্ব-পুরুষ বা উত্তর-পুরুষ হন, তবে সেই দান প্রত্যাহার করা যায় না।

(২) বিবাহ বলবৎ থাকাকালে যে দান স্বামী স্ত্রীকে করেন বা স্ত্রী স্বামীকে করেন তাহা প্রত্যাহার করা যায় না।

(৩) দানের বিষয়বস্তু যদি জমি হয় এবং দানগ্রহীতা যদি সেই জমির উপর ইমারত নির্মাণ বা বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই দান প্রত্যাহার করা যায় না। দানকৃত সম্পত্তি যদি এমনভাবে উন্নত করা হয় যে তাহার প্রকৃতিই বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে সেই দান প্রত্যাহার করা যায় না। গমকে ভাঙ্গাইয়া ময়দা করিলেই এইরূপ পরিবর্তন হয়। দানের বস্তুর যদি এমন উন্নতি করা হয় যে, উন্নতি ঐ বস্তু হইতে পৃথকযোগ্য নয় তাহা হইলে ঐ দান প্রত্যাহারযোগ্য নয়। কৃশ গরু দানে পাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া পুষ্ট করিলে ঐ দান আর প্রত্যাহারযোগ্য থাকে না।

(৪) দানগ্রহীতা যদি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া থাকেন কিম্বা

www.pathagar.com

নিজেই আবার দান করিয়া দখল বুঝাইয়া দিয়া থাকেন তবে সেই দান আর প্রত্যাহার করা যায় না।

(৫) দানের বস্তু যখন দানগ্রহীতার হাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন উহা আর প্রত্যাহার করা যায় না।

(৬) দানে পক্ষবৃন্দের যে কোন পক্ষ মারা গিয়া থাকিলে সেই দান আর প্রত্যাহারযোগ্য থাকে না।

(৭) দান যদি দাতব্য উদ্দেশ্যে হয় তবে তাহা প্রত্যাহার করা যায় না।

(৮) দানগ্রহীতা কিম্বা তাহার পক্ষে কেহ যদি দানের বিনিময়ে দাতাকে কিছু দিয়া থাকেন এবং দাতা উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে সেই দান আর প্রত্যাহারযোগ্য থাকে না।

প্রত্যাহারকে স্পষ্ট হইতে হয় এবং কাযী দ্বারা সমর্থিত হইতে হয়। তবে উল্লিখিত আটটি অবস্থার যেকোন একটি বিদ্যমান থাকিলে কাযী উহা সমর্থন করেন। শাফিঈ এবং হাম্বলীগণ দখল অর্পণ হইয়া যাইবার পর একমাত্র সন্তানের বরাবরে দানের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সমর্থন করেন। অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। মালিকীদের মতে দখল বুঝাইয়া দিবার পর দান আর প্রত্যাহারযোগ্য থাকে না।

হিবা-বি-শারতিল-ইওয়াদ

হিবা এবং হিব-বি-শারতিল ইওয়াদ (هبه بشرط العوض) এক বস্তু নহে। আকবর এই শর্তে বশীরকে তাহার বাড়ী দিল যে, বশীর আকবরকে তাহার বাগান দিবে। এই দেওয়া এবং লওয়াকে হিবা-বি-শারতিল ইওয়াদ বা বিনিময়ের শর্তে দান বলে। এই আদান-প্রদান কিছু পরিমাণে দান এবং কিছু পরিমাণে বিক্রয়। শুরুতে ইহা দান এবং সেই কারণে এজমালী সম্পত্তির এই প্রকার আদান-প্রদান অসিদ্ধ এবং দখলার্পণ আবশ্যক। শেষের দিকে অর্থাৎ দখলার্পণ হইয়া যাইবার পর ইহা বিক্রয়ের প্রকৃতি ধারণ করে। এবং সেই কারণে ইহা প্রত্যাহারযোগ্য নহে এবং অগ্রক্রয়ের অধীন।

হিব-বিল-এওয়াদ

কিছু লইয়া যে দান করা হয় তাহাকে হিবা-বিল-এওয়াদ (هبه بالعوض) বলে। আকবর বশীরকে তাহার বাড়ী দিলেন। বশীর আকবরকে একটি

www.pathagar.com

আংটি দিলেন। আংটি দেওয়ার জন্য কোন শর্ত ছিল না। এই আদান-প্রদানকে হিবা-বিল-এওয়াদ বলা হয়। এই হিবা প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

ওয়াক্‌ফ এবং তাহার সংজ্ঞা

ইসলামী আইনে সম্পত্তির সহিত মালিকানার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সম্পত্তির কেহ না কেহ মালিক থাকিবেই। মালিকানার পরিধি কোন কোন সময় সংকুচিত হইতে পারে, কিন্তু যে পরিধিতে হউক না কেন প্রত্যেক সম্পত্তির মালিক থাকিবার কথা। মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য তাই এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে মালিকানা চলিয়া যাইতে পারে। ওয়াক্‌ফ এই নীতির একটি ব্যতিক্রম। যিনি ওয়াক্‌ফ করেন, তাহাকে ওয়াকিফ বলে। ওয়াকিফ যখন ওয়াক্‌ফ করেন, মালিকানা তখন হস্তান্তরিত হয় বটে ; কিন্তু তৎদ্বারা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মালিকানা অন্য কোন ব্যক্তির উপর বর্তায় না। ওয়াক্‌ফের শাব্দিক অর্থ বন্ধন। ওয়াক্‌ফ দ্বারা সম্পত্তির উপর একটি বন্ধনের শৃঙ্খল নিক্ষিপ্ত হয়। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দেহের উপর সকল ব্যক্তি মালিকানা চিরস্থায়ীভাবে বিলুপ্ত হয়। মানুষ ঐ সম্পত্তির উৎপন্ন শস্য বা মুনাফা ভোগ করিতে পারে কিন্তু উহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে না। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির বৈধতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাহারা ব্যক্তি মালিকানাহীন সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারেন নাই। ইমাম আবু হানিফা এইপ্রকার হস্তান্তরের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ বেশী হইয়া পড়ায় ইমাম সাহেবের বিরোধিতা টিকিতে পারে নাই। যাহারা ইমাম আবু হানিফার মতকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহাদের যুক্তি কম সবল ছিল না। তাহারা বলেন, দরিদ্রদের জন্য বা পুণ্যজনক কাজের জন্য স্থায়ী সম্পদের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাহারা অংগুলি সংকেতে দেখাইয়া দেনযে, যুগ যুগ ধরিয়া মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা এবং মসজিদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে সম্পত্তি সংলগ্ন আছে সে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না। কতিপয় বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদ এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সুন্দর সমন্বয় সাধন করেন। তাহারা বলেন, ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি মালিকহীন নয়। সকল সৃষ্টির মালিক আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির মালিকানা পৌঁছিয়া যায়। ওয়াকফের সম্পত্তির মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা সকল ভোগ এবং ব্যবহারের উর্ধ্বে তাই ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি মানুষের ব্যবহার্য হয়।

www.pathagar.com

ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য

সম্পত্তি ওয়াক্ফ করিয়া ওয়াকিফ পারলৌকিক পুণ্য এবং ইহলৌকিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। দান এবং উইলের মাধ্যমেও পারলৌকিক পুণ্য ও ইহলৌকিক জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় কিন্তু সর্বাবস্থায় ওয়াক্ফের মর্যাদা উচ্চতর। অমুসলিমও ওয়াক্ফ করিতে পারেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি পারলৌকিক পুণ্য অর্জন করেন না। আল্লাহ্‌র তৌহিদে যাহার বিশ্বাস নাই তাহার পক্ষে পুণ্যার্জন সম্ভব নয়।

ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য ইসলাম-বিরোধী হইতে পারে না। ওয়াক্ফ মানুষের কল্যাণের জন্য করিতে হয়, অপরাধ বৃদ্ধি জন্য নয়। হিন্দুর মন্দির কিংবা খৃস্টানের গির্জা নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফ করা যায় না। ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য স্হায়ী হইতে হইবে। কোন একটি ক্ষণস্হায়ী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াকফ করা যায় না। পঞ্চাশ বছরের জন্যও ওয়াক্ফ হয় না। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য ওয়াক্ফ করা হইলে এবং সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা না হইলে ওয়াক্ফ নষ্ট বা অসিদ্ধ হয় না সেক্ষেত্রে ওয়াকিফ যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যের কাছাকাছি কিছুর জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুনাফা ব্যয় করা যায়। ওয়াকিফের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া সাধারণ জনহিতকর কাজেও ঐ সম্পত্তির আয় ব্যয় করা যায়। যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হয়, নানা কারণে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। আকবর এই মর্মে তাহার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করিলেন যে, প্রথমে তাহার সন্তানগণ এবং পরে দরিদ্র জনগণ উহার মুনাফা পাইবে। আকবরের কোন সন্তান থাকিল না। সেক্ষেত্রে দরিদ্র জনগণ ওয়াক্ফকৃত মুনাফা পাইবে।

ওয়াক্ফের সীমা

ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য হইতেছে চিরস্হায়ী ব্যবস্হা। যে কাজের জন্য বা যাহার জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তাহা যে একটি বিশেষ সময়ে অস্তিত্বশীল হইতে হইবে এমন কোন কথাই নাই। ওয়াক্ফের সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য তিনি যে কোন নির্দেশ দিতে পারেন। এই ব্যাপারে তাহার অধিকার অবাধ। অবশ্য তিনি ইসলাম-বিরোধী কিছু করিতে পারেন না। তিনি যে নির্দেশ দিবেন তাহাই বাধ্যকর এবং বলবৎযোগ্য হয়। আকবর তাহার সম্পত্তি

www.pathagar.com

ওয়াক্‌ফ করিয়া এই নির্দেশ দিলেন যে, ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির আয় জায়েদের সন্তানগণ আজীবন ভোগ করিবেন এবং তাহার পর ওমরের সন্তানগণ ভোগ করিবেন এবং তাহার পর দরিদ্র জনসাধারণ ভোগ করিবেন। এই ওয়াক্‌ফ বৈধ। কোন ঘটনার উপর বা কোন সম্ভাবনার উপর নির্ভর রাখিয়াও ওয়াক্‌ফ করা যায়। ওয়াক্‌ফের সুবিধাভোগিগণ প্রতিষ্ঠান হইতে পারে বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে জনগণের দুঃখ লাঘব না হয় সেই ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। ধনী মানুষের ক্লাবের জন্য ওয়াক্‌ফ করা যায় না। মাদ্রাসা, হাসপাতাল, বিশ্রামাগার বা জিহাদের সৈনিকদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা উত্তম। কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য কিংবা সন্তানদের জন্য বা বংশধরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা যায়। ইহা এক প্রকার দান বা হিবা। অবশ্য হিবার দ্বারা দানগ্রহীতা সম্পত্তির মালিক হয় কিন্তু ওয়াক্‌ফ দ্বারা কাহাকেও সম্পত্তির মালিক করা যায় না। বংশধরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিলে বংশের ধারা নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির মুনাফা দরিদ্রদের জন্য ব্যয়িত হয়। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, পরিবারের ধারা চিরদিন অব্যাহত থাকে না, উহার শেষ আছে। ইসলামী আইনে সন্তানদের বরাবরে দানকেও বদান্যতা মনে করা হয়। ইসলামী আইনে যে কোন ভাল কাজই একটি বদান্যতা। পরিবারের মধ্যে ওয়াক্‌ফ সীমাবদ্ধ রাখা সকল সম্প্রদায় এবং মযহাবের মতে সিদ্ধ। এই মত ইজমার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার বৈধতার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি

ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের উপর তেমন কোন বাধা নাই কিন্তু ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির সম্পর্কে কিছু বাধা নিষেধ বর্তমান। ওয়াক্‌ফের সম্পত্তিকে মাল বা স্পর্শযোগ্য হইতে হইবে। সুতরাং ভাড়ার টাকা ওয়াক্‌ফ করা যায় না। ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি এমন হইতে হইবে যে, ইহা ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। টাকা বা অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা যায় না। লীজভুক্ত বা রেহানাবদ্ধ সম্পত্তি ওয়াকফ করা যায়। হানাফী আইনে ইজমালী সম্পত্তির অবিভক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ করা যায়।

ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি

ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির জন্য ওয়াকফনামার মধ্যে কোন বিশেষ শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু ইহা যে

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী এমন বর্ণনা ওয়াক্‌ফনামায় থাকার প্রয়োজন ; জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হইলে, এমন কোন কাজের বর্ণনা থাকিতে হইবে যাহার দ্বারা ওয়াকিফের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সংখ্যা গরিষ্ট মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মতে বৈধতার জন্য ওয়াক্‌ফে দখলার্পণ প্রয়োজনীয়। ওয়াক্‌ফ কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। অবশ্য উইলের মধ্যে এই নির্দেশ থাকিতে পারে যে, উইলকারীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির একাংশ ওয়াক্‌ফ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার এই ব্যবস্থা উইলের সাধারণ নিয়মাধীন হইবে। এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিক সম্পর্কে তিনি এই ব্যবস্থা রাখিতে পারিবেন না এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির প্রশাসন ও পরিচালনা

ওয়াকিফ নিজেই মুতাওয়াল্লী (متولى) হইতে পারেন, আবার তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিতে পারেন। মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিবার সময় তিনি ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তির প্রশাসনের নীতিমালা প্রণয়ন করিয়া তদনুযায়ী সম্পত্তি পরিচালনার নির্দেশ দিতে পারেন। সেই নীতিমালার মধ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে নির্দেশ দিবার অধিকার সংরক্ষিত রাখিতে পারেন। এই সংরক্ষিত সীমার বাহিরে তিনি মুতাওয়াল্লীর কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত না হইবার কারণে ওয়াক্‌ফ নষ্ট হয় না। সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারেন ; মুতাওয়াল্লী নিয়োগের সময় ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির কল্যাণকে বিশেষভাবে মনে রাখেন। ওয়াকিফের বংশধর হইলে যে তাহার মুতাওয়াল্লী হইবার অধিকার থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই।

ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তির প্রশাসনের মূলনীতি হইতেছে ওয়াকিফের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য। ওয়াকিফ যে নির্দেশ দিয়া যান, ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তি সেই নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ওরাক্‌ফভুক্ত সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যাহা করা উচিত তাহাও অবশ্য করিতে হয়। ওয়াকিফ্‌ যে নির্দেশ দিয়া যান তাহা সর্বতোভাবে অবশ্য প্রতিপাল্য হইলেও, তাহার নির্দেশের মধ্যে মূল ওয়াক্‌ফের পরিপন্থী কিছু থাকিলে তাহা প্রতিপাল্য হয় না। ওয়াকিফ যদি এমন নির্দেশ দিয়া যান যাহা আইনবিরোধী তবে সেই নির্দেশ প্রতিপাল্য নয়। এই দুইটি ব্যতিক্রম ব্যতীত ওয়াকিফের অন্য সকল নির্দেশ দেশের

www.pathagar.com

আইনের মত অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হয়। ওয়াকিফের নির্দেশের মধ্যে এমন কিছু থাকিতে পারে যাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হওয়া সম্ভব। আকবর একজন হানাফী মুসলিম। তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ এবং তাহা সংরক্ষণের জন্য তাহার বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করিলেন। ওয়াকফনামার মধ্যে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যে, ঐ মসজিদে একমাত্র হানাফী ব্যতীত অন্য কেহ নামায পড়িতে পারিবে না। এই প্রশ্ন লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইতে পারে। ওয়াকফভুক্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করা উচিত কিন্তু সংরক্ষণের জন্য কি প্রয়োজনীয় তাহা লইয়া মতানৈক্য হইতে পারে। পরিস্থিতি ও অবস্হা বিবেচনা করিয়া এবং ওয়াকিফের নির্দেশাবলী সম্মুখে রাখিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়। দেশের প্রচলিত আইন হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

উইল বা অসিয়ত (وصية)

মৃত্যুর পর যে হস্তান্তর কার্যকর হয় তাহাকেই সাধারণভাবে অসিয়ত বলে। যিনি উইল করেন তাহাকে মুসি (موصى) এবং যাহার বরাবরে উইল করা হয় তাহাকে মুসালাহু (موصى له) এবং যিনি উইল নির্বাহ করিবার জন্য নির্বাচিত হন তাহাকে অসি (وصى) বলা হয়। অসিয়তের ক্ষেত্রে মুসি জীবনকালে তাহার সম্পত্তির উপর পূর্ণ স্বত্বাধিকার বজায় রাখে। ইসলামী আইনে দখলার্পণ তাৎক্ষণিক না হইলে হস্তান্তর অবৈধ গণ্য হয়। এই কারণে অসিয়তকে অবৈধ গণ্য করা উচিত। কিন্তু মুসলিমের পারলৌকিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন। এই সমর্থনের যুক্তিরূপে তাহারা দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। ইহকালে মানুষ যে সাধারণ গোনাহ করে, কল্যাণমূলক উইল দ্বারা সেই গোনাহের মার্জনা লাভ সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, মানুষ মরিয়া যাইবার পরও তাহার সম্পত্তির সহিত বন্ধন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয় না, তাহার দাফন কাফনের জন্য সম্পত্তি দায়ী থাকে। এমতাবস্হায় মরণোত্তর হস্তান্তর অবৈধ হওয়া উচিত নয়। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের এই মত আল কুরআন এবং আল-হাদীস সমর্থিত।

অসিয়তের সীমা

কোন ব্যক্তি তাহার মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়তের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ওয়ারিশদের বরাবরে অসিয়ত

www.pathagar.com

সিদ্ধ নয়। কিন্তু সকল ওয়ারিশ একমত হইয়া সম্মতি দিলে মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক উইল বা অসিয়ত করা যায় এবং এক বা একাধিক ওয়ারিশের বরাবরেও উইল বা অসিয়ত করা যায়। তবে এই সম্মতি মুসির মৃত্যুর পর দিতে হয়।

অসিয়তের উপর এই সীমা আরোপের পশ্চাতে অনেক যুক্তি আছে। পারলৌকিক কল্যাণ এবং মরণোত্তর হস্তান্তরের অধিকারের স্বীকৃতি, এই দুইটি হইতেছে অসিয়ত সিদ্ধ হইবার ভিত্তি। সীমা আরোপ করিয়া ইসলামী আইন এই দুই ভিত্তিকে সবল করিয়াছে। এই দুই ভিত্তিকে সবল করিবার জন্য আইনের মতে এক-তৃতীয়াংশ যথেষ্ট। অসিয়তের দ্বারা ওয়ারিশদের প্রাপ্যাংশ খর্বিত হয় এই কারণেও ওয়ারিশদের বিনানুমতিতে এক-তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করা অসিদ্ধ। আইন যাহার জন্য যে প্রাপ্যাংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি কলহ কোন্দলের সৃষ্টি করিতে পারে; এই জন্য ওয়ারিশদের সম্মতির বিধান করা হইয়াছে।

হানাফীদের মতে ওয়ারিশদের সম্মতির অর্থ হইতেছে দাবী ত্যাগ। শাফিঈদের মতে সম্মতির অর্থ হইতেছে সম্মতিদাতাদের হস্তান্তর। হানাফিগণ বলেন, মুসালাহু সম্পত্তি পান মুসির নিকট হইতে। শাফিঈগণ বলেন, মুসালাহু সম্পত্তি পান ওয়ারিশগণ হইতে।

মুসালাহুর গ্রহণ

ওয়ারিশগণ সম্পত্তি লাভ করেন আইনের প্রতিক্রিয়ায়। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিশগণ উহা পাইবেন ইহাই আইন। এখানে গ্রহণ এবং অগ্রহণের কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু অসিয়তের ব্যাপার অন্য রকম। অসিয়তের মাধ্যমে মুসালাহু সম্পত্তি লাভ করে। কার্যত ইহা একটি দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। এবং যেহেতু ইহা দ্বিপাক্ষিক তাই ইহা সিদ্ধ হইতে হইলে মুসালাহুর গ্রহণ প্রয়োজন। রদ্দুল মুহতার বলে, না-মঞ্জুর না করিলেই গ্রহণ সূচিত হয়। কিন্তু গ্রহণ করিবার পূর্বে মুসালাহু যদি মারা যান তাহা হইলেও অসিয়ত কার্যকরী হয় এবং সম্পত্তি মুসালাহুর ওয়ারিশগণ পান। মুসার মৃত্যুর পর অসিয়ত চূড়ান্ত হইয়া যায়; তবে ইহার কার্যকরিতা কিছু সময়ের জন্য মুলতুবি থাকে। এই সময়ে ইহা মুসালাহু গ্রহণ করিতে পারেন আবার নাও করিতে পারেন। ইতিমধ্যে মুসালাহুর মৃত্যু হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে তিনি অসিয়তকে অগ্রহণ করেন নাই এবং সেই কারণে উহা তাহার

www.pathagar.com

ওয়ারিশদের বরাবরে বর্তিয়া যায়। যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা না-মঞ্জুর করিবার অধিকার বজায় রাখে এবং না-মঞ্জুর করিবার পূর্বে মরিয়া যায় সেই ক্রয়-বিক্রয়ে সংশ্লিষ্ট মাল ক্রেতার ওয়ারিশগণ পায়। এই নীতির সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া অসিয়ত সম্পর্কে তুল্য বিধান প্রণীত হইয়াছে। শাফিঈ এবং যুফারের মতে অসিয়তও এক প্রকার মিরাস।

অসির মৃত্যুর পূর্বে মুসালাহুর মৃত্যু হইলে অসিয়তভুক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে চলিয়া যায়।

অসিয়তের পরিধি

কোন ব্যক্তিবিশেষের বরাবরে অসিয়ত করা যায়। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের বরাবরে অসিয়ত করা যায়। তবে ছয় মাসের মধ্যে ঐ ভ্রূণকে ভূমিষ্ট হইতে হইবে। যে শিশু পিতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সেই শিশু তাহার পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হয়। অসিয়তও একপ্রকার মিরাস তাই ভ্রূণের বরাবরে ইহা সিদ্ধ।

কোন শ্রেণীর বরাবরেও অসিয়ত করা যায়। যে শ্রেণীর বরাবরে অসিয়ত করা যায় সেই শ্রেণীর যে সমস্ত ব্যক্তি মুসার মৃত্যুকালে জীবিত থাকে তাহারাই উহা পায়। মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির জন্য উইল করা যায়।

মুসলিম অমুসলিমের এবং অমুসলিম মুসলিমের বরাবরে হিবা করিতে পারে।

মুসালাহুর বরাবরে মিরাস প্রদান করাই অসিয়তের উদ্দেশ্য। সেই কারণে একমাত্র প্রতিশোধের অধিকার ছাড়া আর সব রকমের অধিকারকে অসিয়ত করা যায়। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট, দখলযুক্ত বা দখলহীন, সম্পত্তির শরীর বা তাহার মুনাফা, পাওনা বা নালিশযোগ্য দাবী, এমনকি ভবিষ্যতে লভ্য সম্পত্তি অসিয়ত করা যায়। যে সম্পত্তি অসিয়ত করিবার সময় অস্তিত্বশীল ছিল না কিন্তু মুসার মৃত্যুর সময় তাহার স্বত্বাধিকারে আসিয়া যায়, সেই সম্পত্তি সম্পর্কেও অসিয়ত সিদ্ধ।

বশির তাহার সম্পত্তি অসিয়ত করিলেন। তিনি অসিয়তনামায় বলিলেন, আকবর তাহার বাড়ীতে বাস করিবে কিংবা ভাড়া দিয়া ভোগ করিবে এবং তাহার এই অধিকার একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ

www.pathagar.com

থাকিবে, অতঃপর বেলায়েত একইভাবে এই সম্পত্তি ভোগ করিবে। এই অসিয়ত সিদ্ধ তবে এখানে শর্ত এই যে, বসিরের অসিয়ত সম্পাদনকালে আকবরকে এবং আকবরের মৃত্যুকালে বেলায়েতকে জীবিত থাকিতে হইবে। আকবর এবং বেলায়েতের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি রাষ্ট্র পাইবে। বশির তাহার অসিয়তনামায় এই নির্দেশ দিতে পারেন যে, সম্পত্তির আয় হইতে আকবর মাসে দুইশত টাকা এবং বেলায়েত মাসে তিনশত টাকা পাইবে। এইরূপ অসিয়তও সিদ্ধ। কোন বস্তুকে দাতব্য কাজে ওয়াক্‌ফ করা যায়। বশির তাহার ঘোড়াকে জিহাদে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ করিতে পারে। এই ওয়াক্‌ফকে অসিয়তভিত্তিক ওয়াক্‌ফ বলে। দুররুল মোখতার-এর গ্রন্থকার বলেন যে, এই ওয়াক্‌ফ প্রকৃতপক্ষে অসিয়ত। রদ্দুল মুহতারেও এই মত পোষণ করে।

অসিয়ত করিবার পদ্ধতি

মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে অসিয়ত করা যায়। ইহাতে কোন অনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে অসিয়ত লিখিত দলিলের মাধ্যমে করা হইয়া আসিতেছে। সম্ভবত ইমাম আবু হানিফার যুগেও লিখিত অসিয়তনামার প্রচলন ছিল।

অসি

যে ব্যক্তি মুসি বা উইলকারীর নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য নিযুক্ত হন তাহাকে অসি বলে। মুসার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, তাহার দেনা পরিশোধ করা এবং সাধারণভাবে সম্পত্তি পরিচালনা করা তাহার কর্তব্য। খাতকদের নিকট হইতে পাওনা আদায় করাও তাহার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কোন ব্যক্তির বিনা সম্মতিতে তাহাকে অসি নিযুক্ত করা যায় না। যিনি অসি নিযুক্ত হন তাহার স্কন্ধে অনেক বোঝা চাপে ; সেই কারণে নিয়োগের পূর্বে তাহার সম্মতির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অসির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন না। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাহাকে অপসারণ করা যায় না। মুসি বা উইলকারী যাহার উপর বিশ্বাস অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাকে অকারণে তাড়াইয়া দেওয়া মুসির অভিপ্রায়কে বেইজ্জত করার শামিল। অসি অবশ্য অন্যকে দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন। অসির সংখ্যা একাধিক হইলে সকলেই যৌথভাবে কাজ করিবেন। তাহাদের মধ্যে

www.pathagar.com

একজনের পদ খালি হইলে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। জরুরী পরিস্থিতি হইলে যেকোন একজন অসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে পারেন। মুসি যদি কোন অসি নিযুক্ত না করেন তবে অসিয়তকে কার্যকরী করিবার জন্য আদালত অসি নিয়োগ করিবেন।

অসিয়তনামার ব্যাখ্যা

অসিয়তনামার মধ্যে ব্যবহৃত ভাষায় অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা থাকিলে উহা ব্যাখ্যার জন্য মুসির অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান প্রয়োজন। মুসির অভিপ্রায়ের আলোকে অসিয়তনামা ব্যাখ্যা করিতে হয়।

অসিয়ত প্রত্যাহার

অসিয়ত একটি স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা। সেই কারণে মুসি তাহার অসিয়ত প্রত্যাহার করিবার অধিকার রাখেন। বস্তুত অসিয়তনামা হইতেছে মুসির একটি প্রস্তাব মাত্র। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে যে কেনে সময় তিনি উহা প্রত্যাহার করিতে পারেন। প্রত্যাহার মৌখিকভাবে করা যায় আবার আচরণের মাধ্যমেও করা যায়। অসিয়তনামাভুক্ত সম্পত্তি যদি মুসি নষ্ট হইতে দেন তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, মুসি তাহার অসিয়ত প্রত্যাহার করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। এক উইলের ব্যত্যয়ে অন্য উইল করিলে পরবর্তী উইল পূর্ব-বর্তীকে বাতিল করিয়া দেয়। অসিয়তভুক্ত সম্পত্তি যদি মুসি বিক্রয় করেন তবে সেই অবস্থা হইতে মুসির প্রত্যাহারের অভিপ্রায় অনুমান করা যায়। মৃত্যুর পূর্বে মুসি উন্মাদ হইয়া গেলে তাহার অসিয়ত বাতিল হইয়া যায়।

ইজারা

সাধারণভাবে ভাড়া দেওয়া বা লওয়াকে ইসলামী আইনে ইজারা বলে। স্হাবর অথবা অস্হাবর সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য চুক্তিকেও ইজারা বলা হয়। স্হাবর ও অস্হাবর সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন শস্য বা মুনাফা সম্পর্কেও চুক্তিকে ইজারা বলা হয়। মানুষের শ্রম সম্পর্কে চুক্তিকেও ইজারা বলা হয়। নির্দিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট উৎপাদন বিক্রয়কেও ইজারা বলে। সম্পত্তির ব্যবহারের বা ভোগের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকিলে তবেই ঐ ব্যবস্হাকে নির্দিষ্ট উৎপাদনমূলক ব্যবস্হা বলা যায়। লীজ ও জামানত ইজারার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

ইজারাভুক্ত সম্পত্তির ব্যবহার

ইজারাভুক্ত সম্পত্তির ব্যবহার সাধারণত চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়। ইজারাভুক্ত সম্পত্তি কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং কতদূর ব্যবহার করা যাইবে তাহা চুক্তির মধ্যেই বর্ণিত থাকে। চুক্তিতে যাহা বর্ণিত থাকে ইজারাগ্রহীতা ঐ রকমভাবেই ইজারাভুক্ত সম্পত্তি ব্যবহার বা ভোগ করিবেন, ঠিক ঐ ভাবে না করিয়া উহার সমতুল্যভাবে তিনি ইজারাভুক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। লোহার কাজ করিবার জন্য কর্মকার ঘর ভাড়া লইলে তিনি সেই ঘরে হয় লোহার কাজ করিবেন নতুবা সমপ্রকৃতির অন্য কাজ করিবেন। যে ব্যক্তি ইজারা লইয়াছেন সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইজারাভুক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর ইজারাভুক্ত সম্পত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আকবর যদি ঘোড়া ভাড়া লইয়া থাকেন তবে তিনি চড়িবার জন্য উহা বশিরকে দিতে পারেন না। আরোহীর উপর ঘোড়ার ব্যবহার অনেকখানি নির্ভর করে। আকবরের নিকট বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইলে তিনি বশিরকে ঐ বাড়ীতে থাকিতে দিতে পারেন বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারেন। তবে চুক্তির মধ্যে নিষেধ থাকিলে এইরূপ কাজ করা যায় না।

ইজারার গঠন

বিক্রয়ের জন্য যেমন প্রস্তাব এবং গ্রহণের প্রয়োজন, ইজারার জন্যও তেমনি প্রস্তাব ও গ্রহণের প্রয়োজন। বিক্রয়ে আদান প্রদান তাৎক্ষণিক হয় কিন্তু ইজারা যেমন তাৎক্ষণিক হইতে পারে তেমনি ইহা ভবিষ্যতে কার্যকরীও হইতে পারে। বিক্রয় শর্তাধীন হইতে পারে না কিন্তু ইজারা শর্তাধীন হইতে পারে। ত্রুটির কারণে যেমন বিক্রয় নাকচ করা যায়, একই কারণে তেমনি ইজারাও নাকচ করা যায়।

ইজারাতে সাধারণত মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে এবং সেই অনযায়ী ভাড়া ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। মেয়াদ নির্ধারিত না থাকিলে ইজারাগ্রহীতাকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে হয়।

ইজারাভুক্ত সম্পত্তির ব্যবহার

ইজারা গ্রহীতার হাতে ইজারাভুক্ত সম্পত্তি আমানতের মত অবস্থান করে। তাহার বিনা দোষে যদি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়, তবে তিনি

www.pathagar.com

দায়ী হইবেন না। তবে তাহার দোষে সম্পত্তির যদি কোন ক্ষতি হয় তবে ইজারাদার বা সম্পত্তির মালিক আদালতের মাধ্যমে ইজারা রদ করিতে পারেন। ইজারাভুক্ত সম্পত্তিকে ব্যবহারের উপযোগী রাখিবার দায়িত্ব সম্পত্তির মালিকের বা ইজারাদাতার। ভাড়া দেওয়া বাড়ীর বৃহৎ সংস্কারের কাজের দায়িত্ব ইজারাদাতার। কিন্তু ইজারাভুক্ত সম্পত্তিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার।

শ্রমের ইজারা

শ্রমের ইজারা আংশিক বা সার্বক্ষণিক হইতে পারে। ভৃত্যের শ্রম সাধারণভাবে সার্বক্ষণিক এবং দালালের শ্রম সাধারণত স্বল্পকালীন হইয়া থাকে।

আমানত

একজনের সম্পত্তি অন্যজনের হাতে আমানতরূপে থাকিতে পারে। আমানত চুক্তির মাধ্যমে হইতে পারে আবার আইনের প্রতিক্রিয়ায় হইতে পারে। জামিনদারের হাতে, প্রতিনিধির হাতে, রেহেন গ্রহীতার হাতে ন্যস্ত সম্পত্তিকে আমানতি সম্পত্তি গণ্য করা হয়। যাহার হাতে আমানতি সম্পত্তি থাকে তাহাকে আমীন (امين) বলা হয়।

আমীনের দায়িত্ব

সাধারণত আমীনের অধিকারে থাকা অবস্থায় তাহার বিনা দোষে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেলে তিনি দায়ী হন না। জামিনদারের হাতে থাকা অবস্থায় যদি সম্পত্তি নষ্ট হয় তবে দায়িত্ব এড়াইতে হইলে জামিনদারকে প্রমাণ করিতে হয় যে, তিনি সাবধানতার ত্রুটি করেন নাই। আমানতি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মালিকের। তিনি ঐ সম্পত্তির আয়ও গ্রহণ করেন।

আরিয়ত

কোন ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে কোন দ্রব্য তাহার ব্যবহারের জন্য বিনিময়ে কিছু না লইয়া প্রদান করেন, তখন যে আদান-প্রদান হয় তাহাকে আরিয়ত বলে।

www.pathagar.com

রেহেন

রেহেন (رهن) এক প্রকার জামানত। সম্পত্তিকে (মাল) অর্থের বা অন্য কিছুর বিনিময়ে কোন ব্যক্তির নিকট আবদ্ধ রাখাকে রেহেন বলে। রেহেন সাধারণত এদেশে বন্দক নামে অভিহিত হয়। রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি হইতে রেহেনের দায় পরিশোধিত হইতে পারে।

স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি রেহেনের বিষয়বস্তু হইতে পারে। এজমালি স্থাবর সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ, হানাফীদের মতে, রেহেন দেওয়া যায় না ; শাফিঈ এবং মালেকীদের মতে ইজমালি সম্পত্তির অবিভক্ত সম্পত্তি রেহেন দেওয়া যায়।

রেহেন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। হানাফীদের মতে রেহেন গ্রহীতার বরাবরে দখল না দেওয়া পর্যন্ত রেহেন পূর্ণ হয় না। খাতক তাহার দেনা শোধ করিবার জন্য সম্পত্তি রেহেন দিবার অঙ্গীকার করিলে সেই অঙ্গীকার বলবৎ করা যায় না। মালিকিগণ অন্য মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন, বিক্রয়চুক্তি যেমন বলবৎ করা যায়, তেমনি রেহেনের চুক্তিও বলবৎ করা যায়।

রেহেন গ্রহীতার অধিকার

রেহেন গ্রহীতার রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি দখল পাইতে এবং যতদিন পর্যন্ত না অর্থ পরিশোধিত হয়, ততদিন উহা বজায় রাখিতে অধিকারী হন। রেহেন গ্রহীতার এই অধিকারকে স্বত্ব বলা যায় না। তবুও রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তির উপর, রেহেনদাতার অন্যান্য মহাজনদের তুলনায় বেশী অধিকার থাকে। রেহেন গ্রহীতা যদিও সম্পত্তি দখলে রাখিতে পারেন, তবুও তিনি উহা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারেন না। রেহেন দাতা রেহেন গ্রহীতাকে রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি যদি ব্যবহার বা ভোগ করিতে অনুমতি দেন তবে রেহেন গ্রহিতা উহা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রেহেন একটি জামানত মাত্র। সেই কারণে রেহেন গ্রহীতা কর্তৃক রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি ভোগ বা ব্যবহারের প্রশ্নই উঠে না। রেহেন যদি বাঈ-উল-ওয়াফা হয় তবে রেহেন গ্রহীতা রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারেন।

রেহেন গ্রহীতা এবং রেহেন দাতার দায়িত্ব

হানাফীদের মতে রেহানাবদ্ধ সম্পত্তি রেহেন গ্রহীতার আমানতে থাকে ; রেহেন গ্রহীতাই রেহানাবদ্ধ সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকে। রেহেন

www.pathagar.com

দাতার হাতে যদি রেহানাবদ্ধ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং রেহানাবদ্ধ সম্পত্তির মূল্য যদি দেনার সমতুল্য হয় তাহা হইলে দেনা পরিশোধিত গণ্য হইবে। রেহানাবদ্ধ সম্পত্তি খাতকের ; সুতরাং ইহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাহার, কিন্তু ইহাকে নিরাপদে রাখিবার দায়িত্ব মহাজনের।

রেহেন গ্রহীতার প্রতিকার

খাতক যদি ঋণ পরিশোধ না করেন তবে রেহেন গ্রহীতা আদালতের মাধ্যমে রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা আদায় করিতে পারেন। খাতকের পূর্ব সম্মতি না থাকিলে রেহেন গ্রহীতা আদালতের মাধ্যম ব্যতীত রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি, বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা উঠাইয়া লইতে পারেন না। খাতক রেহেন গ্রহীতাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন যে, দেনা অনাদায় থাকিলে তাহারা রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই মর্মে একবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে পরবর্তীকালে তাহা প্রত্যাহার করা যায় না। ইসলামী আইন রেহেন উদ্ধার করিবার অধিকারকে কোনভাবে নষ্ট করিতে দেয় না। বাঈ-উল-ওয়াফার ক্ষেত্রে রেহেনোদ্ধার অধিকার নষ্ট করা যায়। বস্তুত বাঈ-উল-ওয়াফাকে জামানত না বলিয়া বিক্রয় বলাই অধিক সংগত। জামানত থাকিলেই যে রহেন গ্রহীতা বা মহাজন অন্য প্রতিকার পাইবে না এমন কোন কথা নাই। খাতকের দেহকে ক্রোক করিয়া দেনা আদায় করা যায়। তবে জামানাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হওয়া সিদ্ধ নহে।

রেহেন দেওয়ার পর রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তিতে রেহেনদাতার স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকিলেও উহা রেহেন গ্রহীতার অধিকার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। রেহেন-দাতা রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন বটে কিন্তু রেহেন গ্রহীতা স্বীকার না করিলে ঐ বিক্রয় মুলতুবী থাকিয়া যায়। বিক্রয় লব্ধ অর্থ সম্পত্তির পরিবর্তে জামানতরূপে গণ্য হয়।

জামিনদারি

জামিনদারিকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় কাফালাত বলা হয়। কোন কিছুর দাবী সম্পর্কে কোন ব্যক্তির দায়িত্ব বা দায়কে অন্য এক ব্যক্তির জামিনদারি দ্বারা শক্ত করা হইলে কাফালতের সৃষ্টি হয়। কোন ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

হাজির করিবার জন্য, কোন দায়িত্ব প্রতিপালন করিবার জন্য, কোন দায় পরিশোধ করিবার জন্য অথবা কোন সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার জন্য চুক্তির মাধ্যমে জামিন হওয়া যায়। জামিন নিরঙ্কুশ শর্তাধীন অথবা সম্ভাব্য হইতে পারে।

মহাজন বা ঐ শ্রেণীর অন্য কোন ব্যক্তি মূল খাতককে কিংবা তাহার জামিনদারকে তাহাদের দায়িত্ব প্রতিপালন বা দায় পরিশোধ করিতে আহবান করিতে পারেন। একজনকে আহবান করিলে অন্যজন দায়িত্বমুক্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্ব প্রতিপালিত বা দায় পরিশোধিত না হয় ততক্ষণ উভয়ই তাহার কাছে দায়ী হয়। যদি চুক্তি এমন প্রকৃতির হয় যে, জামিনের দ্বারা মূল খাতক সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইয়া যান তবে এই চুক্তিকে জামিন না বলিয়া হাওলাত বলাই বিধেয়।

মূল খাতকের দায় হ্রাস পাইলে জামিনদার তার ফায়দা পান। মূল খাতককে সময় দেওয়া হইলে জামিনদারও সময় পান। মূল খাতককে মুক্তি দেওয়া হইলে জামিনদারও মুক্তি পান। কিন্তু জামিনদারকে মুক্তি দেওয়া হইলে মূল খাতক মুক্ত হইয়া যান না।

এজেন্সী

এজেন্সীকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় ওকালত (وكالة) বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তাহার পক্ষ হইয়া বা তাহার হইয়া কোন কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে তবে ওকালতের সৃষ্টি হয়। যাহাকে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহাকে এজেন্ট বা উকিল বলে। যিনি ক্ষমতা দেন তাহাকে মক্কেল বলে। প্রস্তাব এবং গ্রহণের মাধ্যমে ওকালত সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য যাহার উকিল হইবার ক্ষমতা আছে একমাত্র তিনিই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। শিশু বা উন্মাদ উকিল হইতে পারে না।

ওকালত বহু ক্ষেত্রে চলিয়া আসিতেছে। ক্রয়-বিক্রয়ে, ইজারাতে, দেনা-পাওনায়, রেহেনে, হিবাতে, সালিসিতে, দাবী ত্যাগে, স্বীকৃতিতে, মামলা-মকদ্দমায়; শুফাতে, বাটোয়ারায়, সম্পত্তি দখলে, বিবাহে ,প্রভৃতি বহুবিধ কাজে ওকালত প্রথা বিদ্যমান। অপরাধের ক্ষেত্রে ওকালত নাই। অপরাধ করিয়া কেহ এই অজুহাত দিতে পারে না যে, তিনি উহা অন্যের উকিলরূপে করিয়াছেন।

আরিয়ত, রেহেন, জামানত, শরীকানা প্রভৃতিতে উকিল যাহা করেন তাহার জন্য, স্পষ্টচুক্তির অবর্তমানে মক্কেল বাধ্য নন কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়,

www.pathagar.com

ইজারাতে কিংবা সালিসিতে স্পষ্টচুক্তির আবর্তমানেও উকিলের কাজ দ্বারা মক্কেল বাধ্য হয়। উকিল যদি মক্কেলের পক্ষ হইয়া কাজ করিতেছেন এমন কথা প্রকাশ না করেন তবে মক্কেল তাহার কাজের জন্য বাধ্য না হইবার দাবী করিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাহার কাজের জন্য উকিল নিজে দায়ী হইবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মক্কেল এবং উকিল উভয়েই উকিলের কাজের জন্য দায়ী হইবেন।

মামলায় উকিল মক্কেলের দাবী স্বীকার করিতে পারেন। তবে ঐ স্বীকৃতি বিচারকের সম্মুখে হইবে। মক্কেল যে দাবী স্বীকার করিতে উকিলকে নিষেধ করে উকিল তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। সাধারণভাবে ডিক্রীভুক্ত জমিতে দখল লইবার দায়িত্ব উকিলের থাকে না।

উকিলের হাতে সম্পত্তি

নানাবিধ কাজের জন্য মক্কেলের সম্পত্তি উকিলের দখলে যাইতে পারে। খরিদ্দার জুটাইয়া বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য বা মক্কেলের হইয়া ক্রয় করিবার বা উৎপন্ন মুনাফা হইতে দেনা শোধ করিবার জন্য, মক্কেলের সম্পত্তি উকিল দখল লইতে পারেন। যতদিন এই ভাবে মক্কেলের সম্পত্তি উকিলের দখলে থাকিবে, ততদিন উহা আমানত গণ্য হইবে। উকিলের বিনা দোষে ঐ সম্পত্তি নষ্ট হইলে তিনি দায়ী হইবেন না।

মক্কেলের প্রতি উকিলের দায়িত্ব

মক্কেল যে নির্দেশ দিবেন, উকিল তাহাই করিবেন। তিনি যদি তাহা না করেন, তবে তাহার কাজের জন্য মক্কেল বাধ্য হইবে না। মক্কেল তাহার কাজ করিবার জন্য উকিলের উপর যে সমস্ত শর্ত আরোপ করিবেন এবং সীমা বাঁধিয়া দিবেন, সেই সমস্ত শর্ত এবং সীমার অধীনে থাকিয়া উকিল কাজ করিবার সময় মকেকলের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মক্কেলের জন্য সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিতে গিয়া তিনি উহা নিজের জন্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারেন না। মক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার উপর অর্পিত কাজ উকিল অন্যকে দিয়া করাইতে পারেন না।

ওকালতির অবসান

ওকালত হইতে যখন ইচ্ছা তখন মক্কেল উকিলকে ছাড়াইয়া দিতে পারেন। ঠিক একইভাবে উকিলও তাহার দায়িত্ব যে কোন সময় ইচ্ছা

www.pathagar.com

করিলে ত্যাগ করিতে পারেন। যে কাজের জন্য ওকালত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শেষ হইলে এই সম্পর্কের অবসান হয়। কোন পক্ষ মারা গেলে ওকালত নষ্ট হয়। তবে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। আকবর একজন খাতক। তিনি তাহার একটি সম্পত্তি বশিরের নিকট রেহেন দিলেন। আকবর দবীরকে তাহার রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বশীরের দেনা শোধ করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় আকবর বশীরের বিনা অনুমতিতে দবীরকে বরখাস্ত করিতে পারেন না। দবীরও তাহার ওকালতি ছাড়িয়া দিতে পারেন না। আকবর মরিয়া গেলেও দবীরের ওকালতি থাকিয়া যায়। উকিলের দায় মুক্তি যতদিন না পর্যন্ত প্রচারিত হয় ততদিন পর্যন্ত তাহার কাজের জন্য মক্কেল বাধ্য থাকেন।

অংশীদারিত্ব

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মূলধন দিয়া লাভ লোকসানে শরীক হইবার শর্তে কোন ব্যবসায় লিপ্ত হইতে পারেন। তাহাদের এই সংযোগকে চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল আকদ (شركة العقد) বলে। ইহা সম্পত্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব বা ইজমালী মালিকানা (শিরকাতুল মিলক شركة الملك) হইতে ভিন্ন।

চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্বে শর্ত

চুক্তিভিত্তিক অংশীদরিত্বের মূল সূত্র হইতেছে এই যে, ইহাতে প্রত্যেক শরীকের লভ্যাংশে মালিকানা থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবসায়ে নির্ধারিত বেতনে নিযুক্ত থাকেন তবে তাহাকে শরীক বলা যায় না। প্রত্যেক অংশীদারের অংশ নির্ধারিত থাকা উচিত, অন্যথায় ঐ চুক্তিকে ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ গণ্য করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার অংশীদারিত্ব

অংশীদারিত্ব সাধারণত দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যে অংশীদারিত্বে সকল অংশীদারের অংশ সর্বক্ষেত্রে, যথা পুঁজি বিনিয়োগ এবং লভ্যাংশে, সমান সেই অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ময়াফাদাত (شركة المفاوضة) বলে। যে অংশীদারিত্বে অংশীদারগণের অংশ সমান নহে তাহাকে শিরকাতুল আনান (شركة العنان) বলে। শিরকাতুল মুয়াফাদাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার

www.pathagar.com

তাহার অপর অংশীদারের জামিনদার বা প্রতিনিধি। সুতরাং অংশীদারের কাজ বা স্বীকৃতি অন্যের উপর বাধ্যকর। এই বাধ্যকরতা আইনের বিধান, ইহার জন্য চুক্তিতে বিশেষ কোন বিধানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শিরকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে বিশেষ বিধান না থাকিলে এইরূপ বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সকল প্রকার অংশীদারিত্বে প্রত্যেক অংশীদার তেজারতির কাজে একে অন্যের এজেন্ট গণ্য হন। ইসলামী আইন অংশীদারের ব্যক্তিগত দক্ষতা স্বীকার করিয়া তাহাকে বেশী লভ্যাংশ দিতে উৎসাহ দেয়। কোন অংশীদার কম মূলধন দিয়া তাহার দক্ষতার কারণে বেশী মূলধন পাইতে পারে এবং চুক্তিনামায় এইরূপ বিধান রাখা সর্বতোভাবে আইনসম্মত। অংশীদার তাহার উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব বা কাজ তিনি নিজে পালন বা সম্পাদন না করিয়া অন্যকে দিয়া করাইতে পারেন।

মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব তিন প্রকারের হইতে পারে ঃ

১। যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার কিছু পুঁজি তেজারতির মূলধনে প্রদান করেন এবং সকলে তাহাতে শ্রম এবং দক্ষতা প্রয়োগ ও ব্যবহার করেন এবং সকলে লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লইতে স্বীকৃত হন, সেইক্ষেত্রে ঐ অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল আমওয়াল (شركة الاموال) বলে।

২। যে ক্ষেত্রে মূলধন বলিতে সকল অংশীদারের শ্রম এবং দক্ষতা বুঝায় সেই ক্ষেত্রে ঐ অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল আমল (شركة العمل) বলে। দুইজন দর্জি একত্রে মিলিয়া দর্জির তেজারতিতে লিপ্ত হইলে উহাকে এই পর্যায়ের অংশীদারিত্ব বলা যায়। এই প্রকার অংশীদারিত্বে একজন অংশীদার বা একাধিক অংশীদার তেজারতি পরিচালনার জন্য দোকান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিতে পারে।

৩। যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক পুঁজিহীন অংশীদার ধারে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করিতে এবং লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লইতে সম্মত হয় সেই ক্ষেত্রে ঐ অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ওয়াজুহ (شركة الوجوه) বলে।

৪। যে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি সমস্ত মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্যেরা তাহাদের দক্ষতা এবং শ্রম দেয় সেক্ষেত্রে ঐ অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল মোদারিবা (شركة المضاربة) বলে। এই প্রকার অংশীদারিত্বে লভ্যাংশ সকল অংশীদারের প্রাপ্য হয়। কিন্তু যিনি মূলধন সরবরাহ করেন তিনি যদি সমস্ত মুনাফার অধিকারী হন, তবে ইহাকে অংশীদারিত্ব

www.pathagar.com

বলা যায় না ; তখন ইহাকে বাদাআত (بضاعة) বলে ; আর যাহারা শ্রম এবং দক্ষতা দিয়াছেন লভ্যাংশ যদি তাহারা পান তবুও ইহাকে অংশীদারিত্ব বলা হয় না ; ইহাকে বলা হয় করদ (قرض)।

৫। যখন একজন অংশীদার জমি দেন এবং অন্যজন দেন তাহার শ্রম এবং দক্ষতা, এবং এইভাবে ঐ জমি চাষাবাদ হয় তখন সেই অংশীদারিত্বকে বলা হয় মুজারাআত (مزارعة)।

৬। একজন অংশীদারের গাছ যদি অন্য অংশীদার তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে এই অংশীদারিত্বকে মাসাকাত (مساقاة) বলে।

অংশীদারের অধিকার এবং দায়িত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক অংশীদার আইনের দৃষ্টিতে অন্য. অংশীদারের এজেন্ট গণ্য হন। তবে শিরকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে এজেন্টের ক্ষমতা, বিশেষ চুক্তির অবর্তমানে সমান হয় না। শিরকাতুল আমওয়ালের ক্ষেত্রে সকল অংশীদার তেজারতির মাল বিক্রয় করিতে পারেন কিন্তু ক্রয় করিবার অধিকার যিনি মালের তত্ত্বাবধান করেন একমাত্র তাহারই। অংশীদারিত্বের সম্পত্তি একজন অংশীদার অন্যের বিনানুমতিতে ধার দিতে পারে না কিন্তু ধার গ্রহণ করিতে পারে। যে ব্যক্তির হেফাজতে মাল থাকে সে ব্যক্তিকে অন্যের আমানতদাররূপে কাজ করিতে হয়।

শিরকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ অনুসারে লোকসানের অংশ নির্ধারিত হয়। ভিন্ন চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এই আইন বলবৎ থাকে। মোদারিবায় সমস্ত লোকসান মূলধন বিনিয়োগকারী অংশীদারের উপর পড়ে। শিরকাতুল ওয়াজ্বাবে অংশীদারগণ তাহাদের লোকসানের পরিমাণ চুক্তির মধ্যে নির্ধারণ করে।

অংশীদারিত্ব বিলোপ

নোটিশ দিয়া প্রত্যেক অংশীদার অংশীদারিত্বের বিলোপ সাধন করিতে পারে। কোন একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলে বা কোন একজন অংশীদার পাগল হইয়া গেলে ঐ অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয় ইহাই আইনের বিধান। কিন্তু দুইয়ের বেশী অংশীদার থাকিলে এবং মাত্র একজন মরিয়া গেলে বা পাগল হইলে অন্য অংশীদারগণ অংশীদারিত্ব চালাইয়া যাতে পারেন।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
পারিবারিক আইন

পরিবারের ধারণা

যে বিশেষ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামী আইনে পরিবার সম্পর্কীয় বিধানাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেছে নিকাহ (نكاح) বা বিবাহ। সন্তানের পিতৃত্ব ইহারই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মীয়-স্বজনের সম্বন্ধ ইহারই মাধ্যমে নির্ণীত হয়। যে নীতিতে পিতাই প্রধান, মুসলিম পরিবারের ভিত্তি সেই নীতির উপর বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন আলোচনা করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, প্রাক-ইসলামী যুগে গোত্রভিত্তিক সমাজ হইতেই ক্রমান্বয়ে পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন আরব সমাজে নারী জাতির আইন-ভিত্তিক মর্যাদা অতিশয় দুর্বল ছিল। পারিবারিক জীবনে তাহাদের প্রভাব ছিল না বলিলেই চলে। সেই দিনে গোত্রই ছিল বড় কথা। গোত্রের প্রাধান্য ছিল সব কিছুর উপরে। গোত্র লইয়াই ছিল অহংকার এবং অপমান বোধ। সেকালে পরিবারও ছিল, কিন্তু তাহা ছিল নিজের অস্তিত্বে নয়, গোত্রের উপ-বিভাগরূপে। অনেক পরিবার মিলিয়া একটি গোত্র হইত এবং সকল মর্যাদা ছিল গোত্রের ; পরিবারও গোত্রের মর্যাদায় মর্যাদা পাইত। মহান ইসলাম এই অবস্থা এবং ব্যবস্থার পরিবর্তন আনিল। বিশুদ্ধ বিবাহ-নীতির সুশৃংখল এবং কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম সমাজিক জীবনে গোত্রের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া তথায় পরিবারের ভিত্তি উপস্থাপিত করিল।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমাজজীবনে পরিবারকে একক ধরা হইলেও ইসলামী আইনের মূলনীতি হইতেছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং অধি-কার। ইসলামী আইনের এই মূলনীতি হইতে স্খলন কোনক্রমেই আইন বরদাস্ত করে না। সমাজের ভিত্তি যাহাই হোক না কেন ; ইসলামী আইন প্রত্যেক মানুষকে যেমন অধিকারের মর্যাদা দিয়াছে তেমনি কর্তব্যের দায়িত্বে আনিয়াছে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার এবং দায়িত্ব একান্তভাবে তাহার নিজস্ব। যৌথ পরিবার বা এজমালি সংসার বলিয়া ইসলামী আইন কিছু স্বীকার করে না। হিন্দু আইনে সম্পত্তির উপর পারিবারিক মালিকানার স্বীকৃতি এবং পরিবারের কর্তার সর্বাধিনায়কতা অন্যের জন্য অবশ্য প্রতিপাল্য।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনে এইরূপ বিধান নাই। মুসলিম পরিবারের যিনি প্রধান, তাহার কিছু কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষমতার ভিত্তি হয় চুক্তি নতুবা আবশ্যকতা, পরিবারের অশক্ত ব্যক্তিবর্গের হেফাজতের জন্য আবশ্যক বোধে এই শক্তির বা ক্ষমতার ব্যবহার হইতে পারে। স্বামী এবং স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনে একত্র বাস বান্ছনীয় এবং ইসলামী আইন তাহাই নির্দেশ দেয় কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে একত্র বাস ইসলামী আইনের নির্দেশের আওতায় আসে না। এক বাড়ীতে পরিবারের সকলকে থাকিতে হইবে এমন কোন নির্দেশ ইসলামী আইনে পাওয়া যায় না। ইসলামী আইনে রক্তের সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের উপর পারিবারিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবাহের নীতি

ইসলামী আইন বিবাহ প্রথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে উদ্দেশ্যাবলী সম্মুখে রাখিয়া ইসলামী আইন বিবাহের নির্দেশ দিয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

১। মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য প্রজননের প্রয়োজন। নর এবং নারীর যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এই প্রজনন সম্ভব। বিবাহ দ্বারা নর-নারীর যৌন সংসর্গের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। মানুষ বাঁচিতে চাহে, তাহার এই আকাংক্ষা মরোণোত্তর কালের দিকেও প্রসারিত। বংশধরগণ তাহার এই আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করে। বিবাহ বংশের ধারাকে রক্ষা করে।

৩। নর ও নারী স্বাভাবিকভাবে কামপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অপ্রশমিত কামোন্মাদনা তাহাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে। বিবাহ তাহাদিগকে এই বিপথগামিতা হইতে রক্ষা করে।

৪। বিবাহ নর-নারীর জীবনকে সততার দিকে আকর্ষণ করে।

৫। কঠিন জীবন সংগ্রামে নর নারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এবং নারী নরকে অবলম্বন করিয়া একে অপরকে সাহায্য করিতে পারে। জীবিকার্জনে তাহারা একে অন্যের পরিপূরক হইতে পারে। বিবাহের ইহাও একটি উদ্দেশ্য।

৬। বিবাহিত নর-নারীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রেমের উন্মেষ হয়। ক্রমে ক্রমে তাহাদের দ্বৈত জীবন এক হইয়া ওঠে। নর-নারীর মধ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠাও বিবাহের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে বিবাহ প্রথা যেমন মুয়ামালাত তেমনি ইবাদত। ইহা যেমন একদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে অন্যদিকে তেমনি তাহাদের জীবনকে ইবাদতমুখী করিয়া তোলে। বিবাহের জন্য উভয় পক্ষেরই সম্মতির প্রয়োজন। বিবাহের পূর্বে নর এবং নারী চুক্তি করিবার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সমক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বিবাহের পর তাহাদের যে জীবন, স্বাভাবিকভাবে সে জীবন সরল রেখায় চলে না ; তাহাতে অনেক বাঁক, অনেক মোড়, অনেক প্রশ্ন এবং অনেক জটিলতা। এই প্রশ্ন এবং জটিলতার মোকাবেলায় ভারসাম্য স্থাপনের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর একজনকে কিঞ্চিত অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়। শুধু নিজেদের জন্য নয় ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও এই ক্ষমতার প্রয়োজন। দম্পতির একজনকে এই অধিকার মানিয়া লইতে হয়। এই মানিয়া লওয়াকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় মুতা (متعه) বলা হয়। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কে এই অধিকার পাইবে, সেই প্রশ্নে আইন স্বামীর পক্ষেই রায় দিয়াছে। এই রায়ের কারণ হইতেছে স্বামীই সাধারণত দেহে এবং মনে স্ত্রী অপেক্ষা বলবান। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, দেনমোহর দিয়া এই অধিকার স্বামী-স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। কিন্তু স্বামী যে অধিকার লাভ করেন আইন তাহার উপর অনেক বাধা নিষেধ ও সীমা আরোপ করিয়াছে।

নিঃসন্দেহে ইসলামী আইন এক বিবাহের সমর্থক। ইহাই আইনের মতে আদর্শ কিন্তু আইন পুরুষকে অনধিক চারজন স্ত্রী গ্রহণের অধিকার এই শর্তে দিয়াছে যে, তাহাদের সকলের সহিত স্বামী সমান ব্যবহার করিবে। এই প্রশ্নে ইসলামী আইনকে বুঝিতে হইলে ইসলামের আবির্ভাব কালের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকাইতে হয় এবং ইসলামী আইনের নক্‌শা বুঝিয়া লইতে হয়। ইসলামী আইনের নক্‌শা হইতেছে এই যে, ইহা একটি নীতিকে আদর্শ বলিয়া মনে করে এবং সেই আদর্শকে বাস্তবায়ন করিবার জন্য স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিতে থাকে। সবক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে কাজ হয় না, তাই বিবর্তনের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমস্তরে শুধু সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর কাজগুলিকে বাছিয়া লওয়া হয় এবং সেইগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ; এইভাবেই আইন অগ্রসর হইতে থাকে। অবাধ বিবাহের স্থলে ইসলামী আইন শর্তযুক্ত বহু বিবাহ সমর্থন করিয়াছে।

স্বামী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার রাখে। ইহার অর্থ এই যে,

www.pathagar.com

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী যে অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি সেই অধিকার ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু বিবাহের জন্য যেহেতু চুক্তি আবশ্যক, তাই চুক্তিমূলে স্ত্রী স্বামীর অধিকারকে খর্ব করিতে পারেন অথবা নিজের উপর এই অধিকার লইতে পারেন। স্ত্রী বিবাহ চুক্তি মূলে দাম্পত্য বন্ধন ছেদন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

বিবাহ কোন সম্ভাবনার উপর বা ভবিষ্যৎ ঘটনার উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের যে উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হইলে, তাহা পূর্ণ হয় না।

বিবাহের পদ্ধতি

সকল চুক্তির মত প্রস্তাব এবং গ্রহণের মাধ্যমেই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। ইহার জন্য কোন উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। হানাফিগণ বলেন, বিবাহের জন্য প্রস্তাব এবং গ্রহণকে দুইজন উপযুক্ত সাক্ষীর সামনে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, অন্যথায় বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। মালেকীদের মতে, সিদ্ধতার জন্য নহে, প্রচারের জন্য বিবাহে সাক্ষীর আবশ্যক।

কিন্তু সকল নারী সকল পুরুষকে এবং সকল পুরুষ সকল নারীকে বিবাহ করিতে পারে না। ইসলামী আইনে এই সম্পর্কে কিছু বিধি নিষেধ আছে।

নিষিদ্ধ সম্পর্ক

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিকট-আত্মীয় এবং আত্মীয়াদের মধ্যে কোন সময়েই বিবাহ হইতে পারে না। তাহাদের উপর যে নিষেধ আরোপিত হয় তাহা চিরস্থায়ী। সাধারণত রক্তের সম্পর্ক, বিবাহের সম্পর্ক এবং দুধের সম্পর্ক, এই তিন সম্পর্কের আত্মীয় এবং আত্মীয়াদের মধ্যে চিরস্থায়ী নিষেধ আরোপিত হয়। এইরূপ নিষিদ্ধ নর এবং নারীকে মুহারিম (محارم) বলা হয়। রক্তের সম্পর্কের মধ্যে পুরুষের জন্য যাহারা মুহারিম তাহারা হইতেছেন নারী-উত্তর-পুরুষ এবং পূর্ব-পুরুষ অথবা সকল পূর্ব-পুরুষের কন্যা এবং সকল উত্তর-পুরুষের কন্যা অথবা ভাইঝি অথবা বোনঝি অথবা ভাইঝির এবং বোনঝির কন্যা। বৈবাহিক কারণে পুরুষ-মুসলিমের মুহারিম হইতেছে তাহার পূর্ব-পুরুষের স্ত্রী এবং তাহার পুত্রের বা পৌত্রের স্ত্রী। রক্তের সম্পর্কের যে সমস্ত আত্মীয় মুহারিম, দুধের সম্পর্কের সেই সমস্ত আত্মীয় মুহারিম।

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধ অস্থায়ী প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইসলাম সর্বতোভাবে তৌহিদপন্থী ধর্ম। বহু ঈশ্বরবাদীদের সহিত ইসলাম সম্পর্ক রাখিতে চায় না। সেই কারণে কোন মুসলিমের সহিত বহু-ঈশ্বরবাদীর বিবাহ হইতে পারে না। যে সমস্ত ধর্ম কিতাবী (যেমন ইহুদী, নাসারা) তাহাদের অনুসারীদের সহিত মুসলিমের বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়। মুসলিম পুরুষ কিতাবী নারীকে বিবাহ করিতে পারে। যেহেতু নাসারা এবং ইহুদী কিতাবী সেহেতু তাহাদের নারীর সহিত মুসলিম পুরুষের বিবাহ সিদ্ধ। কিন্তু কোন মুসলিম নারী কোন নাসারা বা ইহুদী পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না। এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই বৈষম্যের কারণ খুবই সহজ-বোধ্য। নারী যেমন তাহার স্বামীর প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়, সাধারণত পুরুষ তেমন হয় না। মুসলিম নারী অমুসলিমের ঘরে গেলে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণের সম্ভাবনার মধ্যে পড়িয়া যান। ইসলাম ইহা বরদাস্ত করে না। কোন মুসলিম পুরুষের ঘরে অমুসলিম স্ত্রী আসিলে সেই পুরুষ যে তাহার প্রিয় ধর্ম ত্যাগ করিবে এমন আশংকা করা হয় না। এই কারণে মুসলিম পুরুষকে কিতাবী স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে এই নিষেধ চলিয়া যায়।

বিবাহের উপর কিছু অন্য প্রকার নিষেধাজ্ঞাও আইন দিয়াছে। কোন পুরুষ একটি বিশেষ সংখ্যার অধিক নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। আবার তাহার স্ত্রী বর্তমান থাকিতে তিনি এমন কোন নারীকে বিবাহ করিতে পারেন না যাহাকে তাহার স্ত্রী পুরুষ হইলে বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর ফুফু, খালা বা ভাইঝি ও বোনঝিকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যে স্ত্রী লোক ইদ্দত পালন করিতেছে তাহাকে ইদ্দত কালের মধ্যে বিবাহ করা যায় না।

বাতিল বিবাহ এবং ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ

কোন ব্যক্তি তাহার ভগ্নি বা ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা নিষিদ্ধ সম্পর্কের ব্যক্তি। এই নিষেধ চিরস্থায়ী। ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে তাহা বাতিল গণ্য হয়। তাহা কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ইদ্দত পালনকারিণী কোন মহিলাকে বিবাহ করে বা বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করে তবে উহা ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ গণ্য হয়।

যে বিবাহ বাতিল, আইন তাহাকে একেবারেই স্বীকার করে না। এই বিবাহ যে কখনো হইয়াছে আইন তাহা মানিয়া লয় না। সেই কারণে বিবাহের কোন আইনভিত্তিক প্রতিক্রিয়া এই সম্পর্ক দ্বারা সৃষ্টি হয় না।

www.pathagar.com

কিন্তু ফাসিদ বিবাহের প্রতিক্রিয়া এইরূপ কঠোর নয়। ফাসিদ বিবাহের সন্তান বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং স্ত্রী দেনমোহরের দাবী করিতে পারেন এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইলে তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হয়। এতদসত্ত্বেও আদালত এই বিবাহকে নাকচ করিতে পারেন।

বিবাহের যোগ্যতা

হানাফীদের মতে সকল বালেগ পুরুষ ও নারী নিজেরাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন। তাহারা সম্মত না হইলে কেহই তাহাদিগকে বিবাহ দিতে পারেন না। শাফিঈ এবং মালেকিগণ বলেন যে, বালেগ পুরুষ এবং ক্ষতযোনি বালেগ নারীগণ শুধু বিবাহ করিবার অধিকার রাখেন। শাফিঈগণ আরও বলেন যে, ক্ষতযোনি বালিকা হইলেও সে নিজে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু কুমারী হইলে তাহার বিবাহ করিবার অধিকার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও জন্মে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হানাফীদের মতে বালিকার বিবাহের জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন। কিন্তু শাফিঈদের মতে অবিবাহিত বালিকা বালেগা হইলেও বিবাহের অধিকার রাখে না ; হানাফিগণ বলেন যে, শাফিঈ-গণ বালেগা নারীকে মর্যাদা দিতে অস্বীকার করিয়া ইসলামী আইনের একটি মূল নীতিকে অস্বীকার করিয়াছে। ইসলামী আইনের মূলনীতি হইতেছে এই যে, বালেগা নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান।

বিবাহের অভিভাবক

বিবাহ একটি গুরুতর ব্যাপার। মানুষের জীবনে ইহার গুরুত্ব অপরি-সীম। বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন তাই একটি অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া হানাফিগণ বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা, পিতামহ এবং অন্যান্য আত্মীয়কে অভিভাবকত্ব দিয়াছে। কিন্তু পিতা বা পিতামহ ব্যতীত অন্য কাহারও অভিভাবকত্বে যে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়, পাত্র বা পাত্রী সেই বিবাহ অস্বীকার করিতে পারে এবং সেই বিবাহকে নাকচ করিয়া দিবার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। পাত্র এবং পাত্রীর এই অধিকারকে আইনের পরিভাষায় খেয়ারুল বুলুগ (خيار البلوغ) বলে। পিতা এবং পিতামহ যে বিবাহেব অভি-ভাবক, সেই বিবাহ সম্পর্কে পাত্র এবং পাত্রীর অধিকার এতদূর বিস্তৃত নহে। আইনতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, পাত্র-পাত্রীদের কল্যাণ কামনায় পিতামহ বা

পিতা যে বিবাহ দিয়াছেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকার দিলে তাহাদের কল্যাণ-মানসকে আঘাত করা হয়।

মালেকিগণ মনে করেন যে, হাদীস একমাত্র পিতাকে পাত্র এবং পাত্রীর অভিভাবক স্বীকার করে। শাফিঈগণ হাদীসের এই অধিকারকে পিতামহ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। হানাফিগণ পিতা এবং পিতামহ ছাড়া অন্যকেও অভিভাবকত্বের অধিকার প্রদান করেন এবং বলেন, ইহাই ইসলামী আইনের নীতি। আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে বিবাহের অভিভাবকত্ব সুলতান বা কাজীর উপর বর্তায়।

পিতা এবং পিতামহ অভিভাবক থাকিয়া যে বিবাহ দেন, সেই বিবাহ যে নাবালক পাত্র এবং পাত্রীর পক্ষে কল্যাণকর আইন তাহা অনুমান করে। কিন্তু এই অনুমান চূড়ান্ত নহে। পরিণামে যদি ইহা দৃষ্ট হয় যে, নাবালক বা নাবালিকার জন্য বিবাহ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিজনক এবং অবাঞ্ছিত হইয়াছে তবে সেই বিবাহ রদযোগ্য হইয়া পড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের বর্তমান আইনে এই নীতি কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক বিবাহ দিলে এবং বিবাহে যৌন মিলন না হইলে ১৮ বৎসরের পূর্বে স্ত্রী বিবাহ নাকচ করিয়াছে এই কারণে সে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী পইতে পারে।

এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে মেয়েকে ঋতুমতী হইবার সাথে সাথেই বালেগা ধরা হইত এবং বালেগা হইবার পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়া থাকিলে বালেগা হইবার পর সে বিবাহ নাকচ করিতে পারিত। বর্তমান আইনে ঋতুমতী হইবার সাথে বিবাহ নাকচ করিবার অধিকারের কোন যোগ নাই। বর্তমান আইনে ১৬ বৎসরের আগে যে বিবাহ তার পিতা বা অভিভাবক দিয়াছেন, সেই মেয়ে ১৮ বৎসর বয়সে পড়িবার আগে তাহার বিবাহ নাকচ করিতে পারে। ইসলামিক পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৮ আইনে) ১৫ বৎসরকে বাড়াইয়া ১৬ বৎসর করিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পিতা বা পিতামহ কর্তৃক নিষ্পন্ন বিবাহ নাকচযোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমান আইনে পিতা নাবালিকা মেয়ের (১৬ বৎসরের কম) বিবাহ দিলেও সেই বিবাহ নাকচযোগ্য। প্রসঙ্গত ইহাও বলা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে নাবালক নাবালিকার বিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

অসম বিবাহ

সমতা বলিতে, (১) বংশের, (২) চরিত্রের, (৩) সম্পত্তির, (৪) পেশার, (৫) মর্যাদার এবং (৬) শিক্ষার সমতা বুঝায়। বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীকে এই ছয়টি নিরিখে স্ত্রীর সমতুল্য হইতে হয়। কোন নারী যদি এইগুলি উপেক্ষা করিয়া নিম্নস্তরের কোন পুরুষকে বিবাহ করে, তবে তাহার আত্মীয় স্বজন ইহাতে বাধা দিতে পারে। বংশের ইজ্জতকে রক্ষা করাই এই নির্দে-শের উদ্দেশ্য।

দাম্পত্য অধিকার

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করেন। এই অধিকারসমূহের কিছু স্বামী পান তাহার স্ত্রীর উপর এবং কিছু স্ত্রী লাভ করেন তাহার স্বামীর উপর। বিবাহের সময় কিংবা পরবর্তী কালে স্বামী এবং স্ত্রী এই সমস্ত অধিকার চুক্তির মাধ্যমে সংকুচিত বা প্রসারিত করিতে পারেন। স্ত্রীর উপর সাধারণভাবে স্বামী যে সমস্ত অধিকার লাভ করেন সেইগুলি একে একে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

১। স্বামীর অধিকার আছে এই দাবী করার যে, স্ত্রী তাহার (স্বামীর) গৃহে বাস করিবেন এবং স্বামীকে সঙ্গ দিবেন। এই অধিকার খুবই মৌলিক কিন্তু তবুও এই অধিকার একেবারে শর্তহীন নহে। যে ব্যবহার স্ত্রীর নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, স্বামী যদি স্ত্রীর উপর সেই ব্যবহার করেন, তবে স্ত্রী স্বামীর সহবাসে যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারেন।

২। অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের সহিত স্ত্রীর মেলামেশা যাহাতে অশালীন না হইয়া ওঠে, স্বামী তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা করিবার সুযোগ চাহিলে স্বামী সেই সুযোগ প্রদান করিতে অসম্মত হইতে পারেন না।

৩। কতিপয় বিশেষ সীমার মধ্যে স্ত্রীর চলাফেরার অধিকার স্বামী সীমিত রাখিতে পারেন এবং স্বামী স্ত্রীকে অশোভন আচরণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামী নিজের আচরণকেও শোভন রাখিতে বাধ্য। নিজে অসভ্য হইয়া তিনি স্ত্রীর কাছে সভ্যতা দাবী করিতে পারেন না।

৪। স্বামী আপন বিবেচনায় যে কোন সময় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন এবং কয়েকটি সীমার মধ্যে তিনি একাধিক বিবাহ করিতে পারেন।

www.pathagar.com

স্বামীর এই তালাক এবং বহু বিবাহের অধিকারকে অত্যুচ্চ পরিমাণ মোহরানা ধার্য করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং এই উপমহাদেশে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ করা হয়। বিবাহের সময় এইরূপ চুক্তি করা যায় যে, স্বামী যদি একাধিক বিবাহ করেন তবে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে। চুক্তির মাধ্যমে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

ইসলামী আইন স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীকে কোন অধিকার দেয় নাই। স্ত্রীর সম্পত্তির উপর মালিকানা অর্জন তো দূরের কথা, তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কোন অধিকার স্বামীর নাই। স্ত্রীর সম্পত্তি সবসময় তাহার নিজের থাকে। বিবাহের পূর্বে এবং পরে স্ত্রী আপন অধিকারে সম্পত্তি অর্জন বা বর্জন করিতে পারেন। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীর সম্পত্তি সম্পর্কীয় কোন অধিকার খর্বিত, সংকুচিত বা বিনষ্ট হয় না। স্ত্রী তাহার এক বিবাহ বলবৎ থাকাকালে অন্য বিবাহ করিতে পারেন না।

স্বামীর উপর স্ত্রীরও কতিপয় অধিকার ইসলামী আইন দিয়াছে। সেইগুলি নিম্নরূপ।

১। স্ত্রী তাহার মর্যাদা অনুযায়ী বাসস্থান দাবী করিতে পারেন। স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সহিত একত্রে বাস করিতে তিনি অস্বীকৃত হইতে পারেন।

২। স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী এবং উভয়ের মর্যাদা অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণ-পোষণ দাবী করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করিতে পারন না।

৩। সতীন থাকিলে তিনি তাহার তুলনায় সমব্যবহার দাবী করিতে পারেন।

৪। তিনি তাহার মোহরানা দাবী করিতে পারেন। তলবী মোহরানা দেওয়া না হইলে তিনি স্বামীর সহবাসে যাইতে আপত্তি করিতে পারেন।

দেনমোহর

বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী যে অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করেন, তাহা সাধারণত দেনমোহর নামে পরিচিত। ইহাকে বিবাহের পণ বা মূল্য বলা সঙ্গত নহে। ইহা যদি পণ বা মূল্য হইত, তবে যে বিবাহে উহার উল্লেখ থাকে না, সেই বিবাহ অসিদ্ধ গণ্য হইত। দেনমোহরের উল্লেখ না থাকিলেও সেই বিবাহ সিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর হইতেছে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ইজ্জতের

www.pathagar.com

নিদর্শন। স্ত্রী কিংবা তাহার অভিভাবক বিবাহের সময় যে কোন পরিমাণ দেনমোহর ধার্য করিতে পারেন। দেনমোহরের পরিমাণ খুব বেশী হইলেও তাহা অসিদ্ধ হয় না। বিবাহের সময় দেনমোহর একেবারেই ধার্য না হইলে স্ত্রী মোহরে মিসল (مهر المثل) পাইতে অধিকারী হন। স্ত্রীর পরিবারের অন্যান্য পাত্রিগণ যে রূপে দেনমোহর পাইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ মোহরের অধিকারী হন। ইহাকে মোহরে মিসল বলে।

স্বামীর সহিত সহবাস হইলে দেনমোহরের উপর স্ত্রীর অধিকার পূর্ণ ভাবে আদায়যোগ্য হয়। স্বামী এবং স্ত্রী বাধাহীনভাবে একত্রে বাস করিলে (খেলওয়াতুল সহীহ الخلوة الصحيحة) তাহাদের মধ্যে সহবাস হইয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়। স্বামী বা স্ত্রীর যে কোন একজনের মৃত্যু হইলে দেন-মোহর পূর্ণভাবে আদায়যোগ্য হয়। স্বামী কর্তৃক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইলে কিংবা স্বামীর কোন কাজের জন্য বিবাহ ভাঙিয়া গেলে স্ত্রী দেনমোহর পাইতে অধিকারী হন। সম্ভুক্ত বা নির্জন বাস হইয়া থাকিলে তিনি পূর্ণ দেনমোহর পাইবেন, অন্যথায় পাইবেন অর্ধেক। স্ত্রীর কোন দোষের কারণে যদি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং তিনি যদি সম্ভুক্ত বা নির্জনবাসিনী না হইয়া থাকেন তবে তিনি কোন দেনমোহর পাইবেন না।

দেনমোহর দুই প্রকার হইয়া থাকে। যথা—তলবী (মুআ'জ্জাল معجل) এবং স্থগিত (মুয়াজ্জাল مؤجل)। দেনমোহর কোন্ প্রকারের হইবে তাহা বিবাহের চুক্তির উপর নির্ভর করে। চুক্তির অভাবে ইহা প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিবাহ বর্তমান থাকাকালে স্ত্রী যে কোন সময় তলবী মোহরানা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে স্থগিত দেনমোহর দাবী করা যায় না।

বিবাহ বিচ্ছেদ

স্বামী যে কোন সময় কারণে বা অকারণে স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন। বিবাহের সময় চুক্তিমূলে স্ত্রীও এই অধিকার লাভ করিতে পারেন। স্বামীর এই অধিকারকে আইনের পরিভাষায় তালাক বলে। বালেগ এবং পরিণত বুদ্ধির না হইলে স্বামী তালাকের অধিকার অর্জন করে না।

www.pathagar.com

ইসলাম তালাককে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। স্বামী এবং স্ত্রীর একত্র বাস একেবারেই অসহ্য হইয়া পড়িলেই, কেবল সেই পরিস্থিতিতেই এই কঠোর অস্ত্র বিবাহের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু উচ্চারিত হইলেই ইহা কার্যকরী হয়। তালাকের পশ্চাতে সংগত কারণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। অধিকার এমন অবাধ হওয়ার ফলে ইহার প্রয়োগ সীমিত হওয়া আবশ্যক। ইসলাম যে সমস্ত কাজকে জায়েজ করিয়াছে তাহার মধ্যে তালাক একটি, কিন্তু ইহা নিকৃষ্টতম (আবগাদুল মুবাহাত لمباحات । ابغض)।

মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আইন মানুষকে যে অধিকার দিয়াছে সেই অধিকারের প্রতিক্রিয়া যদি অশুভ হয় তবে উহাকে শর্ত এবং সীমার বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় ; স্বামীর এই অধিকারের উপর আইন কিছু কিছু শর্ত আরোপ করিয়াছে। স্বামী যাহাতে অকস্মাৎ ক্রোধের বশে বা অসম্ভব দ্রুততায় এই অধিকার প্রয়োগ না করে এবং তাহাদের যুগ্ম মঙ্গল এবং সন্তানদের কল্যাণ কামনায় যেন ইহা করে, আইনের বিধিমালা সেই নির্দেশ দেয়।

তালাক সাধারণত দুই প্রকারের যথা—রাজাই (رجعى) এবং বাইন (بائن) রাজাই তালাক প্রত্যাহারযোগ্য কিন্তু বাইন তালাক নয়। ইদ্দতকালে স্বামী যদি তালাক প্রত্যাহার না করেন, তবে রাজাই তালাক বাইন হইয়া যায়। প্রত্যাহার যেমন কথার দ্বারা করা যায় তেমনি আচরণ দ্বারাও করা যায়।

তালাকের পদ্ধতি সাধারণত তিন রকমের হয়। যথা—আহসান (احسن) হাসান (حسن) এবং বিদাত (بدعة) । আহসান পদ্ধতিতে স্বামী স্ত্রীর তোহরের (طهر) সময় একবার তালাক উচ্চারণ করেন এবং ইদ্দতকাল পর্যন্ত উহা প্রত্যাহার করেন না। ইদ্দতের পর তালাক কার্যকরী হয়। হাসান পদ্ধতিতে প্রতি তোহরের সময় স্বামী তালাক উচ্চারণ করেন এবং এইভাবে তিন তোহরের সময় তিনবার তালাক উচ্চারণ করেন। তৃতীয়বার উচ্চারণের পর তালাক কার্যকরী হয়।

কিন্তু স্বামী যদি একবার মাত্র এইভাবে তালাক উচ্চারণ করেন যাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি আর উহা প্রত্যাহারযোগ্য রাখিতে চান না তাহা হইলে ঐ তালাক চূড়ান্ত গণ্য হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলেন, আমি তোমাকে

www.pathagar.com

অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়াছি, তবে সেই তালাক চূড়ান্ত গণ্য হয়। স্বামী যদি তিনবার বলেন, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তবে ঐ তালাক চূড়ান্ত গণ্য হয়। স্বামী যদি বলেন, আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম তবে সেই তালাক চূড়ান্ত গণ্য হয়। অবশ্য যেভাবেই হোক না কেন, একত্রে এইরূপ অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া আইন বাঞ্ছনীয় মনে করে না। তাই এই তালাককে বিদাৎ বলা হয়।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন বাংলাদেশে এই নীতির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স-এর ৭ ধারায় বলা হইয়াছে ঃ

(১) কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থ করিলে, যে কোন প্রকারের হউক তালাক উচ্চারণ করার পরেই তিনি তালাক দিয়াছেন বলিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ দ্বারা জানাইবেন এবং স্ত্রীকেও উহার একটি নকল পাঠাইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি (১) উপধারার বিধান অমান্য করিলে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) (৫) উপধারার বিধান অনুসারে অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন তালাক পূর্বাহ্নে প্রত্যাহার করা না হইলে (১) উপধারা মোতাবেক চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরিত নোটিশের তারিখ হইতে ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

(৪) (১) উপধারা মোতাবেক নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একটি সালিশী কাউন্সিল গঠন করিবেন এবং এই কাউন্সিল পুনর্মিলন ঘটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) তালাক দেওয়ার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে (২) উপধারায় উল্লিখিত মুদ্দত অথবা গর্ভকাল এই দুইটির মধ্যে যাহা পরে শেষ হইবে তাহা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

(৬) এই ধারামতে কার্যকরী তালাক দ্বারা যে স্ত্রীর বিবাহ ভংগ হইয়াছে, ঐ বিবাহ ভংগ তৃতীয়বারের জন্য কার্যকরী না হইলে তৃতীয়

www.pathagar.com

ব্যক্তির সংগে মধ্যবর্তীকালীন কোন বিবাহ ছাড়াই তাহার পূর্ব স্বামীর সংগে পুনর্বিবাহ কোনরূপ বাধা থাকিবে না।

হানাফিগণের মতে জবরদস্তিতে পড়িয়া তালাক দিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিনা তাহলিলে পুনর্বার বিবাহ করা সিদ্ধ নহে। ইমাম সাহেবের এই মত অন্য ইমামগণ সমর্থন করেন না। ইমাম আবু হানিফার ফতোয়ায় শব্দের প্রতি মোহের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আইনের মতলবকে উপেক্ষা করিয়া সূক্ষ্ম আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার ফলে এইরূপ মতবাদের জন্ম হয়।

ইলা, জিহার

তালাক শব্দ উচ্চারণ না করিয়া অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে এমন অভিপ্রায়ব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার না করিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হওয়া যায়। স্বামী যদি এই বলিয়া শপথ করেন যে, তিনি স্ত্রীর সহিত কোন যোগ রাখিবেন না এবং এইরূপ বিযুক্ত অবস্থায় চার মাস কাটাইয়া দেন তবে এই আচরণের প্রতিক্রিয়ায় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে। ইহার নাম ইলা। কোন স্বামী যদি তাহার স্ত্রীকে তাহার মাতার কিংবা অন্য মুহারিম নারীর সহিত তুলনা করেন তবে ইহার ফলে স্বামী কাফ্ফারা দিতে বাধ্য হইবেন।

স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ

তালাক দিবার অধিকার স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করিতে পারেন। একবার প্রদান করিলে তিনি উহা আর ফিরাইয়া লইতে পারেন না। অবশ্য স্ত্রী ইচ্ছা করিলে এই ক্ষমতা ব্যবহার নাও করিতে পারেন। এই ক্ষমতা প্রদানকে তাফবিদ (تفويض) বলে। তাফবিদ তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথম প্রকার হইতেছে আল ইখতিয়ার (الاختيار)। ইহাতে স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক দিতে পার বা পছন্দ মত কাজ করিতে পার। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে আল আমরুবিল ইয়াদ (الامر باليد) ইহাতে স্বামী স্ত্রীকে বলেন, তোমার কারবার তোমার হাতে রহিল। তৃতীয় প্রকার হইতেছে আল মাশিয়াত (المشية) ইহাতে স্বামী স্ত্রীকে বলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তালাক দিতে পার। অর্থ কিংবা সম্পত্তির বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া

www.pathagar.com

হইলে ইহাকে খুলা (خلع) অথবা মুবারত (مبارات) বলা হয়। মুবারতের অর্থ হইতেছে পারস্পরিক মুক্তি।

তালাকের উচ্চারণ

তালাক প্রকাশ্য শব্দের দ্বারা (সরীহ صريح) অথবা সাংকেতিক শব্দ দ্বারা (কিনায়া) করা যাইতে পারে। তালাক লিখিত বা মৌখিক হইতে পারে। যে শব্দ এত স্পষ্ট যে ইহার মধ্যে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা নাই তাহাকে সরীহ বলে। যে শব্দের অর্থ তালাক হইতে পারে আবার অন্য কিছু হইতে পারে, সেই শব্দকে কিনায়া বলে। শব্দ বা বাক্য যেখানে স্পষ্ট সেখানে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শব্দ বা বাক্য যেখানে অস্পষ্ট বা সাংকেতিক, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আর যেখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেখানে স্বামীর বক্তব্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ফুরকাত

স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন। ক্ষমতা প্রাপ্তা হইলে স্ত্রীও স্বামীকে তালাক দিতে পারে। আইন আদালতকে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার অধিকার দিয়াছে। এই অধিকারকে ফুরকাত বলা হয়। স্বামীর দোষে ফুরকাত হইলে তালাকের প্রতিক্রিয়া হয়। স্ত্রীর দোষে ফুরকাত হইলে ফাসখ (فسخ) এর প্রতিক্রিয়া হয়। উভয়ভাবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়।

স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ আনেন, তবে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন। ইহাকে লিয়ান (لعان) বলে। স্বামী যদি বীর্যহীন বা লিঙ্গহীন হয়, তবে আদালত বিবাহ রদ করিতে পারেন। এই রদ তালাকের মত। স্ত্রী যদি খেয়ারুল বুলুগের অধিকার প্রয়োগ করিয়া বা কুফুর কারণে বিবাহ রদ করাইয়া লয়, তবে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর উদযোগে হইয়াছে ধরিয়া লইতে হয়। স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের বিকৃতির কারণে স্বামী যদি বিবাহ রদ করাইয়া লয় তবে এই বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর দোষে হইয়াছে ধরিয়া লইতে হয়। ধর্মত্যাগের কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে।

বাংলাদেশে এই নীতির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এই আইনের ৪ ধারায় বলা হইয়াছে ঃ বিবাহিত মুসলিম নারী যদি ইসলাম

www.pathagar.com

ধর্ম ত্যাগ করিয়া বা ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে তবে সেই কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবে না। কিন্তু ধর্ম ত্যাগের পরও যে সব কারণে মুসলিম বিবাহিত স্ত্রী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী পাইতে পারে, এই ধর্মত্যাগী স্ত্রীও সেই সব কারণে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী পাইবে। অবশ্য কোন বিধর্মী স্ত্রীলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পুনরায় তাহার আদি ধর্মে ফিরিয়া গেলে সেই স্ত্রী এই ধারার মর্যাদা পাইবে না।

ইসলাম-পূর্ব যুগে স্ত্রীকে তালাক দিবার যে অবাধ অধিকার স্বামীর ছিল এবং যে অধিকারের বলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিত কিন্তু মুক্তি না দিয়াও কিছু বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারিত, ইসলামের আবির্ভাবের পর ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে সেই প্রথাকে সংস্কারমুখী করা হইয়াছে। এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইসলামী আইন বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মধ্যে স্থায়ী প্রেম প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ইসলামী আইনের যে আদর্শ তাহাতে বিবাহের সম্বন্ধ হইবে আজীবন। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া বিবাহ এবং তালাকের আইনকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। যাহাকে ভাল-বাসিতে পারা যায় না তাহাকে বাঁধিয়া রাখার কোন হেতু নাই। বাঁধিয়াও রাখিব এবং ভালবাসাও দিব না এই ব্যবস্থা অন্যায়। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা এই দুই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

প্রসংগত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলিমদের মধ্যে এক বিবাহই নীতি, বহু বিবাহ হইতেছে ব্যতিক্রম বিশেষ। এই উপমহাদেশে মুসলিমদের মধ্যে বিবাহের চুক্তির মধ্যে অন্য বিবাহের নিষেধের শর্ত লিখিয়া লওয়া হয়। কতিপয় সমাজ ব্যতীত মুসলিমদের মধ্যে বহু বিবাহকে শুধু একটি রক্ষাকবজ রূপে গ্রহণ করা হয়। পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাকে একটি উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইদ্দত

বিবাহ বিচ্ছেদের সাথে সাথে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদ নানা প্রকারের হইতে পারে। স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিতে পারেন। স্বামী প্রদত্ত ক্ষমতায় শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী তালাক দিতে পারেন, আদালত বিবাহ রদ করিয়া দিতে পারেন এবং সর্বশেষে স্বামী

www.pathagar.com

স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হইতে পারে। এই সমস্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। কিন্তু যেভাবেই হউক না কেন বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও কিছু দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় থাকে। বস্তুত বিবাহকে এক প্রকার যৌন অংশীদারিত্ব বলা যায়। এই অংশীদারিত্ব একটি বিশেষ সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই বিশেষ সময়কে ইদ্দত (عدة) বলে। ইদ্দতের শাব্দিক অর্থ হইতেছে গণনা করা। যেই সময়কে আইন ইদ্দত নাম দিয়াছে সেই সময় অতিবাহিত না হইলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। স্ত্রীকে কেন ইদ্দত পালন করিতে হয় তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। যে সময় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, সেই সময় স্ত্রীর গর্ভে সন্তান থাকিতে পারে। সন্তান আছে কিনা তাহা গর্ভকালের একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী অন্য বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে কাহার সন্তান অবস্থান করিতেছে তাহা জানা কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীকে একটি নির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিতে হয়। ইদ্দতের ইহাই তাৎপর্য। কিন্তু যে বিবাহে যৌন সহবাস হয় নাই সেই বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে ইদ্দত প্রতিপালন আবশ্যক নহে। তালাকের মাধ্যমে যে বিবাহ ভংগ হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দত হইতেছে তিন ঋতুকালের মেয়াদ, ইহাই হানাফীদের মত। শাফিঈ এবং মালেকিগণ ইদ্দতের জন্য তিন তোহর নির্ধারণ করিয়াছেন। নাবালিকা এবং বৃদ্ধার জন্য ইদ্দত তিন মাস। বিধবার জন্য ইদ্দত চার মাস দশ দিন। গর্ভবতী নারীর জন্য প্রসবকাল পর্যন্ত ইদ্দত প্রসারিত হয়। যতদিন না পর্যন্ত ইদ্দত শেষ হয় ততদিন নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার নাই। তবে তিনি তাহার স্বামীগৃহে বাস করিবার অধিকার রাখেন। তালাকপ্রাপ্তা হইলে তিনি ইদ্দত কালের জন্য ভরণ-পোষণ পাইতে অধিকারী হন।

পিতৃত্ব

বিবাহ প্রথার একটি মূল্যবান অবদান হইতেছে সন্তানের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পিতৃত্ব দিয়াই সন্তানের মর্যাদা নির্ণীত হয়। সন্তান মুসলিম কি অমুসলিম ইহা জানিতে হইলে তাহার পিতার ধর্মের খোঁজ লইতে হয়। আইন পিতার উপর সন্তান পালনের দায়িত্ব দিয়াছে। কে পিতা তাহা না জানিতে পারিলে এই দায়িত্ব বলবৎ করা যায় না। ইসলামী আইন এই বিষয়ে খুবই উদার। সকল সন্তানকেই ইসলাম বৈধ বলিয়া গণ্য করে। প্রসংগত স্মরণ রাখা

www.pathagar.com

প্রয়োজন যে, বংশের গৌরব করা আরব চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাহার পিতৃত্ব অনির্ণীত আরব সমাজ তাহাকে ঘৃণ্য জ্ঞান করিত। আরবে দত্তক গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

বিবাহিতা নারীর সন্তানের পিতা তাহার স্বামী। দাম্পত্য শয্যায় সন্তান জন্মলাভ করে। দম্পতির বিবাহ সম্পর্ক বজায় থাকা কালে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে ছয় মাসের মধ্যে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তানের পিতৃত্ব তাহার মাতার স্বামীকে আইন দেয়। বিবাহ অব্যাহত থাকা কালে সন্তান জন্মিলে আইন ধরিয়া লয় যে, ঐ সন্তান প্রসূতির স্বামীর। বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবার পর ছয় মাসের মধ্যে সন্তান হইলে উহাও প্রসূতির স্বামীর সন্তান বলিয়া গণ্য করা হয়। তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিলে দুই বৎসর পর্যন্ত স্ত্রীর সন্তানকে তাহার স্বামীর সন্তান বলিয়া হানাফিগণ গণ্য করেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ এই মেয়াদকে চার বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। কত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে সন্তানের জন্ম হইলে উহার পিতৃত্ব প্রাক্তন স্বামীর উপর আরোপ করা যাইবে ইহা লইয়া বিভিন্ন মযহাবের মধ্যে প্রচুর মতভিন্নতা দেখা যায়। পিতৃত্ব সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আইনের একটি অনুমান মাত্র। এই অনুমান অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে গ্রহণযোগ্য না-ও হইতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর কোন নারী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময় হইতে ছয় মাসের মধ্যে তিনি যদি একটি সন্তান প্রসব করেন তবে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারে কোন অনুমানের সাহায্য লওয়া উচিত নয়। তবে আইনের মতে অন্তত ছয় মাস না হইলে গর্ভকাল পূর্ণ হয় না। সুতরাং বিবাহের পর ছয় মাস উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে স্ত্রীর সন্তান হইলে সেই সন্তানকে বৈধ বলা যায় না। বিবাহকালে স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করেন সেই সন্তানকে স্বামী তাহার নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারেন। হানাফিগণের মতে স্ত্রীর সহিত সংযোগ না থাকিলেও এই দাবী নষ্ট হয় না। শাফিঈগণ অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্বামী কাজীর সম্মুখে শপথ লইয়া সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে কাজী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন।

বিবাহ যেমন সহিহ হইতে পারে তেমন আবার ত্রুটিপূর্ণও হইতে পারে। কিন্তু বিবাহের ত্রুটি সন্তানের পিতৃত্বকে প্রভাবিত করে না। স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিয়া তাহার যে সন্তানকে দুনিয়ায় লইয়া আসেন সেই সন্তানের পিতৃত্ব নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাসকারী পুরুষের উপর অর্পিত হয়।

www.pathagar.com

পিতৃত্বের স্বীকৃতি

বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও যখন কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে তাহার সন্তান বলিয়া স্বীকৃতি দেয় তখন আইন সেই স্বীকৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লয়। শিশুর যদি বুঝিবার বয়স হইয়া থাকে তবে সে এই পিতৃত্বের দাবীকে মানিয়া লইতে পারে এবং মানিয়া লইলেই পিতৃত্বের এই দাবী ত্রুটিহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যদি দেখা যায় যে, অবস্থা এবং পরিস্থিতি এইরূপ যে শিশুটি তাহার দাবীদারের সন্তান হইতে পারে না তাহা হইলে অন্য কথা। সেই ক্ষেত্রে আইন ঐ ব্যক্তিকে পিতা বলিতে স্বীকৃত হইবে না। দবিরের বয়স চল্লিশ বছর। আকবরের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। দবির দাবী করিলেন যে, আকবর তাহার পুত্র। পাঁচ বৎসর বয়সে কাহারও পক্ষে সন্তানের পিতা হওয়া সম্ভব নয়; এই কারণে দবিরের দাবি অগ্রাহ্য হইবে। বশির যে ইমরানের পুত্র তাহা সকলেই জানে। খলিল বশিরকে তাহার পুত্র বলিয়া দাবী করিলেন। এই দাবী গ্রাহ্য হইবার কথা নয়। ইকরাম দাবী করিলেন যে নকিব তাহার পুত্র। দেখা গেল যে নকিবের মাতা ইকরামের ভগ্নি। ইকরামের এই দাবী গ্রাহ্য হইবে না। স্বীকৃতিকে আইনের ভাষায় ইকরার (اقرار) বলা হয়। ইকরারকে জন্মের বৈধতায় প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়।

সন্তানের ভরণ-পোষণ

সাধারণত সন্তানের ভরণ-পোষণ করিবার দায়িত্ব পিতার। যেহেতু আইন পিতার উপর এই দায়িত্ব দিয়াছে, সেহেতু সন্তান পিতার বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের দাবী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। সন্তান যদি পুত্র হয় তবে যে পর্যন্ত না সে নিজস্বভাবে জীবিকার্জনে সক্ষম হয়, সে পর্যন্ত এই অধিকার বলবৎ থাকে। পুত্র যদি অক্ষম হয় তবে যে পর্যন্ত না তাহার অক্ষমতা দূর হয় সে পর্যন্ত তাহার এই অধিকার বলবৎ থাকে। আর সন্তান যদি কন্যা হয় তবে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাহার এই অধিকার বলবৎ থাকে। কিন্তু পিতা যদি দরিদ্র হন এবং মাতা বিত্তবতী হন তবে মাতার উপর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য বিত্তবতী মাতা যে অর্থ ব্যয় করেন, সেই অর্থ তিনি পিতার দরিদ্র দশা কাটিয়া যাইবার পর তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার অধিকারপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

হন। মাতা এবং পিতা উভয়েই দরিদ্র হইলে এবং পিতামহ অথবা পিতৃব্য ধনী হইলে, পিতামহ বা পিতৃব্যের উপর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। অবশ্য তাহারা এই খরচ, সন্তানের পিতা যখন সক্ষম হন তখন তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। সন্তানের যদি সম্পত্তি থাকে তবে পিতা সেই সম্পত্তি হইতে সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন।

দরিদ্র আত্মীয়বর্গ

ভরণ-পোষণের জন্য দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের আত্মীয়বর্গের উপর কিছু দাবী আইনত রাখেন। যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বিবাহের বেলায় নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে পড়ে, তাহারা এই দাবী করিতে পারেন। পিতা, মাতা কিংবা পিতামহ ও পিতামহী যদি দরিদ্র হইয়া পড়েন তবে পুত্র এবং পৌত্র তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। পুত্র এবং পৌত্র যদি সম্পদশালী না হন তবুও তাহারা এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি পান না। আত্মীয়বৃন্দ তখনই সাহায্যের দাবী করিতে পারেন যখন তাহারা বয়সের কারণে বা অন্য দৈহিক কারণে অক্ষম হন। নারীর ক্ষেত্র অবিবাহিত বা বিধবা হলেই এই দাবী চলে। এই দাবী সেই আত্মীয়ের উপর করা যায় যে আত্মীয় নিজে দরিদ্র নন। দরিদ্র আত্মীয়ের উপর এই প্রকার দাবী চলে না।

অভিভাবকত্ব

যাহারা শিশু বা জড়বুদ্ধি বা বিকৃতমস্তিষ্ক তাহারা আত্মরক্ষায় কিংবা সম্পত্তি রক্ষায় অপারগ, তাহাদের জন্য আইন অভিভাবকত্বের বা বেলায়েতের (ولايت) ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে অপারগ ব্যক্তির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অক্ষম ব্যক্তিদের দেহ এবং সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়নের জন্য বেলায়েতের বিধান করা হইয়াছে। তবে দেহের জন্য যিনি অভিভাবক হইবেন সম্পত্তির জন্যও যে তিনি অভিভাবক হইবেন এমন কোন কথা নাই। এই দুই কাজের জন্য দুই ব্যক্তি কিংবা এক ব্যক্তি অভিভাবক হইতে পারেন। যাহার জন্য অভিভাবকত্বের প্রতিষ্ঠা, তাহার কল্যাণই এই নীতির মূল উদ্দেশ্য। যাহার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হয় তাহার কল্যাণ ব্যতীত অভিভাবক অন্য কিছুই ভাবিতে পারেন না। অভিভাবকের অধিকার তাই কল্যাণনিরপেক্ষ নয়।

www.pathagar.com

দেহের অভিভাবক

দেহের তত্ত্বাবধানের (হিজানাত حضانة) অধিকার সাধারণত পিতা মাতার। যে সন্তান এতই শিশু যে, সে নিজে খাইতে বা কাপড় পরিতে পারে না সেই সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার মাতার উপর ন্যস্ত। পুত্র হইলে সাত বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা হইলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত মাতার এই অধিকার বজায় থাকে। মাতার অবর্তমানে মাতামহী, পিতামহী, ভগ্নি, ফুফু, খালা প্রভৃতির উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

এই অধিকার সন্তানের কল্যাণের জন্য মাতার উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের কল্যাণের প্রতি মাতার বা আত্মীয়ার পক্ষে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়ার কাছে সন্তানের কল্যাণ আশা করা যায় না তবে মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়ার উপর এই দায়িত্ব বহাল রাখা বা অর্পণ করা যায় না। সন্তানের কোন অনাত্মীয়কে যদি মাতা বিবাহ করেন কিংবা যদি প্রকাশ্যভাবে দুশ্চরিত্রা হইয়া পড়েন কিংবা মাতা যদি এমন পেশায় নিযুক্ত হন, যে পেশায় সন্তানের দিকে তাকাইবার তাহার অবসর নাই, তবে আইন তাহাকে সন্তানের হিজানাত দিবে না।

পুত্রের বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হইলে এবং কন্যা বালেগ হইলে তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকার পিতা লাভ করেন। সন্তানের মংগলের জন্য এই বিধান করা হইয়াছে। এই বয়সে পুত্র এবং কন্যার জন্য যাহা প্রয়োজন, মাতার পক্ষে তাহা সরবরাহ করা কঠিন। শিক্ষার ব্যয় সাধারণভাবে পিতাই দিতে পারেন। এইসব সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পিতা মরণোত্তরকালের জন্য ব্যবস্থা করিবার অধিকার রাখেন। সেই সময়ের জন্য তিনি অভিভাবক মনোনীত করিয়া যাইতে পারেন। পিতা এবং তাহার মনোনীত ব্যক্তির অবর্তমানে পিতামহের উপর কিংবা পিতৃবংশের অন্য কাহারও উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। তাহাদের অবর্তমানে আদালত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

সম্পত্তির অভিভাবক

নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের অধিকার প্রথমে পিতার, অতঃপর পিতা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির। তাহাদের অবর্তমানে পিতামহই এ অধিকার লাভ করেন। তাহার অবর্তমানে আদালত দায়িত্ব গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

নাবালকের সম্পত্তি অভিভাবকই রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাহার নিজের সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ করিবার জন্য যেরূপ যত্ন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের ক্ষেত্রে অভিভাবক সেইরূপ সাবধানতা ও যত্ন লইতে বাধ্য। যাহা করিলে নাবালকের মঙ্গল হয় তিনি তাহাই করিতে পারেন। যাহা নাবালকের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা করিবার অধিকার তাহার নাই। তিনি নাবালকের সম্পত্তি দান, ওয়াকফ বা অসিয়ত করিতে পারেন। তবে তিনি দান করিতে পারেন না। তিনি নাবালকের পক্ষে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন না। অভিভাবকরূপে তিনি যদি নাবালকের ক্ষতিকর কোন কাজ করেন তবে তাহার সেই কাজের জন্য নাবালকের সম্পত্তি দায়ী হইবে না। যে লেন-দেনে লাভ লোকসানের সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই, সেই লেন-দেনে অভিভাবক নাবালকের পক্ষে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু অভিভাবকের সেই প্রকার লেন-দেন নাবালকের সম্পত্তির উপর বাধ্যকর হয় না, যে লেন-দেনে সংঘাতিক ক্ষতি বা লোকসান হয়।

উত্তরাধিকার

মুসলিমদের মধ্যে পারিবারিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হইতেছে উত্তরাধিকার আইন। যখন কোন ব্যক্তি মরিয়া যান তখন তাহার কর্তব্য দায়িত্ব এবং অধিকার স্থানান্তরিত হয়। উহা যাহাদের উপর বর্তায় তাহারাই হইতেছেন উত্তরাধিকারী। এই অধিকার এবং দায়িত্বের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে। অধিকার বলিতে সম্পত্তির উপর, সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন শস্য বা মুনাফার উপর, পাওনা প্রভৃতির উপর অধিকার বুঝায়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দেনা শোধ করা উত্তরাধিকারীর কর্তব্য এবং দায়িত্বের মধ্যে আসিয়া যায়। মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উত্তরাধিকারিগণ তাহাই ভাগ বন্টন করিয়া লয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে তাহার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করিতে হয়। অতঃপর তাহার দেনা থাকিলে সেগুলি শোধ করিতে হয় বা দায় থাকিলে তাহা হইতে মুক্তি লইতে হয়। এই সব শেষ হইবার পর তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টিত হয়।

যাহারা বৈবাহিক সম্পর্কে বা রক্তের সম্পর্কে নিকট আত্মীয় তাহারাই মৃতের সম্পত্তি লাভ করিবার যোগ্য। ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের ইহাই

www.pathagar.com

মূলকথা। যাহারা যত বেশী নিকটে তাহাদের দাবী তত বেশী। কে কত বেশী নিকটে এই প্রশ্নের নিরসন বড়ই কঠিন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, পিতামাতা এবং পুত্রের মধ্যে কে তোমার বেশী নিকটে তা তুমি জান না। স্বাভাবিকভাবে যাহারা যত বেশী নিকটে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন তাহাদের তত বেশী প্রাধান্য দিয়েছে।

উত্তরাধিকারে বাধা

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র চতুষ্টয়ে উত্তরাধিকারীর অধিকার লাভ বাধাপ্রাপ্ত হয়ঃ

১। দাসত্ব ঃ যে ব্যক্তি দাস তিনি নিজেই অপরের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হন। সুতরাং তাহার পক্ষে সম্পত্তি অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি মিরাস (উত্তরাধিকারত্ব) পান না।

২। খুন ঃ হন্তা বা ঘাতক যাহাকে হত্যা করেন, তাহার সম্পত্তি তিনি (ঘাতক) পান না।

৩। ভিন্ন ধর্মিতা।

৪। দেশের ভিন্নতা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম কোন ব্যক্তির মিরাস অমুসলিম দেশের কোন ব্যক্তি পান না।

মিরাসের বণ্টন ঃ আসহাবুল ফারায়েদ

আল-কুরআন কতিপয় উত্তরাধিকারীর অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাহাদের অংশ এইভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে আসাবুল ফারায়েদ (اصحاب الفرائض) বলে। তাহাদের সংখ্যা ১২। এই বারজনের চারজন পুরুষ এবং আটজন নারী। তাহারা হইতেছেন ঃ

(১) স্বামী, (২) পিতা, (৩) দাদা (পিতার পিতা) (৪) সহোদর ভাই (বৈপিত্রেয়), (৫ স্ত্রী, (৬) মাতা, (৭) দাদী (পিতার মাতা), (৮) কন্যা, (৯) ছেলের কন্যা, (১০) আপন ভগ্নী (একই বাপ-মা জাত), (১১) বৈমাত্রেয় ভগ্নী এবং (১২) সহোদর ভগ্নী (বৈপিত্রেয়)। এই বারজন ছয় রকম নির্দিষ্ট অংশে মিরাস পান। যথা : ১/২ অংশ, ১/৪ অংশ, ১/৮ অংশ, ২/৩ অংশ, ১/৩ অংশ ১/৬ অংশ। অংশ নিম্নবর্ণিতভাবে বণ্টিত হয়।

(ক) পিতা ঃ যদি মরহুমের পুত্র বর্তমান থাকে তবে তিনি ১/৬ অংশ প্রাপ্ত হইবেন। যদি পুত্র বর্তমান না থাকে, কিন্তু কন্যা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে পিতা প্রথমে তাহার নির্দিষ্ট অংশ ১/৬ গ্রহণ করিবেন এবং অন্যাকে

www.pathagar.com

অবশ্য প্রাপ্য অংশ বণ্টন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, অবশিষ্টাংশ ভোগী হিসাবে তাহা গ্রহণ করিবেন।

(খ) মাতা ঃ যদি মরহুমের পুত্র এবং/কিংবা কন্যা বর্তমানে থাকে তাহা হইলে তিনি ১/৬ অংশ প্রাপ্ত হইবেন, যদি উহাদের কেহই বর্তমান না থাকে তাহা হইলে ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

(গ) স্বামী ঃ যদি মরহুমের পুত্র কিংবা কন্যা কেহ বর্তমান থাকে তাহা হইলে তিনি ১/৪ অংশ পাইবেন। আর যদি তাহাদের কেহই বর্তমান না থাকে তবে তিনি ১/২ অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

(ঘ) স্ত্রী ঃ যদি মরহুমের পুত্র কিংবা কন্যা কেহ বর্তমান থাকে তাহা হইলে তিনি ১/৮ অংশ পাইবেন। যদি তাহাদের কেহই বর্তমান না থাকে তাহা হইলে ১/৪ অংশ প্রাপ্ত হইবেন। একাধিক স্ত্রী থাকিলে উহারা ঐ অংশ নিজদিগের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া লইবেন।

(ঙ) কন্যা ঃ মরহুমের পুত্র এবং কন্যা যদি বর্তমান থাকে তাহা হইলে কন্যা কোন নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবেন না। উপরোক্ত অংশীদার-দিগের যাহারা বর্তমান থাকে তাহাদিগকে তাহাদের অংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ বন্টন করিয়া লইবেন যেন প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ প্রাপ্ত হয়। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র কন্যা না থাকে, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের কন্যা বর্তমান থাকে তাহা হইলে তাহারা ঐ পুত্র কন্যার স্থলাভিষিক্ত হইবে ; অর্থাৎ ঐ পুত্র কন্যার মতই অংশ গ্রহণ করিবে। সুতরাং এক্ষেত্রে পিতা, মাতা, স্বামী কিংবা স্ত্রীর অংশের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

পুত্র ও কন্যারা যতই নিম্ন হউক না কেন, উহারা যদি সমস্তরের হয় এবং উহাদের উচ্চস্তরের কোন পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা পুত্র কন্যার মতই সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবে।

যদি উপরের কিংবা সমস্তরের কোন পুত্র কন্যা বর্তমান না থাকে তাহা হইলে কন্যা একা হইলে ১/২ অংশ এবং একাধিক হইলে ২/৩ অংশ সমান ভাগে নিজদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার অধিকারী হইবেন।

(চ) পুত্রের কন্যা ঃ যদি কন্যা থাকে এবং কন্যার স্তরে কোন পুত্র না থাকে তাহা হইলে কন্যা একজন হইলে সে ১/২ অংশ প্রাপ্ত হইবে ; এবং পুত্রের কন্যা ১/৬ অংশ প্রাপ্ত হইবে। যদি কন্যা একাধিক থাকে তাহা হইলে তাহারা ২/৩ অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং পুত্রের কন্যা কোন অংশই

www.pathagar.com

প্রাপ্ত হইবে না। অর্থাৎ কন্যা পক্ষের $\frac{১}{২}$ অংশ কন্যাগণই গ্রহণ করিবে ; পুত্রের কন্যাগণ কোন অংশই প্রাপ্ত হইবে না।

(ছ) যদি মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা না থাকে এবং পুত্রও না থাকে তাহা হইলে পিতা, মাতা, স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুত্রের কন্যাগণ কন্যাগণের মতই অংশ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ একজন হইলে $\frac{১}{২}$, একাধিক হইলে $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং একজন হইলে উহাদের নিম্নস্তরের কন্যাগণ $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্ত হইবে।

(জ) কন্যাকে পুত্রের সঙ্গে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আইন প্রদান করিয়াছে এবং কন্যাকে পুত্রের সঙ্গে এই অবশিষ্টাংশ ২ : ১ অনুপাতে ভোগ করার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এবং পুত্র জীবিত না থাকিলে ; কন্যা একজন হইলে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং একাধিক হইলে উহারা একত্রে $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রাপ্ত হইবে। পুত্রের উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতি পিতা মাতা, স্বামী কিংবা স্ত্রী এবং কন্যা এই আপনজনদের কেহই উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। এইজন্য ইহাদিগকে আসহাবুল ফারায়েদ বলা হইয়াছে।

পুত্র প্রথম শ্রেণীর অবশিষ্ট ভোগী এবং পিতা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশিষ্ট ভোগী। ইসলামী আইনানুযায়ী ইহারা বতমান থাকিতে পিতা মাতা, স্বামী কিংবা স্ত্রী এবং কন্যা ব্যতীত অন্য কেহই কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে না। যদি পুত্র, পিতা এবং কন্যা বর্তমান না থাকে তাহা হইলে কুরআন নির্দেশিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশীদারগণ তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবে। যথা : (জ) সহোদর ভগ্নী, একজন হইলে $\frac{১}{২}$ একাধিক হইলে $\frac{২}{৩}$ একত্রে গ্রহণ করিবে।

(ঝ) বৈমাত্রেয় ভগ্নী, একজন হইবে $\frac{১}{২}$ একাধিক হইলে $\frac{১}{৩}$ একত্রে গ্রহণ করিব।

(ঞ) বৈপিত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নী, একজন হইলে $\frac{১}{৬}$ একাধিক হইলে $\frac{২}{৩}$ একত্রে সমান অংশে গ্রহণ করিবে।

ইহার পরে আসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়ারিশ। ইহারা আসাবা (عصبه) নামে অভিহিত হয়। আসহাবুল ফারায়েদগণের মধ্যে মিরাস বণ্টনের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিলে আসাবাগণ পায়। আসাবাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১। আসাবা বি নাফসিহি
২। আসাবা বি গায়রিহি
৩। আসাবা মা গায়রিহি

www.pathagar.com

আসাবা বি নাফসিহি নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণকে বলা হয় ঃ

১। পুত্র
২। পুত্রের পুত্র এবং অধঃস্তন পুরুষ
৩। পিতা
৪। পিতার পিতা এবং ও উর্ধ্বতন পুরুষ।
৫। আপন ভাই
৬। বৈমাত্রের ভাই
৭। আপন ভ্রাতার পুত্র
৮। বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্র
৯। আপন ভ্রাতার পুত্রের পুত্র
১০। বেমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের পুত্র
১১। আপন চাচা
১২। বৈমাত্রেয় চাচা
১৩। আপন চাচার পুত্র
১৪। বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র
১৫। আপন চাচার পুত্রের পুত্র
১৬। বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রের পুত্র
১৭। আপন চাচার পুত্রের পুত্র, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রের পুত্র প্রভৃতি।

'আসাবা বি গায়রিহি, সেই সমস্ত মহিলা ওয়ারিসকে বলা হয় যারা পুত্রের ওয়ারিসদের সাথে সম্পত্তি পায়। যথা ঃ

১। কন্যা, পুত্র সহ।
২। পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রসহ।

'আসাবা মা গায়রিহি' নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বলা হয় ঃ

১। আপন ভগ্নী, পুত্রের কন্যার কন্যাসহ।
২। বৈমাত্রেয় ভগ্নী ; কন্যা এবং পুত্রের কন্যাসহ।

'আসাবাত'কে অন্যভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। মৃতের সন্তান
২। মৃতের পুরুষ জাতীয় উর্ধ্বতন পুরুষ।
৩। মৃতের পিতার পুরুষ জাতীয় সন্তান। প্রথম অংশ পাবেন মৃতের সন্তান, তারপর উর্ধ্বতন পুরুষ তারপর পিতার অধঃস্তন পুরুষ।

www.pathagar.com

ইহার পরে আসে জাবউল আরহাম (ذوى الارحام)। যাহারা কুরআন নির্দেশিত অংশীদার (জাবুল-ফারায়েদ) নয়, কিংবা অবশিষ্ট ভোগী (আসাবা) নয় তাহাদিগকে দূর-আত্মীয় (জাবুল-আরহাম) বলা হয়। ইহারা হইল স্বগোত্র বা আসাবাদিগের মধ্যে অংশীদার নয় এমন স্ত্রীলোকগণ; যথা ভ্রাতার কন্যা কিংবা পিতার ভগ্নী এবং স্ত্রী লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত যাহারা এইরূপ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণ যথা কন্যার পুত্র, কন্যার কন্যা ইত্যাকার ব্যক্তিগণ।

(১) যদি কোন অংশীদার কিংবা অবশিষ্টভোগী বর্তমান না থাকে তাহা হইলে মরহুমের সম্পত্তি দূর আত্মীয়গণের মধ্যে বন্টন করা হয়, (২) কিংবা যদি স্বামী কিংবা স্ত্রী একমাত্র অংশীদার হিসাবে বর্তমান থাকে এবং কোন অবশিষ্টভোগী জীবিত না থাকে তাহা হইলে স্বামী কিংবা স্ত্রী তাহার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে এবং বাকী অংশ দূর আত্মীয়গণের মধ্যে বন্টিত হইবে। (৩) দূর-আত্মীয়কে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা:

(১) মরহুমের বংশধরগণ যাহারা অংশীদার কিংবা অবশিষ্টভোগী নয়। (২) মরহুমের পূর্ব পুরুষগণ যাহারা অংশীদার কিংবা অবশিষ্টভোগী নয়। (৩) মরহুমের পিতামাতার বংশধরগণ যাহারা অংশীদার কিংবা অবশিষ্টভোগী নয়। (৪) মরহুমের পিতা-মাতার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষগণের বংশধরগণ, যাহারা অবশিষ্টভোগী নয়। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক নম্বর, দুই নম্বরের উপর, দুই নম্বর তিন নম্বরের উপর এবং তিন নম্বর চার নম্বরের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উহাদের উপরের শ্রেণীর কেহ বর্তমান থাকিতে নিম্নের শ্রেণীর কেহ সম্পত্তিতে অংশ প্রাপ্ত হইবে না।

রক্ত-নিঃসম্পর্কিত উত্তরাধিকারী

অংশীদার, অবশিষ্টভোগী কিংবা দূর আত্মীয়ের অবর্তমানে সম্পত্তি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারগণ প্রাপ্ত হয়। মরহুমের ভবিষ্যতে কোন প্রকার জরিমানা প্রদান করার প্রয়োজন হইতে পারে কিংবা মরহুমকে ভবিষ্যতে কোন প্রকার মুক্তিপণ দ্বারা উদ্ধার করার প্রয়োজন হইতে পারে উহা বিবেচনা করিয়া মরহুম পূর্ব হইতেই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ লোকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন। ইহাতে "ওয়াল" প্রসূত উত্তরাধিকার বলা হইত এবং উহা পারস্পরিক ছিল (উহা এখন এই উপমহাদেশে প্রচলিত নাই)।

www.pathagar.com

বাদ পড়িবার নীতি

মুসলিম আইনে নিম্নলিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মিরাস হইতে বঞ্চিত হয় না :

১। পিতা, ২। মাতা ৩। পুত্র, ৪। কন্যা, ৫। স্বামী এবং ৬। স্ত্রী।

ইহাদের অবর্তমানে ঊর্ধ্বতন বা অধঃস্তন পুরুষেরা ইহাদের অংশ পায়। যথা—পিতার অবর্তমানে পিতার অংশ পিতামহ পায়। অন্য কথায়, পিতা পিতামহকে বঞ্চিত করে।

১। পিতার পিতা, সম্পূর্ণরূপে পিতা কর্তৃক বা নিকটবর্তী পিতার পিতা দ্বারা বঞ্চিত হন।

২। মাতার মাতা, মাতা কর্তৃক এবং নিকটবর্তী পিতামহী দ্বারা বঞ্চিত হন। পিতামহী পিতা কর্তৃক এবং পিতার দ্বারা বঞ্চিত হন।

৩। পুত্রের কন্যা, সম্পূর্ণরূপে পুত্রের দ্বারা বা ঊর্ধ্বতন পিতার পুত্র দ্বারা বঞ্চিত হন।

৪। আপন ভগ্নী, সম্পূর্ণরূপে পুত্রের দ্বারা বা পুত্রের পুত্র, পিতা বা পিতার পিতা দ্বারা বঞ্চিত হন।

৫। বৈমাত্রেয় ভগ্নী, সম্পূর্ণরূপে পুত্রের দ্বারা বা পুত্রের পুত্র, পিতা বা পিতার পিতা দ্বারা বঞ্চিত হন এবং সম্পূর্ণরূপে আপন ভাই বা আপন ভগ্নী দ্বারা বঞ্চিত হন।

৬। সহোদর ভাই (বৈপিত্রেয়), সহোদর ভগ্নী (বৈমাত্রেয়) সম্পূর্ণরূপে পুত্রের দ্বারা বা পুত্রের পুত্র; পিতা বা পিতার পিতা দ্বারা বঞ্চিত হন এবং কন্যার দ্বারা বা পুত্রের কন্যার দ্বারা বঞ্চিত হন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ক্ষতি এবং অপরাধ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষতি

ক্ষতি এবং অপরাধের পার্থক্য

ক্ষতি করা এবং অপরাধ করা আইনের দৃষ্টিতে দুইটি ভিন্ন কাজ হইলেও, ইহাদের মধ্যে ভেদরেখা অতি সূক্ষ্ম। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়ে গণঅধিকার ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। তবুও মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ এই দুই কাজকে ভিন্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। প্রতিকারের নিরিখে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। যে কাজের প্রতিকার কোন ব্যক্তি নিজে পাইতে অধিকারী সেই কাজকে ক্ষতি বলা হয়। যে কাজের প্রতিকার জনসাধারণ পাইতে অধিকারী তাহাকে অপরাধ বলা হয়। যে কাজের আঘাত ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও আহত করে, আইনের দৃষ্টিতে তাহাই ক্ষতি (Tort)। এক ব্যক্তির কাজের জন্য যদি অপর ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাইতে হকদার হন তবে তাহার সেই কাজকে ক্ষতি বলা হয়। কোন ব্যক্তি কাজের জন্য যখন জনসাধারণ আহত হয় তখন সেই ব্যক্তির কাজকে অপরাধ বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তার, সম্পত্তির হেফাজতের এবং কর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে। এই অধিকার ভঙ্গ করিলে ক্ষতি করা হয়।

আত্মরক্ষা এবং নিরোধ

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে তাহার দেহকে এবং সম্পত্তিকে রক্ষা করার (১ غ)। এই উদ্দেশ্যে তিনি আক্রমণকে নিরোধ করিবার জন্য বা প্রতিহত করিবার জন্য, বিপন্ন হইবার পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার রাখেন। আইন বলে না যে, আহত হইবার পূর্বে কাহারও কিছু করিবার নাই। আঘাত আসিতেছে জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আইনের নির্দেশ নয়। আসন্ন আঘাতকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা সকল মানুষ আইনের আওতায় থাকিয়া লইতে পারে। এই অধিকার আইন কেন দিয়াছে তাহার

www.pathagar.com

কারণ অতি সুস্পষ্ট। অন্যকে আঘাত করিবার জন্য যে ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয় সে ব্যক্তি তাহার নিজের নিরাপত্তার আইনভিত্তিক অধিকার হারায়। তাই যে ব্যক্তির দিকে আঘাতকারীর লক্ষ্য নিবদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। এই সময় তাহার পার্শ্বে যাহারা থাকেন তাহারাও এই অধিকার পায়। আঘাত নিরোধ করিতে বা আত্মরক্ষা করিতে কতখানি শক্তি প্রয়োগ সিদ্ধ তাহা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। যতটুকু অগ্রসর হইলে আঘাতকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করা যায় আইন ততটুকু মাত্র অগ্রসর হইবার অধিকার প্রদান করে। যে পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া অপ্রয়োজনীয় ছিল সে পর্যন্ত অগ্রসর হইলে আইন তাহাকে সমর্থন করে না। যে হিংস্রতা অবলম্বন না করিলেও চলে সে হিংস্রতা আইনের চোখে অসমর্থনীয়। অপরাধের আস্ফালন শুনিলেই যে প্রতিহত করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে ইহা সংগত নহে। যে ক্ষতি আসন্ন তাহা যদি আইনের মাধ্যমে নিবারণ করা যায়, তবে তাহাই করিতে হইবে। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজের হাতে আইন তুলিয়া নিতে পারেন না কিন্তু পরিস্হিতি গুরুতর হইলে ক্ষতিকারী ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অধিকারও ইসলামী আইন মানুষকে দিয়াছে। নিজের জীবন রক্ষার জন্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তার জন্য বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য মানুষ খুন করাও আইন বিরুদ্ধে নহে। ঘরের মাল চুরি করিয়া লইয়া রাত্রির অন্ধকারে যখন চোর পালাইতে থাকে তখন গৃহস্বামী চোরকে অনুসরণ করিতে পারেন এবং নিজের মাল উদ্ধার করিবার জন্য চোরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারেন।

যে ব্যক্তির জমিতে কেহ অনধিকার প্রবেশ করে কিংবা উপদ্রবের সৃষ্টি করে সেই ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশককে বাহির করিয়া দিতে এবং উপদ্রব সৃষ্টিকারী সকল বস্তুকে সরাইয়া ফেলিতে পারেন। প্রতিবেশী যদি কোন ব্যক্তির জমিতে তাহার ঘরের এক অংশ বাড়াইয়া দেয় তবে তিনি প্রতিবেশীর সেই বর্ধিত অংশ নিজে সরাইয়া ফেলিতে পারেন। বাড়ীর ছাদে প্রতিবেশী আবরণ সৃষ্টি করিলে বাড়ীর মালিক তাহা সরাইয়া ফেলিতে পারেন। রাস্তার উপর যদি কেহ তাহার মাল জমা করে তবে যে কোন ব্যক্তি উহা সরাইয়া ফেলিতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে জনসাধারণের রাস্তা বা পথ ব্যবহার করিবার। সেই অধিকারে কেহ বাধা সৃষ্টি করিলে তাহার কাজকে আইন ক্ষতি গণ্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ক্ষতি হইতে মুক্ত হইবার। রাস্তাকে কেহ যেমন আটকাইতে পারে না

www.pathagar.com

তেমনি রাস্তার উপর আকাশকে আটকাইবার অধিকার কাহারও নাই। ঝুল বারান্দা রাস্তার উপর আবরণ সৃষ্টি করিলে তাহা প্রত্যেক পথিকই সরাইয়া দিতে পারেন। এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা নিবারণ করিবার অধিকার আইন সকল মানুষকে দিয়াছে। এইসব অপরাধ যখন কাহারও চোখের সম্মুখে সংঘটিত হইতে থাকে কিংবা কোন ব্যক্তি যখন এইসব অপরাধ করিবার উদযোগ গ্রহণ করে তখন যে কোন ব্যক্তি আপন হস্তে আইন গ্রহণ করিয়া ঐ অপরাধীকে নিবৃত্ত করিতে পারে। এই সমস্ত অপরাধ সাধারণত জনসাধারণের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে; তাই আইন সকল মানুষকে এই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে তাহার অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছে।

ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ

ক্ষতির আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে জানায়াত (جناية)। তবে আইনতত্ত্ব-বিদগণ দেহের উপর আঘাতকে জানায়াত বলেন। আঘাত গুরুতর হউক বা লঘু হউক অথবা আঘাতে মানুষ প্রাণত্যাগ করুক বা না করুক সকল আঘাতের ক্ষতিকে জানায়াত বলা হয়। সম্পত্তি সম্পর্কীয় ক্ষতিকে অনধিকার প্রবেশ বা গাসাব (غصب) এবং ধ্বংস বা অনিষ্ট (তালাফ নোকসান تلف نقصان) বলে। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা দুইভাবে ব্যাহত হইতে পারে। যথা জবরদস্তি বা (ইকরা اكراه) এবং প্রতারণা বা তাগরীর (تغرير)।

ক্ষতিপূরণের এই অধিকারসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৌলিক এবং ক্ষতির দায়ও চূড়ান্ত এবং শর্তহীন।

দেহের এবং সম্পত্তির ক্ষতি

হারুন কারুনের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করিল। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবে কারুনের ক্ষতি হইল। এই যে ক্ষতি হইল, তাহার জন্য হারুন কারুনের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে হকদার। হারুনের মনে অভি-সন্ধি ছিল কি না তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য নয়। হারুনের মনের প্রতি আইনের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন ব্যক্তির দেহে এবং শরীরে যখন কোন প্রকার আঘাত আসিয়া পৌঁছে এবং কিছুর মাধ্যম ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি যদি এই আঘাতের কারণ হয়, তবে যে ব্যক্তি এই আঘাতের কারণ হয় আইনের চোখে সেই ব্যক্তি আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তিকে আঘাতের

www.pathagar.com

কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহার কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হইতে পারে আবার দৈবক্রমেও হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই প্রকারভেদের জন্য ক্ষতিপূরণের তারতম্য হয় না। যে ব্যক্তিকে আঘাতের কারণ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়, সেই ব্যক্তি উন্মাদ বা শিশু হইলেও তাহার দায় থাকিয়া যায়।

যদি একাধিক কারণে কাহারও ক্ষতি হইয়া যায় তবে কাহার উপর দায়িত্ব বর্তিবে সেই প্রশ্নের উত্তর দুরূহ হইয়া পড়ে।

দায়-এর নীতি

দবির এবং কবির, দুইজন সাক্ষী, কাজীর সম্মুখে শপথ লইয়া বলিল যে, রমিসার স্বামী রমিসাকে তালাক দিবার ক্ষমতা দিয়াছিল। নকীব এবং রকীব দুইজন সাক্ষী কাজীর সম্মুখে শপথ লইয়া বলিল যে, রমিসা তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। কাজী ইহাদের কথাকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন। অতঃপর দবির এবং কবির বলিল, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। তাহার পর নকীব ও রকীব স্বীকার করিল যে, তাহারাও মিথ্যা বলিয়াছে। এই ক্ষেত্রে নকীব ও রকীব ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে। কারণ তাহাদের কথাতেই কাজী বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম দিয়াছেন।

আকরাম আহসানকে কামলা নিযুক্ত করিল এবং তাহাকে জমিতে কূপ খনন করিতে বলিল। আকরামের আদেশে আহসান কূপ খনন করিল। যে জমিতে কূপ খনন করা হইল সে জমি আকরামের নহে, তমিজের। আহসান জানিত না যে সে তমিজের জমিতে কূপ খুড়িতেছে। এই অবস্থায় কূপ খননের জন্য আকরামই দায়ী হইবে, আহসান নয়। যদিও আহসানের কোদালে তমিজের ক্ষতি হইয়াছে তবুও সে তাহার অজ্ঞতার কারণে রেহাই পাইবে। দবির উজিরকে একটি ঘোড়া মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিল। ঘোড়াটি দবিরের মনে করিয়া উজির উহাকে মারিয়া ফেলিল। এক্ষেত্রে ঘোড়ার মালিকের কাছে উজিরই প্রথম দায়ী হইবে কিন্তু উজিরের কাছে দবির দায়ী হইবে।

যদি ক্ষতির কারণ মানুষ না হইয়া অন্য কিছু হয় এবং সেই অন্য কিছু মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে পরিচালনাকারী মানুষটি ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে। দবির বাঁধ দিয়া তাহার জমির উপর পানি জমাইল। অবশেষে এক রাত্রিতে সে তাহার বাঁধ কাটিয়া দিল। সেই পানি গিয়া প্রতিবেশী

www.pathagar.com

আমীরের জমি ভাসাইল। ইহাতে আমীরের ক্ষতি হইল। আমীরের ক্ষতির জন্য দবির দায়ী হইবে।

যে কাজ মানুষ স্বাভাবিকভাবে সরল বিশ্বাসে করে, সে কাজের জন্য অন্যের ক্ষতি হইলে, তাহাতে কেহ দায়ী হয় না। নিয়াজ তাহার মহল্লার মসজিদে আলোকসজ্জার জন্য একটা ঝাড়বাতি দান করিল। সেই ঝাড়-বাতি ভাঙিয়া পড়ায় একজন মুসল্লী নিহত হইল। নিয়াজ তাহার জন্য দায়ী নহে। মসজিদে আলোকসজ্জা দান করার অধিকার তাহার আছে।

করিম তাহার জমিতে কূপ খনন করিল। আবদাল কূপের কথা না জানিয়া সেই জমিতে গিয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। করিম ইহার জন্য দায়ী নহে।

যে কাজের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি আছে সেই কাজ করিবার সময় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। সাবধান না হইলে বিপদের জন্য তাহাকেই দায়ী হইতে হয়। আরমান একটি বিরাট কাঠ মাথায় লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছে। সেই কাঠ এত ভারী যে, সে উহা মাথায় স্থির রাখিতে পারিতেছে না। পথের এক জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইতেই সে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি মাথায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পথ দিয়া সেই সময় একজন দধিওয়ালা মাথায় দধি লইয়া যাইতেছিল। কাষ্ঠখণ্ডটি দধিওয়ালার শরীরের উপর গিয়া পড়িল। ইহার আঘাতে দধিওয়ালার পা ভাঙিয়া গেল এবং মাথা হইতে দধির ভাণ্ড পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় আরমান দধিওয়ালার পায়ের চিকিৎসা এবং দধির মূল্যের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, কাষ্টখণ্ড মাথায় বহন করা যদিও বেআইনী নয় তবুও সাবধান না হওয়া বেআইনী। যেখানে সাবধান না হইলে অন্যের ক্ষতি হয় সেখানে ঐ ক্ষতির জন্য অসাবধান ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিন্তু কাজটি যেখানে অন্যায় সেখানে সাবধানতা বা অসাবধানতার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। নিয়াজের বাড়ী একটি রাস্তার পার্শ্বে। সে তাহার বাড়ীর ছাদের কার্নিসকে এত বাড়াইয়া দিল যে রাস্তার একাংশ তাহার দ্বারা ঢাকিয়া গেল। কিছুদিন পর ভূমিকম্পে ঐ কার্নিস ভাঙিয়া এক পথিকের মাথায় পড়িয়া তাহাকে জখম করিল। এই ক্ষেত্রে নিয়াজ কার্নিস নির্মাণের সময় সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকিলেও সে পথিকের জখমের জন্য দায়ী হইবে। পথের উপর কাহারও কার্নিস বানাইবার অধিকার নাই। সুতরাং নিয়াজ যাহা করিয়াছে তাহা অন্যায়; নিয়াজের এই কাজে সাবধানতার অভাব ছিল কিনা তাহা বিবেচনা করার কথা নয়। কিন্তু যে কাজ অন্যায় নয়, সে কাজ

www.pathagar.com

করিলে দৈবক্রমে যদি কাহারো ক্ষতি হইয়া যায় সে কাজের জন্য কাহাকেও দায়ী করা চলে না। রাস্তায় ঘোড়া দৌড়াইবার অধিকার সকলের আছে তাই ঘোড়া ছুটাইবার সময় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে কেহ নিহত হইলে তাহার জন্য অশ্বারোহী দায়ী হইবে না। কিন্তু রাস্তার উপর ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিবার অধিকার কোন ব্যক্তির একেবারেই নাই। সুতরাং রাস্তায় কেহ যদি ঘোড়া বাঁধিয়া রাখে এবং সেই ঘোড়ার পায়ের আঘাতে যদি কেহ মরিয়া যায় তবে অশ্বের মালিক সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে।

যে ব্যক্তি আঘাত পায় তাহার সাবধানতার অভাব থাকিলে তাহার আঘাতের জন্য কেহই দায়ী হয় না। রাস্তার পার্শ্বে সুরুজউল্লাহর দোকান আছে। সে তাহার দোকানের সম্মুখে প্রত্যহ পানি ছিটায়। পথিক ইচ্ছা করিলে ঐ পানি ছিটানো অংশ বাদ দিয়া রাস্তার অন্য পাশ দিয়াও যাইতে পারে কিংবা সাবধানতার সহিত সন্তর্পণে রাস্তার ঐ অংশটুকু পার হইতে পারে। এইসব কিছু না করিয়া যে পথিক রাস্তার ঐ অংশ দিয়া চলিতে শুরু করে এবং আছাড় খাইয়া হাত ভাঙিয়া ফেলে সেই পথিকের এই আঘাতের জন্য সুরুজউল্লাহ্ দায়ী হইবে না। যাহা এড়াইতে পারা যাইত তাহা না এড়াইবার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহার জন্য কেহ দায়ী হয় না।

বলপ্রয়োগ

প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার আছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা মানুষের সেই অধিকার হরণ বা খর্ব করা যায়। হিংসাত্মক কাজের ভয় দেখাইয়া কিংবা আটক করিয়া কিংবা শক্তি প্রয়োগ করিয়া মানুষকে তাহার অনিচ্ছাকৃত কাজ করানো যায়। ইহাকেই বলপ্রয়োগ বলে। বলপ্রয়োগ সম্পর্কে হানাফী আইন কিঞ্চিত জটিল। যে বলপ্রয়োগ খুব গুরুতর প্রকৃতির, সেই বলপ্রয়োগ দ্বারা মানুষের অভিপ্রায় বিকৃত হয়। সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বলপ্রয়োগ করে সেই ব্যক্তিকেই কাজের মালিক গণ্য করা হয় এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে মজলুম তাহার হাতের যন্ত্র হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাজের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে উহা জালিমের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না—তবে সেই কাজের জন্য জালিমকে দায়ী করা যাইবে না। বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ দ্বারা যে কাজ করিতে হয়, সেই কাজ কোন অবস্থায় জালিম করিতে পারে না। মজলুমের জিহ্বা দিয়া জালিম কথা বলিতে

www.pathagar.com

পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে মজলুম তাহার কাজের জন্য নিজেই দায়ী হয়। মজলুমের ক্ষতি হইলে সে অবশ্য জালিমের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে।

যে কাজ, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণের দ্বারা হয় না আচরণ দ্বারা হয়, সে কাজের দায়িত্ব কোন কোনে ক্ষেত্রে জালিমের, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মজলুমের। ইয়াকুব জায়েদের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহার (জায়েদের) সম্পত্তি জহুরের নিকট বিক্রয় করিতে এবং দখল দিতে বাধ্য করিল। এক্ষেত্রে বিক্রয় ত্রুটিযুক্ত হইবে কারেণ বিক্রয়ের জন্য যে সম্মতি প্রয়োজন তাহা জায়েদের ছিল না। কিন্তু জহুরের বরাবরে যে দখলার্পণ করা হইয়াছে তাহার জন্য ইয়াকুবকে দায়ী করা যায় না। কারণ ইয়াকুব সম্পত্তির মালিক না থাকায় সে দখলার্পণের অধিকার রাখে না। আহসান চেরাগ আলীকে খুন করিবার জন্য বসিরকে বাধ্য করিল। আহসান বসিরকে বলিল যে, সে (বসির) যদি তাহাকে (চেরাগ আলীকে) হত্যা না করে তবে তাহার (বসিরের) জীবন বিপন্ন হইবে, এই ক্ষেত্রে আহসানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার অধিকার চেরাগ আলীর উত্তরাধিকারীগণ লাভ করিবেন। বসিরের নিজের জীবন তাহার কাছে অন্য সকলের জীবন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তাহার নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য বসির চেরাগ আলীকে খুন করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে বসির নিজের অভিপ্রায়ে চেরাগ আলীকে খুন করিয়াছে এমন বলা যায় না। ইমাম আবু হানিফা এবং মুহাম্মদ এই মত পোষণ করেন। সুফার বলেন, খুনের জন্য হন্তাই দায়ী হইবে, তাহার উপর বলপ্রয়োগকারী কোন ব্যক্তি নহে। আবু ইউসুফ বলেন, এই ক্ষেত্রে কাহাকে গুরুদণ্ড দেওয়া যাইবে না তবে বসিরকে রক্তমূল্য দিতে হইবে। ইমাম শাফিঈ বলেন, সকল ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে। তিনি বলেন, উচ্চারণের দ্বারা তখনই সিদ্ধ কাজ হয় যখন উহা অভিপ্রায় অনুযায়ী করা হয়। বাধ্য হইয়া যে উচ্চারণ করা হয় তাহার কোন প্রতি-ক্রিয়া নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্ন একেবারেই উঠে না।

প্রতারণা

প্রতারণার জন্য প্রতারকের বিরুদ্ধে প্রতারিতের কিছু অধিকার সৃষ্টি হয়। তবে এইস্থলে বিচারের জন্য অনেক প্রশ্ন উত্থিত হয়। যে কাজকে

www.pathagar.com

প্রতারণা বলা হইতেছে তাহা কি আদৌ প্রতারণামূলক ছিল? যিনি প্রতারণার অভিযোগ করিতেছেন তিনি কি যথার্থই প্রতারকরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন? প্রভাবিত হইয়া থাকিলে ইহাতে কাহারো কি ক্ষতি হইয়াছিল? এই সব প্রশ্নের মধ্যে না যাইয়া ইসলামী আইন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতির প্রতিকারের চিন্তা করে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাল যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে সেই আদান-প্রদান ইসলামী আইনে অসিদ্ধ গণ্য হয়। এই আদান-প্রদানে ক্রেতা মাল সম্পর্কে পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিনা বা উহাতে বিক্রেতার আচরণ প্রতারণামূলক ছিল কিনা সেই প্রশ্নের দিকে ইসলামী আইন যাইতে চাহে না, তবে প্রতারণার দ্বারা প্রতারিত ব্যক্তির ক্ষতি হইলে প্রতারিত ব্যক্তি প্রতারকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে।

প্রতিকার

ইসলামী আইনে ক্ষতির প্রতিকার দুই প্রকার। যথা-প্রতিশোধ (কিসা-আস- কওদ قود - قصاص) এবং ক্ষতিপূরণ (দিয়াত, ইরশ ارش - دية ، এই দুই প্রকার প্রতিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা ভংগ হইলে প্রাপ্তব্য। সম্পত্তির অধিকার ভংগ হইলে যে প্রতিকার প্রাপ্তব্য তাহা হইতেছে পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিপূরণ।

প্রতিশোধ একটি অতি পুরাতন আরব দেশের প্রথা। শুধু আরব দেশেই বা বলি কেন, পৃথিবীর সব পুরাতন দেশেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রতিশোধ প্রথার সাথে সাথে আরব দেশে কাহারো অনিষ্ট হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইসলাম, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও, প্রথাদ্বয়কে যেমন সম্মান করিয়াছে তেমনি সংস্কার করিয়াছে। প্রতিশোধের মাধ্যমে প্রতিকার পাইবার নীতি ইসলাম মানিয়া নিয়াছে কিন্তু বলিয়াছে যে ক্ষতিপূরণের নীতি সমাজিক শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য অধিকতর গ্রহণীয়। যেহেতু ইসলাম মনে করে যে, ক্ষতিপূরণের নীতি প্রতিশোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাই ইসলামী আইন প্রতিশোধের এলাকাকে বিধির দ্বারা সংকুচিত করিয়াছে। এই সংকোচন প্রসংগে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, প্রতিশোধের অধিকার যেমন ব্যক্তিভিত্তিক তেমনি সমাজভিত্তিক। সেই কারণে প্রতিশোধকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। রাষ্ট্র তাই প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত প্রয়োগ করিয়াছে। ফলে

www.pathagar.com

অনিষ্টকারী যে পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে শুধুমাত্র সেই পরিমাণ মত আঘাতের মধ্যে প্রতিশোধকে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব হইয়াছে।

যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সেই আঘাত নির্ধারণযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি আঘাতকারী ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ লইতে পারে। আঘাতকারীর আঘাত আহত ব্যক্তির জীবন নষ্ট হইলে আহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ আঘাতকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে পারেন। আঘাতকারী যে পরিমাণ আঘাত করে তাহাকেও সেই পরিমাণ আঘাত করা যায়। আকবর বসিরের ডান হাত ভাঙিয়া দিল। প্রতিশোধমূলে বসির আকবরের ডান হাত ভাঙিয়া দিতে পারে। হাতের জন্য হাত, চোখের জন্য চোখ, দাঁতের জন্য দাঁত ভাঙিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আকবর যদি বসিরের হাড় ভাঙিয়া দেয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ অচল। বসিরের হাড় কতখানি কোন জায়গায় ভাঙিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উপরন্তু আকবরের হাড় ভাঙিবার অধিকার পাইয়া বসির মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে পারে এবং আকবরের জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। আইন এই সব কারণে হাড় ভাঙার প্রতিশোধ সমর্থন করে না। হত্যার ক্ষেত্রে মাত্রার প্রশ্ন উঠে না। আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষের জীবন সমান। যিনিই নিহত হউন না কেন, হন্তার জীবনের মূল্য নিহত ব্যক্তির জীবনের তুলনায় বেশী নহে। হানাফীদের মতে স্বাধীন মানুষের এবং ক্রীতদাসের, নারী এবং পুরুষের, অমুসলিম এবং মুসলিমের জীবন একই মূল্য বহন করে।

আইন, প্রতিশোধের জন্য, আর একটি সীমা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। যে ক্ষেত্রে অপরাধ স্বেচ্ছামূলক নহে সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ অবৈধ। অপরাধ স্বেচ্ছামূলক কি না এই প্রশ্নে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে আইন প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার স্বীকার করে না। প্রতিশোধের অধিকার সাধারণভাবে ব্যক্তিভিত্তিক। আহত ব্যক্তি কিংবা তাহার ওয়ারিশগণ প্রতিশোধ লইতে পারেন। আবার অর্থের বিনিময়ে অপরাধীকে মুক্তি দিতে পারেন। অপরাধীকে ক্ষমা করিবারও অধিকার তাহারা রাখেন। হত্যা বা আঘাতের অপরাধকে যখন অর্থের বিনিময়ে মাপ করিয়া দেওয়া যায় তখন আহত ব্যক্তি বা তাহার ওয়ারিশ কেবলমাত্র অপরাধীর নিকট হইতে অর্থ দাবী করিতে পারেন। যেক্ষেত্রে প্রতিশোধের বদলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র অপরাধীকে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা হয়।

www.pathagar.com

অবহেলা বা ভ্রমের কারণে যদি হত্যা সংঘটিত হয় তাহা হইলে অপরাধীর গোত্র বা উপজাতি বা মহল্লাবাসী মরহুমের ওয়ারিশগণকে রক্তপণ দিবার জন্য দায়ী হয়। প্রত্যেক গোত্র তাহার লোকদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য। এই কর্তব্যে শৈথিল্য ঘটিলেই কেবল গোত্রের কোন ব্যক্তি নর হত্যার কাজে লিপ্ত হইতে পারে। কোন মহল্লায় যদি কোন ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায় এবং নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে তখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ঐ মহল্লার পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে হলফ নিবার জন্য নির্বাচিত করিতে পারেন। ঐ পঞ্চাশজন লোক যদি হলফ নিয়া বলে যে, তাহারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই তবে মহল্লার সকল অধিবাসীর উপর রক্তমূল্য দিবার কিংবা কারাবরণ করিবার দায় আসিয়া পড়ে। কোন ব্যক্তির গৃহদ্বারে যদি কোন লাশ দেখা যায় এবং বুঝা যায় যে উহাকে খুন করা হইয়াছে এবং গৃহস্বামী খুন করে নাই বলিয়া শপথ গ্রহণ করে তবে সকল মহল্লাবাসীকে রক্তমূল্য দিতে হয়। এই নীতি গোত্র বা সমাজ এবং দলের উপরও প্রযোজ্য।

রক্তমূল্য বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়। অপরাধের গুরুত্বও এই প্রসংগে বিবেচিত হয়।

প্রতিশোধ সম্পর্কে ইসলামী আইন বহুকালাবধি অচল হইয়া গিয়াছে। একদিন আইন এই প্রথাকে স্বীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু এই স্বীকৃতির সহিত এত কঠোর শর্তাবলী জুড়িয়া দিয়াছিল যে উহা প্রতিপালন করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। অচল হইবার কারণ ইহাই। বর্তমান কালে মুসলিম দেশসমূহে মানুষের দেহ এবং জীবনের উপর আঘাতকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়, ক্ষতি বলিয়া নয়। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মতে যে কাজের দ্বারা জনসাধারণের ক্ষতি হয় তাহাই অপরাধ। এই বিবেচনায় মনুষ্যদেহের উপর আঘাতকেও অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায়। অন্য প্রকার অনিষ্টের ক্ষেত্রে, যাহা নষ্ট হয় বা হরণ করা হয়, তাহার সমতুল্য দ্রব্য বা সেই দ্রব্য প্রত্যার্পণের আদেশ দিয়া এই অনিষ্টের প্রতিকার করা যায়। যে সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করা সম্ভব তৎসম্পর্কে প্রত্যার্পণের আদেশ দেওয়া হয়। অনিষ্টকারীর দখলে থাকাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মুনাফা মালিক পাইতে অধিকারী হন। ঐ সময় সম্পত্তি নষ্ট হইলে বা সম্পত্তির ক্ষতি হইলে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়। ঐ সময়ে অনধিকারী সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়া থাকিলে মালিক সম্পত্তি ফিরাইয়া পায়, অনধিকারী তাহার উন্নতি করা অংশ লইয়া যাইতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধ

যখন মানুষের প্রাথমিক গণঅধিকার ক্ষুন্ন করা হয় তখন সেই কাজকে বলা হয় মাআসিয়াত (معصية) বা অপরাধ। এইজন্যই কতিপয় গণ-অধিকারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে উকুবাত (عقوبات) বলে। সম্পত্তি, মানবদেহ, সুনাম, রাষ্ট্র, ধর্ম, শান্তি শৃঙ্খলা এবং সুনীতির বিরুদ্ধে অপরাধ হইতে পারে।

শাস্তি দুই রকম হয়। প্রথম প্রকারের শাস্তিকে বলা হয় হদ্দ (حد)। হদ্দ বলিতে পরিমাণ বা সীমা বুঝায়। যে শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট তাহাকে হদ্দ বলে। দ্বিতীয় প্রকার শাস্তির নাম তাআজির (تعزير)। যে শাস্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে তাহাকে তাআজির বলে।

হদ্দ

ইসলামের আবির্ভাবকালে হদ্দ প্রচলিত ছিল। ইসলামী আইন কতিপয় অপরাধের জন্য হদ্দকে বহাল রাখিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার দণ্ড প্রদান করিবার জন্য কঠোর শর্তাবলী আরোপ করিয়াছে। এই শর্তগুলি যেমন কঠিন তেমনি অনমনীয়। ফলে খুব কচিৎ ইসলামী আইনে এই দণ্ড প্রদান সম্ভব হয়। প্রতিশোধমূলক প্রতিকার অবলম্বন করা যেমন দুরূহ তেমনি এই দণ্ড প্রদান করাও দুরূহ। হদ্দ-এর দণ্ডের প্রয়োগ তাই খুব বিরল। সুতরাং শাস্তির আইনে হদ্দের স্থান কেবলমাত্র ঐতিহাসিক হইয়া পড়িয়াছে। ইসলামী আইনতত্ত্ব অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাব কালে যে সমস্ত রীতিনীতি বা প্রথা প্রচলিত ছিল, ইসলাম যে পর্যন্ত সম্ভব হইয়াছে সে পর্যন্ত সেই সব প্রথা ইত্যাদি রদ করে নাই তবে প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতির অপব্যাখ্যা বা অপপ্রয়োগ রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থা রাখিয়াছে। ইসলাম নতুন আইনের বিধান দিয়াছে কিন্তু তাহা আকস্মিক নয়। আস্তে আস্তে জনমতের বিবর্তনের সাথে সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া পুরাতনের পরিবর্তে নূতনকে উপস্থাপনা করা হইয়াছে।

ব্যভিচারের জন্য কংকর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা, চুরির জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন, রাজপথে দস্যুতার জন্য বা মদ্যপান করিবার জন্য বা তোহমত

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য আশি বা এক শতবার বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদানের বিধান আছে ; ইহাকেই হদ্দ বলে।

যদি অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তবে হদ্দের দণ্ড দেওয়া যায় না। আইন সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে, সাক্ষ্য প্রমাণের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে হদ্দের দণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। যে আইন বা ফতোয়া হদ্দের দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছে সেই আইনের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিলে সেই ক্ষেত্রে হদ্দের দণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। এই সন্দেহকে আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত সন্দেহ বা শুবহাতুল-মহল (شبهة المحل) বলে। অপরাধী যদি আইন না জানিয়া এবং না বুঝিয়া কোন অপরাধ করে তবে তাহার এই অজ্ঞানতার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও তাহার উপর হদ্দের দণ্ড প্রয়োগ করা যায়। এই সন্দেহকে কাজ সম্পর্কীয় সন্দেহ বা শুবহাতুল ফিইল (شبهة الفعل) বলে।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোন কোন আইনতত্ত্ববিদের মতে কোন মুসলিমের পক্ষে দেখিয়া থাকিলেও এই ব্যাপার সাক্ষ্য বা খবর দেওয়া উচিৎ নহে। অবশ্য তাহার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা থাকিলে এবং সেই ব্যক্তি সাক্ষী হইয়া থাকিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যে সমস্ত লম্পট জনসমাজের শ্লীলতার দাবীকে নস্যাৎ করে এবং তাহদের লাম্পট্য হইয়া অহংকার করে কেবলমাত্র তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই ইসলামী আইনের নীতি। এই ক্ষেত্রে চারজন পুরুষ চাক্ষুষ সাক্ষী থাকিতে হইবে। বহাবাহুল্য এই চারজন সাক্ষী একত্রিত করা খুবই কঠিন কাজ। আবার একত্র হইলেই হইল না ইহাদের সাক্ষ্য বিচারককে কঠিনভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়। সাক্ষীদিগকে তাহাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করিবার অধিকার দিতে হইবে। অবশেষে সাক্ষীগণ দেরীতে উপস্থিত হইলে বা বিলম্বে সাক্ষী দিলে ইহাও বিচারকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিবে।

তাআজির

মানুষের জীবন, দেহ, সম্পত্তি, গণশান্তি, শ্লীলতা, সুনীতি, ধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার শাস্তি তাআজির। বস্তুত মুসলিমদের সমগ্র ফৌজদারী আইন (আস-সিয়াসক-উপ-শরীয়াই السياسة الشرعية) তাআজীরের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি

www.pathagar.com

কোন অপরাধের জন্য কি প্রকারের শাস্তি দিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার পূর্ণ অধিকার রাখেন। তাআজিরের উদ্দেশ্য হইতেছে অপরাধীকে শোধন করা এবং অপরাধ যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া অপরাধীর শাস্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করেন। অপরাধের প্রকৃতি যে পরিস্থিতিতে অপরাধী অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা অপরাধীর চরিত্র, সমাজে তাহার মর্যাদা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বিচারককে শাস্তি দিতে হয়। তাআজিরের দণ্ড নানা প্রকারের হইতে পারে; শুধুমাত্র হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়াও এক প্রকারের দণ্ড। জরিমানা করা, দেহে আঘাত করা, কারাগারে নিক্ষেপ করা বা দ্বীপান্তর করার শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য

প্রাথমিক বক্তব্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম কোন আকস্মিক পরিবর্তন আনে নাই। ধীরে ধীরে মানুষের মনকে উন্নতমুখী করিয়া ক্রমে ক্রমে আইনকে পরিবর্তন করা হইয়াছে। অকস্মাৎ পরিবর্তন অসার্থকতায় পর্যবসিত হইতে পারে, সেই জন্য এই সাবধানতা। আদালতের কার্যবিধির আইনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইসলামী আইনের এই প্রকৃতি অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইসলামী আইনের কার্যবিধি বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবহ। এই বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবহ কার্যপ্রণালী প্রচলিত প্রথার উপর উপস্থাপিত। ইসলামের আবির্ভাবের সময় যে প্রণালী এবং পদ্ধতিতে বিচার কার্য পরিচালিত হইত তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাকে বজায় এবং বহাল রাখিয়া এবং তাহাকে বুনিয়াদ ধরিয়া লইয়া তাহার উপর ইসলামী আইনের কার্যবিধি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সাক্ষিগণই বিবাদের বিচার করিতেন। ইসলামী আইন বলিল, নির্ধারিত সংখ্যক সাক্ষী যে দাবীকে সমর্থন করিবে, কাজী সেই দাবীর অনুকূলে রায় দিবে। কি সুন্দরভাবে ইসলাম প্রচলিত প্রথাকে সংস্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী আইন ইহাও বলিয়া দিল যে সাক্ষীর কাজ হইতেছে বিচারককে তথ্য প্রদান করা। সাক্ষীর সাক্ষ্যের গ্রহণীয়তা সম্পর্কেও ইসলামী আইন বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। হলফের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইসলামী আইন বহাল রাখিয়াছে। হলফ লইয়া যাহা বলা হয় তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, চূড়ান্ত বলিয়া নয়। সাক্ষীর সাক্ষ্যের সত্যতা বিচার করিবার জন্য ইসলামী আইন কতিপয় বিধির নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। সাক্ষিগণের সাক্ষ্য যাহাতে পরস্পর বিরোধী না হয় তজ্জন্য সাবধানতামূলক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষবৃন্দ যখন পরস্পরবিরোধী দাবী করিয়া বসেন এবং প্রত্যেক স্ব স্ব দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন তখন কোন্ পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে তৎসম্পর্কে ইসলামী আইন বিধিমালার মাধ্যমে নির্দেশ দিয়াছে। ইসলামী আইন বলিয়াছে

www.pathagar.com

যে, বিচারের ভিত্তি হইবে নিশ্চিতি, অনুমান নয়। ইসলামী আইনের বিধি-মালা পরস্পরবিরোধী দাবীর ত্বরিৎ সমাধানের নির্দেশ প্রদান করিয়াছে।

বিচারক যেমন ব্যক্তিগত অধিকার বলবতের আদেশ দিতে পারেন তেমনি গণঅধিকার বলবতের আদেশও দিতে পারেন। যে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তির স্বার্থ ব্যাহত হয় কিংবা এক বা একাধিক ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হয় সেই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দাবী পেশ করেন। যে ক্ষেত্রে গণঅধিকার বিপন্ন হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি আদালতে প্রতিকার প্রার্থী হন। উভয় ক্ষেত্রেই কার্যবিধি প্রায় এক রকম। দাবীর ভিন্নতার জন্য কোন কোন বিষয়ে প্রণালীর বিভিন্নতাও পরিদৃষ্ট হয়।

আদালত নির্বাচন

যে ব্যক্তি বিচার চাহেন তাহাকে উপযুক্ত আদালতে দাবী পেশ করিতে হয়। যে আদালত তাহার দাবী সম্পর্কে বিচার করিবার অধিকার রাখেন সেই আদালতকে উপযুক্ত আদালত বলা হয়। সাধারণভাবে যে এলাকায় বাদী এবং তাহার সাক্ষ্যগণ বাস করেন সেই এলাকার আদালতে তাহাকে দাবী পেশ করিতে হয়। বিশেষ ধরনের দাবী বিচার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক না হইয়া আদালত বিষয়ভিত্তিক হয়। সাধারণত বিবাদের বিষয়বস্তু বা বিবাদীর বাসস্থান আদালতে নির্বাচনের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। জমি লইয়া মামলা হইলে যেখানে জমি অবস্থিত সেইখানেই যে মামলা করিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। বিবাদীর বাড়ী যেখানেই হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাদীর বাড়ীর এলাকাতেই মামলা দায়ের করিতে হয়।

কতিপয় সংজ্ঞা

দাবী (দাওয়া دعوا) বলিতে কোন ব্যক্তির অন্যের বিরুদ্ধে অধিকার বলবৎ করিতে আদালতে প্রার্থনা করাকে বুঝায়। যে ব্যক্তি দাবী করেন তাহাকে মুদ্দাঈ (مدعى) বলে। যাহার বিরুদ্ধে দাবী করা হয় তাহাকে মুদ্দাআ আলাইহি (مدعى عليه) বলে। বাংলা ভাষায় ইহাদিগকে বাদী বিবাদী বলা হয়। হেদায়া বলে, বাদী তাহার দাবী ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু

www.pathagar.com

বিবাদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা হইতে ছুটিয়া যাইতে পারে না। সাধারণভাবে বাদীকেই তাহার দাবী প্রমাণ করিতে হয়। অন্য কথায় যে ব্যক্তি তাহরে দাবী প্রমাণ করিতে বাধ্য তাহাকেই বাদী বলা হয়। বাদী ব্যর্থ হইলে বিবাদীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। সুতরাং সাক্ষ্য প্রমাণ না দিয়াও বিবাদী মামলায় জিতিয়া যাইতে পারে। বিবাদী শুধু অস্বীকার করিয়া চুপ থাকিতে পারে। মুহাম্মদ বলেন, যে ব্যক্তি অস্বীকার করেন তিনিই বিবাদী।

কে দাবী করিতে পারেন

যাহার বুদ্ধি আছে বা হইয়াছে একমাত্র তিনিই আদালতে দাবী লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। সুতরাং নাবালক বা উম্মাদ আদালতে নালিশ করিবার অধিকার রাখেন না। তাহাদের উপর কোন অনিষ্ট হইলে তাহারা অভিভাবকের মাধ্যমে নালিশ করিতে পারেন। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ হইলে তাহাদের অভিভাবকগণ জবাবদিহি করিতে পারেন।

দাবী সম্পর্কীয় বিধিমালা

কোন দাবী লইয়া আদালতে নালিশ করিতে হইলে কতিপয় বিধিমালা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হয়। যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হইতেছে অর্থাৎ বিবাদীর পূর্ণ পরিচয় আদালতকে জানানো প্রয়োজন। নালিশের আরজীতে বিবাদীর সঠিক পরিচয় এবং ঠিকানা দিতে হয়। যাহা লইয়া নালিশ করিতে হয় তাহারও সঠিক বিবরণ আরজীতে থাকা আবশ্যক। যে পরিচয় দ্বারা নালিশের বিষয়বস্তু সম্যক বুঝিতে পারা যায়, সেই পরিচয়ই যথেষ্ট। যদি জমি সম্পর্কে মামলা উপস্থিত করা হয়, তবে সেই জমির চৌহদ্দি বর্ণনা করিতে হয়। আরজীতে জমির মূল্য দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদী কিভাবে ঐ জমির মালিক হইলেন তাহাও বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে বাদী যে ঐ জমির মালিক তাহা নিশ্চয় করিয়া আরজীতে বলিতে হয়। খাতকের বিরুদ্ধে অর্থ আদায়ের মামলার আরজীতে কিভাবে খাতককে অর্থের জন্য দায়ী করা হইতেছে তাহা বলা প্রয়োজন। বাদী কেন এবং কোন খাতে বা কি বাবদে বিবাদীর নিকট অর্থ পাইবে তাহা আরজীতে পরিষ্কার করিয়া বলিতে হয়। বিবাদী টাকা ধার লইয়া থাকিলে কিংবা কোন দ্রব্য ধারে লইয়া থাকিলে কিংবা বাদীর শ্রম কিনিয়া থাকিলে তাহা উল্লেখ করিতে হয়।

www.pathagar.com

যে দাবী বাস্তবভাবে অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয় সেই দাবী উত্থাপনের সাথেই খারিজযোগ্য। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি ষাট বৎসর বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে তাহার পুত্র বলিয়া দাবী করে এবং দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করে তবে ঐ মামলা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হয়।

যে দাবী অসমঞ্জস উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই দাবী আদালত গ্রহণ করেন না। উপস্থিত হইবা মাত্রই আদালত তাহা খারিজ করিয়া দেন। বাদী তাহার আরজীতে দাবী করিল যে, সে বিবাদী লইতে একখন্ড জমি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছে এবং ঐ চুক্তি বলবৎযোগ্য। আরজীর মধ্যে বাদী আরও বলিল যে, ঐ জমিখানির মালিক সে নিজে। দেখা যাইতেছে যে বাদী তাহার আরজীতে পরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। বাদী যদি সংশ্লিষ্ট জমির মালিক হয় তবে তাহার পক্ষে ঐ জমি ক্রয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদী যদি কোন সম্পত্তিকে অন্যের প্রতিনিধিরূপে দাবী করেন এবং পরক্ষণে নিজের বলিয়া দাবী করেন তবে তাহার উক্তি পরস্পরবিরোধী হওয়ায় ঐ মামলা খারিজ হয়। বাদীর বক্তব্যের মধ্যে যে বৈপরীত্য পরি-লক্ষিত হয় তাহা যদি সমন্বয়যোগ্য হয়, তবে বাদীর দাবী খারিজ করিয়া দেওয়া যায় না।

দাবী লিখিত হইতে পারে আবার মৌখিক হইতে পারে। মৌখিক হইলে বিচারক তাহা লিখিয়া লন।

বাদী যে দাবী করিবেন তাহাতে নালিশের কারণের বর্ণনা থাকিতে হইবে এবং যাহার বিরুদ্ধে নালিশ আনীত হয় তাহার অপকর্মের বর্ণনা থাকিতে হইবে। এই বর্ণনা এমন হইবে যে, বিবাদী তাহার কাজ স্বীকার করিলে বাদী ডিক্রী পাইবে। আদালতে মামলা উপস্থিত হইলে বাদীর দাবী বিবাদী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন এবং তদাবস্থায় বাদী ডিক্রী পাইবেন। বাদীর দাবী যদি বিবাদী অস্বীকার করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে মামলা চলিবে। বাদী যদি বলেন যে, বিবাদীর প্রতিনিধি বাদীর দোকান হইতে মাল কিনিয়াছেন কিন্তু মূল্য দেয় নাই এবং বিবাদী সেই মূল্য দিতে বাধ্য এবং বিবাদী যদি এই দাবী অস্বীকার করেন তবে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর মামলা চলিবে। এই ক্ষেত্রে বিবাদীকে বিরোধী পক্ষ বা খসম (خصم) বলা হয়। বাদী যদি তাহার আরজীতে বলেন যে, বিবাদীর প্রতিনিধি তাহার দোকান হইতে মাল ক্রয় করিয়াছে এবং বিবাদীর প্রতিনিধি মালের মূল্য দিয়াছেন কিনা এ সম্পর্কে নীরব থাকেন এবং বিবাদী বাদীর দাবী অস্বীকার করেন তবে মামলা খারিজ

www.pathagar.com

হইয়া যাইবে। যেহেতু বাদী তাহার আরজীতে কোন স্পষ্ট প্রতিকার দাবী করেন নাই, তাই তাহার মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

মামলার পক্ষবৃন্দ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন বা অন্যের অধিকার অস্বীকার করিতে পারেন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয় সম্পর্কে দাবী একত্রে উত্থাপন করিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে মামলার পক্ষের প্রশ্ন উত্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে ইসলামী আইন বিধি মামলার মাধ্যমে কিছু নির্দেশ দিয়াছে। যাহার দখলে বস্তু আছে ঐ বস্তু উদ্ধারের জন্য তাহাকে বিবাদী করিয়া মামলা করিতে হয়। আকবর বশিরের ঘোড়া চুরি করিয়া লইয়া দবিরের নিকট বিক্রয় করিল। বশিরের ঘোড়া দবিয়ের দখলে রহিল। এই ঘোড়া পাইবার জন্য বশির দবিরের বিরুদ্ধে মামলা করিবে, আকবরের বিরুদ্ধে নয়। দবির আকরের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া অর্থ আদায় করিতে পারিবে। যাহার দখল হইতে সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে, তিনি অপহরণকারীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। তিনি আমানতদার হইতে পারেন, যে কোনভাবেই তাহার দখল আসিয়া থাকুক না কেন তিনি মালিককে পক্ষ না করিয়া অপহরণকারীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে মামলা করিতে হইলে তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে যে কোন একজন বাদী হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলায় তাহার ওয়ারিশগণের যে কোন একজনকে বিবাদী করিলে চলে। ইহাই সাধারণ নিয়ম কিন্তু মৃতব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ পাওয়ার জন্য যদি কেহ মামলা করে তবে যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি দখল করিতেছে তাহাকে বিবাদী করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির দখলহীন ওয়ারিশকে বিবাদী করিয়া মামলা করা অবৈধ। কিন্তু তাই বলিয়া দখলকার ওয়ারিশ যাহা স্বীকার করিবে তাহা অপর ওয়ারিশের উপর বাধ্যকর হইবে না। মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায়ের জন্য তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে যে কোন একজন মামলা করিবার অধিকার রাখেন। মামলা করিয়া তিনি যদি ডিক্রী লাভ করিতে সক্ষম হন তবে সেই ডিক্রীর ফল সকলে পাইবে। বাদী কেবলমাত্র তাহার নিজের অংশ আদায় করিয়া লইতে পারিবে। একইভাবে মৃতের সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির অর্থের দাবী থাকিলে তিনি একজনকে বিবাদী করিয়া মামলা করিতে পারেন। যদিও সেই ওয়ারিশ বিবাদীর স্বীকৃতি দ্বারা অন্য ওয়ারিশ বাধ্য হইবেন না। তবুও বাদী

www.pathagar.com

যদি তাহার দাবী প্রমাণ করেন তবে তাহা সকল ওয়ারিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইবে।

একটি সম্পত্তির যখন একাধিক মালিক থাকে তখন এক শরীক অন্য শরীকের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না। এক শরীকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে অন্য শরীক তদ্দ্বারা বাধ্য হন না। এজমালী সম্পত্তির একজনের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তিনিই শুধু তাহার অংশমত দায়ী হইবেন।

জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন সম্পদ সম্পর্কে মামলা করিবার প্রয়োজন পড়িলে সাধারণের মধ্য হইতে যে কোন একজন দাবী লইয়া মামলা উপস্থিত করিতে পারেন। জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে মামলা করিতে হইলে যে কোন একজন উহা করিতে পারেন। মামলায় ডিক্রী হইলে উহার সুফল সকলের উপর বর্তায়। যে জলাশয় বা চারণভূমি দুই গ্রামের অধিবাসীরা ভোগ করেন, সেই জলাশয় বা চারণভূমি সম্পর্কে মামলা করিতে হইলে বাদী শ্রেণীতে উভয় গ্রামের কিছু কিছু লোক থাকিতে হইবে কিন্তু গ্রামের লোকসংখ্যা যদি অনধিক একশত মাত্র হয় তবে সকলকে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

মামলার শুনানী

পক্ষবৃন্দ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের সামনে আদালতে মামলার শুনানী করা হয়। যদি সম্ভব হয় তবে বাদী বিবাদীকে সঙ্গে লইয়া আদালতে হাজির হইয়া তাহার দাবী পেশ করিতে পারেন। বাদী যদি বিবাদীকে সংগে করিয়া না আনেন তবে তাহাকে হাজির করিবার জন্য আদালত হইতে সমন জারি করা হয়। বিবাদী যদি নিজে বা প্রতিনিধি মারফত আদালতে হাজির হইতে অস্বীকার করেন, তবে তাহাকে বাধ্য করিয়া আদালতে আনিবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তবুও যদি তাহাকে আদালতে হাজির না করা যায়, তবে আরজীর নকল তাহার নিকট তিনবার প্রেরণ করিতে হয়। তিন তারিখে তিনবার সমন প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও বিবাদী যদি আদালতে হাজির না হয়, তবে আদালত হইতে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহার জন্য বিচারক একজন এজেন্ট নিযুক্ত করিবেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ লওয়া হইবে। এতদসত্ত্বেও বিবাদী যদি গরহাজির থাকে বা কোন প্রতিনিধি না পাঠায় তবে বিচারক বিবাদীর স্বার্থ দেখিবার জন্য একজন ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

নিয়োগ করেন। ঐ ব্যক্তির সামনে মামলার শুনানী হয় এবং বিচারক রায় প্রদান করেন। এইভাবে একতরফা ডিক্রী হইবার পরও যদি বিবাদী আদালতে হাজির হইয়া এই নিবেদন করেন যে, ডিক্রী ন্যায়সংগত হয় নাই তাহা হইলে তাহার বক্তব্য উপস্থাপনা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বিবাদী তাহার বক্তব্য প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলে বাদীর ডিক্রী রদ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি প্রতিশোধ বা হদ্দ সেই সমস্ত অপরাধ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত না হইলে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয় না। এই সমস্ত অপরাধের বিচার তাই একতরফা করা যায় না।

প্রতিদাবীর মাধ্যমে জওয়াব

যখন উভয় পক্ষ আদালতে হাজির হয় তখন বাদীকে তাহার দাবী বর্ণনা করিতে আহ্বান করা হয়। তিনি যদি লিখিত দাবী পেশ করিয়া থাকেন তবে তাহাকে তাহার আরজী প্রত্যয়ন করিতে বলা হয়। বাদীর দাবী এইভাবে পেশ হইবার পর বিচারক আবশ্যক মনে করিলে বিবাদীকে বাদীর দাবীর উত্তরে তাহার বক্তব্য বা জওয়াব পেশ করিতে আহ্বান করেন। বিবাদী বাদীর দাবী অস্বীকার করিতে পারেন কিংবা দাফআ (دفع) এর অজুহাত পেশ করিতে পারেন। বাদী যদি অর্থের দাবী করিয়া মামলা করিয়া থাকেন এবং বিবাদী যদি স্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি বাদীর পাওনা মিটাইয়া দিয়াছেন কিংবা বিবাদী তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন কিংবা তাহারা উভয়ে এই বিষয়ে মিটমাট করিয়া লইয়াছেন কিংবা অন্য প্রকারে ইহা শোধ বোধ হইয়া গিয়াছে তবে বিবাদীর এই উক্তিকে দাফআ বলে। বিবাদী তাহার উক্তি প্রমাণ করিতে পারিলে বাদীর দাবী খারিজ হয়।

বিবাদী বাদীর দাবী লইয়া তর্ক করিলে বাদীকে তাহার দাবী প্রমাণ করিবার জন্য আহবান জানানো হয়। বাদী গ্রহণযোগ্য এবং যথা পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তাহার দাবী প্রমাণ করিতে পারিলে তিনি ডিক্রী পান। কিন্তু তিনি যদি সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তাহার দাবী প্রমাণে অসমর্থ হন তবে তিনি বিবাদীকে হলফ লইয়া তাহার দাবী অস্বীকার করিবার আহ্বান জানাইতে পারেন। বিবাদী হলফ লইয়া বাদীর দাবী অস্বীকার করিলে বাদীর মামলা খারিজ হয়। তিনি হলফ লইতে অস্বীকার করিলে বাদীর মামলা ডিক্রী হয়। পুরাতন আমলে কাজী তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিতে পারিতেন। দুররুল মোখতারের লেখক

www.pathagar.com

বলেন, বর্তমান কালে কাজীদের সততা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কারণ আছে, তাই বিচরের সময় তাহাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান মামলার মধ্যে আনিতে দেওয়া যায় না।

ভিন্ন এলাকায় বিবাদ হইলে যে কার্যধারা অবলম্বনীয়

কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া বলা হয় যে, কাজীর হুকুম তাহার এলাকার অধিবাসীদের উপর বাধ্যকর, অন্য এলাকার অধিবাসীদের উপর নহে। কিন্তু পরবর্তীকালে আসহাব এবং তাবেঈনদের সমর্থন লইয়া ইসতিহসান-এর নীতিতে এই নীতি করা হইয়াছে যে, যে এলাকায় বিবাদী বসত করেন এবং সাক্ষিগণ পাওয়া যায় সেই এলাকার কাজীর নিকট বাদী মামলা করিতে পারেন। যে কাজীর আদালতে মামলা দাখিল হয় সেই আদালতের এলাকায় যদি বিবাদী বসবাস না করেন তবে বিবাদীর প্রতিনিধির সামনে কাজী সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন। সাক্ষী প্রমাণে যদি বাদীর দাবী সত্য প্রমাণিত হয় তবে কাজী ডিক্রীর আদেশ দিতে পারেন। এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর কাজী সমস্ত নথি দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সামনে সীল করিয়া বাদী এবং ঐ দুইজন সাক্ষীর মারফৎ সমস্ত নথিপত্র যে আদালতে বিবাদী বাস করেন সেই আদালতের কাজীর নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। বাদীর এলাকার কাজী নিজে সিদ্ধান্ত না দিয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ নথি অপর কাজীর নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন। অপর কাজী তখন এই সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে রায় দিতে পারেন।

যে সমস্ত বিষয়ে হদ্দ এবং প্রতিশোধের বিধান আছে সেই সমস্ত বিষয়ে এই কার্যবিধি প্রযোজ্য নয়। দেনা আদায়, বিবাহ পিতৃত্ব প্রভৃতি সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারের মামলায় এই কার্যবিধি প্রযুক্ত হয়।

ডিক্রী

যাহার দ্বারা মামলা সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তাহাকে ডিক্রী বা হুকুম (حكم) বলে। ডিক্রীর মাধ্যমে মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়। যে দাবী লইয়া মানুষ আদালতে আসে, তৎসম্পর্কে আদালত সাক্ষী প্রমাণ লইয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্তকেই ডিক্রী বলে।

www.pathagar.com

ডিক্রীর দ্বারাই বিবাদের অবসান হয়। ডিক্রী নানা প্রকারের হইতে পারে। যে ডিক্রী আদেশমূলক সেই ডিক্রীর দ্বারা বিবাদীর উপর নির্দেশ দেওয়া হয়। বিবাদী দেনাদার হইলে এবং বাদী পাওনাদার হইলে ডিক্রীর মাধ্যমে বাদীকে অর্থ প্রদান করিবার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডিক্রী খারিজমূলক হইলে সেই ডিক্রীতে বলিয়া দেওয়া হয় যে বাদী তাহার দাবী প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাহার প্রার্থিত অধিকার পাইবেন না। আদালতের আদেশ ও নির্দেশকে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ডিক্রীর দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বাধ্য হয়? সাধারণভাবে পক্ষবৃন্দ এবং যাহাদের তাহারা প্রতিনিধি, তাহারা ডিক্রী দ্বারা বাধ্য। অন্য কেহ আদালতের ডিক্রী দ্বারা বাধ্য নন। ডিক্রী বাধ্যকর বলার অর্থ এই যে পক্ষবৃন্দের মধ্যে ডিক্রী এমনভাবে বাধ্যকর যে ডিক্রী সম্পর্কে পরে আর কোন আপত্তি তোলা যায় না। পক্ষবৃন্দের মধ্যে যে বিবাদ লইয়া বিচার হইয়াছিল এবং শুনানীর পর যে বিবাদের উপর আদালতের বিচারক সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন সেই বিবাদ লইয়া পুনরায় আদালতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার পক্ষবৃন্দের নাই। সম্পত্তি সম্পর্কে ডিক্রী দেওয়া হইয়া থাকিলে ঐ সম্পত্তির দখলকার এবং তাহার মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তি স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহারা সকলে বাধ্য হইবেন। একজন ওয়ারিশের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে উহা মরহুমের সম্পত্তির উপর বাধ্যকর হইবে। কোন সম্পত্তিকে যদি আদালত ডিক্রীর মাধ্যমে ওয়াক্‌ফভুক্ত ঘোষণা করেন তবে সেই ঘোষণা দ্বারা সকলেই বাধ্য হইবে; ইহাই রুকনুল ইসলামের মত। আবু লায়েস এবং সদরুশ শহীদ ভিন্নমত পোষণ করেন। কতিপয় পরিস্থিতিতে আদালতের ডিক্রী বাতিল গণ্য হইতে পারে। যে ডিক্রী কোন স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী বা যে ডিক্রী অগ্রহণীয় সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বা যে ডিক্রী বিচারকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের অনুকূলে দেওয়া হয় সেই সব ডিক্রী বাতিল গণ্য হয়।

প্রতিষ্ঠিত আইন ভংগ করিয়া যে ডিক্রী দেওয়া হয় সেই ডিক্রী পুনর্বিবেচনা করিবার অধিকার আইন আদালতকে দিয়াছে।

ডিক্রী জারি

আইন যেমন আদালতকে ডিক্রী দিবার ক্ষমতা দিয়াছে, তেমনি ডিক্রীদারকে ডিক্রী জারির মাধ্যমে তাহার প্রার্থিত প্রতিকার পৌঁছাইয়া দিবার ক্ষমতাও দিয়াছে। ডিক্রী জারি করাকে তানফীদ (تنفيذ) বলা হয়। ইহার

www.pathagar.com

মাধ্যমে ডিক্রীদার তাহার অনুকূলে প্রদত্ত আদেশের ফায়দা লাভ করেন। বিবাদী যদি খাতক হন এবং আদালত যদি বাদীকে অর্থ প্রদানের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং বিবাদী যদি তাহা মানিতে ব্যর্থ হইয়া থাকেন তবে আদালতের আদেশে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে রাখা হয়। যতদিন না সে ডিক্রীকৃত অর্থ বাদীকে প্রদান করেন ততদিন তাহাকে কারাগারে রাখা হয়। বিবাদীর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যদি বাদীর দাবী শোধ করা সম্ভব হয় আদালত সেই প্রকার নির্দেশ দেন। বিবাদীর দখলীয় কোন জমি যদি বাদীর প্রাপ্য বলিয়া ডিক্রী হয় তবে বিবাদীকে সেই জমি বাদীর অনুকূলে দখল পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়। তবে বিবাদীর হাতে যদি কোন অর্থ না থাকে কিংবা তাহার দখলে যদি কোন সম্পত্তি না থাকে এবং তাহার এই করুণ অবস্থা বিচারক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তবে অনাদায়ের কারণে তাহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় না। অর্থ প্রদানের মত অবস্থা থাকিলে খাতক যদি তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে বাদীকে তাহার দাবী পূরণ করিতে ব্যর্থ হয় তবে তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। খাতক যদি পাওনা মিটাইয়া দিতে অযথা বিলম্ব করে বা দেনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি লুকাইয়া রাখে তবে তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। খাতকের বা বিবাদীর কারাবাস দীর্ঘায়িত হইতে থাকিলে বিচারক তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন।

অনুপূরক আদেশ

মামলার বিষয়বস্তু সংরক্ষণের নিমিত্ত বিচারক অনুপূরক আদেশ দিবার অধিকার রাখেন। যদি দেখা যায় যে সম্পত্তির সকল মালিক আদালতে উপস্থিত নাই এবং যাহারা উপস্থিত নাই তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তবে বিচারক সেই সম্পত্তির জন্য সম্পত্তি দখলকারের নিকট হইতে আমানত লইতে পারেন বা রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন। দবির কিছু সম্পত্তি এবং দুইপুত্র হুমায়ুন এবং আকবরকে রাখিয়া মারা গেলেন। দবিরের প্রতিবেশী জায়েদ তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। হুমায়ুন বড় এবং আকবর ছোট। হুমায়ুন দেশত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। আকবর সমস্ত সম্পত্তি দাবী করিয়া জায়েদের বিরুদ্ধে মামলা করিল। এই অবস্থায় আদালত সম্পত্তি কাহাকে দিবেন? ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, আকবরকে অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়া হইবে এবং অন্য অর্ধেক

www.pathagar.com

জায়েদ ভোগ করিতে থাকিবে। জায়েদের নিকট হইতে কোন জামানত লওয়ার প্রয়োজন নাই। ইমাম আবু হানিফার শিষ্যদ্বয় মোহাম্মদ এবং আবু ইউসুফ বলেন যে, আকবর অর্ধেক সম্পত্তি পাইবে এবং অন্য অর্ধেক সম্পত্তি হইতে অন্যায় দখলকারী জায়েদকে ভাগাইয়া উহাতে একজন ভাল লোক বসানো হইবে।

সালিস

মধ্যস্থতাকারীর (যাহাকে বাংলায় সালিস বলা হয়) নিকট বিবাদ, কলহ বা সম্পত্তি এবং অন্য বিষয়ক দাবী দাওয়া লইয়া যাইবার অধিকার ইসলামী আইন পক্ষবৃন্দকে দিয়াছে। ইহাকে তাহাকিম (تحكيم) বলা হয়। কাজীর জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন মধ্যস্থতাকারীর জন্য সেই যোগ্যতা প্রয়োজন। তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য একই রকম হওয়াতে ইসলামী আইন এই বিধান দিয়াছে। জিম্মিদের মধ্যে বিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাদের আপন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যে কোন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করিতে পারেন। যে অপরাধের শাস্তি হদ্দ বা প্রতিশোধ সেই অপরাধের নিষ্পত্তির জন্য সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি নাই। মধ্যস্থতাকারী পক্ষবৃন্দ বা সাক্ষীকে হলফ দিতে পারেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারেন। সেই সিদ্ধান্ত আদালতে উপস্থিত করা হইলে আদালত তম্মূলে ডিক্রী দিতে পারেন। সালিসের যে সিদ্ধান্ত তাহাতে যদি আইনের পরিপন্থী কিছু না থাকে তবে সাধারণভাবে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আদালত হইতে ডিক্রী দেওয়া হয়।

তামাদি

সাধারণভাবে ইসলামী আইনে তামাদির বিধান নাই। কোন কোন মুসলিম দেশে ইহার বিধান করা হইয়াছে। ইসলামী আইনতত্ত্ববিধদগণ বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাজীকে নিয়োগ করিবার সময় এই নির্দেশ দিতে পারেন যে, তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না ; ঠিক একইভাবে রাষ্ট্রপ্রধান এই নির্দেশ দিতে পারেন যে একটি বিশেষ সময়ের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে তাহার পর কোন পক্ষ আদালতে যে দাবী আনিবেন কাজী তাহা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না। মুসলিম

www.pathagar.com

আইনতত্ত্ববিদগণের এই যুক্তি প্রমাণ করে যে প্রগতিমুখী ইসলামী আইনের ধারা যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাইয়া চলিবার ক্ষমতা রাখে। এই প্রগতিমুখী ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিয়া বিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী আইন নিয়ত অগ্রসরমান।

সাক্ষ্য আইনতত্ত্ব

যে সূত্রের উপর ইসলামী সাক্ষ্য আইন প্রতিষ্ঠিত, সেই সূত্রাবলী বুঝিতে পারিলে ইসলামী সাক্ষ্য আইনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। ইসলামী সাক্ষ্য আইন আধুনিক সাক্ষ্য আইন-সদৃশ নহে। ইসলামী সাক্ষ্য আইনতত্ত্ব প্রনিধান করিলে এই আইনের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। সাক্ষীর সাক্ষ্য বস্তুটি কি? ইসলামী আইনের মতে সাক্ষ্য (شهادة) হইতেছে খবর। সাক্ষী যখন আদালতে সাক্ষ্য দেয় তখন সে খবর পরিবেশন করে মাত্র। ইসলামী আইনের মতে সাক্ষী কেবল একজন সংবাদবাহক মাত্র। এক ব্যক্তির কাজ যখন অন্য ব্যক্তির অনুকূলে কোন অধিকার সৃষ্টি করে, তখন যাহার অনুকূলে অধিকার সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাষ্ট্র সেই অধিকার পাইতে সহায়তা করে।

একইভাবে কোন বিশেষ একটি ঘটনা ঘটিবার ফলে কোন ব্যক্তির বরাবরে কোন বিশেষ অধিকার জন্মলাভ করিতে পারে; এই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার লাভ করিতে সহায়তা করে। কোন ব্যক্তি যখন কোন অধিকার লাভ করে, তখন সেই অধিকার যাহাতে সেই ব্যক্তি পায় তাহা সমাজের দেখা উচিত এবং যে দায়িত্ব সমাজের, রাষ্ট্র সমাজের হইয়া সেই দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তির বরাবরে অধিকার সৃষ্টি হয় সেই ব্যক্তি তাহার অধিকারকে বলবৎ করিবার জন্য রাষ্ট্রের নিকট দাবী জানাইতে পারেন। রাষ্ট্রের বরবেরে কোন অধিকার জন্মিলে রাষ্ট্র নিজেই তাহা বলবৎ করিতে পারেন। ব্যক্তির অনুকূলে বা রাষ্টের অনুকূলে এই অধিকার সৃষ্টির কথা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা যদি ব্যক্তিগতভাবে জানিতে পারেন, তবে সরাসরি তিনি উহা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলিতে কাজী বা বিচারককে বুঝায়। বিচারকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সব খবর জানিতে পারা সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে এই অধিকারসমূহ বলবৎ করিবেন? সাক্ষীর মাধ্যমে তিনি খবর পাইতে পারেন এবং পাইয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে সাক্ষীই তাহার মূল অবলম্বন। সাক্ষীর মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য ছাড়াও

www.pathagar.com

যে ঘটনা বা কাজের উপর অধিকার দাবী করা হয় সেই ঘটনা বা কাজের চিহ্ন প্রভৃতি দ্বারাও বিচারক সম্যক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। ঘটনা বা কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাহা মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নয় বা যাহার কোন চিহ্ন বর্তমান থাকে না বা পাওয়া যায় না, তবে তাহা বিচারের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। এই কারণে যাহা অনস্তিত্ববাচক বা অস্বীকারমূলক, তৎসম্পর্কে কোন সাক্ষ্য হইতে পারে না। যে ঘটনার দ্বারা কোন অধিকার সৃষ্ট হয় সেই ঘটনার রাষ্ট্রের অবগতিতে লওয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এই ঘটনা দেখিতে পায় সেই ব্যক্তির উপর উহা রাষ্ট্রের অবগতিতে লইবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। যিনি যাহা দেখিতেছেন, তিনি তাহা আদালতকে বলিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সকলে সকল কথা সম্পূর্ণভাবে নাও বলিতে পারেন। এক্ষেত্রে যাহা তিনি বলেন তাহা খবর হয় না। ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, যে-বিবরণ ঘটনার পূর্ণ পরিচয় বহন করে না, সেই বিবরণ সাক্ষ্য নহে। তাহারা বলেন, যাহা খবর তাহাই সাক্ষ্য; যাহা ঘটনার পূর্ণ এবং নিখুঁত বিবরণ নহে তাহা খবর নয়। তাহাদের মতে মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা খবর বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। যাহা সত্য তাহাই খবর। যাহা খবর তাহাই সাক্ষ্য।

যে ঘটনা এক ব্যক্তির অনুকূলে এবং অন্য ব্যক্তির প্রতিকূলে অধিকার সৃষ্টি করে, সেই ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে। যাহার প্রতিকূলে অধিকার সৃষ্ট হয় তাহার নিকট দাবী করা হইলে তিনি যদি উহা পূরণ করেন বা করিতে সম্মত হন তবে আর সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। কিন্তু তিনি যদি দাবী পূরণ করিতে অস্বীকার করেন তবে সাক্ষ্যের আবশ্যকতা দেখা দেয়। পূর্বে বলা হইয়াছে সাক্ষ্য বলিতে খবর বুঝায় সুতরাং সাক্ষ্য দেওয়া হইবা মাত্রই বিবাদী বা আসামীর উপর দাবী পূরণের কর্তব্য এবং দায়িত্ব নিক্ষিপ্ত হয়। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ ঘটনা দেখেন সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার অধিকার লাভ করেন। সেই ব্যক্তি বিবাদী বা আসামীকে বাদীর বা ফরিয়াদীর অধিকার পূর্ণ করিতে বলিতে পারেন। বিবাদী বা আসামী যদি বাদীর বা ফরিয়াদীর দাবী পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়, তখন বিচারক বিবাদী বা আসামীকে উহা পূরণ করিতে বাধ্য করেন। সুতরাং বিচারকের কাজ হইতেছে খবর পাইয়া বা লইয়া বিবাদী বা আসামীর দ্বারা বাদী বা ফরিয়াদীর দাবী পূরণ করানো। ইসলামী আইনের পরিভাষায় সাক্ষ্যকে শাহাদাত (شهادة) বলা হয়।

www.pathagar.com

মানুষ সব সময় যে শাহাদত দিতে পারিবে এমন নিশ্চিতি দুর্লভ। ভ্রমবশত বা প্রভাবের কারণে মানুষ মিথ্যা ভাষণ করিতে পারে। বিচারককে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ করে তাহাকে সাক্ষী বলা যায় না, মিথ্যাবাদী বলা যায়। যাহা সত্য তাহাই সাক্ষ্য, সুতরাং সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে পারে না। যাহা মিথ্যা বা অসত্য তাহা বলিবায় অধিকার কেহ রাখে না এবং বিচারকও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই নীতিগতভাবে ইসলামী আইনে সাক্ষী শুধু এক তরফা হইতে পারে। সত্য দুই রকম হইতে পারে না, তাই সাক্ষ্যও দুই রকম হইতে পারে না। ইসলামী আইন মিথ্যা এবং ভ্রান্তি হইতে আদালতকে রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় বিধান দিয়াছে। সেই বিধান দ্বারা সাক্ষ্যের প্রকৃতি ও কার্যধারা নির্দেশ করা হইয়াছে।

সাক্ষ্যের শ্রেণী

গুণগত উৎকর্ষ বিচারে সাক্ষ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সার্বজনীন সাক্ষ্য বা তাওয়াতুর (تواطور))। এই শ্রেণীর সাক্ষ্যের মূল্য সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃহৎ সংখ্যক লোক যখন একই খবর পরিবেশন করে, তখন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অধিক সংখ্যক লোক একত্র হইয়া একই বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে, এমন আশংকা নিতান্তই অমূলক। অধিক সংখ্যক লোক একই বিষয়ে ভুল করিবে, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং বহুলোকে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার মূল্য অপরিসীম। এই প্রকার সাক্ষ্যকে সার্বজনীন সাক্ষ্য বা তাওয়াতুর বলে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে একক সাক্ষ্য বা আহাদ (احاد)। যখন পরিমাণের দিক হইতে সাক্ষীর সংখ্যা বৃহৎ নয় তখন তাহাদের সাক্ষ্য এই শ্রেণীতে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বীকৃতি বা ইকরার (اقرار)। যখন কোন ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত দাবীকে মানিয়া লইয়া স্বীকৃতি ঘোষণা করে তখন তাহার এই ঘোষণাকে ইকরার বলে।

সাক্ষীর যোগ্যতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইসলামী আইনে বিষয়ের বা ঘটনার সত্য বিবরণকে সাক্ষ্য বলে এবং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তিনি সাক্ষী নামে পরিচিত

www.pathagar.com

হন। যিনি পূর্ণ সত্য বলিবেন না বা মিথ্যা বলিবেন, তাহাকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। মানুষ নানা কারণে মিথ্যা কথা বলিতে পারে। অনেক পরিস্থিতি তাহাকে সত্য ভাষণ হইতে বিরত রাখে। এই সব কারণে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ইসলামী আইন সাক্ষীর যোগ্যতা সম্পর্কে তিনটি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিয়াছে।

(১) নিরপেক্ষার অভাব। যেখানে পক্ষবৃন্দের মধ্যে সম্পর্ক এই প্রকার যে একজন অপর জনের দ্বারা প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন হইতে পারে সেখানে একজন অপরের অনুকূলে বা পোষকতায় বা সমর্থনে সাক্ষ্য দিতে যোগ্যতা রাখেন না। পুত্রের অনুকূলে পিতা বা পিতার অনুকূলে পুত্র সাক্ষ্য দিতে পারেন না। বাদী তাহার নিজের অনুকূলে বা বিবাদী তাহার নিজের অনুকূলে সাক্ষী দিতে পারেন না। বিবাদীর শত্রু বাদীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। মুসলিমের বিরুদ্ধে অমুসলিম সাক্ষ্য দিতে পারেন না।

(২). চারিত্রিক বিশ্বস্ততা। যাহাদের প্রবৃত্তি এবং বৃত্তি এমন প্রকৃতির যে তাহাদিগকে সাধারণত নির্মল চরিত্র মনে করা যায় না, তাহাদের সাক্ষী হইবার যোগ্যতা নাই। পেশাগতভাবে যাহারা নর্তকী এবং অভ্যাসগতভাবে যাহারা জুয়াড়ী এবং মদ্যপ এবং মিথ্যাবাদী তাহারা সাক্ষী হইতে পারেন না। যে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন ভঙ্গ করিলে হদ্দের দন্ড দেওয়া হয়, সেই সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন যাহারা ভঙ্গ করে তাহারা সাক্ষ্য দিবার যোগ্যতা রাখে না। আল মাজাল্লার মতে যাহাদের গুণ অপেক্ষা দোষ বেশী তাহারা সাক্ষী হইবার যোগ্য নয়। বিবেকহীন সরকারী কর্মচারীগণও সাক্ষী হইবার অযোগ্য। আবু ইউসুফ বলেন, যাহার পক্ষে সত্য কথা বলা স্বাভাবিক, চরিত্রহীন হইলেও তাহাকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

(৩) বুদ্ধির পক্কতা এবং জানিবার দেখিবার ক্ষমতা। শিশু এবং উন্মাদ সাক্ষী হইতে পারে না। যে বিষয়ে প্রমাণের জন্য দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন সে বিষয় সম্পর্কে অন্ধ ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না।

ভ্রান্তির এবং মিথ্যা ভাষণের বিরুদ্ধে অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এবং এক ব্যক্তির জন্য আরেক ব্যক্তির যাহাতে অনিষ্ট না হয় সেই কথা মনে রাখিয়া ইসলামী আইন দাবী পূরণের জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অপর্যাপ্ত মনে করে। মানুষের অধিকার লইয়া যেখানে বিতর্ক, সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দুই জন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারী সাক্ষীর সাক্ষ্য একান্তভাবে আবশ্যক। যেখানে প্রশ্ন

www.pathagar.com

এমন প্রকৃতির যে উহার উত্তর শুধু নারীর পক্ষে জানা সম্ভব সেখানে একজন নারী সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট গণ্য হয়। যে ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রমাণ একান্তই আবশ্যক সেক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ সাক্ষী থাকিতেই হইবে। যে অপরাধের শাস্তি হদ্দ সেই অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে দুইজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক। ব্যভিচার প্রমাণ করিতে হইলে চারজন পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন। নারীকে পুরুষের তুলনায়. সাক্ষী দিবার ব্যাপারে হীন মনে করা হয়।

সাক্ষীর যোগ্যতা সম্পর্কে তদন্ত

যে ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষে অভিযোগ করেন, যে ব্যক্তি তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছে সেই ব্যক্তি অসাধুতা বা ভ্রান্তির কারণে মিথ্যা বলিয়াছে সে ক্ষেত্রে ঐ সাক্ষীর যোগ্যতা এবং সততা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিচারককে আইন নির্দেশ দিয়াছে। বিচারক গোপনভাবে ঐ সাক্ষী সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারেন আবার যোগ্য এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা ঐ সাক্ষীর জীবন এবং চরিত্র সম্পর্কে তদন্ত করাইতে পারেন। এইরূপভাবে তদন্ত করাইলে বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িয়াই চলে। এই কারণে এই প্রকার তদন্ত বহুপূর্বেই অচল হইয়া গিয়াছিল। সাক্ষী যদি কাজীর এলাকার অধিবাসী না হন তবে সাক্ষীর এলাকার কাজীকে তাহার সম্পর্কে তদন্তের অনুরোধ জানানো যায়। প্রত্যেক কাজী তাহার এলাকাস্থ সৎ মানুষের একটি তালিকা সর্বদা নিজের কাছে রাখেন। এই তালিকা মাঝে মাঝে সংশোধন করা হয়।

প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য

শুধু প্রত্যক্ষ সাক্ষীই, বিশেষ কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত, আইনের দৃষ্টিতে প্রমাণের জন্য গ্রহণীয়। দেখিবার হইলে উহা দেখিতে হইবে এবং শুনিবার হইলে উহা শুনিতে হইবে। যাহারা দেখিবেন এবং শুনিবেন তাহারই উহা প্রমাণ করিবার যোগ্যতা রাখেন। ইহাকেই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বলে। কোন কোন বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়। পিতৃত্ব, মৃত্যু, বিবাহ, কাজীর নিয়োগ এইসব ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণীয়। যাহারা এই বিষয়ে সংবাদ রাখেন, তাহারা যদি চরিত্রবান হন তবে এই বিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন। তবে এই প্রকার অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট হইলে চলিবে না। একটি নির্দিষ্ট তারিখে কোন বিশেষ এলাকায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কাজী ছিলেন কিংবা

www.pathagar.com

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি একটি স্থানে এবং তারিখে মারা গিয়াছিলেন, এইরূপ সাক্ষ্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও গ্রহণীয় হয়। অপ্রত্যক্ষ হইলেও সাক্ষী যদি তাহার খবরকে ঘটনা বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের কারণে, সত্য বলিয়া মনে করেন তবে সেই খবর সাক্ষ্য রূপে তিনি আদালতকে পরিবেশন করিতে পারেন। কোন ঘটনা এবং বিষয় যদি এতই সুবিদিত হয় যে অপ্রত্যক্ষ সূত্র হইতে ইহা জানিলেও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইবার কথা নয় তবে সেই ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়। একটি সম্পত্তি যে ওয়াক্‌ফ করা হইয়াছিল ইহা অপ্রত্যক্ষ সূত্রে জানিয়াও তৎসম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। ইসলামী আইনে, জমিতে যাহার দখল আছে তাহাকে মালিক মনে করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি জমি দখল করেন সেই ব্যক্তিকে আদালতে মালিক রূপে পরিচয় দিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যায়। যিনি দখল করিতে দেখেন তিনিই কেবল এইরূপ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

অতীত ঘটনা বা বিষয় যাহারা প্রত্যক্ষ্যভাব জানেন তাহারা ঐ সব ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে যোগ্যতম সাক্ষী হইতে পারেন। কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া নাও থাকিতে পারেন এবং বাঁচিয়া থাকিলেও দেশ ত্যাগ প্রভৃতি কারণে তাহারা দুষ্প্রাপ্য হইতে পারেন। এই অবস্থায় যাহারা ঐ সব ব্যক্তিগণ হইতে ঘটনা বা বিষয় শুনিয়াছেন তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন। প্রয়োজনের তাগিদে এই সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়। ইহাকে সাক্ষ্যের সাক্ষ্য বা শাহাদাত-আলা শাহাদত বলে।

দাবীর সহিত সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য

সাক্ষ্য যদি দাবীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে আদালত ঐ সাক্ষ্যে বিশ্বাস করেন না। বাবর এই দাবী করিয়া আদালতে নালিশ করিলেন যে, তিনি সোনাপুরের জমি মালিকরূপে দুই বৎসর দখল করিতেছেন। এই দাবীর উপর হুমায়ুন ও আকবর সাক্ষ্য দিলেন যে তাহারা বাবরকে পাঁচ বৎসর সোনাপুরের জমি ভোগ দখল করিতে দেখিয়াছেন। আদালত হুমায়ুন ও আকবরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। কিন্তু হুমায়ুন ও আকবর যদি বলেন যে, তাহারা বাবরকে এক বৎসর কাল ঐ জমি ভোগ দখল করিতে দেখিয়াছে তবে তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রহণীয় হইবে না। এক বৎসরের পূর্বেকার অবস্থা তাহাদের অজানা থাকিতে পারে। সেলিম এক হাজার টাকা দাবী করিয়া দবিরের বিরুদ্ধে মামলা করিলেন। সেলিমের সাক্ষীগণ বিচারককে মাত্র পাঁচশত টাকার কথা বলিলেন। এই সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। কিন্তু

www.pathagar.com

সাক্ষীগণ যদি দুই হাজারের কথা বলিতেন তবে উহা আদৌ গ্রহণীয় হইত না। সাক্ষ্যের মধ্যে যদি বৈপরীত্য বা বিরোধিতা পরিদৃষ্ট হয়, তবে আদালত সমস্ত সাক্ষ্যই অবিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। সাক্ষ্য যদি কোন সুবিদিত ঘটনা দৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কে হয় তবে উহা বিশ্বাস করিবার প্রশ্নে বিচারক দেখিবেন যে ঐ সাক্ষ্য সুবিদিত ঘটনা বা বিষয়ের বিরোধী কিনা; বিরোধী হইলে বিচারক উহা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রমাণের অগ্রগণ্যতা

দবীর বলিতে চাহেন যে তিনি যখন আমীরের নিকট হইতে তাহার সম্পত্তি ক্রয় করেন তখন তাহার (আমীরের) স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। আকবর বলিতে চাহেন যে আমীর সেই সময় মৃত্যু ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। আমীরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দবীরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে। মানুষ সুস্থ থাকে ইহাই ধারণা করিয়া লইতে হয়। মানুষ উন্মাদ নয়, সাধারণত এই ধারণাই করা উচিত; সেই কারণে যে ব্যক্তি অন্যকে উম্মাদ বলিতে চাহেন তাহার উপর উহা প্রমাণের ভার পড়ে। ইসলামী আইন বলে, যাহা সাধারণ এবং স্বাভাবিক আইন তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। এই ধরিয়া লওয়াকেই ইসলামী আইনের পরিভাষায় ইসতিস-হাবউল হাল (استصحاب الحال) বলে। বাদী একরূপ এবং বিবাদী অন্যরূপ বলিলে কাহার কথা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ইসতিস-হাবউল-হালের উপর নির্ভর করে।

কোন সম্পত্তি সম্পর্কে যদি বাদী বলেন যে, তিনি উহা একাই মালিক রূপে ভোগ করিতেছেন এবং বিবাদী যদি বলেন সে, তিনি এবং বাদী ঐ সম্পত্তি যৌথ মালিকানায় ভোগ দখল করিতেন তবে বাদীর দাবী সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয়। উভয়ে এককভাবে দাবী করিলে দুই পক্ষকে যৌথ মালিক ঘোষণা করা যায়।

কোন পক্ষের দাবী গ্রহণীয়

যে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে বিবদমান উভয় পক্ষই সাক্ষ্য দিতে অপারগ সে বিষয়ে বা ঘটনায় তাহা, যাহা স্বভাবের অনুকূল (তাহকিমুল হাল تحكيم الحال) বিচারক তাহাই গ্রহণ করিবেন। শাজাহান এবং রমিসা একই গৃহে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করেন। সেই গৃহস্থিত একখানি তরবারি লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। স্বামী দাবী করিলেন যে, তরবারি তাহার

www.pathagar.com

স্ত্রী দাবী করিলেন যে, ঐ তরবারি তাহার। স্বামী বলিলেন, তিনি হলফ লইয়া বলিতে প্রস্তুত আছেন যে তরবারিখানা তাহার। এমতাবস্থায় বিচারক স্বামীর অনুকূলে রায় দিবেন। এই রায় দিবার পূর্বে বিচারক স্বামীকে হলফ লইতে নাও বলিতে পারেন। বিরোধীয় বস্তু যদি তরবারি না হইয়া ঘরের তৈজসপত্র হয়, তবে বিচারক স্ত্রীর অনুকূলে রায় দিবেন। অবশ্য স্ত্রী বা স্বামী যদি পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম হন তবে অন্য কথা। যে বস্তুর মালিক হওয়া যাহার পক্ষে স্বাভাবিক, বিপরীত প্রমাণের অভাবে আদালত তাহাকেই উহার মালিক ধরিয়া লন। দাতা তাহার দান প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন এবং দান গ্রহীতা বলিলেন যে, দানকৃত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আদালত দান গ্রহীতার কথাই মানিয়া লইবেন। ইহা মানিয়া লইবার পূর্বে বিচারক দান গ্রহীতাকে শপথ করিতে নাও বলিতে পারেন। আমানত গ্রহীতা যদি শপথ লইয়া বলেন যে, তিনি আমানতদারের নিকট আমানতকৃত বস্তু ফেরত দিয়াছেন, তবে তাহার এই দাবী বিচারক মানিয়া লইবেন। জন নামক একটি খ্রিশ্চিয়ান মরিয়া গেল। তাহার বিধবা মরিয়ম আদালতকে বলিল, সে জনের মৃত্যুর পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। জনের পুত্রগণের কথাই বিচারক মানিয়া লইবেন। যে আদান-প্রদান সম্পর্কে বিবদমান পক্ষবৃন্দ পরস্পরবিরোধী দাবী করে এবং প্রত্যেক পক্ষে হলফ লইতে উদ্যত হয়. বিচারক সেই আদান-প্রদানকে অসিদ্ধ ঘোষণা করিবেন। দাবী পরস্পর বিরোধী হইলে কোন পক্ষের দাবী মানিয়া লওয়া ঠিক নহে। বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিল। এই মামলায় বিক্রিত বস্তু এবং তাহার মূল্য সম্পর্কে উভয় পক্ষ পরস্পরবিরোধী উক্তি করিল। বিচারক ঐ বিক্রয় রদ করিয়া দিবেন।

অবস্থাভিত্তিক সাক্ষ্য

কোন বিষয় বা ঘটনাকে সব সময় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মানবিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। এমন বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে বা এমন ঘটনা ঘটিতে পারে, যে প্রশ্ন এবং ঘটনা সম্পর্কে মানুষ কিছু দেখে নাই বা শুনে নাই। অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সব ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনেক সময় ঘটনা এবং বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে। ইহাকেই অবস্থাভিত্তিক সাক্ষ্য

www.pathagar.com

বলা হয়। যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি অবস্হা বা কারিনাত (قرينة), সেই সিদ্ধান্তকে অবস্হাভিত্তিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত গণ্য করা হয়। . অবস্থাভিত্তিক সাক্ষ্যকে প্রমাণের জন্য গ্রহণ করিতে হইলে উহার প্রকৃতিকে হইতে হইবে নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বা কাতিয়াতুন (قطعية, । নাসির একটি পরিত্যক্ত বাড়ী হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল) তাহার চোখে মুখে ত্রস্ততার ভাব। তাহার হাতে একখানা ছুরি। সেই ছুরি হইতে তাজা রক্ত ঝরিতেছে। ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীর মধ্যে একটি মৃত দেহ পাওয়া গেল ; তাহার গলা কাটা এবং সেখান হইতে রক্ত পড়িতেছে। এই রূপ অবস্হা এবং পরিস্হিতিতে নাসিরকে হত্যাকারী গণ্য করা যায়। যে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নাসিরকে হত্যাকারী গণ্য করা যায় তাহা অবস্হাভিত্তিক।

দালীলিক সাক্ষ্য

মৌখিক সাক্ষ্যের পরিবর্তে অনেক সময় দালীলিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তবে দালীলিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার সময় বিচারককে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যে সমস্ত বিষয় বা ঘটনা বা আদান-প্রদান সাধারণভাবে লিখিত হইবার কথা নয়, সেই সমস্ত বিষয় বা ঘটনা বা আদান-প্রদান সম্পর্কে আদালতে লিখিত দলিল দাখিল হইলে বিচারক তাহা গ্রহণ নাও করিতে পারেন। অন্য প্রকার দলিল গ্রহণ করিবার সময় উহা যে জাল নহে বিচারক তাহা পরীক্ষা করেন। সন্দেহ যুক্ত দলিল আদালত গ্রহণ করেন না। সন্দেহযুক্ত দলিল আদালত সর্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকেন সরকারী দলিল পত্র এবং আদালতের নথি-পত্র বিচারক বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। যে সমস্ত খাতা-পত্র তেজারতির প্রথামতে ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত রাখিয়া থাকেন তাহাও আদালত গ্রহণ করেন। যে দলিল দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে গৃহীত হয় সেই দলিল সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

স্বীকৃতি

বিবাদী যদি বাদীর দাবী স্বীকার করেন তবে সেই স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বিচারক বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে পারেন এবং দিয়া থাকেন। তবে সেই স্বীকৃতিকে হইতে হইবে স্বেচ্ছাভিত্তিক এবং শর্তহীন। বিবাদী যদি তামাশা করিয়া বা বাধ্য হইয়া স্বীকৃতি দিয়া থাকেন, তবে তাহা

www.pathagar.com

গ্রাহ্য হইবে না। স্বীকৃতি যদি স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী হয় তবে ইহা গ্রহণযোগ্য হয় না।

সাক্ষ্য প্রত্যাহার

সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করিতে পারেন। সাক্ষী যদি তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করিতে চান তবে তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে এবং বিচারকের সম্মুখে তাহার প্রত্যাহার ঘোষণা করিতে হইবে। বিচারক তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার পূর্বেই সাক্ষীকে এই প্রত্যাহার ঘোষণা করিতে হইবে, তবেই বিচারক তাহা কার্যকরী করিবেন অর্থাৎ তাহার সাক্ষ্যকে মূল্য দিবেন। সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর যদি সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাহার ঘোষণা করেন তবে সেই প্রত্যাহার দ্বারা বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হইবে না।

প্রতিবন্ধ

সব কথা সব সময় সকলকে বিচারক বলিতে দেন না। দবীর একখানি জমির মালিক। তাহার ভাই বশীর ঐ জমিখানা জায়েদের নিকট বিক্রয় করিল। এই ক্রয় বিক্রয়ের কথা-বার্তার সময় দবীর উপস্থিত ছিল। কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর দবীর আদালতে যাইয়া বলিতে চাহিল যে, সে তাহার ভাই বশীরকে ঐ জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করে নাই। বিচারক দবীরকে ইহা বলিতে দিবেন না। ঐ জমিখানি বশীর কর্তৃক জায়েদের বরাবরে বিক্রীত হইবার সময় দবীর তাহার উপস্থিতির দ্বারা বশীরের প্রতিনিধিত্ব মানিয়া লইয়াছিল এবং ইহা দেখিয়া সরল বিশ্বাসে জায়েদ ঐ জমি ক্রয় করিয়াছিল। অত:পর আর দবীরকে অন্য কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আচরণ বিবেচনা করিয়া এইরূপ বাধা প্রদানকে পাশ্চাত্য আইনে প্রতিবন্ধ (estoppel) বলে। ইসলামী আইন ইহাকে বায়ানুদ-দারুরাত (بيان الضرور) বলে।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সাংবিধানিক আইন এবং প্রশাসনিক আইন

সাংবিধানিক আইন : রাষ্ট্রের ধারণা :

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ

ইসলামী আইনে রাষ্ট্রের ধারণা ভিন্ন প্রকৃতির। বিশ্বের সমস্ত মুসলিম মিলিয়া গঠিত হয় একটি মিল্লাত। সেই মিল্লাত পরিচালিত এবং প্রশাসিত হয় একজন প্রধান দ্বারা। সেই প্রধানকে বলা হয় ইমাম বা খলিফা। মিল্লাতের প্রশাসন এবং পরিচালনার সমস্ত ভার একজন ইমামের পক্ষে পূর্ণভাবে বহন করা দুঃসাধ্য। সুশাসন এবং সুপরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তাহার এই ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিতে পারেন। ইহার জন্য তিনি এক বা একাধিক উজীর নিয়োগ করিতে পারেন। এই উজীরদের নিকট তিনি তাহার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন অথবা বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন অথবা কোন ক্ষমতা অর্পণ না করিয়া তাহাদিগকে শুধু পরামর্শ দিবার দায়িত্ব দিতে পারেন। তাহার আদেশ নির্দেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, ইহার তত্ত্বাবধানের ভার তিনি তাহাদের উপর দিতে পারেন। কোন দেশ বা অঞ্চলের জন্য পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা দিয়া তিনি কোন ব্যক্তিকে রাজ্যপাল (Governor) নিয়োগ করিতে পারেন। প্রতিরক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি সকল বা যে কোন বিভাগের ক্ষমতা তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে পারেন। এইসব ক্ষেত্রে ইমাম বা খলিফার যে ক্ষমতা আছে সেই সব ক্ষমতা ইমাম বা খলিফা কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন। ইমাম বা খলিফার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অতি ব্যাপক এবং বিস্তৃত, কিন্তু তাহা হইলেও আইন প্রণয়নের অধিকার তিনি রাখেন না। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে যদি আইনবিদ হন তবে তিনি আইন ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তিনি যে ব্যাখ্যা দিবেন তাহা যে অধিক মূল্য বহন করিবে এমন কোন কথা নাই। তিনি আইনের অধীন, আইন তাহার অধীন নয়। কাজী যে আদেশ বা ডিক্রী দিবেন, তাহা অন্য সকলের ন্যায় তিনিও মানিতে বাধ্য। ইসলামের ইতিহাস এই বিষয়ে বড়ই গৌরবজনক। কাজী কঠোর আদেশ দিতেছেন এবং রাষ্ট্র

www.pathagar.com

প্রধান তাহা সশ্রদ্ধ চিত্তে মানিয়া লইতেছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বিরল নহে। খলিফা হযরত আলী এক ইহুদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। এই মামলায় কাজী সুরাইহ হযরত আলীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন। অবশ্য ইমাম যদি কাজীর আদেশ প্রতিপালন না করেন, তবে কাজীর পক্ষে কিছু করিবার থাকে না। এই কারণে প্রতিশোধ বা হদ্দের দণ্ড রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে দেওয়া যায় না। কাজী এই প্রকার দণ্ডাদেশ কার্যকরী করিবার অধিকার রাখেন না। ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে কাজী তাহা শুনিয়া তৎ সম্পর্কে তাহার মত লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তাহার অভিমতসহ তিনি ইমামের কাছে উহা পেশ করিয়া তাহাকে যথা-বিহিত প্রতিকারের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

ইমামের নির্বাচন

ইমাম জনগণের প্রতিনিধি মাত্র। জনগণ হইতে তিনি তাহার সকল ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করেন। ইজমার মাধ্যমে তাহার এই পদলাভ ঘটে। রসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু এই নির্বাচনে সকল মুসলিম শরীক হইতে পারেন নাই। যে ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের পক্ষে নির্বাচনে শরীক হওয়া সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তিগণের নির্বাচন যথেষ্ট গণ্য হয়। প্রধান বা আয়ান (اعیان) বলিতে দেশের শিক্ষিত, মার্জিত এবং সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণকে বুঝায়। নির্বাচিত হইবার পরই ইমাম রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন। ইমাম যদি জালিম হন বা তিনি যদি আইন ও ধর্মীয় অনুশাসনকে একের পর এক ভঙ্গ করিয়া চলেন তবে মুসলিম জনসাধারণ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ পদে বসাইতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইমাম থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সকল মুসলিমের নিকট হইতে আনুগত্য পাইবার অধিকার রাখেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার আদেশ সকলে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। কাজী-খানের বরাত দিয়া বাহারুর রায়েকের গ্রন্থকার বলেন, অভিজাত ব্যক্তিগণের আনুগত্য এবং আদেশ কার্যকরী করিবার ক্ষমতার উপর সুলতানাত নির্ভরশীল। শুধুমাত্র অভিজাত ব্যক্তিগণের আনুগত্য পাইলে কেহ সুলতান হইতে পারে না। আদেশ কার্যকরী করিবার ক্ষমতা তাহার থাকা চাই। আদেশ কার্যকরী করিবার ক্ষমতাই সুলতানের মূল কথা। জালিম হইয়াও তাহার এই ক্ষমতা থাকিলে

www.pathagar.com

তিনি তাহার সিংহাসন বজায় রাখিতে পারেন। প্রসঙ্গত এই স্থলে একটি নিবেদন করিতে হয়, মনে হয় তৎকালীন সুলতানদের বাহু বলে খিলাফত গ্রহণ প্রভৃতির পটভূমিকায় গ্রন্থকারগণ বিব্রত হইয়া পড়েন এবং অনিচ্ছুকভাবে উঁহাদের সাথে ইসলামী খিলাফতের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস গ্রহণ করেন।

ইমাম হাশেমি পরিবারের না হইলেও তাহাকে কোরায়েশ হইতে হইবে। কোরায়েশদের মধ্যে ইমামের উপযুক্ত কাহাকেও না পাওয়া গেলেও অন্য কোন ব্যক্তিকে সুলতান রূপে নির্বাচন করা যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত এবং জ্ঞানী হইতে হইবে। নির্বাচিত ইমাম তাহার উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করিতে পারেন। তবে সেই মনোনয়ন জনসমর্থিত হইতে হইবে। এইভাবে হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে মনোনীত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন ইমাম থাকাই ইসলামের নির্দেশ। ইসলামের এই নির্দেশ কিয়ৎপরিমাণে খোলা-ফায়ে রাশেদীনের জামানায় প্রতিপালিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর মুস-লিম বিশ্বের অনেক দেশ স্বৈরাচারী সুলতানগণ দ্বারা শাসিত হইয়াছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এ যাবৎ কোন সাধারণ ইমাম খুঁজিয়া পায় নাই।

প্রশাসনিক আইন ঃ রাজস্ব

গণ-সম্পত্তির (Public Property) মালিকানা সম্বন্ধে ইসলাম বৈপ্ল-বিক মত পোষণ করে। রাষ্ট্রপ্রধান এই প্রকার সম্পত্তির অছি মাত্র, কোন প্রকারে তিনি মালিক নন। গণ-সম্পত্তির উৎস নানাবিধ। ইহার প্রথম উৎস হইতেছে রাজস্ব। রাজস্ব আদায় হইবা মাত্রই উহা ট্রেজারীতে বা বায়তুল মালে (بيت المال) জমা দিতে হয়। নিম্নবর্ণিত খাত হইতে রাজস্ব আদায় করা হয়।

(১) মুসলিমগণ যে জমি ভোগ দখল করেন, তাহার উপর যে খাজনা ধার্য হয় তাহাকে ওশর (عشر) বলে। রাজস্বের ইহাই প্রথম উৎস।

(২) অমুসলিমগণ যে সমস্ত জমি-জমা ভোগ-দখল করেন, সেই সমস্ত জমি-জমার উপর ধার্য করকে খিরাজ (خراج) বলা হয়। ইহা রাজস্বের দ্বিতীয় উৎস।

(৩) হেফাজত এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে অমুসলিমদের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা জিজিয়া (جزية) নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

(৪) দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যকল্পে মুসলিমদের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা জাকাত নামে পরিচিত। ইহা হইতেও রাজস্ব সংগৃহীত হয়।

(৫) অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদে জয়লাভ করিয়া যে সম্পত্তি পাওয়া যাইত তাহার এক-পঞ্চমাংশকে খুমুস (خمس) নামে অভিহিত হইত । ইহা হইতেও রাজস্ব আসিত।

(৬) রাষ্ট্রের কোনস্থানে খনি থাকিলে উহা হইতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে যাইত।

(৭) বাজেয়াপ্ত মালও রাষ্ট্রীয় তহবিল সংগ্রহের একটি উৎস ছিল।

যাকাত এবং যুদ্ধলব্ধ গণিমতের পঞ্চমাংশ এবং খনি হইতে প্রাপ্ত সম্পদ শুধুমাত্র দরিদ্র কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে ইমাম এইগুলিকেও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য জেহাদের কাজে ব্যয় করিতে পারিতেন।

অন্য খাতে সংগৃহীত রাজস্ব সাধারণত প্রশাসনের কাজে ব্যয়যোগ্য।

প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রের পরিধি এবং জটিলতা যখন এত ব্যাপকতা লাভ করে নাই তখন ইমাম নিজেই অবসর সময়ে আয়ের সংস্থান করিতেন এবং এইভাবে তাহার সংসার খরচ মিটাইতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিস্তৃতিতে এবং জটিলতায় রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় কার্য এমন বিপুল হইয়া পড়িল যে ইমামের হাতে রোজগার করিবার মত সময় এবং অবসর দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল। অতঃপর বায়তুল মাল হইতে তাহার এবং তাহার পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করা হইল।

ইমামগণ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক

নদী, জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা, পতিত জমি প্রভৃতিকে গণসম্পত্তি (Public property) বলে।

এই সমস্ত গণসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ইমামের উপর ন্যস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা প্রভৃতি, সমগ্র জনসাধারণের জন্য বা কোন সম্প্রদায়ের জন্য নিবেদিত। ইমাম এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক। রাষ্ট্রের সকল নাবালক, উন্মাদ এবং জড়বুদ্ধি ব্যক্তিসমূহের দেহ এবং সম্পত্তির তিনিই অভিভাবক।

www.pathagar.com

ইমাম নিজে এই সমস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করিতে সব সময় সক্ষম নহেন। এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাই তিনি সাধারণত কাজীকে অর্পণ করেন। সুতরাং বিচার কার্য ছাড়াও কাজীগণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দেখাশুনা এবং অসহায় মানুষের হেফাজত করিয়া থাকেন। মুসলিমগণ যাহাতে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ প্রতিপালন করেন; তৎজন্য ইমাম ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখেন। জনসাধারণের আচরণ যাহাতে অশোভন বা অশালীন না হয় তাহাও দেখিবার দায়িত্ব ইমামের। এই উদ্দেশ্যে তিনি আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে পারেন। এইসব দায়িত্ব তিনি কাজীর উপর অর্পণ করিতে পারেন। জুম্‌য়ার নামাযে ইমামতি করিবার সম্মানজনক অধিকার একমাত্র ইমামের। এই কাজে তিনি অন্য ব্যক্তিকেও নিয়োগ করিতে পারেন।

যাকাত

যাকাত শুধু মুসলিমদের উপর ধার্য করা যায়। মুসলিমগণ ইহাকে ফরজ ইবাদতে গণ্য করে। মুসলিমগণের নিকট হইতে রাষ্ট্র ইহা আদায় করিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র ইহা শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও আদায় করিতে পারেন। হযরত আবু বকরের খিলাফত আমলে এইভাবে যাকাত আদায় করা হইত। কিন্তু আধুনিককালে ইহা প্রদান করিবার দায়িত্ব বিত্তবান মুসলিমদের ধর্মীয় বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জমি-জমার উপর এই কর ধার্য হয় না; ইহা ধার্য হয় বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত থাকে যে সোনা, রূপা, জানোয়ার বা তেজারতির পণ্য। ইহার হার শতকরা আড়াই ভাগ।

জিজিয়া কর

জিজিয়া একটি ব্যক্তিগত কর। ইহা দুইভাবে আরোপিত এবং ধার্য হয়। ইহা অমুসলিমদের সহিত চুক্তিমূলে আরোপিত হইতে পারে। এইভাবে আরোপিত হইলে জিজিয়ার হার চুক্তির মাধ্যমে ধার্য হয়। দ্বিতীয়ত বিজিত অমুসলিমদের উপর এই কর ধার্য হইতে পারে ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তার অঙ্গীকারের বিনিময়ে। হানাফীদের মতে অমুসলিমদের আর্থিক

www.pathagar.com

অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই কর নির্ধারণ করা হয়। শাফিঈদের মতে এই করের হার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল অমুসলিমের উপর একই রকম। জিজিয়া হইতেছে দুশমন অমুসলিমের মুক্তিপণ। যে সমস্ত দুশমন অমুসলিম হত্যার অযোগ্য, তাহারা জিজিয়ার আওতায় আসে না। নারী, শিশু, রোগী এবং অন্ধ এই কারণে জিজিয়া কর হইতে মুক্ত। আরবের মূর্তিপূজক এবং ধর্মত্যাগিগণকে ইসলাম গ্রহণ করিতে অথবা মৃত্যুবরণ করিতে বলা হয় সুতরাং তাহাদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করা যায় না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীগণের উপর জিজিয়া কর ধার্য করা যায় না। যখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পান।

উশর

যে দেশের সকল অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে সে দেশের সকল জমির উপর উশর (দশমাংশ) ধার্য করা হয়। উশর প্রদান করা মুসলিমদের জন্য ইবাদত। এই করের বোঝা খুব ভারী নহে এবং সেই কারণে ইহা সকল মুসলিমের উপর আরোপ করা ন্যায়সংগত। মুসলিমগণ প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া যে দেশ জয় করেন অথবা যে দেশ মুসলিমদের নিকট নতি স্বীকার করে সেই দেশের সকল অধিবাসীর উপর খিরাজ ধার্য করা হয়। মক্কার অমুসলিমদের সহিত রসূলুল্লাহর যে সময় চুক্তি হয় সেই সময় সকলের উপর উশর ধার্য করা হইয়াছিল। মক্কায় খিরাজ আরোপ করা হয় নাই। তৎকালীন আরবের সমস্ত জমির উপর উশর আরোপ করা হইয়াছিল কারণ সেই দেশে তৎকালে কোন ব্যক্তির পক্ষে অমুসলিম থাকিবার কথা নয়। তৎকালে আরববাসীকে বলা হইয়াছিল— হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে না হয় তাহারা যুদ্ধ করিবে। আসহাবদের ইজমা মতে সিরিয়াতে খিরাজ আরোপ করা সিদ্ধ। সেচ ব্যবস্থার উপর করের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে বিজিত দেশের জমি নদী বা অন্য কোন স্রোতের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় না এবং যে দেশের জমিতে কূপ খনন করিয়া পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে হয় সেই দেশের জমির উপর উশর ধার্য করা হয়। পতিত জমি চাষাবাদ যোগ্য করা হইলে তাহাতে কোন প্রকার কর ধার্য করা হইবে সেই প্রশ্নের উত্তর সন্নিহিত জমির প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে হয়, ইহাই আবু ইউসুফের মত। কূপের বা ঝর্নার বা বড় নদীর পানির দ্বারা সেচের

www.pathagar.com

মাধ্যমে যে জমি চাষাবাদ যোগ্য করা হয় সেই জমির উপর উশর আরোপিত হয়। জমির উর্বরতার এবং উৎপাদিত ফসলের খিরাজের পরিমাণ নির্ভর করে, তবে কোনো অবস্থায় খিরাজের পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অর্ধেকের বেশী হইবে না। খিরাজী জমির শস্য যদি বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয় তবে সেই বৎসরের জন্য খিরাজ দিতে হয় না। মালিকের অবহেলায় যদি খিরাজী জমির ফসল নষ্ট হয়, তবে খিরাজ হইতে রেহাই পাওয়া যায় না। খিরাজ জমি মুসলিমের মালিকানায় এবং দখলে গেলেও উহার করের প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন হয় না।

বিচার ব্যবস্থা

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, কাজীর নিয়োগে এবং বিচার ব্যবস্থাপনায় ইমামের ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইমাম এবং তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে মন্ত্রী এবং প্রশাসক কাজী নিয়োগ করিতে পারেন। ইসলামী আইন প্রয়োগ করিবার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানও কাজী নিয়োগ করিতে পারেন

কাজী নিয়োগ

যে ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারেন সেই ব্যক্তি কাজী নিয়োজিত হইতে পারেন। অর্থাৎ কাজী নিযুক্ত হইতে হইলে তাহাকে বালেগ ও স্বাধীন মুসলিম হইতে হইবে। শাফিঈদের মতে তাহাকে পরহেজগার হইতে হইবে। হানাফীগণ পরহেজগার কাজীকে পছন্দ করেন কিন্তু পরহেজগার হওয়া তাহাদের মতে কাজী পদলাভের পূর্বশর্ত নয়। হানাফীদের মতে যে কাজী মুত্তাকী নন তাহার ডিক্রী অবৈধ ঘোষণা করা যায় না। হানাফীগণ আরো বলেন যে, কাজীকে যে মুজতাহিদ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যে ক্ষেত্রে কাজী মুজতাহিদ নন সেক্ষেত্রে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য মুফতি নিয়োগ আবশ্যক। আইনের প্রশ্নে মুফতি কাজীকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। মুফতিকে অবশ্যই ভাল আলীম হইতে হইবে। আইনের জ্ঞান ছাড়াও তাহাকে পুণ্য চরিত্র বা আদিল হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কাজী হইবার জন্য যে সমস্ত যোগ্যতা থাকা দরকার মুফতিকে সেই সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন থাকিতে হইবে।

www.pathagar.com

মহিলা কাজী

শাফিঈদের মতে মহিলাদের কাজী হইবার অধিকার নাই। হানাফীগণ অন্যমত পোষণ করেন। তাহারা বলেন, মহিলাগণ যেহেতু সাক্ষী হইবার যোগ্যতা রাখেন সেইহেতু তাহারা কাজীও হইতে পারেন। তবে যেহেতু তাহারা হদ্দ এবং প্রতিশোধের যোগ্য শাস্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন না, সেই হেতু আদেশও দিতে পারেন না।

কাজীর অধিকার এবং ক্ষমতা

নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য কাজী নিয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ বিষয়কে তাহার ইখতিয়ারের বাহিরে রাখা যাইতে পারে। তাহার ইখতিয়ার কোন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাইতে পারে। শুধুমাত্র সৈন্য বাহিনীর বিরোধ বিচারের জন্য ইমাম একজন কাজী নিয়োগ করিতে পারেন। একটি মামলা নিষ্পত্তির জন্য দুইজন কাজীও নিযুক্ত হইতে পারেন।

সুলতানের অনুমতি থাকিলে কাজী উপ-কাজীকে নিয়োগ দানের ক্ষমতা রাখেন এবং যাহাকে তিনি নিয়োগ দান করেন তাহাকে তিনি বরখাস্ত করিতে পারেন। কাজী কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উপ-কাজী রায় দিতে পারেন। উপ-কাজী কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া কাজীও রায় দিতে পারেন।

সন্দেহের কারণে বা কোন কারণ ব্যতীতও সুলতান কাজীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফার মতে এক বৎসরের অধিক কাল কাহাকেও কাজী রাখা উচিত নয়। সুলতানের মৃত্যু হইলে কাজীর পদচ্যুতি হয় না।

কাজীর অন্যান্য কর্তব্য

ওয়াক্‌ফ বা ঐ প্রকৃতির সম্পত্তিসমূহের হেফাজত এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কাজীর উপর ন্যস্ত থাকে। নাবালক, উন্মাদ, জড়বুদ্ধি এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পত্তি এবং স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বও তাহার উপর ন্যস্ত। ওয়াক্‌ফ-ভুক্ত সম্পত্তির প্রশাসন এবং পরিচালনার জন্য কাজীকে যে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি ব্যাপক। ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে উহা নিবেদিত তাহা নিষ্পন্ন

www.pathagar.com

করিবার জন্য কাজী যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। যাহাদের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হইয়াছে তাহাদের কল্যাণের জন্য কাজী সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে কাজী ওয়াক্‌ফের অভিপ্রায় দ্বারা বাধ্য নহেন। ওয়াকিফ যাহাকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেন তাহার ক্ষমতা অপেক্ষা কাজীর ক্ষমতা অধিক। প্রয়োজনের সময় মুতাওয়াল্লি ওয়াকফভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা ইজারা দিতে বা বন্ধক দিতে পারেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লির এই অধিকার কাজীর অধিকারের মত বিস্তৃত নহে। ইসলামী আইনে মুতাওয়াল্লির অধিকার সংকীর্ণ কাজীর তত্ত্বাবধান প্রায় সার্বক্ষণিক। তাহার তত্ত্বাবধান ব্যতীত ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তির পরিচালন এবং সংরক্ষণ সম্ভব নহে। ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তি এবং তাহার আয় সম্পর্কে মুতাওয়াল্লি কাজীর নিকট হিসাব পাঠাইতে বাধ্য। ওয়াক্‌ফভুক্ত সম্পত্তি পরিচালনার পক্ষে কাজী যদি মুতাওয়াল্লির কাজের মধ্যে কোন গলদ দেখিতে পান তবে কাজী সেই মুতাওয়াল্লিকে বরখাস্ত করিয়া অন্য মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখেন। নাবালক এবং উন্মাদের অভিভাবকের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে কাজীর অধিকার একই প্রকার। তাহাদের সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবার জন্য বা তাহাদের কল্যাণের জন্য কাজী তাহাদের সম্পত্তির উপর প্রভূত অধিকার রাখেন। নাবালকের কোন অভিভাবক না থাকিলে তাহার দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য তিনি অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারেন। কাজী নাবালককে বিবাহও দিতে পারেন। কোন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি প্রবাসী হন কিংবা তাহাদের ঠিকানা যদি জানা যায় তবে কাজী তাহার সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত, করিতে পারেন। কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হইলে তিনি তাহার সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন। শামসুল আয়িম্মা হালবাই বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি দেনা রাখিয়া গিয়া থাকেন এবং তাহার ওয়ারিশগণ যদি নাবালক থাকে এবং তিনি নির্বাহী নিয়োগ না করিয়া যদি উইল করিয়া গিয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রশাসক নিযুক্ত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আইন

মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যেকার সম্বন্ধ

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্বন্ধ নিম্নবর্ণিত ছয়টি দৃষ্টিকোণ হইতে আইনতত্ত্ববিদগণ দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন :

(১) মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্বন্ধ।

(২) মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী অমুসলিমের সহিত মুসলিম রাষ্ট্রের সম্বন্ধ।

(৩) অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মোসাফিররূপে বা অধিবাসীরূপে বসবাসকারী মুসলিমের সহিত ঐ রাষ্ট্রের সম্বন্ধ।

(৪) অমুসলিমের সহিত মুসলিমদের সম্বন্ধ।

(৫) অমুসলিম প্রজাদের সহিত মুসলিম রাষ্ট্রের সম্বন্ধ।

(৬) মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের সহিত ঐ রাষ্ট্রের মুসলিমদের সম্পর্ক।

এই বিষয়গুলি আরব মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ জেহাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

যুদ্ধ ঘোষণা

ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম দ্বীনের হেফাজতের জন্য দারুল হরবের অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে পারেন। মক্কায় কাফিরদের নিকট রসূলুল্লাহ যে আচরণ পাইয়াছিলেন তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, দ্বীন ইসলামের সহিত অমুসলিমগণ দুশমনী করিয়া যাইবে। দ্বীন ইসলামের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিবার পর শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রের সহিত মুসলিম রাষ্ট্র জেহাদে অবতীর্ণ হইতে পারে। জেহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে দ্বীন ইসলামের হেফাজত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতদূর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তাহার বেশী অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মসলিম রাষ্ট্রের ইমাম দুশমন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারেন। যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে শত্রু রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানাইতে হয়। এই দাওয়াত গ্রহণ করিলে আর

www.pathagar.com

যুদ্ধের কোন প্রশ্নই উঠে না। শত্রু রাষ্ট্রের অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার পর মুসলিম রাষ্ট্রকে জিজিয়া কর দিতে স্বীকৃত হইলে জেহাদ বন্ধ করিতে হয়। ধর্মগ্রহণ না করিয়াও যাহারা ইসলামের কর্তৃত্ব মানিয়া লয়, তাহাদের নিকট হইতে আর বিপদের অশংকা নাই। যে সকল অমুসলিম জিজিয়া কর প্রদানের সম্মতির মাধ্যমে ইসলামের সুমহান কর্তৃত্ব মানিয়া লয় তাহারা মুসলিম রাষ্ট্রের ইমামের নিকট তাহাদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার সর্বপ্রকার অধিকার মুসলিমদের মত দাবী করিতে পারে। শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য ইসলাম জেহাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সৈনিকদের জীবন এবং সম্পত্তি

ইসলামী আইনে সকল মুসলিমের জন্যে ধর্মযুদ্ধের অধিকার বা অনুমতি আছে। মুসলিম জেহাদ করিবার অনুমতি বা দায়িত্ব পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অনুমতি বা দায়িত্ব শর্তহীন নয়। এই দায়িত্ব প্রতিপালনের সময় তাই মুসলিমকে কতিপয় বিধি-নিষেধের অধীনে থাকিতে হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগীর উপর কোন কঠোর আচরণ নিষিদ্ধ। তাহাদের হত্যা করিবারও অনুমতি নাই। কিন্তু তাহারা যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে তাহাদের প্রতি এই নিষেধ প্রযুক্ত হইবে না। যুদ্ধের সময় শত্রুদের যে সমস্ত দ্রব্য অধিকার করা হয় সেগুলি যুদ্ধের পুরস্কাররূপে গণ্য হয়। যাহারা অমুসলিম শত্রু-রাষ্ট্র জয় করেন, তাহাদের মধ্যে ঐ বিজিত রাষ্ট্র ইমাম ভাগ করিয়া দিতে পারেন কিংবা ইচ্ছা করিলে তিনি বিজিত অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসীর উপর জিজিয়া কর আরোপ করিতে পারেন। যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে কি ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা পরিস্হিতি বিবেচনা করিয়া ইমাম নির্ধারণ করিতে পারেন। তিনি তাহাদিগকে হত্যার আদেশ দিতে পারেন কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারেন কিংবা জিম্মী হিসাবে তাহাদিগকে মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয়ে আনিতে পারেন। যুদ্ধে যদি অমুসলিমের হাতে মুসলিম দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে যায় তবুও সে কাহারও দাস হইতে পারে না। বন্দী হইলেও মুসলিমকে দাসত্বের শৃংখলে শৃংখলিত করা যায় না। স্বাধীনতা সকল মুসলিমের জন্য অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য। কিন্তু মুসলিমের কোন সম্পত্তি যদি যুদ্ধকালে বিজয়ী

www.pathagar.com

অমুসলিম হস্তগত করে, তবে তাহা সেই অমুসলিমের হইয়া যায়। মুসলিম তাহার সেই সম্পত্তি সাধারণত পাইতে পারে না।

যুদ্ধের সময় মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিমের কর্তব্য

অমুসলিম রাষ্ট্রের সহিত মুসলিম রাষ্ট্রের যে সময় জেহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়, তখন দলগতভাবে ঐ যুদ্ধে যোগদান করা সকল মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। মুসলিমদের ইহা দলগত দায়িত্ব, একক দায়িত্ব নহে। যদি দেখা যায় যে জেহাদে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম যোগদান করিয়াছে তবে অবশিষ্ট মুসলিমগণ যুদ্ধে যোগদানের দায় হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু সকল মুসলিম যদি যুদ্ধে যোগদান হইতে বিরত থাকে, তবে সকল মুসলিমকে অপরাধী গণ্য করা হয়। অমুসলিমগণ যদি মুসলিমগণকে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বল নির্বিশেষে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য এবং কাফিরের বিজয়কে সুদূরপরাহত করিবার জন্য সকলের পক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া আবশ্যিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অবস্থা এইরূপ না হইলে সাধারণভাবে শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং দুর্বলের উপর যুদ্ধ করিবার কোন দায়িত্ব আইন প্রদান করে নাই।

সন্ধি বা চুক্তি

মুসলিম রাষ্ট্রের ইমাম মুসলিমদের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া অমুসলিম রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিতে পারেন। সন্ধি করিলে তিনি উহার শর্ত-সমূহ বিশ্বস্তভাবে পালন করিবেন। অমুসলিমগণ যাহাতে মুসলিমদের উপর কোন অবিচার না করিতে পারে, তাহার জন্যই জেহাদ করিতে হয়। যদি দেখা যায় যে সন্ধির মাধ্যমে জেহাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে তবে সন্ধি বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। একমাত্র মুসলিমদের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া মুসলিমের স্বার্থকে সম্মুখে রাখিয়া ইমাম অমুসলিম রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি বা সন্ধি করিবেন। ইহা যেমন স্বল্প-মেয়াদী হইতে পারে তেমনি দীর্ঘ-মেয়াদীও হইতে পারে। আইন ইহার জন্য কোন বিশিষ্ট সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। সন্ধির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ইমাম সন্ধি হইতে সরিয়া আসিতে পারেন। তবে ইহার জন্য তাহাকে দুইটি শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রথমত, অপর পক্ষকে তিনি তাহার

www.pathagar.com

সংকল্পের কথা যথাসময়ে জানাইয়া দিবেন এবং দ্বিতীয়ত, ইহা তাহার কাছে স্পষ্ট হইতে হইবে যে মুসলিমদের স্বার্থের পক্ষে এই কাজ সবিশেষ অনুকূল। শত্রুপক্ষকে কিছু না জানাইয়া একতরফাভাবে সন্ধি ভঙ্গ করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল এবং ইসলামী আইন কিছুতেই উহা সমর্থন করে না। যদি শত্রুপক্ষ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অত্যাচারমূলক আচরণ শুরু করিয়া দেয় তবে ইমামের পক্ষে আর নোটিশ দিবার প্রয়োজন থাকে না।

ইমাম শান্তির সন্ধি করিতে পারেন এবং শান্তির সন্ধি হইয়া যাইবার পর কোন অমুসলিমের সহিত যুদ্ধ করা যায় না। কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমকে মুসলিম আশ্রয় দিতে পারে এবং এইরূপ আশ্রিত অমুসলিমের সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার কোন মুসলিমের নাই। কিন্তু ইমাম যদি বুঝিতে পারেন যে আশ্রয় দেওয়া অন্যায় হইতেছে তবে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয়চ্যুত করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে আশ্রিত অমুসলিমদিগকে সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত করাইতে হয়।

দারুল ইসলাম এবং দারুল হরব

অমুসলিমদের সহিত মুসলিমদের সম্পর্ক অমুসলিমদের দেশের চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ এই দৃষ্টিকোণ হইতে অমুসলিম দেশগুলিকে দারুল ইসলাম (دار الاسلام) এবং দারুল হরব (دار الحرب) এই দুই নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতেছেন মুসলিম এবং যে রাষ্ট্রের আইন হইতেছে ইসলাম, সেই রাষ্ট্রকে নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম বা নিরাপদ অঞ্চল বলা যায়। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতেছেন একজন অমুসলিম এবং যেখানে মুসলিম নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার সহিত তাহার ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে না, সেই রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে দারুল হরব বা যুদ্ধের অঞ্চল। কিন্তু মুসলিম শাসিত দেশ যদি অমুসলিম বিজেতাদের হাতে চলিয়া যায় কিংবা দেশের সরকার যদি জিম্মীরা গঠন করিতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র সেই কারণে ঐ দেশ দারুল হরব হইয়া যায় না। নিম্নবর্ণিত তিনটি অবস্থা যে রাষ্ট্রে বর্তমান সেই রাষ্ট্রকেই শুধু দারুল হরব বলা যায়ঃ

(১) ঐ রাষ্ট্রের অমুসলিমদের আইন বা বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে।

(২) ঐ রাষ্ট্রের চারিদিকে এমন দেশ থাকিবে যাহাদিগকে যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

www.pathagar.com

(৩) রাষ্ট্রের মুসলিম অথবা জিম্মী নিরাপত্তার সহিত বাস করিতে পারে না।

উপরে যে তিনটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইল ইহা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের ভিত্তিতে দররুল মুখতারের রচয়িতা নির্ধারণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ এবং আবু ইউসুফ বলেন, যে দেশে হদ্দ বা প্রতিশোধ নাই এবং যে দেশের আইন ইসলামসম্মত নয় সেই দেশকেই দারুল হরব বলা উচিত। যে দেশের মুসলিমদের জন্য মুসলিম আইন এবং অমুসলিমদের জন্য অমুসলিম আইন সে দেশকে দারুল ইসলাম বলিতে কোন বাধা নাই। যদি কোন দারুল ইসলাম অমুসলিমগণ জয় করিয়া লইয়া দারুল হরবে পরিণত করে তবে সেই দেশের অমুসলিমদের প্রতি কাজে মুসলিমগণ বিরোধিতা করিবেন। যে দেশে ইসলামী আইন প্রচলন করা যায়, তাহা এক সময়ে দারুল হরব হইলেও, এই অধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দারুল ইসলাম বলা যায়।

একটি দেশকে দারুল হরব বলিব না দারুল ইসলাম বলিব ইহা নির্ধারণ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে ঐ দেশে জুমার নামাযের বৈধতা। কি অবস্থায় জুমার নামায আদায় করা যায়? যে শহরে ইসলামী আইন পরিচালনা করিবার জন্য এবং ইসলামী শাস্তির আদেশ, হদ্দ প্রভৃতি দিবার জন্য প্রশাসক বা কাজী আছেন শুধুমাত্র সেই শহরে জুমার নামায আদায় করা যায়। হেদায়ার লেখক বলেন, ইহাই সর্ববাদীসম্মত মত। জুমার নামায বৈধ হইবার জন্য ইমাম আবু হানিফা তিনটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত ঐ শহরে রাস্তাঘাট এবং বাজার থাকিবে, দ্বিতীয়ত ঐ শহরে অন্যায়ের প্রতিকার এবং আইনের শাসন প্রবর্তন করিবার জন্য একজন প্রশাসক থাকিবেন এবং তৃতীয়ত শরীয়তের সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ দেশে আলেম থাকিবেন। জুমার নামায সিদ্ধ হইবার জন্য আরেকটি শর্ত প্রতিপালন করিতে হয়। জুমার নামায সুলতান বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে হইতে হইবে। অমুসলিম যদি মুসলিম রাষ্ট্রকে জয় করিয়া লইয়া মুসলিম প্রশাসক নিয়োগ করেন তবে সেই মুসলিম প্রশাসক জুমার নামাযের আদেশ দিতে পারেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সুলতান যদি কোন অমুসলিমকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন তবে সেই স্থানেও জুমার নামায আদায় সিদ্ধ হইবে। ঐ অবস্থায় মুসলিমগণ সুলতানের নিকট মুসলিম প্রশাসক নিয়োগ দাবী করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

ইসলামের আইন কার্যকরী না থাকিলেও কোন দেশে যদি ইসলামী আইন প্রবর্তন এবং প্রচলনের পথে কোন বাধা না থাকে, তবে সেই দেশে জুমার নামায আদায় করা যায়। যে দেশে জুমার নামায আদায় করিতে গেলে মুসল্লিগণ জুলুমের বা অপমানের সম্মুখীন হইবার আশংকার মধ্যে থাকেন না, সেই দেশে জুমার নামায আদায় করা যায়।

বিদেশে নাগরিকের কর্তব্য

ইসলামী আইনে সাধারণত দুইটি দিক রহিয়াছে। ইহার একটি হইতেছে ইহলৌকিক এবং অপরটি হইতেছে পারলৌকিক। যে সমস্ত আইন ইহ-লৌকিক ব্যাপারকে স্পর্শ করে, সেই সমস্ত আইন যাহাতে কার্যকর এবং বলবৎ হয় তাহা দেশের আদালত তত্ত্বাবধান করে। যে সমস্ত আইন পরলোকের সহিত সম্পৃক্ত তাহার প্রতিপালনের ভার মুসলিমের ব্যক্তিগত বিবেকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তাহার নিজের এলাকার মধ্যেই শুধু ইসলামী আইন বলবৎ করিতে পারেন। তাহার দেশের বাহিরে যে সমস্ত মুসলিম অবস্থান করেন, তাহাদের উপর তিনি স্বাভাবিক কারণেই তাহার প্রশাসনের হস্ত প্রসারিত করিতে পারেন না। তবে দ্বীন ইসলামের বিধি-নিষেধ সকল মুসলিমের জন্য প্রতিপাল্য। অমুস-লিম রাষ্ট্রে যে মুসলিম বাস করেন তাহার জন্যও দ্বীন ইসলামের বিধি প্রতিপাল্য। কোন মুসলিম তাহার অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান কালে যদি ইসলামী আইন স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করেন তবে তিনি গুনাহগার হন। তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে অমুসলিম রাষ্ট্রে তাহার শরীরের এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নাই এবং সেখানে তাহার ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালন করা সম্ভব নয় তবে তাহার পক্ষে ঐ দেশ ত্যাগ করাই বান্ছনীয় হইবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের সরকার যদি তাহার সম্পত্তি ভোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা অন্য কোনভাবে তাহার বা তাহার সন্তানগণের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করে, তবে তিনি ঐ স্থানের অমুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির উপর আঘাত করিবার অধিকার পাইবেন। তিনি যখন অমুসলিম রাষ্ট্রে বাস করিতে যান তখন তাহাকে বাধা দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট হয় রাষ্ট্র তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই দেশে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিল। সেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐ দেশে বসবাস করিতে-ছিলেন। অতঃপর তাহার উপর অত্যাচার হইলে ধরিয়া লওয়া যায় যে ঐ

www.pathagar.com

রাষ্ট্র তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবার অধিকার ইসলামী আইন সকল মুসলিমকে দিয়াছে। কিন্তু অবস্থা যদি এইরূপ না হয় এবং তিনি ঐ দেশে শান্তিতে এবং নিরুপদ্রবে বাস করিতে থাকেন তবে ঐ দেশের রাষ্ট্রের বা জনগণের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তিনি রাখেন না। তাহার হস্তক্ষেপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া গণ্য করা যায়। বিশ্বাসঘাতকতাকে ইসলামী আইন কোন দিন প্রশ্রয় দেয় না।

www.pathagar.com

কতিপয় আরবী শব্দ এবং অভিব্যক্তির বাংলা ব্যাখ্যা

Ada—আদায়, দেনা পরিশোধ করা, দায়িত্ব প্রতিপালন করা

Adabu'l-Qadi—কার্যবিধি

'Adadiyat—সংখ্যার হিসাবে বিক্রীত দ্রব্য

'Adalat—চারিত্রিক ন্যায়পরতা

'Adat—প্রথা

'Adhab—আযাব ; পারলৌকিক শাস্তি

Adil—চরিত্রবান ব্যক্তি, পুণ্যবান, নিরপেক্ষ

Af'al—কাজ, অভ্যাস

Af'alu'l-jawarih—শারীরিক কর্ম

Af'alu'l-qalb—মানসিক কর্ম

Ahad—একব্যক্তি বর্ণিত হাদীস

Ahlaf—প্রতিশ্রুত শত্রু

Ahliyat—আইনগত যোগ্যতা

Ahliatu'l-wajub—অধিকার এবং দায়ধারণের যোগ্যতা

Ahlatu'l ada'—অধিকার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা

Ahlu's-Sunnat wa'l-Jama'at—নিষ্ঠাবান উপসম্প্রদায় অথবা সুন্নী

Ahlu'l-hawa—মেজাজী এবং অভিলাষী ব্যক্তি

Aiyyun—যে কেহ

Akhbar—সংবাদ অথবা খবর অথবা বিবরণ

Akhbarana—আমাদেরকে খবর দিল

Akhbarat—সংবাদসমূহ,

Akilas—গোত্র, সেনাদল

A'lal—কারণসমূহ

'Alam—নামবাচক বিশেষ্য

'Alamat—চিহ্ন

Al'am'ru bil yadi—অন্যের উপর ন্যস্ত কাজ, স্ত্রীর উপর স্বামীর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ

www.pathagar.com

Al-ashyau'l-mubahatu'l 'umumiah—সকলের সাধারণ ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি

Al-fa – তখন, তৎকালে, অতঃপর, তৎকালীন

Al'ikhtiar—স্ত্রীর উপর অর্পিত তালাক দেওয়ার ক্ষমতা, এলাকা

'Alim – আইনজ্ঞ, আইনবিদ

Al-itlaf mubasharatun—অন্য কোন কারণ ব্যতীত অপর ব্যক্তির কার্যে ক্ষতিসাধন

Al-itlaf tasabbuban—দুই বা ততোধিক কারণে উদ্ভূত ক্ষতি

Al'-mashi'at – তোমার ইচ্ছায় তালাক, স্ত্রীর উপর অর্পিত তালাক দেওয়ার ক্ষমতা

'Am-–সাধারণ অর্থে শব্দসমূহ

'Ami—অপেশাদার লোক, যে বিশেষজ্ঞ নয়

Amanat—আমানত, ন্যস্ত দ্রব্য

Amin—সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক

Anbiya—আম্বীয়াগণ, নবীগণ, প্রেরিত পুরুষেরা

Aqar—ভূ-সম্পত্তি

'Aqd—চুক্তি

'Ariyat—সুবিধাজনক ধার

Arkan—কাজের আবশ্যকীয় উপাদান

'Asba –অবশিষ্টাংশ

Ashab—সাহাবাগণ,

Ashabu'l-fara'id—সম্পত্তির নির্দিষ্ট শরীক ব্যক্তিগণ, আল কুরআনে নির্দিষ্ট শরীকগণ

Ashabu't-takhrij—প্রামাণিক গ্রন্থ বা মত হইতে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সন্দেহ ব্যাখ্যায় নিয়োজিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ

Ashabut-tarijh—প্রামাণিক গ্রন্থ বা মতে বিবাদ বা দ্বন্দ্ব সমাধান করার জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি

Ashabu't-tashih – আইনের কোন বিশেষ বিবরণের প্রামাণ্যতা বা দুর্বলতা সম্বন্ধে অভিমত দিবার যোগ্য ব্যক্তি

Asl—মূল, আইনের প্রামাণিক গ্রন্থ বা মত

www.pathagar.com

Asnad—হাদীসের প্রামাণিক উক্তি বা ব্যাখ্যা
As siasat ush shara'i—ফৌজদারী আইন, অপরাধ শাস্ত্রবিধি
As-Siyar—জিহাদ, সংবিধানিক ও প্রশাসন আইন
At-Tauwaliya—ব্যয়ের মূল্যে বিক্রয়
'Aul—ক্রমবর্ধমান মতবাদ
'Awarid—পরিস্থিতি
Ayat—স্তবক, চিহ্ন
'Ayb—ত্রুটি, দোষ, অভাব
'Ayn—নির্দিষ্ট অথবা সীমাবদ্ধ সম্পত্তি
'Azimat ঠিক, নির্ভুল অথবা অপরিবর্তনীয় আইন
Bada't—পুঁজি, মূলধন, রাজধানী
Badihi—স্বতঃস্ফূর্ত বা অনুভূতি জ্ঞান
Badl—শব্দের প্রতিকল্প ব্যবহার
Bai'—অর্থলাভের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়
Baitu'l-mal—বায়তুল মাল, কোষাগার, রাজকোষ
Bai'ul-wafa—শর্তসাপেক্ষে বা শর্তাধীন বিক্রয়ে বন্ধক
Batil—বাতিল
Batin—আভ্যন্তরিক, অন্তঃদহ
Bayan—অপরিবর্তনীয় তালাক
Bayanu'dh-dharurat—প্রয়োজন ব্যাখ্যা, প্রতিবন্ধ
Bayyanat—সাক্ষ্য, প্রমাণ
Bidat—পরিবর্তিত প্রথা, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে মত
Dabt—ধারণের ক্ষমতা
Dahriatun—নাস্তিক, অবিশ্বাসী
Dakhil নতুন গোত্রে যোগদানকারী ব্যক্তি
Dalalatan—ভাষার ভাবার্থ, ভাষায় বিজড়িত করণ
Dararun fahlshun—সুস্পষ্ট এবং গুরুতর ক্ষতি
Daru'l harb—যুদ্ধ এলাকা, শত্রুভাবাপন্ন বা যুদ্ধপ্রিয় রাষ্ট্র, বিদেশী রাষ্ট্র
Daru'l Islam—নিরাপদ এলাকা, বন্ধু রাষ্ট্র
Daruri—প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

Dawa'—দাবী।
Dayn'—অনির্দিষ্ট সম্পত্তি
Dhahni—মানসিক
Dhawi'l-arham—দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়
Dhimma—আইনগত ক্ষমতা
Dhimmi—জিম্মী, মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা
Diyat—ক্ষতিপূরণ
Dhu'l-yad—অধিকারী, সম্পত্তি দখলকারী ব্যক্তি
Faa'lia—চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি সম্পর্কীয়
Falasifata—দার্শনিকগণ
Faqih—আইনজ্ঞ
Fard—বাধ্যতামূলক
Fasid—বাতিলকৃত, অসিদ্ধ করণ
Fasiq—ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা লংঘনকারী
Faskh—অপরিবর্তন, লোপসাধন, রদকরণ
Fiqh—ফিকাহ্ শাস্ত্র, জড় বা পার্থিব আইনের বিজ্ঞান
Fiqhu'l-Akbar—বিখ্যাত ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান
Furdun kifayatun—সম্প্রদায়ের বা লোক সমাজের অবশ্যপাল্য দায়িত্ব
Furqat—বিচ্ছেদ, তালাক
Fusukhat—চুক্তি বাতিল বা রদকরণের কাজ
Ghairu-maljiin—অদমনীয়, অবাধ্য
Ghairu mustabinin—বোধগম্য বা স্থায়ী আকার ব্যতীত রচনা-সমূহ
Ghasab—অন্যায়রূপে অধিকার
Ghasib—অন্যায়রূপে অধিকারী, অনধিকার প্রবেশকারী
Ghayia—চুক্তিতে ফলাফল সম্পর্কীয়
Ghurur—ধোকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা
Hadd—এক ধরনের শাস্তি
Hadith—হাদীস
Haddathana—এইরূপে আমাদের নিকট বর্ণিত

www.pathagar.com

Haiwanat—প্রাণী
Hajj—হজ্জ
Hakim—হাকিম, বিচারক, আইনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী
Halal—হালাল, উপযুক্ত, উচিত
Haq—হক, অধিকার
Haqiqi—প্রাথমিক অর্থে শব্দসমূহ
Haqqu'l-marur—রাস্তার অধিকার
Haqqu,l-majra—পানির ধারার অধিকার
Haqqu,l-masil—অন্যের জমির উপর পানি পরিবহনের অধিকার
Haqqun qaimun bi nafsihi—নিজ হইতে উদ্ভূত অধিকার
Hara bi—আইনের পরিপন্থী
Haram—নিষিদ্ধ কাজ
Hatim—শপথ পরিচালনার স্থান
Hawalat—নবায়ন
Hazl—পরিহাস, বিদ্রূপ
Hiba—দান, উপহার
Hiba bi Sharti'l-iwad—বিনিময়ের শর্তে দান
Hiba bil-'iwad—বিনিময় গ্রহণে দান
Hikmat, maslahat—আইনের কার্যধারা
Hissi—স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কাজ
Hizanat—অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধায়কত্ব
Hujub—বর্জন করার মতবাদ
Hukm—হুকুম, আদেশ, আইন
Hukmi—প্রতীকরূপে দখল
Hurmat—বিচ্ছেদ বা তালাক দেওয়ার অধিকার
Hasanun—সৎকাজ
'Ibadat—উপাসনা
Ibahat—অনুমোদন
'Ibaratun—মূল গ্রন্থের ভাষা দ্বারা
'Iddat—ইদ্দত

www.pathagar.com

Ihraz—হস্তগত, মূল অর্জিত সম্পত্তি
Ihsan—আইনত বা বৈধভাবে বিবাহিত
Ii'tai mislihi—একই ধরনের দ্রব্য দেওয়া
Ijab—প্রস্তাব
Ijara - ইজারা, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া
Ijma—ঐকমত্য
Ijtihad—আইনের ব্যাখ্যা
Ikhtiar - ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প, মনন
Ikrah বলপূর্বক অবরোধ
Ila'—ইলা, এক প্রকারের তালাক দেওয়া
Ilham—প্রেরণা, ইলহাম
''Illat—ফলোৎপাদক কারণ বা হেতু
'Ilmu'l—Faru' আইনের ব্যবহারিক বিজ্ঞান
'Ilmu'l-Usul—ব্যবহারতত্ত্ব, আইন বিজ্ঞান
'Ilmu't tamaniyata—একের মনে সন্তুষ্টি জ্ঞান
'Ilmu'l-yaqin - নিশ্চিত জ্ঞান
Iman—বিশ্বাস, ঈমান
Insha'—মৌলিক কার্যাবলী
Iqala—সম্মতির রদকরণ
Iqrar—পিতৃত্বের স্বীকৃতি, বিশ্বাসের ঘোষণা
Iradat ইচ্ছা
Irsh—ক্ষতিপূরণ
I'sawiatun - হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী বা অনুগামী
Isharat—ইশারা বা চিহ্ন
Isharatun—অন্তর্নিহিত অর্থ, মৌলিক অর্থের তাৎপর্য
Islam—ইসলাম ধর্ম
Isqatat—অধিকার বিলোপের কাজসমূহ
Istilal—শাফিঈ ও মালিকী মতে আইনের একপ্রকার উৎস ব্যাখ্যার
এক প্রকার পদ্ধতি
Istihsan—ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নিরপেক্ষতা বা ন্যায়পরতা
Istishab-ul-hal—সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি হইতে অনুমান

www.pathagar.com

Istisana—এক প্রকারের বিক্রয়
Istishabu'l-hal—ধারাবাহিকতার অনুমান
I'tiqadat—বিশ্বাস বা ঈমানের কাজসমূহ
Ithbatat—সৃজনশীল কাজসমূহ, সৃষ্টিধর্মী কাজসমূহ
Jahl—অজ্ঞতা
Jama' munakkar—অনির্ধারিত বহুবচন
Jami'—তাহাদের সবাই
Jama't—সম্প্রদায়, জামাত
Janayat—ব্যক্তিগত অপকার
Jarh—প্রতিবাদ
Jihad—ধর্মযুদ্ধ
Jiziya—ব্যক্তির উপর ধার্য কর, জিজিয়া
Juz—একটি অংশ
Kaffarat—অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব অপালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, কাফ্ফারা
Kafir—অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ
Khafi—দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট
Kamilatun—পরিপূর্ণ শাস্তি
Khula'—স্ত্রীর উপর অর্পিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করার বা তালাক দেওয়ার ক্ষমতা
Khalf—প্রতিকল্প, বিনিময় কৃত
Khilafat—খিলাফত, উত্তরাধিকার
Khamr—আঙুর রসের এক ধরনের মাদক দ্রব্য
Khas—বিশেষ শব্দ
Khasm—বিরোধী, বিপক্ষ
Khata—ভুল, ত্রুটি, দুর্ঘটনা
Khariji—খারিজী, বহিরাগত
Khayaru'l-bulugh—সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর প্রদত্ত মনোনয়ন বা ইচ্ছা
Khayaru'l-'aib—দোষ বা ত্রুটি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন
Khayarur-ruyat—দেখিবার ইচ্ছা
Khayarush-shart—বিক্রয়ের জন্য চুক্তি করার ইচ্ছা

www.pathagar.com

Khayaru't-taghrir—প্রতারণার জন্য কাজ কারবার রদ করার ইচ্ছা
Kafalat—জামিনদারী, জামানদারী
Khiraj—এক ধরনের ভূমি-কর
Khitab—আল্লাহর নিকট হইতে বাণী
Khula'—স্ত্রীর উপর অর্পিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা
Kinaya—পরোক্ষভাবে উল্লেখিত শব্দসমূহ
Kitabat—রচনাবলী
Kull—সবাই, সকলে
Lia'n—স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ
La muthbatun—যাহা প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণ করা যায় না
Lazim—কাজ-কারবারে বাধ্যতামূলক
Lazimuhu'l-mutakhkhar—গ্রন্থে শব্দ ব্যবহারের জন্য যাহা ভাবার্থ
Ma—যাহা
Maa'si'at—অপরাধ
Mabia'—বিক্রীত জিনিস
Mad'dia—মূল সম্পর্কীয় বা দৈর্ঘ্যের মাপ
Mahru'at—সরল মাপে বা দৈর্ঘ্যের মাপে হিসাব করা বস্তু
Mafhum—শব্দের ভাবার্থ
Mahal—কাজে সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু
Mahkum' alaihi—যাহাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হয়, ব্যক্তি
Mahkum bihi—আইনের উদ্দেশ্য, কাজসমূহ
Mahr—দেনমোহর
Mahru'l-mithl—বিশেষ বা উপযুক্ত দেনমোহর
Ma'hud—বিশেষ বা নির্দিষ্ট বিশেষ্য
Majaz—মধ্যম শব্দ
Majhul unnusah—এক ব্যক্তির অজ্ঞাত পিতৃত্ব
Majnun—পাগল, বিকৃত মস্তিষ্ক
Makilat—ধারণ ক্ষমতার মাপে বিক্রীত বস্তু
Makruh—নিন্দিত বা অনুপযুক্ত কাজ, মকরূহ

www.pathagar.com

Makruhun kirahata tahrimin—মাকরুহ তাহরিমা, যে নিন্দিত কাজ হারামের কাছাকাছি

Makruhun kirahata tanzihin—মকরুহ তানজিহি, যে নিন্দিত কাজ হালালের কাছাকাছি

Mal—সম্পত্তি, মালপত্র
Maljiun—বল প্রয়োগ, বাধ্যতা
Malik—মালিক
Ma'na—শব্দের অর্থ
Mandub ; mustahab, nafi—অতিরিক্ত কিন্তু নিন্দিত কাজ
Manfaat—সম্পত্তির আয়, মুনাফা
Manqul—অস্থাবর সম্পত্তি
Ma'ruf—সুবিদিত, বিখ্যাত
Masalihu'l-mursala wa'l-istislah-জনকল্যাণে সাধারণ বিবেচনা
Mashhur—সুবিদিত, বিখ্যাত হাদীস
Matuh—মূর্খ ব্যক্তি, বোকা
Maudu' lahu—কোন কিছুর মৌলিক প্রয়োগ দ্বারা শব্দের ভাবার্থ
Mauzunat—ওজন দ্বারা বিক্রীত দ্রব্য
Mawat—পতিত জমি, অনুর্বর জমি
Mawla mawalat—চুক্তি দ্বারা উত্তরাধিকার
Milku'l-yad—দখলের অধিকার
Milku'l-raqba—সম্পত্তির অধিকার
Milku't-tasarruf—হস্তান্তরিত করণের অধিকার
Mithaq i-azali—প্রাথমিক বা মূল চুক্তিপত্র
Mithli—সদৃশ্য, তুল্য
Mithlun ma'aqulun—বোধগম্য বা স্পষ্ট তুল্য
Modariba—একজনের পুঁজি এবং অন্যের দক্ষতা ও শ্রমে অংশীদারিত্ব
Mau'jjal—চাহিবামাত্র দেয় দেনমোহর
Muajjal—স্থগিত দেনমোহর
Mu'allal—বিস্তারিত কারণে ভিত্তি করিয়া
Mu'amilat—দুনিয়াবি কাজকারবার, মানুষের মধ্যে লেন-দেন, বিক্রয় শর্তে বন্ধক

www.pathagar.com

Mu'airaf- নির্ধারিত বহুবচন
Mu'aththir—প্রামাণিক,প্রামাণ্য, বিশ্বাসযোগ্য
Mubah- অনুমোদনীয় কাজ
Mubarat —পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিচ্ছেদ
Mudda'a' laihi—বিবাদী
Muflis—দেউলিয়া, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি
Mudda'i বাদী, দাবীদার
Mufassar—সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট অর্থ
Muhaqala—গাছে থাকাবস্থায় গম বিক্রয় বা গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ বিক্রয়
Muharim—স্থায়ীভাবে বিবাহে নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ
Muhkam —অপরিবর্তনীয় ভাবার্থে শব্দ
Mujlis—সভা, মজলিশ
Mujmal—অস্পষ্ট
Mujtahid—ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি
Mujtahidun fi'l-Madhhab —কোন বিশেষ মতবাদে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবহার-শাস্ত্রবিদগণ
Mujtahidun fi,l-Masal—আইনের অমীমাংসিত প্রশ্নে ব্যাখ্যা দানের উপযুক্ত ব্যবহার শাস্ত্রবিদ
Mujtahidun fi'sh-Shari'—আইনের মতবাদ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ
Mujtahidunu,l-Futiya,—আইনের কোন বিশেষ মতবাদে অনুসারী ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ
Mujtahidu'l-Madhhab— মযহাবী ব্যবহারশাস্ত্রবিদ
Mujtahidunu'l-Muqayyid—সীমিত ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যব্যহার শাস্ত্রবিদগণ
Mujtahidunu'l-Mutlaq—ব্যাখ্যাদানে সম্পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ
Mukatab—কতিপয় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের অধিকারী দাসেরা
Mukhabara—এক প্রকারের ইজারা
Mula'im—সঠিক কারণ

www.pathagar.com

Munabadha - এক প্রকারের বিক্রয়
Munakahat—গৃহ সম্বন্ধীয় আইন
Muna'qad—কাজে স্থাপিত বা গঠনকৃত
Muqa'ida—বিনিময়
Muqallids—অনুগামী, অনুসারী
Murabaha—আবশ্যকীয় মূল্যে এবং নির্ধারিত লাভে বিক্রয়
Mursal—অসংগত বা সামঞ্জস্যহীন হাদীস
Musa lahu—যাহার অনুকূলে উইল করা হইয়াছে
Musaqat—বৃক্ষের উপর অংশীদারী
Musawama—দর কষাকষি করিয়া বিক্রয়
Musha'—অগ্র-ক্রয়, অন্যের পূর্বে ক্রয়ের অধিকার
Mushtarak—ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারণ শব্দ
Musi—যে ব্যক্তি উইল করিয়া মারা যায়
Muslahat—জনকল্যাণের নীতি
Mustabinun ghairu marsumin—সহজপাঠ্য রচনা যাহা প্রচলিত পদ্ধতিতে লিখিত নহে
Mustabinun mursumun—প্রচলিত প্রথানুযায়ী সহজপাঠ্য রচনা
Muta't—সমাজে বিবাহ করার অধিকার, স্ত্রীকে দেওয়া উপহার, অস্থায়ী বিবাহ
Mutawatir—সার্বজনীন সাক্ষ্যে প্রমাণিত
Mutlaq—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ
Mutwalli—মুতাওয়াল্লী, ওয়াকফ্ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক
Nahi—নিষিদ্ধকারী আইন
Najisun bi a 'inihi—অপরিষ্কার, ময়লা
Nafid—ফলপ্রদ, কাজ চালাইবার শক্তিসম্পন্ন
Nafs—ব্যক্তি, প্রাণ
Najub—স্বত্বগ্রাহ্য
Nafsu'l—বাধ্য বাধকতা
Nakara—অনির্ধারিত
Naql—বদলী
Naskhu'l-qira'at—কুরআনের শব্দের রদ, বাতিল বা নিরসন

www.pathagar.com

Naskhu'l-hukm—কুরআনের আইনের রদ
Nass—মূল গ্রন্থসমূহ, মূল পাঠসমূহ
Nazm—কুরআনের শব্দসমূহ
Nikah—বিবাহ
Niyat—উদ্দেশ্য
Nuqud—টাকা
Qabda—দখল
Qabul—কবুল, গ্রহণ করিতে স্বীকৃতি
Qada'—আইনের প্রতি বাধ্যবাধকতায় অনির্ধারিত কার্যমূল্যি
Qadi—বিচারক
Qaran—কাল
Qard—ধার, ঋণ, কর্জ
Qasd—ইচ্ছা
Qasiratun—অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিবিশিষ্ট শাস্তি
Qata'i—সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীত গ্রন্থ বা পাঠ
Qaul—শব্দে প্রকাশ
Qawd—প্রতিশোধ, প্রতিদান
Qimi—বৈসাদৃশ্য
Qisa's—প্রতিশোধ, প্রতিদান
Qismat—বন্টন
Qiyas—সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমান, সাদৃশ্যবোধক সিদ্ধান্ত
Qubhun—কুকর্ম, খারাপ কাজ
Qur'an—কুরআন শরীফ
Qurbat—আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী
Radd—পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া. প্রতিদান, পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ।
Rafu'u'l-yadain—নামাযের সময় কানের পাশে হাত তোলা
Rahn—বন্ধক. রেহেন
Raja'i—বাতিলযোগ্য বা রদযোগ্য তালাক
Raqaba—একজন ক্রীতদাস
Rasul—আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, রসূল
Riba'—অতিরিরিক্ত সুদে ঋণদান, অবৈধ সুদ

www.pathagar.com

Rida—সম্মতি
Rubbu'l-mal—পুঁজির মালিক
Rukhsat—পরিশুদ্ধ
Rukn—প্রয়োজনীয়, উপাদান.সম্বন্ধীয়
Ruqba—মৃত্যু হইবার চিন্তায় দান
Sabab—পূর্ববর্তী বা প্রাথমিক কারণ
Safih—দুর্বল চিত্তের লোক
Saghir—নাবালক
Sahibu'l-bid'at—নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী
Sahih—শুদ্ধ, বৈধ
Salam—অগ্রীম মূল্য পরিশোধভিত্তিতে এক ধরনের বিক্রয়
Salat—সালাত, উপাসনা, নামায
Samawi—দৈব পরিস্থিতি
Sarf—স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ বা রৌপ্য বিক্রয়, মুদ্রা বিনিময়
Sarih—সাধারণ শব্দ
Sariq—চোর
Saum—রোযা, উপবাস
Sayd—খেলাধুলা
Shahadat -মৌখিক প্রমাণ
Shahadut ala shahadut—প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য
Shara'—আইন-বিধি, পথ
Shari'at—শরীয়ত, ধর্মীয় আইনের সারগ্রন্থ
Shara'i—ব্যবহার শাস্ত্রের কাজ
Shauq - কোন বস্তুর জন্য ইচ্ছা করা
Shayyun—দ্রব্য, সামগ্রী, জিনিস
Shirkatu'l-milk—দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অবিভক্ত সম্পত্তির মালিকানা
Shirkatu'l-aqd—চুক্তিতে অংশীদারত্ব
Shirkatu'l-mufadat—সমতার ভিত্তিতে অংশীদারী
Shirkatu'l-mufadat—অসম অংশীদারী

www.pathagar.com

Shirkatu'l-anan —পুঁজির বা মূলধনের অংশীদারত্ব
Shirkatu'l-amwal অংশীদারত্বে জমা
Shirkatu'l amal—অংশীদারীর শ্রম
Shirkatu'l-wajuh—অংশীদারীর জমা
Shubhat'ul-fail—কোন কাজের উপর সন্দেহ বা ভুল হওয়া
Shubhatu'l-mahal – কোন বিষয়ে আইন প্রয়োগ সন্দেহ বা ভুল হওয়া

Sibr বর্জন
Sifat—গৌণ বিশেষ্য
Sigha—ব্যাকরণ সংক্রান্ত বা ব্যাকরণ সিদ্ধ প্রকার
Shighar দেনমোহর হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক ধরনের বিবাহ
Silat– উদারপ্রকৃতির দায়গ্রহণ
Suaria চুক্তি সম্পাদনে বহিঃসম্পর্কীয় কোন কিছু
Sunnat—হাদীস, রসূলুল্লাহর কার্যাবলী
Suras—কুরআনের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ
Ta'amul—প্রথা, প্রচলিত রীতি
Taba'taba'In—সাহাবীদের উত্তরসূরীদের উত্তরসূরী
Tafsir—কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
Tafwid—প্রতিনিধি নিয়োগ, অন্যের উপর কার্যভার অর্পণ
Tagarir_প্রতারণা, প্রবঞ্চনা
Tahayyu—ব্যবস্থা. পরিকল্পনা, প্রয়োজন
Tahkim–মধ্যস্থতা, শালিসী
Tahili—পূর্ব স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহের পূর্বে বর্তমান স্বামীর সহিত যৌনমিলন
Tassin—যাহা সংগত বা নির্ভুল
Tayammum—তায়াম্মুম
Takhsis—সাধারণ উক্তি বা প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টকরণ
Taklifi – দমন, নিয়ন্ত্রণ বা শাসন ; আইনের সংজ্ঞা
Talabu'l-muwathibat—অগ্রক্রয়কারীর দাবীর প্রথম উক্তি

www.pathagar.com

Talabu't-taqrir wal-isahad—জমির বিক্রয়কারী বা বিক্রেতার ঘটনাস্থলে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে অগ্রক্রয়কারীর উক্তি

Ta'abul-khusumat —আদালতে অগ্রক্রয় অধিকারের বলবৎকরণ বা কার্যকরীকরণ

Talafi nuqsan—ক্ষতি বা অনিষ্ট, মূল্যের অবনতি বা কমতি

Talaq —স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ

Ta'lil —কারণভিত্তিক যুক্তি

Ta'n নিন্দা, তিরস্কার, অভিযোগ

Tanbibu'l-qalb—হৃদয়ের অথবা বিবেকের অনুপ্রেরণা

Tanfid—প্রাণদণ্ড

Taqlid—অন্যের মতামত উহার প্রামাণিকতা ব্যতীত অনুসরণ করা

Taqrir—অর্থ নির্ণয়

Tarijihu'l-bayy'inat - প্রমাণের অগ্রাধিকার

Tark—ত্রুটি

Tasarrufat—কর্মশক্তি বা ইচ্ছার ব্যয়, স্বেচ্ছামূলক কাজসমূহ

Tasarrufat'us h-shari - আইনগত কার্যাবলী

Tasdiq—আমাদের কাজে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার স্বীকৃতি

Tawatur—সার্বজনীন প্রমাণ

Ta'zir - শাস্তি সম্পর্কীয় মতবাদ

Tazwij —বিবাহ

Thaman—পারিশ্রমিক, মূল্য

Thanawiyatun – দুই স্রষ্টায় যাহারা বিশ্বাসী, পারসিক পুরোহিত-মণ্ডলী সংক্রান্ত

Thayyiba —যে মেয়ে যৌনমিলন করিয়াছে

Thawab—আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বা পুরস্কার, সওয়াব

Tuhr - পবিত্রতার কাল

Turk't-tarwa—অবহেলা

Uf' —রাগ বা অবমাননার উক্তি

Ummatu'd-Da'wat —নূতন প্রথা প্রবর্তনকারী, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী

www.pathagar.com

'Uqubat—শাস্তি
'Urbun—অনুমোদনক্রমে এক ধরনের বিক্রয়
'Urf—রীতি, প্রথা
'U'rud মালামাল
'Ushr—জমির উপর ধার্য কর, পূর্বে শুধুমাত্র অমুসলিমদের উপর আরোপিত এক ধরনের ভূমি কর
Usulu'l fiqh—আইন বিজ্ঞান
Vakalat—প্রতিনিধিত্ব
Wadi'—আবশ্যকীয় মূল্যের তুলনায় কম মূল্যে বিক্রয়
Wadai'—ঘোষিত আইন
Wadiyat—জমা, আমানত
Wahi—আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত বাণী, প্রত্যাদেশ
Wajubu'l-ada—কোন কিছু করার জন্য বাধ্যবাধকতা
Wasi—মৃতব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক
Wasiyat—উইল বা ইচ্ছাপত্র
Waqi'at—মোকাদ্দমাসমূহ
Wathniyatun পুতুল উপাসক
Wilayat—অভিভাবকত্বের অধিকার
Wirathat—উত্তরাধিকারের অধিকার
Wajub বাধ্যবাধকতা
Yad—দখল
Yahi—অনুর্বর জমির পুনরুদ্ধার
Yaqini—কতিপয় প্রমাণ
Zahir—সুস্পষ্ট, অর্থপূর্ণ
Zahiru'l-hal—বাহ্যিক পরিস্থিতি
Zahirun—প্রকাশ্যে
Zaujiat—বিবাহ-সংক্রান্ত অধিকার
Zanni—আনুমানিক
Zakat—যাকাত
Zihar—জিহার নিষিদ্ধ আত্মীয়ার পৃষ্ঠের সহিত স্ত্রীর তুলনা।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

স্যার আবদুর রহিম নিম্নবর্ণিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন :

١ ـ الاشباح و النطا ئر

٢ ـ الديات البينات

٣ ـ الحاوى

۴ ـ الجامع الكبير

۵ ـ الجامع الصغير

٦ ـ الكافى

٧ ـ الخلاصة

٨ ـ المبسوط

٩ ـ المجلة

١٠ ـ المجمه

١١ ـ المنار

١٢ ـ المنخول

١٣ ـ المحرر

١۴ ـ المحيط

١۵ ـ المختار

١٦ ـ التقرير و التحرير

١٧ ـ الاصول مع كشف الاسرار

١٨ ـ الواجز

١٩ ـ الواقعات

٢٠ ـ الذخيرة

٢١ ـ النهر

٢٢ ـ السير الكبير

٢٣ ـ السير الصغير

٢۴ ـ التفسير الكبير

٢۵ ـ الزيادة

٢٦ ـ بحرالرائق

٢٧ ـ در المختار

٢٨ ـ درر الباحية

٢٩ ـ فتوى عالمگيرى

٣٠ ـ فتوى رشيد الدين

٣١ ـ فتح الجليل

٣٢ ـ فتح القدير

٣٣ ـ الهاروذيات

٣۴ ـ هداية

٣۵ ـ ابن خلدون

٣٦ ـ عناية

www.pathagar.com

٣٧ ـ جامع الفتوى
٣٨ ـ جامع الصغير
٣٩ ـ جمع الجوامع
٤٠ ـ جرجانيات
٤١ ـ كنز
٤٢ ـ كشف الغمه
٤٣ ـ كشف الاسرار
٤٤ ـ كشاف فى اصطلاح الفنون
٤٥ ـ خزانة المفتائن
٤٦ ـ كفايه
٤٧ ـ كسانيات
٤٨ ـ مجموع النوازل
٤٩ ـ مختصر
٥٠ ـ مسند امام حنبل
٥١ ـ مسلم الثبوت
٥٢ ـ نيل المعارب
٥٣ ـ نقاية
٥٤ ـ نور الانوار
٥٥ ـ قدورى
٥٦ ـ قران
٥٧ ـ قسطلانى
٥٨ ـ قناعة
٥٩ ـ رد المحتار
٦٠ ـ روضة النادية
٦١ ـ روقيات
٦٢ ـ صحيح البخارى
٦٣ ـ صحيح المسلم
٦٤ ـ شرح الوقايه
٦٥ ـ تفسير احمدى
٦٦ ـ تفسير جلالين
٦٧ ـ تفسير كشاف
٦٨ ـ تلويح
٦٩ ـ تفسير المدارك
٧٠ ـ توضيح
٧١ ـ تحفة المحتاج

www.pathagar.com

বিষয়সূচী

অ

অংশীদারী—১

অধিকার—১৫৮-১৬৩

—হকুকুল্লাহ—১৫৮

—হক্কুল এবাদ—১৫৮

—গণ অধিকার—১৫৯

—ব্যক্তিগত অধিকার—১৫৯

—কামিল উকুবাত—১৬০

—কাসির উকুবাত—১৬০

—অনির্ভর অধিকার—১৬১

—নির্ভর অধিকার—১৬১

—খালফ—১৬১

—নাফস—১৬২

—হুরমত—১৬২

—মিলক—১৬২

—জাউজিয়াত—১৬২

—বিলায়াত—১৬২

—খিলাফত—১৬২

—মিরাসের অধিকার—১৬২

—তাসারুফ—১৬২

অসিয়ত—২৪৬

—সংজ্ঞা—২৪৬

অসি—২৪৯

—সীমা—২৪৬

—মুসালাহ্‌র গ্রহণ—২৪৭, ২৪৮

—পরিধি—২৪৮-২৪৯

—পদ্ধতি ২৪৯

—প্রত্যাহার ২৫০

www.pathagar.com

অংশীদারিত্ব—২৫৭-২৫৯
—শিরকাতুল আকদ—২৫৭
—শিরকাতুল মিলক—২৫৭
—চুক্তিভিত্তিক শর্ত—২৫৭
—প্রকার ভেদ—২৫৭-২৫৯
—শিরকাতুল মুয়াফাদাত—২৫৭-২৫৯
—শিরকাতুল আনান—২৫৭-২৫৯
—শিরকাতুল আমওয়াল—২৫৮
শিরকাতুল আমল—২৫৮
—শিরকাতুল ওয়াজুহ—২৫৮
—শিরকাতুল মোদারিবা—২৫৮
—বাদাআত—২৫৯
—করদ—২৫৯
—মুজারাআত—২৫৯
—মাসাফাত—২৫৯
—বিলোপ—২৫৯
অংশীদারের অধিকার এবং দায়িত্ব—২৫৯
অভিভাবক—২৭৮
—সম্পত্তি—২৭৯
অপরাধ—২৯৭ ২৯৯
—মায়াসিয়াত—২৯৭
—উকুবাত—২৯৭
অনুপূরক আদেশ—৩০৯
অভিব্যক্তি (আরবী) বাংলা ব্যাখ্যা—৩৩৭, ৩৩৮

আ

আইন—৪০
—আইন কর্মকর্তা—৪০, ৪১
—নির্ধারণের পন্থা—৪০
—আইনের জটিলতা—৪১, ৪২

www.pathagar.com

—প্রয়োগ-সূত্র ৪৩,৪৪,৪৫, ৪৭
—আইনের সংজ্ঞা ৩৫, ৫০
—আইনের উৎস—৫০,৫১, ৬৬, ৬৭,
—আইনের কাজ—৫৫
—আইনের পরিধি—৫৫
—উদ্দেশ্য—৫৫
—আইনের অধিকার এবং দায়িত্ব—৫৬
—আইনের প্রকৃতি—৫৭
—শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ—৬০,৬১,৬২,৬৩,৬৪, ৬৫
—অজ্ঞতা—১৮৫-১৮৮
চুক্তি-স্থানের প্রভাব—২০৩,২০৪
আমানত—২৫২
আমীনের দায়িত্ব—২৫২
আরিয়ত—২৫২
আসহাবুল ফরায়েদ—২৮১
আসাবা বি নফসিহি—২৮৩
আসাবা বি গায়রিহি—২৮৩
আসাবা মা গায়রিহি—২৮৩

ই

ইদ্দত—১১,২৭৪,২৭৫
ইজারা—১৫,২৫০-২৫১
ইজমা—২৭,৫৩, ৯৮,৯৯,১০৫,১০৬,১০৮,১০৯
ইসতিহসান—১৩৩,১৩৪,১৩৫
ইসতিসলাহ—১৩৪,১৩৫
ইসতিদলাল—১৩৫,১৩৬
ইজতিহাদ—১৩৭,১৩৮
ইসলাম কি—১৯৬
—ধর্মত্যাগী—১৯৯
—ইকরার—২৭৭

www.pathagar.com

ইমাম—৩২১
— রাজ্যপাল—৩২১
—নির্বাচন – ৩২২
—ইজমা—৩২২
—আয়ান—৩২২
—সুলতানাত—৩২২
—যোগ্যতা—৩২৩

উ

উত্তরাধিকার—১২, ১৩, ২৮০
—বাধা—২৮১
—রক্ত নিঃসম্পর্কিত—২৮৫,২৮৬
উইল—১৫,১৬
উরফ—২৭,৫৪
উসূল (আইনতত্ত্ব)—৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৪৮,১১৩,১১৪

এ

এজেন্সী—২৫৫

ও

ওয়ারিশান—১৬
ওয়াক্‌ফ—২৪২
—সংজ্ঞা—২৪২
—উদ্দেশ্য—২৪৩
সীমা—২৪৩
—সম্পত্তি—২৪৪
—সৃষ্টি—২৪৪
—প্রশাসন ও পরিচালনা—২৪৫
ওকালত—২৫৬
– মক্কেলের প্রতি দায়িত্ব—২৫৬
ওকালতির অবসান—২৫৬,২৫৭

www.pathagar.com

ক

কিয়াস—২৬,২৭,৫৩,১১৫
—অর্থ, পরিধি—১১৫,১১৬,১১৭
—শর্ত—১১৮,১২১
—ইল্লাত—১২২-১২৭
—মূল্য—১২৮-১৩২
কার্য—১৫২
—হিসসী—১৫২
—শরঈ—১৫২
—আফআলুল জাওয়ারিহ—১৫২
—কালব—১৫২,১৫৩
—কওল—১৫৩
—আমল—১৫৩
—তাসাররুফাত—১৫৪
—তাসাররুফাতুশশারঈ—১৫৪
—ইনশাআত—১৫৪
—আখবারাত—১৫৪
—শাহাদাত—১৫৪
—ইসবাতাত—১৫৪
—ইশকাতাত—১৫৪
—উকুদাত—১৫৪
—ফুসুখাত—১৫৪
কাজ—
—মুবাহিলাত—১৫৭
—মুন্আ'কিদ—১৫৭
—নাফিদ—১৫৭
—লাজিম—১৫৭
—মহল—১৭২
—তুরুকু-তাররওয়া—১৭৩
—খাতা—১৭৩
—ইখতিয়ার—১৭৩

www.pathagar.com

—নিয়ত—১৭৩
—শওক—১৭৩
—অভিপ্রায়—১৭৪,
—সম্মতি—১৭৩
—বিচার—১৭৫
—জ্ঞান—১৭৫
—গুরুত্ব—১৭৫-১৮৩
—বিস্মরণ—১৭৫
—পানোন্মত্ততা—১৭৮, ১৯৩
—ভ্রম—১৭৭
—হজল—১৭৯
—বলপ্রয়োগ—১৮৩
—মালজিউন—১৮৩
—গাইর মালজিউন—১৮৩
কার্যবিধি—৩০০, ৩০৭
কাজী
—নিয়োগ—৩২৭
—মহিলা—৩২৮
—অধিকার ও ক্ষমতা—৩২৮
—অন্যান্য কর্তব্য—৩২৮, ৩২৯

গ

গণ-সম্পত্তি—৩২৩
—বায়তুলমাল—৩২৩
—ওশর—৩২৩, ৩২৬
—মিরাজ—৩২৩
—জিজিয়া—৩২৩, ৩২৫
—যাকাত—৩২৩, ৩২৫
—খুমস—৩২৩

www.pathagar.com

চ

চুরি—৭
—চুক্তি—২২৩, ২২৮
—ফাআলিয়া—২২৩
—মাদ্‌দিয়া—২২৩
—সুরিয়া—২২৩
—গাঈয়া—২২৩
—মৌলিক উপাদান—২২৩
—মূলকথা—২২৪
—পূর্ণকরা—২২৪
—গঠন পদ্ধতি—২২৪
—শর্ত—২২৫, ২২৭
—যৌথচুক্তি—২২৮
—শ্রেণীবিন্যাস—২২৮
—সম্পত্তি হস্তান্তর—২২৮
—উৎপাদ হস্তান্তর—২২৯
—ইজারা ২২৯
—আরিয়াত—২২৯
—ওয়াদিয়াত—২২৯
—রেহেন এবং জামানত—২২৯
—বিবাহ—২২৯

জ

জমিনদারি—২৫৪, ২৫৫
জাবউল আরহাম—২৮৫

ড

ডিক্রী—৩০৭
—হুকুম—৩০৭
—খারিজ—৩০৮
—পক্ষবৃন্দ—৩০৮

www.pathagar.com

—বাতিল—৩০৮
—জারি—৩০৮
—তানফীদ—৩০৮

ত

তালাক—১০
—ইলা—১১, ২৭২
—জিহার—১১, ২৭২
—খুলা—১১, ১৭৩
—রাজাই—২৭০
—বাইন—২৭০
—আহছান—২৭০
—হাছান—২৭০
—বিদাত—২৭০
—তাফবিদ—২৭২
—মুবারাত—২৭২
—সরীহ—২৭২
—কেনায়া—২৭২
—ফুরকাত—২৭২, ২৭৪
তফসির—৩৫, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮
তফসিরের আভিধানিক অর্থ—৮৭
তকলিদ—১৩৭, ১৩৯
তাযাদ্রি—৩১০

দ

দিয়াত (রক্তপণ)—৪
দত্তক গ্রহণ—১২
দায়িত্ব—১৬৩, ১৬৪
—শ্রেণীভেদ—১৬৩
দায় বোধ—১৬৪
—আদা—১৬৪

www.pathagar.com

—কাদা—১৬৪
—কাসের—১৬৪
—কামেল—১৬৪
—সমতুল্য—১৬৪
দায়িত্বের উৎস হস্তান্তর—১৬৪-১৬৫
—রোকন—১৬৫
—ইল্লাত—১৬৫
—সবাব—১৬৫
— শর্ত—১৬৫-১৬৬,১৬৭
—কার্যকর কারণ—১৬৫
প্রস্তুতকারী কারণ—১৬৫
দাসত্ব—১৯৩-২০১
—দাসমুক্তি—১৯৪
—দাসের অধিকার—১৯৫
—বিবাহ এবং তালাকের অধিকার—১৯৫
—ব্যক্তিগত অধিকার—১৯৫
দাবী—৩০০,৩০৪
—মুদ্দাঈ—৩০১
—মুদ্দাআ আলাইহি—৩০১
—বিধিমালা—৩০২,৩০৩
—খসম—৩০৩

প

প্রথা এবং রীতি নীতি—২-৩
প্রবীণ পরিষদ—৩
প্রতিশোধমূলক শাস্তি—৬
পিতৃত্ব—৭,১১,
প্রতিকার—২৯৪,২৯৬
—কিসাস—২৯৪
—কওদ—২৯৪

www.pathagar.com

—দিয়াত—২১৪
— ইরস—২১৪

ফ

ফেকাহ ৪৮, ৪৯
ফাসিদ—১৫

ব

ব্যভিচার—৭
বিবাহ (নিকাহ)—৭, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩
—পদ্ধতি - ২৬৩
—প্রথা—৭
প্রকার - ৮
—মোহরানা—৮, ৯, ২৬৮, ২৬৯
— নারীর অধিকার —৯
বহু বিবাহ—৯
—নিষিদ্ধ বিবাহ (মুহারিম)—১০, ২৬৩, ২৬৪
বিবাহ বিচ্ছেদ—১০, ২৬৯
—বাতিল বিবাহ—২৬৪
—ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ—২৬৪, ২৬৪
—যোগ্যতা—২৬৫
—অভিভাবক—২৬৫, ২৬৬
—খেয়ারুল বুলুগ—২৬৫, ২৬৬
—অসম বিবাহ—২৬৭
—দাম্পত্য অধিকার—২৬৭,২৬৮
—পিতৃত্ব—২৭৫,২৭৭
বাই (বিক্রয়)—১৩,২৩০
—সরফ—১৩, ২৩১, ২৩৩
—সালাম—১৩.২৩১, ২৩৩
—মুরাবাহা—১৩
—মুসাওয়ামা—১৪

www.pathagar.com

—মুলামাসা—৯২
—মুজাবানা—৯৪
—মুহাকালা—৯৪
—মুনাবাজা—৯৫
—বাতিল—৯৫, ৯৬
—ইরবুন—৯৬
—শর্ত—২৩১
—ইসতিসনা—২৩৩
—রিবা—২৩৪
—আলওয়াফা—২৩৫
—ফেসখ—২৩৬
—খেয়ারুশ শরত—২৩৬
—খেয়ারুল আইব—২৩৬
—খেয়ারুত তাগরির—২৩..
বেলায়াত—২৭৮

ভ

ভরণ-পোষণ—২৭৫

ম

মনসুখ—১৮
মযহাব—২৫, ১৯৬
মালিক—২৯, ৩০
মুহাদ্দিস—৩৪
মাকরূহ—৯৫
মুজতাহিদ—১০১
—যোগ্যতা—১০১
—শ্রেণী—১৪৬,১৪৭. ১৪৮
—বিধান—১৪৯, ১৫০
মালিকানা—২০৫, ২০৬
—মাল—২০৬

www.pathagar.com

—মানকুলাত—২০৬
—মুতাত—২০৬
—মাল—২০৬,২০৭
—নাজিসুন—২০।
—বি আইনিহি—২০৭
মুবাহাতুল উসুনিয়া—২০৭
—আলো এবং বাতাস—২০৭
—আগুন—২০৮
—ঘাস—২০৮
—পানি—২০৮
—চারণভূমি এবং বন—২০৯
—জনসাধারণের রাস্তা—২০৯
—উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠান—২১০
—মাওয়াত—২১০
—সাইদ—২১০
—মুবাহাত—২১০
—স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি—২১০
—মনকুল—২১০
—অস্থাবর সম্পত্তি—২১০
—জমির সহিত যুক্ত—২১০
—জমি হইতে বিচ্ছিন্ন—২১১
—মাকিলাত—২১১
—মাউজুনাত—২১১
—আদাদিয়াত—২১১
—মাজরুআত—২১১
—মুকাদ্দারাত—২১১
—নকুদ—২১১
—উরুদ—২১১
—হাইওয়ানাত—২১১

www.pathagar.com

স

সদৃশ এবং বিসদৃশ—২১৯.
—মিসলী—২১৯
—মালিকানা অর্জন—২২১, ২২২
—ইহরাজ—২২১
—নকল—২২১
—খলফ—২২১
—আদি অর্জন—২২১
—দীর্ঘাধিকার—২২২
মক্কেলের প্রতি উকিলের দায়িত্ব—২৫৬
মামলার পক্ষবৃন্দ—৩০৫, ৩০৫
—শুনানী—৩০৫-৬
প্রতিবাদীর মাধ্যমে জওয়াব—৩০৬

য

যোগ্যতা—১৬৮-১৭৪
—সংজ্ঞা—১৬৮
—মাহকুম আলাইহি—১৬৮
—জিম্মী—১৬৮
—ধারণ ও প্রয়োগ—১৬৮
—আহলিয়াতুল ওয়াজুব—১৬৮
আহলিয়াতুল আদা—১৬৮
—প্রভাব—১৬৯
—কৃত্রিম ব্যক্তি—১৬৯
—বিভাগ—১৬৯
—সামাবি—১৭০
মাকসুবা—১৭০
—এখতিয়ার—১৭১
কাসদ—১৭১
থগির—১৮৮-১৯১

www.pathagar.com

—উন্মাদ—১৯২
—জড়বুদ্ধি—১৯২
—দুর্বল চিত্ত—১৯২
—মুফলিস—১৯৩
—অযোগ্য বৃত্তিধারী—১৯৩
—দাসত্ব—১৯৩-১৯৫
—অমুসলিম—১৯৬
অমুসলিম আইন ও প্রথা—১৯৮
—ধর্মত্যাগী—১৯৯
মতভ্রষ্ট ব্যক্তি—১৯৯
—মৃত্যু ব্যধিগ্রস্ত মানুষ—২০০-২০২
যোগ্যতা
—মৃত ব্যক্তি—২০২

র

রক্তপণ (দিয়াত)—৪
রিবা—১৫
রেহেন ২৫৩
—গ্রহীতার অধিকার—২৫৩
—গ্রহীতা ও দাতার দায়িত্ব—২৫৩-২৫৪
—গ্রহীতার প্রতিকার—২৫৪

শ

শাফিঈ—৩০,৩১
শাস্তি—২৯৮
—হদ্দ—২৯৭,২৯৮,
—ওবহাতুল মহল—২৯৮
—ওবহাতুল ফিইল—২৯৮
—তাযিরির—২৯৮,২৯৯
শাহাদাত—৩১২
—সাক্ষ্য আইনতত্ব—৩১১
—সাক্ষ্যের শ্রেণী—৩১৩

www.pathagar.com

—ভাওয়াতুর—৩১৩
— আহাদ—৩১৩
—একরার—৩১৩
—সাক্ষীর যোগ্যতা—৩১৩,৩১৫
— প্রত্যক্ষ—৩১৫
—অপ্রত্যক্ষ—৩১৫
—দাবীর সহিত সাদৃশ্য—৩১৬
— ইসতিসহাবুল হাল—৩১৭
—অবস্থাভিত্তিক সাক্ষ্য—৩১৮
— দালিলিক সাক্ষ্য—৩১৯
—প্রত্যাহার—৩২০
—বায়ানদ-দারুরাত—৩২০

স

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন—৪৬
সম্পত্তি—২১১—২২০
—মনকুল এবং গায়রে মনকুল—২১০-২১১
—মাকিলাত—২১১
—মওজিনাত—২১১
— আদাদিয়াত—২১১
—মজরুআ'ত—২১১
—উরুর—২১১
—মিসলী—২১১
—কিমী—২১২
—আইনী—২১২
—দাইত—২১২
—ব্যবহার ও ভোগ—২১৩
—পশ্চাৎ ভার—২১৪
—সুখাধিকার—২১৫

www.pathagar.com

—হক্কুল মারুর—২৯৫
—হককুল মাজরা—২১৫
—হককুল মাসিল—২১৫
—হককুশ শুফা—২১৫, ২১৬
—তানাবুল মোয়াছিবাত—২১৭
—তালাবুত তাকরির—২১৭
—তালাবুল খুসুমাত—২১৭
— দখল—২১৮-২২০
—হাকিকি দখল—২১৮
— হকমি দখল—২১৮
—মিল্কুল ইয়াদ (দখলী স্বত্ব)—২১৮
সম্পত্তি
—গাসিব—২২০
—স্বত্বমালের দখল—২২০
— পূর্ণ বা অপূর্ণ দখল— ২২০
— হাওয়ালাত—২২৯
— সুফনজা (একচেঞ্জ)—২৩০
—বাই (বিক্রয়)—২৩০
—উকিলের হাতে সম্পত্তি—২৫৬
সালিশ ৩১০
সম্বন্ধ
—মুসলিম এবং অমুসলিম আইন—৩:০
—যুদ্ধ ঘোষণা—৩৩০
—শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক—৩৩১
— শত্রু রাষ্ট্রের সৈনিকের জীবন ও সম্পত্তি—৩৩১
— যুদ্ধের সময় মুসলিমদের কর্তব্য—৩৩২
— সন্ধি বা চুক্তি—৩৩২
— দারুল ইসলাম—৩৩৩
—দারুল হরব—৩৩৩
—জিম্মির নিরাপত্তা—৩৩৩
—বিদেশে নাগরিকের কর্তব্য—৩৩৫-৩৬

www.pathagar.com

হ

হলফ—৪, ৫, ৬

হস্তান্তর – ১৩

বিনিময় – ১৩

হানাফী– ২৮, ২৯

হামবলী—৩১, ৩২

হাদিস বিজ্ঞান– ৩২, ৩৩

হাদিসের বিশুদ্ধতা ও শ্রেণীবিন্যাস—৭০, ৭১

হিবা—২৩৬

—মুসা—২৩৭

—দখলের প্রকৃতি—২৩৭

—দানের পরিধি—২৩৮

— শর্তাধীন দান —২৩৯

—দান গ্রহিতা—২৩৯

—রাজায়াত – ২৪০

—হিবাবিশাতিল এওয়্যজ—২৪১

—হিবাবিল এওয়াজ—২৪১

হিজানাত—২৭৯

ক্ষ

ক্ষতি—২৮৭, ২৯০

—জানায়াত—২৮৯

—গাসাব—২৮৯

—তালাক-লোকসান—২৮৯

—ইরাহ—২৮৯, ২৯২

—তাগরিদ—২৮৯, ২৯৩

—দেহ এবং সম্পত্তি—২৮৯,

—দায় – ২৯০-২৯১

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

সাধারণ আইন

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য।
২. সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ভাষ্য।
৩. সাক্ষ্য আইনের ভাষ্য।
৪. দণ্ডবিধির ভাষ্য।
৫. চুক্তি আইনের ভাষ্য
৬. পণ্য বিক্রয় আইন ও অংশীদারী আইনের ভাষ্য।
৭. বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা।
৮. Copyright Laws in Bangladesh.
৯. Laws Relating to Children in Bangladesh.

ইসলামী আইন

১০. মুসলিম আইনের রূপরেখা।
১১. ইসলামী আইনতত্ত্ব।
১২. ইসলামী আইন।
১৩. ইসলামী আইন ব্যবস্থা : নারী ও শিশু প্রসংগে।

ছোট্ট গল্প

১৪. আইনের চোখে।
১৫. আইনের আলোকে।
১৬. আইনের অন্ধকারে।
১৭. আড়ালে তার সূর্য হাসে।

উপন্যাস

১৮. এক পুরুষ দুই স্ত্রী।
১৯. ইস্রাব ফকির।
২০. রাহেলার মামলা।

নাটক

২১. নয়া শপথ।
২২. উত্তরোল।
২৩. কলরোল।

শিশু কিশোর সাহিত্য

২৫. নবীদের কথা।
২৬. সৈয়দ আমীর আলী।
২৭. এমাম মালেক।

গীতি নাট্য

২৪. মন্মক।

বিবিধ

২৮. নজরুলের বিচার ও কারাদণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com